আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

খণ্ড ১ • সংখ্যা ১ • ডিসেম্বর ২০২১

প্রবন্ধ

জেগার্স ডব্লিউ কোলদকো
অনুবাদ: সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০: যুদ্ধ অর্থনীতি-রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র-মহামারি সংকট

আবুল বারকাত
"বঙ্গবন্ধু-দর্শন": তত্ত্ব, প্রয়োগ ও "উচ্ছেদিত সম্ভাবনা"

মইনুল ইসলাম
বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য: সমাধান কোন্ পথে?

আবুল বারকাত
বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কত দূর যেতো?

আবুল বারকাত
করোনাভাইরাস: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র

আহমেদ জাভেদ
বাংলাদেশে নীতি ও ন্যায্যতা চিন্তার ভূমিকা এবং অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতার ভাবনা

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন
উন্নয়ন ভাবনায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বনাম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যবেক্ষণমূলক পর্যালোচনা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
কৃষিপণ্যের (ধানের) মূল্য, প্রান্তিক কৃষকদের ভালোবাসার অর্থনীতি

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
রাজশাহীতে বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মোহাম্মদ জাকারিয়া, সজীব কুমার রায়
রংপুর বিভাগে উন্নয়ন সম্ভাবনা ও সমস্যা

এস এম আবু জাকের
চট্টগ্রামের ব্যাংকিং এবং কতিপয় বিশেষ ঝুঁকি

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর বিভাগের অনগ্রসরতা: উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

সমকাল পর্যালোচনা

বাবুর আলী গোলদার
দক্ষিণ-পশ্চিম জলাবদ্ধ উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ
রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

সুকুমার ঘোষ
নওয়াপাড়া নদীবন্দর: সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ সাইদুর রহমান
বাংলাদেশে পেঁয়াজ অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

খণ্ড ১ সংখ্যা ১ ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক

ড. আবুল বারকাত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একটি ষান্মাসিক প্রকাশনা
[বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমকাল পর্যালোচনা-গ্রন্থ পর্যালোচনা ও বিদেশি ভাষা থেকে অনূদিত লেখাসমূহে উপস্থাপিত যাবতীয় তথ্য-তত্ত্ব ও মতামত লেখকদের একান্তই নিজস্ব। এক্ষেত্রে সম্পাদক ও প্রকাশক কোনো দায় বহন করেন না।]

কৃতজ্ঞতা
বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রকাশে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ

আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২

মূল্য: টাকা ৩০০ (দেশে), মার্কিন ডলার ২০ (বিদেশে)

জার্নাল ক্রয়/সাবস্ক্রিপশন-এর জন্য যোগাযোগ করুন:
প্রযত্নে, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৮৮০-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org

সম্পাদকীয়

মানুষের যাপিত জীবনে কর্মে ও মননে বোধোদয়নের প্রথম পাঠ হওয়া উচিত নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ হওয়া। কিন্তু পরিতাপের বিষয়—দুর্বৃত্ত অর্থ ও পুঁজির দৌরাত্ম্যে জর্জরিত 'রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি' ব্যবস্থায় ব্যক্তির চারপাশ থেকেই সু-নীতি বিলীন হয়েছে। পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে কু-নীতিনির্ভর সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতা। লোভ-লালসার কালোছায়া এখন বিবেকের আঙিনায় সদর্পে বিচরণ করে। সর্বব্যাপ্ত অন্যায়-অনাচারে সুবিচারের আশা এখন ক্ষীণ। এমনই এক প্রেক্ষাপটে 'কভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস' নামক এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসও বৈশ্বিক মহামারির সৃষ্টি করে আমাদের অস্তিত্ব নিয়েই টানাহ্যাঁচড়া শুরু করেছে—আমাদের জীবনকে গভীর অনিশ্চতায় নিক্ষেপে করেছে। তাই তো সবারই ব্যাগ্র জিজ্ঞাসা—এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কী? পথ নিশ্চিতভাবেই আছে। এবং তা আছে আমাদের হাতেই। কারণ, সৃষ্টিজগতে আমরা 'মানুষ'ই শুধু ঘোর অমানিশা ভেদ করে আলোকিত পথ রচনা করতে পারি। জটিল ও কঠিন এই বাস্তবতায় মুক্তির পথ অন্বেষণে এবং সঠিক নির্দেশনার মানসে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই-ই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলো 'বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি'।

আমাদের এই উদ্যোগটি বিশেষ এক তাৎপর্য বহন করে এই জন্য যে, শুধু প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তক ও বরেণ্য গবেষকেরাই নন, তরুণ ও মেধাবী অর্থনীতিবিদ ও গবেষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর লেখায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি। কৃতী এই মানুষদের কেউ কেউ জাতির কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখা-স্তরে স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁদের। নীতি-নৈতিকতা নিয়ে তাঁরা অহর্নিশ ভাবেন। ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করে মানুষের জীবনকে শোভন ও আলোকিত করাই এই মানুষদের ধ্যান-জ্ঞান। স্বভাবতই তাঁদের লেখনিতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ রয়েছে, রয়েছে অনাগত কোনো শঙ্কার কথা অথবা নির্মোহ প্রত্যাশা। এবং এর সবই প্রকাশ পেয়েছে 'কভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস'-এর মহাবিপর্যয়ের ঠিক অব্যবহিত আগে আগেই অর্থাৎ ২০১৯-২০ সময়কালে। কারও কারও লেখায় মানবসমাজের বর্তমান মহাবিপর্যয়কর এই অবস্থার প্রচ্ছন্ন আভাসও পাওয়া যায়। ধীমান এই লেখকেরা নিজেদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আপন সময়কে ধরে রেখে নৈতিকতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন অনুপুঙ্খ। এবং সে কারণে তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের এই যুগসন্ধিক্ষণে পথনির্দেশনা পাওয়া যে খুবই সম্ভব—সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই জার্নাল নানা মাত্রিকতায় সাবলীল লেখনিসমৃদ্ধ সু-নীতি ও কু-নীতির বিশেষ এক পরিক্রমা। নানান প্রসঙ্গে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের মননদীপ্ত প্রকাশভঙ্গি এবং লেখনির বিপুল বৈচিত্র্য ও উদ্ভাস আমাদের আশান্বিত করে। তাঁদের অজস্র আপন ভাবনার প্রকাশ—আমাদের মন-মননকে শোভন করবে; সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে করণীয় বাতলে দেবে—সর্বোপরি মানুষের বিবেককে গ্রহণ-বর্জনের যৌক্তিক বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেবে। অর্থনীতিশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের শুধু অন্যতম শাখাই নয়; এর শেকড় দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের অনেক গভীরে প্রোথিত, সুবিন্যস্ত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিশাস্ত্রের চর্চায় নীতিনৈতিকতা এখন কতটুকু বিদ্যমান—সে নিয়ে সাধারণমনের সকরুণ জিজ্ঞাসা আমাদের ভাবিত করে, অনেক ক্ষেত্রে দুঃশ্চিন্তিত এবং ব্যথিতও করে। সে কারণে অর্থশাস্ত্রঘনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে লেখকদের

গভীর উপলব্ধির প্রতিফলনসমৃদ্ধ এই জার্নাল কাল-পর্বের বিস্তৃত এক আলেখ্য, যা আমাদের চিন্তার খোড়াক দেবে—বিবেক চেতনায়নে তাড়িত করবে।

এই জার্নালে স্থান পাওয়া লেখাগুলোর সবই অভ্রান্ত-অকাট্য, তেমনটি বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। জ্ঞানার্জনের পথ সরলরৈখিক নয়, মসৃণ তো নয়-ই—জ্ঞানের পথ চলায় তাই তর্ক-বিতর্ক থাকাই স্বাভাবিক। তবে কিছু প্রবন্ধের মর্মবাণী অগণন হরফের ভিড়ে কখনোই হারিয়ে যাওয়ার নয়, এর মূল্য চিরকালীন-সর্বজনীন। কারণ—প্রবন্ধে অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে একবিংশ শতকের বৈশ্বিক জীবনে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নব্য-ফ্যাসিস্ট আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, বর্বর পুঁজিবাদ, তথাকথিত নব্য উদারবাদ, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, যুদ্ধ, সভ্যতার সংকট; জাতীয় জীবনে আমাদের স্বদেশভূমি বাংলাদেশের সৃষ্টি ও ছন্দপতন, বাঙালি জাতির পিতার হত্যা ও অসময়ে তিরোধানে আমাদের অন্ধকারযাত্রার উৎসের সন্ধান এবং তা থেকে উত্তরণের পথনির্দেশনা; আছে মৌলবাদ, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, গ্রাম-শহরনির্বিশেষে মানুষের নিদারুণ ক্লেশের অনুসন্ধান ও তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; আছে আমাদের স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ নানা বিষয়ের গভীর বিশ্লেষণ। এসব প্রবন্ধ পাঠ শেষে যে-কেউই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন—প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব দাবিকারী হিসেবে নৈতিকতা-মনুষ্যত্ববোধ ফিরিয়ে আনাই এখন সবচেয়ে জরুরি। আর এই উপলব্ধিবোধই কেবল আমাদের সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম।

বাংলা ভাষায় লেখা নির্মোহ ও নিরেট তত্ত্ব ও তথ্যের আকর এই জার্নালের আলোকোজ্জ্বল লেখাগুলোর জন্য লেখকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। মানবসমাজের শোভন জীবনের আকুতি নিয়ে একঝাঁক জ্ঞানীর এই প্রবন্ধসমগ্রের পাতায় পাতায় ফুটে ওঠা—মানুষের প্রতি ভালোবাসা—আমাদের গর্বিত করেছে। সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কার্যনির্বাহক কমিটি, সমিতির সম্মানিত সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা। এই সংখ্যায় গ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহ যথারীতি পর্যালোচিত এবং সম্পাদকীয় পর্ষদের অনুমতিসাপেক্ষে প্রকাশ করা হলো। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া আমাদের বর্তমান বাস্তবতা পেছনে ফেলে বৈষম্যহীন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার পথ রচনার স্মারক এই জার্নাল বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ঐশ্বর্য্য ও গর্ব।

আবুল বারকাত
সম্পাদক, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

১. ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০: যুদ্ধ অর্থনীতি-রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র-মহামারি সংকট ১
জেগার্স ডব্লিউ কোলদকো
অনুবাদ: সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

২. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন": তত্ত্ব, প্রয়োগ ও "উচ্ছেদিত সম্ভাবনা" ২৭
আবুল বারকাত

৩. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য: সমাধান কোন পথে? ৫৫
মইনুল ইসলাম

৪. বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কত দূর যেতো? ৯১
আবুল বারকাত

৫. করোনাভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র ১১৫
আবুল বারকাত

৬. বাংলাদেশে নীতি ও ন্যায্যতা চিন্তার ভূমিকা এবং অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতার ভাবনা ১২৫
আহমেদ জাভেদ

৭. উন্নয়ন ভাবনায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বনাম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যবেক্ষণমূলক পর্যালোচনা ১৪৯
মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন

৮. কৃষিপণ্যের (ধানের) মূল্য, প্রান্তিক কৃষকদের ভালোবাসার অর্থনীতি ১৬৭
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

৯. রাজশাহীতে বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ১৭৯
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

১০. রংপুর বিভাগে উন্নয়ন সম্ভাবনা ও সমস্যা ১৯১
মোহাম্মদ জাকারিয়া, সজীব কুমার রায়

১১. চট্টগ্রামের ব্যাংকিং এবং কতিপয় বিশেষ ঝুঁকি ২০৩
এস এম আবু জাকের

১২. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর বিভাগের অনগ্রসরতা: উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান ২১৯
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

সমকাল পর্যালোচনা

১. দক্ষিণ-পশ্চিম জলাবদ্ধ উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা ২৩৩
বাবুর আলী গোলদার

২. রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ ২৩৯
বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ

৩. নওয়াপাড়া নদীবন্দর: সমস্যা ও সম্ভাবনা ২৫৩
সুকুমার ঘোষ

৪. বাংলাদেশে পেঁয়াজ অর্থনীতির গতি প্রকৃতি: একটি পর্যালোচনা ২৫৯
মোঃ সাইদুর রহমান

গ্রন্থ পর্যালোচনা • গ্রন্থ আলোচনা • অনূদিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" ২৬৩
গ্রন্থকার: আবুল বারকাত

গ্রন্থ পর্যালোচনা

১. অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা ২৬৫
মো. আব্দুল হান্নান

২. কভিড-১৯: বাংলাদেশের শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন, আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি ও করণীয় ২৭৩
মতিউর রহমান, শিশির রেজা

গ্রন্থ আলোচনা

১. "পুঁজিবাদ যে অসভ্য-বর্বর সে ব্যাপারে আমি ড. আবুল বারকাতের সঙ্গে একমত।" ২৭৭
মহিউদ্দিন খান আলমগীর

২. "পরিষ্কারভাবেই বলি, অনেক ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে।" ২৮৯
সুশান্ত কুমার দাস

অনূদিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১. "হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার" ৩০৩
গ্রন্থকার: অমর্ত্য সেন
অনুবাদ: আহমেদ জাভেদ

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ০১-২৫
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০: যুদ্ধ অর্থনীতি-রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র-মহামারি সংকট*

মূল: জেগার্স ডব্লিউ কোলদকো**
অনুবাদ: সুভাস কুমার সেনগুপ্ত***

সারসংক্ষেপ *করোনা ভাইরাস মহামারি সৃষ্ট সংকট সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে মানুষের জীবনযাত্রার মান রক্ষা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ও সেবা কার্যক্রম টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে অপ্রচলিত ব্যবস্থা গ্রহণে প্রণোদিত করেছে। আগ্রাসীভাবে অর্থের জোগান বাড়ানোর নীতি অনুসরণের ফলে বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি প্রক্রিয়াগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর প্রভাব কতটুকু তা বিবেচনা করা এবং অর্থনৈতিক নীতিসম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সূচকগুলোর তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যেই বেশি, কেননা, এটি আংশিকভাবে অবদমিত। সাধারণ দামে স্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় না। আমরা ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি—একই সাথে মুদ্রাস্ফীতি এবং ঘাটতিসহ অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছি। যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে, ১.০ এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিতে ২.০ এর সাথে মুদ্রাস্ফীতি অবদমনের এই বর্তমান ঘটনা, ৩.০ এর সাথে তুলনা করা পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয়। এ ধরনের তুলনা শুধু এসব প্রক্রিয়ার সাদৃশ্যই নয় বরং, বিভিন্ন পরিবার ও ব্যবসার সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াগুলোর পার্থক্যও তুলে ধরে। এই নিবন্ধে অতিরিক্ত সঞ্চয় অবমুক্তির পাঁচটি প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা মহামারি পরবর্তী ভবিষ্যতে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা দেবে। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কে স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয়ে রূপান্তরের জন্য উদ্যোগী হওয়া এবং সেইসাথে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুদ্রার মজুদকে কার্যকর চাহিদায় পরিণত করতে নতুন সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহার ও বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।*

* মূল প্রবন্ধটি ইংরেজি ভাষায় রচিত, যা অধ্যাপক জেগার্স ডব্লিউ কোলদকো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমিতে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছেন। — সম্পাদক

** অধ্যাপক, রাজনৈতিক অর্থনীতি; প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী, পোল্যান্ড; ফোন: +৪৮ ২২ ৫১৯ ২১ ০৭, ই-মেইল: kolodko@tiger.edu.pl

*** অধ্যাপক, সিনিয়র রিসার্চ কনসালটেন্ট, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি); ফোন: ০১৮২৫ ০৪২০২৯, ই-মেইল: subassengupta@gmail.com

মূল শব্দ অবাধ মুদ্রাস্ফীতি, অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি, অর্থ সরবরাহ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, মহামারি, জেইএল শ্রেণিবিন্যাস সূচি: সি২০, ডি১৪, ই২১, জি৪০, পি২২, পি৫১

ভূমিকা

আমরা কি মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রক্রিয়াগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য ত্বরণের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি? যদিও কেউ কেউ এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অথবা পরবর্তী বিপর্যয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন; অন্যরা এর বিপরীতে, দাম বৃদ্ধির ন্যূনতম পূর্বাভাস দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামেন। দুটি ভিন্ন মতামতের কারণে সব ক্ষেত্রে যেমনটি হয়, তেমনি এই সময়েও প্রথমে বিতর্কের বিষয়টি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং বিতর্কের কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলোর সঠিক সংজ্ঞায়ন প্রয়োজন। কখনো কখনো এমনও হয়—একই ঘটনা ও একই রকম ধারণা বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অন্য সময়ে একই ঘটনা ও উন্নয়নকে অভিহিত করা হয় ভিন্ন আঙ্গিকে, যা অনেক বিভ্রান্তি তৈরি করে। এতে, শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রেও ভুল প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

বৈশ্বিক মহামারির প্রেক্ষাপটে মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতির সম্ভাব্য বিবর্তনের উত্তর খুঁজতে গিয়ে, যা আসলেই মানবিক; কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সেক্ষেত্রে পুরো বিষয়টি সঠিক অনুধাবনের জন্য প্রথমে মুদ্রাস্ফীতির যথাযথ শ্রেণি বিন্যাস প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে জটিল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি, তা যতটা আর্থিক, ততটাই সামাজিক প্রকৃতির—যা উভয়ই একদিকে রাজনীতির ওপর নির্ভর করে, অন্যদিকে রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু একই সাথে ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক সত্তার সিদ্ধান্ত—পরিবার এবং যেকোনো ধরনের ব্যবসার সিদ্ধান্তের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

সমকালীন মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণগুলো যদিও ইতিহাসে অনন্য, এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে সম্পর্কে রাষ্ট্র, সমাজ এবং অর্থনীতিগুলো ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। অতএব, এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, তা থেকে কীভাবে, কখন, কোনটি করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন রূপ

মুদ্রা সংকোচনের কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে—একটি বিপরীত প্রক্রিয়া—মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা সারা বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়। আর্জেন্টিনা এবং তুরস্কের মতো দেশগুলো ছাড়া, যেখানে ২০২১ সালে ভোক্তা দাম সূচক বা কনজুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) যথাক্রমে প্রায় ৪৩ এবং ১২ শতাংশ হবে বলে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) পূর্বাভাস দিয়েছে, সেখানে কার্যত অর্থনীতির জন্য বাস্তবে ক্ষতিকর নয় এমন স্তরে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। এটি মৃদু মুদ্রাস্ফীতি। স্বভাবতই, 'গেলোপিং ইনফ্লেশন' বা দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান মুদ্রাস্ফীতি, এমনকি 'হাইপারইনফ্লেশন' বা অতি মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত ভেনিজুয়েলা (ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সিপিআই প্রায় ২৯৬০ শতাংশ) এবং জিম্বাবুয়ে (যথাক্রমে, প্রায় ৩৫০ শতাংশ)।

অধিকাংশ অর্থনীতিতে, সার্স-কোভ-২ এর মহামারি সংকটের কারণে অনেক রাষ্ট্রের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো শান্তিকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রচলন করেছে। সেগুলো যদিও সচরাচর

ব্যবহৃত কাগজি মুদ্রা নয়, তবু এটি এখনো 'ছাপানো মুদ্রা' হিসেবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিচিত। সুতরাং, যদি দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃত জোগান ছাড়াই প্রচুর অর্থ 'ছাপানো' হয়ে থাকে তবে প্রশ্ন হলো, এতে মুদ্রাস্ফীতি কেন ত্বরান্বিত হয়নি? বিপরীতে, অন্যরা বিশ্বাস করে—কয়েক মাস আগের তুলনায় এটি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে: "অনিবার্য ঘটনা শুরু হয়েছে। মার্চ মাসে আমেরিকার ভোক্তা দাম সূচক (সিপিআই) এক বছর আগের তুলনায় ২.৬ শতাংশ বেশি ছিল, যখন মহামারি শুরু হওয়ার সাথে সাথে দামগুলো আকস্মিকভাবে কমে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে ১.৭ শতাংশ থেকে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি ছিল ২০০৯ সালের পরে সবচেয়ে বড় উত্থান, শেষবারের মতো অর্থনীতি গভীর আঘাত সামলে নিয়ে ফিরে এসেছিল যথাস্থানে। মে মাসের মধ্যে সিপিআই ৩.৫ শতাংশের উপরে পৌঁছতে পারে" (ইকোনমিস্ট ২০২১বি)। এই পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো—বিবৃতিটি ধনী দেশগুলোর জন্য নির্দিষ্ট মানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আমাদের মনে রাখা উচিত, সেখানে বসবাসকারী এক-সপ্তমাংশ মানুষ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের সমগ্র উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকেরও কম উৎপাদন করছে।

মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যেই বেড়েছে, এ ছাড়া আমরা আংশিক অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছি। অর্থের বাড়তি জোগান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলন থেকে অনেকাংশেই প্রত্যাহার করা হয়েছে এই অর্থে যে, মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থনীতির অঙ্গগুলোকে অবরুদ্ধ করার কারণে এটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসেবে নিশ্চল হয়ে গেছে। সর্বোপরি, এটি একটি ক্রান্তিকালীন অবস্থা এবং শেষ অবধি এসব তহবিল পাঁচটি প্রণালির মাধ্যমে নিজস্ব পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারবে:

১. কার্যকর চাহিদা বাড়বে এবং তা উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে,
২. আমদানি বৃদ্ধির ফলে জোগান বাড়বে, তবে লেনদেনের ভারসাম্যের অবনতি ঘটবে,
৩. স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয় বাড়বে,
৪. শেয়ার ও রিয়েল এস্টেটসহ পণ্য ও সম্পদের দাম বাড়বে,
৫. মুদ্রাস্ফীতির ফলে দাম বাড়বে।

এগুলোর অনুপাত আগে থেকে আমাদের জানা নেই, তবে সমস্যাটি যে প্রাসঙ্গিক সেটা ঠিক। উদাহরণস্বরূপ আগে থেকেই লেনদেনের উদ্বৃত্ত বা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রয়েছে এমন দেশগুলোর পক্ষে দ্বিতীয় প্রণালি ব্যবহার করা সহজ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানি ও রাশিয়া একটি ভালো অবস্থানে রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের অবস্থা সে তুলনায় সঙ্গীন। তবে, আমরা জানি, যেকোনো অবস্থায়, প্রথম ও তৃতীয় প্রণালীর আকারগুলো বাড়ানো প্রয়োজন।

মহামারির ব্যতিক্রমী ধরননির্বিশেষে অনেক দেশেই সামগ্রিক সঞ্চয় হারের দীর্ঘমেয়াদি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে যদি সঞ্চয়ের হার কম হয়, যেমনটি সমাজতন্ত্র-উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বাড়তি সঞ্চয় প্রবণতা, ব্যয়যোগ্য আয়ের ক্রমবর্ধমান অনুপাতকে আলাদাভাবে রাখার জন্য, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সম্ভাবনা, জনগণের বার্ধক্য এবং ভোগের ধরন পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে মুদ্রাস্ফীতি হলো সাধারণ দাম স্তরের বৃদ্ধি। উদারীকৃত বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বাড়লে বুঝতে হবে দাম স্তর বেড়েছে (ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি); অথবা অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দাম বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে (চাহিদা-প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি)। অর্থনৈতিক বাস্তবতায়, এ দুটি রূপ সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও সমভাবে নয়। পরিবারের জন্য এটি আসলে কোনো বিষয় নয়; দাম বাড়ছে, তাই জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে। আর সে কারণেই আমরা মুদ্রাস্ফীতি পছন্দ করি না। কিন্তু কেন দাম বাড়ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন অন্যদের কাছে—অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদের কাছে।

আমরা মুদ্রাস্ফীতি পছন্দ করি না কেননা, এটি সাধারণ দাম স্তরের বৃদ্ধি, যেখানে এই বৃদ্ধির গড় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার দামগুলোর বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের ফল। বর্তমানে, মহামারির পর চাহিদা এবং সরবরাহ অভিঘাতের কারণে এই বৈচিত্র্য অস্বাভাবিক বেশি এবং প্রসঙ্গত বিরক্তিকর। উদাহরণস্বরূপ, পোল্যান্ডে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের (জিইউএস) সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ দাম স্তর সামান্য বেড়েছে—২.৪ শতাংশ, গত বছর, ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯, এবং ৩.৪ শতাংশ, বার্ষিক গড়গুলোর সম্পর্ক বিবেচনা সাপেক্ষে। তবে এসব সূচক থেকে বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ৫১.১ শতাংশ ও ফলের ক্ষেত্রে ১৭.৬ শতাংশ দাম বৃদ্ধি এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামের দাম ১০.৯ শতাংশ বা পোশাকের দাম ৩.০ শতাংশ কমে যাওয়ার কারণে এ ধরনের বড় ধরনের পার্থক্যগুলো ধরা পড়ে না। বিভিন্ন ধরনের পণ্যের দামের ওঠানামার প্রসারণ, তাদের বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটির তুলনায় গড়ের সাথে আরও বেশি সংযুক্ত থাকে, এর ফলে আয়ের পুনর্বণ্টন হয় অনেক বেশি পরিমাণে; এটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অযৌক্তিক; কেননা তা শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন থেকে উৎসারিত নয়।

নামিক আয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের স্তর ব্যয়ের কাঠামো এবং সেইসাথে মুদ্রাস্ফীতির সংশ্লিষ্ট তীব্রতা নির্ধারণ করে। যদি, ধরা যাক, পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারের নিট আয় পিএলএন ১০ হাজার, তাহলে তারা মাথাপিছু ২ হাজার থেকে অর্ধেকেরও বেশি খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। পোল্যান্ডে খাদ্যের দাম গড়ে ৫ শতাংশ বেড়েছে (বছর বছর), যা সার্বিক ভোক্তা দাম সূচকের তুলনায় অর্ধেক বেশি। যখন তিনজনের একটি পরিবারের কাছে পিএলএন ৪০ হাজার থাকে, তখন তারা খাদ্যের জন্য পিএলএন ১০ হাজার খরচ করে, এভাবে রুটির দাম ৮.১ বা মাংসজাত সামগ্রী ৯.৫ শতাংশ বাড়লে তারা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্রব্য সেবার নিজস্ব দামের গতিশীলতায় এ ধরনের পার্থক্যের কারণে জনসাধারণের ধারণায় মুদ্রাস্ফীতি প্রকৃতপক্ষে যা হবে তার চেয়ে হিসাব করা হয় অনেক বেশি। আমরা এর সঠিক স্তরটি জানি না, তবে কয়েকটি দেশে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি নিশ্চিতভাবে প্রদর্শিত সরকারি সূচকগুলোর তুলনায় বেশি।

মহামারি ব্যয় এবং ভোগের কাঠামো মূলত বদলে দিয়েছে এবং যেসব সামগ্রী আমরা এখন বেশি পরিমাণে কিনছি সেগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে আরও বেড়েছে। তবে এর বিপরীত প্রবণতাগুলোও লক্ষণীয়। বিশেষ করে, যেসব ডিজিটাল সেবার ক্রয় বাড়ছে সেগুলোর দাম কমে গেছে। পারিবারিক বাজেটগুলোর পরিসংখ্যানিক জরিপে ব্যবহৃত বাজারে কেনাকাটার বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, এসব পরিবর্তনের ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ে (রেনস্ডর্ফ ২০২০)। এ ছাড়া পরিবারের কেনা পণ্য ও পরিষেবার খুচরা মূল্যের সরকারিভাবে নিরূপিত সূচকে রিয়েল এস্টেট, বিশেষ করে আবাসনের ক্রমবর্ধমান দাম বিবেচনায় নেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ ২০২০ সালে পোল্যান্ডে, এগুলো গড়ে ৮.৯ শতাংশ বেশি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, এর মধ্যে প্রাথমিক বাজারে ৬ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বাজারে প্রায় দ্বিগুণ—১১.২ শতাংশ।

তবু, মানুষ অনুভূতিহীন বিশ্লেষক নয়। তারা গড় হিসাব করে না এবং শেয়ার ও ওজন অনুমান করে না, কিন্তু সহজেই তাদের নিজ থেকে খণ্ডিত তথ্য মেনে নেয়, একেবারেই পেশাদার পর্যবেক্ষণ নয়, কিন্তু—প্রায়ই গণমাধ্যমের পণ্ডিতদের বিভ্রান্তিকর পরামর্শকে গুরুত্ব দেয়। মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি এমনই: কোনো ব্যক্তি যিনি একজন কেশবিন্যাসকারীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তিনি বলেন, "সবকিছুই অনেক বেশি ব্যয়বহুল হচ্ছে, কয়েক শতাংশ!" (পোল্যান্ডে ২০২০ সালে কেশবিন্যাস এবং বিউটি সার্ভিসের দাম গড়ে ১১.১ শতাংশ বেড়েছে); কিন্তু গ্যাস স্টেশন থেকে বের হওয়ার সময় একই ব্যক্তি দাবি করেন না যে

"সবকিছুই সস্তা হচ্ছে, ১০ শতাংশের বেশি!" (জ্বালানির দাম ১০.৭ শতাংশ কমেছে) এই বিষয়গত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাগুলো শক্তিশালী করে। যেহেতু জনসাধারণের ধারণা—"সবকিছুই অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে" একটি বড় মাত্রায়, তাহলে বাস্তব বিশ্বে এটি আরও বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে; কারণ, দামগুলো প্রত্যাশার সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ছাড়া, যদি জীবনযাত্রার খরচ বাড়তে থাকে, কর্মচারীদের এর ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন হয় বা এমনকি ক্ষতিপূরণ দাবিও করতে পারে, অর্থাৎ মজুরি ও সুবিধা বাড়াতে হয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত; সরকারের মতে দাম যতটা বাড়ে ততটা নয়, বরং যতটা 'সত্যিই' বাড়ে। শ্রমবাজারের কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকের ঘাটতি হলে এই ধরনের মজুরি বৃদ্ধি তত বেশি কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। এতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ আরও বাড়তে এবং আরও খারাপ হতে পারে, সেইসাথে মজুরি (সেজন্য খরচও) এবং পণ্য ও সেবার দাম বাড়ে। অতএব, মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাগুলো যাতে স্তিমিত হয়, সে জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ও বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ।

মুদ্রাস্ফীতি দমন

সমস্যার এখানেই শেষ নয়, কোনোভাবেই। যদি তা-ই হতো, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলা করা এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জটিল হবে না। দুর্ভাগ্যবশত, এর কারণ আমরা আবারও শুধু দাম মুদ্রাস্ফীতি (যাকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতিও বলা হয়) নিয়ে আলোচনা করছি না, বরং সেইসাথে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি যাকে প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়, তা নিয়েও আলোচনা করছি। এই দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রাস্ফীতি অতীত থেকে পরিচিত (চার্লসওয়ার্থ ১৯৫০; কোলদকো ১৯৮৪)। পশ্চিমের ধনী দেশগুলোতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। এসব দেশের সরকার প্রশাসনিক, রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরে দাম নির্ধারণ করলেও জোগান ও চাহিদার মধ্যে তা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনি, সেইসাথে নেওয়া হয়েছিল বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পদক্ষেপ, যা সামরিক উদ্যোগগুলোতে অর্থায়ন করেছিল। জনসাধারণের কাছে এগুলো ছিল অনভিপ্রেত আর্থিক সম্পদের নামান্তর; তারা তাদের ব্যয়যোগ্য আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করেছিল, এ কারণে নয় যে, তারা ওই সঞ্চয় করতে চেয়েছে, বরং বাজারে অবাধে বিক্রয়যোগ্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের অভাবে তারা সঞ্চয়ে বাধ্য হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কফি থেকে জুতা পর্যন্ত প্রায় সবকিছুই রেশনের আওতাধীন ছিল। শিল্পকে সামরিক উৎপাদনে ব্যবহারের কারণে সাইকেল বা রেফ্রিজারেটরের মতো ভোগ্যপণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল। এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে, ১৯৪৩ সালে কেবল ১৩৯টি যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি হয়েছিল (ইকোনমিস্ট ২০২১এ)।

যুদ্ধ যখন শেষ হলো—সাধারণ মন্দা সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে ব্যাণিজ্যচক্রেরও ভূমিকা ছিল, সে সময় ভোক্তা খাতে শিল্প এবং পরিষেবাগুলোর বেচাকেনা যথেষ্ট বেড়েছিল। এর কারণ, বিপুলসংখ্যক পরিবার তাদের পূর্বের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় নিয়ে বাজারে ছুটে এসেছিল। যুদ্ধের পাঁচ বছর পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আট মিলিয়নেরও বেশি গাড়ি উৎপাদিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উপায়ে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি থেকে উদ্ধার পেয়েছিল তা অনুকরণীয়। তারা ধ্বংসাত্মক অতিমুদ্রাস্ফীতি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল পর্যাপ্ত (সারণি ১)।

সারণি ১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির হার, ১৯৪৬-১৯৪৯

(শতাংশে)

	বছর	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	জিডিপি	-১১,৬	-১,১	৪,৮	-০,৬
	সিপিআই	১৮,১	৮,৮	৩,০	-২,১
যুক্তরাজ্য	জিডিপি	-২,৫	- ১,৩	৩,২	৩,৩
	সিপিআই	৩,১	৭,০	৭,৭	২,৮

উৎস: যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে: (ইউএস জিডিপি ২০২১) এবং (ইউএস ইনফ্লেশন ২০২১); যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে: (মেজারিং ওয়ার্থ ২০২১) এবং (হিস্টোরিক্যাল ইউকে ২০২১)

এটি মনে রাখা প্রয়োজন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক দেশ অতি মুদ্রাস্ফীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল; এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি তাদের অর্থনীতির জন্য ছিল ধ্বংসাত্মক (লোপেজ ও অন্যান্য, ২০১৮)। এই সময়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আটলান্টিকের উভয় প্রান্তে (কিন্তু সবকটি ইউরোপ মহাদেশীয় দেশগুলোতে নয়, যেখানে উদাহরণস্বরূপ হাঙ্গেরি ইতিহাসের সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কথা জানিয়েছে; ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি ১৫ ঘণ্টায় দাম দ্বিগুণ হয়েছে, প্রতিদিন বেড়েছে ২০০ শতাংশেরও বেশি!), অতৃপ্ত চাহিদার অংশ বাধ্যতামূলকভাবে স্থগিতের মাধ্যমে সৃষ্ট সঞ্চয় বর্তমান আয়ে থেকে উৎসারিত অতিরিক্ত চাহিদার প্রবাহে পরিণত হয়েছিল (পয়েশ ১৯৫৩)। অর্থনীতির জন্য এটি এক বিরাট উদ্দীপনা, যা বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার দ্রুত বাড়িয়েছিল, একইসাথে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে নতুন সক্ষমতা তৈরি করে এবং শিল্পের অংশবিশেষ খণ্ড খণ্ড উৎপাদনে রূপান্তরকরণে সহায়ক হয়। সেনাবাহিনীকে ট্যাঙ্ক দেওয়ার পরিবর্তে কৃষকদের কাছে ট্রাক্টর বিক্রি করা হয়েছিল; সৈন্যদের বন্দুক দেওয়ার পরিবর্তে সাংবাদিকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল টাইপরাইটার; জাহাজ ব্যবহার করে সেনাবাহিনীকে ইউরোপে পরিবহনের পরিবর্তে যাত্রীবাহী জাহাজ পর্যটকদের বহন করতে শুরু করেছিল।

ঐসব অভিজ্ঞতার পরে—আমরা তাদের অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ বলে অভিহিত করতে পারি—স্বল্পস্থায়ী এবং বরং দাম এবং মজুরির নিশ্চল হয়ে যাওয়ার ব্যর্থ ঘটনাগুলোর প্রসঙ্গ বাদ দিলে অতি উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলোতে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা অজানা ছিল, অথচ যেখানে তারা প্রায়ই উচ্চ দাম মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কখনো কখনো এর সাথে দেখা যেতো ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং কম উৎপাদন বৃদ্ধির দুর্বিষহ অবস্থা। এটি ছিল তথাকথিত স্ট্যাগফ্লেশন (ব্লাইন্ডার ১৯৭৯) বা নিশ্চলতার স্ফীতি (অধিক বেকারত্ব ও অধিক মুদ্রাস্ফীতির সমন্বিত অবস্থা), এবং চরম অবস্থায়, দাম বৃদ্ধির সাথে কমে আসতো উৎপাদন, সেই অবস্থাকে বলা হয় স্লামফ্লেশন বা অতি মন্দাস্ফীতি। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় ব্যর্থতা, যখন ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার সূচক ছিল ১৩.৩ শতাংশ, এবং এক বছর পরে যুক্তরাজ্যে ১৮ শতাংশে পৌঁছেছিল, রোনাল্ড রিগান এবং মার্গারেট থ্যাচারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার অন্যতম কারণ।

অন্যদিকে, ক্যানসারের মতোই অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল (কোলদকো ১৯৮৬; নাটি ১৯৮৬)। আমরা এটিকে ২.০ হিসেবে চিহ্নিত করব। স্বাভাবিকভাবেই, এর মাত্রায় পার্থক্য ঘটেছে। এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থনৈতিক

ভারসাম্যহীনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, দামের স্তরের পরিবর্তন বা প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতির সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল (হাওয়ার্ড ১৯৭৬; পোর্টেস ১৯৭৭; স্টেইনার ১৯৮২)। এটি ব্যাপকভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে, সরকারি তথ্যের তুলনায় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার ১-২ শতাংশ পয়েন্ট বেশি (এডিরিং ১৯৮৩; উইলস ১৯৮২)।

এটি সত্য, কিছুটা হলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি গোপন রেখে চিরাচরিত মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি সফলভাবে আড়ালে রাখা হয়েছিল—এটি ছিল বাজার অর্থনীতির যুক্তির বিরুদ্ধে, যার সাথে সেই সময়ের কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির সাদৃশ্য ছিল সামান্যই—কিন্তু এটি ছিল বালিতে একটি উটপাখির মাথা গোঁজার মতো। সরকার এবং সরকারি অর্থনীতি, যা উপলব্ধি করতে চায়নি—সেটি বাস্তবে দেখা গেছে—অথবা বরং, ভোগ্যপণ্যের তীব্র ঘাটতি হিসেবে প্রত্যেক গৃহিণী এবং একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রত্যেক ক্রয়কর্মকর্তা অনুভব করেছেন।

পরবর্তী সময়ে আমলাতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলোতে মুদ্রাস্ফীতির জটিলতা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, জোনোস কর্নাইয়ের গবেষণাগুলো ছিল (১৯৮০, ১৯৮২, এবং ১৯৮৬) এ বিষয়ে একাডেমিক আলোচনার জন্য অপরিহার্য। ১৯৮০ এর দশকে, গোঁড়া রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দেশগুলোতে, পূর্বেকার চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে কম অনুভূত হয়েছিল, যখন পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে বাজারমুখী সংস্কার প্রবর্তনকারী অর্থনীতিগুলোতে এবং বিশেষ করে, যুগোশ্লাভিয়ায় যেখানে অর্থনৈতিক শাসনের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মাত্রার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছিল সেখানে মুদ্রাস্ফীতি অনুভূত হয়েছিল বেশি। এ সত্ত্বেও আরও মন্দ বিষয় হলো, যেসব অসঙ্গতিপূর্ণ সংস্কার বাণিজ্যকে শুধু আংশিকভাবে উদার করেছে কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদার প্রয়োজনে পর্যাপ্ত কঠোর বাজেট সীমাবদ্ধতা এবং পদ্ধতিগত বাধা প্রবর্তন করেনি, সেক্ষেত্রে অর্থনীতির সরবরাহের দিকের সক্ষমতার (আমদানিসহ) মাধ্যমে ভারসাম্য বাজায় রাখা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় পণ্যের অভাবের সাথে দাম বৃদ্ধির প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল। এই লক্ষণকে বলা হয় 'শর্টেজফ্লেশন' বা ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি (কলোদকো, ম্যাকম্যাহন ১৯৮৭); জিনিসপত্র আরও বেশি ব্যয়বহুল হয়ে উঠছিল, সেগুলো সবসময় কেনা সম্ভব ছিল না। এটি ছিল দামের তীব্রতা বৃদ্ধি, এবং এতে ব্যবসায়িক দক্ষতার অবনতি ঘটছিল এবং বাড়ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিরক্তি; এটি ছিল ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতনের অন্যতম কারণ।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে (হিক্স ১৯৪৭) অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ থেকে পুনরুদ্ধারের তুলনায়, সমাজতন্ত্র-উত্তর ব্যবস্থার রূপান্তরকালে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ থেকে পুনরুদ্ধার ছিল দুর্দশাজনক (কোলদকো ১৯৯১; মান্ডেল ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬; নাটি ২০১৮বি)। অনেকাংশে, এটি ছিল নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক মতবাদের (হার্ভে ২০০৫; কোলদকো ২০০০) চাপের কাছে নতিস্বীকারের পরিণতি, যা দুর্ভাগ্যক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং পূর্ব ইউরোপীয় অর্থনীতি ও সমাজের জন্য ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এ ছাড়া, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দেশগুলোতে বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক নীতি এবং সংস্কারের দিকনির্দেশনাকে প্রভাবিত করে (নাটি ১৯৯০; পডকামিনার ১৯৯২; রোজাতি ১৯৯১)। এর ফলে, তথাকথিত রূপান্তরযোগ্য গভীর মন্দা পোল্যান্ডে ৩ বছর থেকে রাশিয়ায় ১০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, যেখানে জিডিপি স্তর নেমে এসেছিল অর্ধেকেরও বেশি।

পোল্যান্ডে, ১৯৮৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ্ব থেকে ১৯৯২ সালের প্রথমার্ধ্ব পর্যন্ত উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। জিইউএস-এর সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে জিডিপি যথাক্রমে ১১.৬ ও ৭.০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এটি উল্লেখ্য যে, এই ধরনের অস্থির সময়ের জন্য নিরূপিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক উপাত্ত—উৎপাদন ও দামের গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত বলে অনুমান করা হয়েছে এবং সে কারণেই তা অবশ্যই যথাযথ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত; পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে, যদিও, তা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ইতিবাচকভাবে যাচাই করেছিল। মন্দার গভীরতা কমানোর ক্ষেত্রে এটি কোনোভাবেই বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ ও প্রচেষ্টা থেকে তথাকথিত শক থেরাপির ক্ষমাপ্রার্থীদের বিরত করতে পারেনি (উইনিকি ১৯৯১)। তবে অন্যান্য লেখক নির্দেশ করেছেন যে, মন্দা আরও গভীর ছিল, কারণ জিইউএসের পরবর্তী হিসাব অনুসারে, ১৯৯০-১৯৯১ সালে জিডিপি প্রায় ২৩ শতাংশ কমে গিয়েছিল। (জাকুবোভিচ ২০২০)। অন্য কথায়, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ লক্ষণের দুই বছর পর, জাতীয় আয় ছিল পঞ্চমতম কম এবং দাম প্রায় ১২ গুণ বেশি! (সারণি ২)।

সারণি ২: পোল্যান্ডে সাময়িক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির হার, ১৯৯০-১৯৯১ (শতাংশে)

	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২ (১৯৮৯=১০০)
জিডিপি			
সরকারি উপাত্ত	-১১,৬	-৭,০	৮২,২
বিকল্প হিসাব	-১৩,৮	-১০,৩	৭৭,৩
সিপিআই	৫৮৫,৮	৭০,৩	১১৬৭,৯

উৎস: পোল্যান্ডের স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক (জিইউএস ২০২১এ)। বিকল্প হিসাব (জাকুবোভিচ ২০২০)।

বস্তুতপক্ষে, পোল্যান্ডে, কর্মসূচিসংক্রান্ত ভুল অনুমান এবং স্থিতায়ন প্যাকেজের ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ থেকে স্ট্যাগফ্লেশন বা নিশ্চলতার স্ফীতি (অধিক বেকারত্ব ও অধিক মুদ্রাস্ফীতির সমন্বিত অবস্থা) এবং এমনকি মন্দাজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে অর্থনীতির উত্তরণ ঘটেছে। ১৯৮৯ এবং ১৯৯০-১৯৯১ এর শেষের দিকে স্থিতায়ন নীতিটি ওয়াশিংটন কনসেনসাস-এর ধারণাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সনাতন প্রচেষ্টার ওপর কিছুটা নির্ভরশীল ছিল, সেটিকে মূলত ত্রৈমাসিক উদারীকরণ-

চিত্র ১: ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি থেকে অতিমন্দাজনিত মুদ্রাস্ফীতি

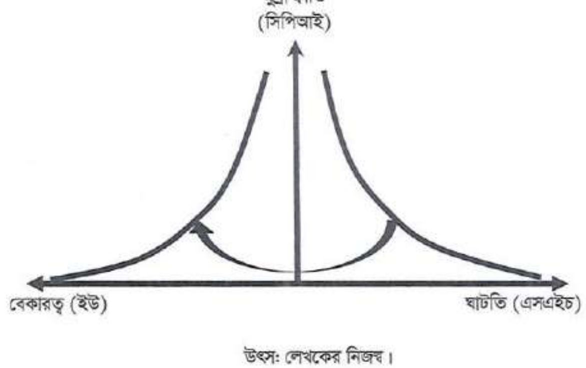

উৎস: লেখকের নিজস্ব।

বেসরকারীকরণ-কঠোর আর্থিক নীতিতে পরিণত করা হয়েছিল, সেই সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সাথে এর কোনো সামঞ্জস্য ছিল না (উইলিয়ামসন ২০০৫)। ফলে, অবাধ (দাম) মুদ্রাস্ফীতি আগের চেয়ে এমনকি আরও বেশি ছিল, সে সময় অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির (ঘাটতিসমূহ) পরিবর্তে বিপুলসংখ্যক মানুষের বেকারত্ব দ্রুত বাড়ছিল (কোলদকো ১৯৯২) (চিত্র ১)।

আগ্রহের বিষয় হলো, শুধু চীন (কর্নাই ২০০৮; লিন ২০০৪)) এবং ভিয়েতনাম (কোলদকো ১৯৯০; কোলদকো, গট্জ-কোজিয়ের কিউইকজ, স্ত্রজেসজেউস্কা-প্যাকজেক ১৯৯১; পোপোভ ২০০৬; কর্নাই, কিয়ান ২০০৯) তাদের ক্রমাগত সংস্কার এবং সুচিন্তিত নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি মন্দা এড়িয়ে এবং অতি মুদ্রাস্ফীতির প্রাদুর্ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়ে ঘাটতি অর্থনীতির দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেয়েছে (গুইটিন, মান্ডেল ১৯৯৬)। নিঃসন্দেহে, কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা এতে সহায়তা করেছিল (কোলদকো ২০২০)। চীনে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘাটতিগুলো সফলভাবে দূর করার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল, এবং দাম অবমুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট দাম মুদ্রাস্ফীতি কমে এসেছিল (সারণি ৩)।

সারণি ৩: চীনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির হার ১৯৯০-১৯৯৩ (শতাংশে)

বছর	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩
জিডিপি	৩,৮	৯,২	১৪,২	১৪,০
সিপিআই	৩,১	৩,৪	৬,৪	১৪,৭

উৎস: চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চিত্র ২: চীন, পোল্যান্ড এবং রাশিয়ায় মাথাপিছু জিডিপি ১৯৯০ = ১০০
(ক্রয়ক্ষমতার সমতা, ইউএসডি ২০১৭ অনুযায়ী)

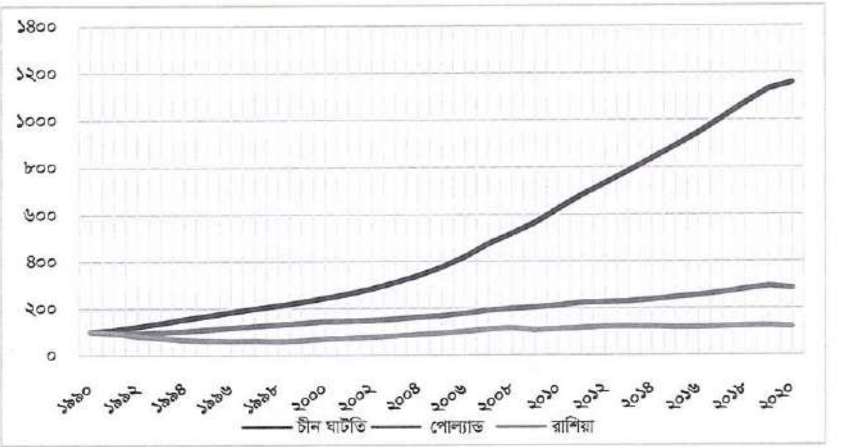

উৎস: ১৯৮৯-২০১৯ (ডব্লিউডিআই ২০২১); চীন এবং রাশিয়ার ক্ষেত্রে ২০২০ (ডব্লিউইও ২০২১এ), পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে (জিইউএস ২০২১বি).

ওইসব অভিঘাতের সদূরপ্রসারী প্রভাব এবং পরবর্তীপর্যায়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াগুলো এখনো স্পষ্টত দৃশ্যমান (চিত্র ২), এবং তাদের পরিণতিগুলো—শুধু অর্থনৈতিক (ড্যাব্রোভস্কি ২০২০) নয়, ভূ-রাজনৈতিক (বেল ২০১৫; ইকোনমি ২০১৮)—সুদূরপ্রসারী।

বর্তমান সময়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সোভিয়েত এবং পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে নমনীয় বাজেটের সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী ছিল উৎপাদনের উপায়গুলোর রাষ্ট্রীয় মালিকানা, এবং প্রকারান্তরে এগুলোই, মুদ্রাস্ফীতিরও কারণ—সময় ও স্থান ভেদে বেশি বা কম অবদমিত, অথবা বেশি বা কম অবাধ এবং সেই অর্থে, রীতিসম্মত ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর। বিষয়টি এ রকমই ছিল, কিন্তু, এটি কি অনিবার্যভাবে সেভাবেই ঘটবে? যখন জোনোস কর্নাই দাবি করেন, এটি সেভাবেই ঘটেছে (কর্নাই ১৯৯২): মারিও নাটি মনে করেন, তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, কঠোর বাজেটের প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রবর্তন না করেও সমাজতন্ত্রে ভারসাম্য দামের মাধ্যমে চাহিদা-জোগানের সমতা বিধান সম্ভব (নাটি ২০১৮এ)। তাঁর মতে, বিষয়টি সে রকম ছিল না, এটি নিয়মের কারণে নয়, বরং অর্থনৈতিক নীতির ত্রুটির জন্য ঘটেছে।

ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তারা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। যেখানে চীনে—এমনকি ভিয়েতনামে এবং খুব অনুন্নত কম্বোডিয়া এবং লাওসে—তারা সফল হতে পেরেছিল। তাহলে, কর্নাই কি ঠিক নন? কারণ, ভারসাম্য দামের মাধ্যমে বাজারে চাহিদা ও জোগানের সমতা বিধান সমাজতন্ত্রেও কি সম্ভব? যেসব জায়গায় এটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়, সেখানে কঠিন বা নমনীয় বাজেটের সীমাবদ্ধতাগুলো কি সম্পৃক্ত? চীনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলকী? এটি কি একটি সুষম বাজারসহ সমাজতন্ত্র, এবং আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে, অতিরিক্ত উৎপাদন এবং বেকারত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাজারে সরবরাহ প্রবাহের তুলনায় চাহিদার প্রবাহ যখন বেশি হয়, অথবা এটি কি এখনো আংশিক নমনীয় বাজেটের সীমাবদ্ধতাসহ পুঁজিবাদ? (এলম্যান ২০২১)।

আমার মতে, এর কোনোটিই নয়। গুণগত দিক থেকে সমসাময়িক চীনা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহজাত নমনীয় বাজেট সীমাবদ্ধতাসহ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, এবং সেইসাথে কঠোর সীমাবদ্ধতাসহ উদার পুঁজিবাদ এ উভয় ধরন থেকে ভিন্ন (হুয়াং ২০১৭)। এই ব্যবস্থাকে চৈনিকবাদ (কোলদকো ২০১৮) বলা হয়। এটি একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত শংকর, যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানার একাধিক রূপ একইসাথে বিদ্যমান এবং যা স্বৈরতান্ত্রিকতা ও মেধাশক্তির আন্তসম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাজারের অদৃশ্য হাতের শক্তিকে রাষ্ট্রের দৃশ্যমান হাতের শক্তির সাথে সংযুক্ত করে। সুতরাং, ঘাটতি দূর করার জন্য সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের প্রয়োজন—কর্নাইয়ের এই অভিসন্দর্ভ সঠিক নয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ঘাটতি দূর করা সম্ভব—নাটির এ ধারণাও বিতর্কিত। বাস্তবে, কেউই এটি প্রমাণ করেননি, যতক্ষণ না আমরা এই দাবি সত্য বলে মেনে না নেই যে, চীনের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র, কিন্তু 'চীনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ' (হু ২০১৯)।

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দেশগুলোতে, সমাজতন্ত্র-উত্তর রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল গ্যালোপিং মুদ্রাস্ফীতি, এবং এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অতি মুদ্রাস্ফীতিও, কারণ এগুলো অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কাজে লাগাতে সক্ষম হয়নি (ব্রেজার, ক্রেব ২০১১; পোপোভ ২০১৪)। স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে এটি মেনে নেওয়া হলেও, এই নির্দিষ্ট সম্পদটি সমাজতন্ত্র-উত্তর বাস্তবতায় সম্পূর্ণ নতুন ধারায় রূপান্তরিত হয়নি—বরং, তা ঋণ বা সম্পত্তির নিদর্শনপত্রে (সিকিউরিটিজ) বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এরপর তাদের সারোগেটগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের

বেসরকারীকরণের একটি ব্যাপক কর্মসূচির পরবর্তী বাস্তবায়নের প্রত্যাশায়, ইতিমধ্যেই অর্থনীতির স্থিতায়ন এবং পুঁজিবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে জারি করা যেতে পারে। এর পরিবর্তে, কেবল জনগণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়গুলোই নয় বরং, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংরক্ষিত কিছু মজুদও নিষ্কাশিত হয়েছিল (লাস্কি ১৯৯০; পোজনানস্কি ১৯৯৬)।

পোল্যান্ডে, তথাকথিত শক থেরাপি অনুসরণের ফলে উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যায়, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রকৃত সরবরাহ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। এটি স্থিতায়ন নীতির সুস্পষ্ট ভুল, বিশেষ করে, পুরোনো ঋণের ওপর অতিরিক্ত সুদের হার, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাড়তি মজুরির ওপর দমনমূলক করারোপ, অত্যধিক মাত্রায় পোল্যান্ডের মুদ্রা জেল্যাটির অবমূল্যায়ন, এবং বিদেশি বাণিজ্যের অতি দ্রুত উদারীকরণ—সেইসাথে রাষ্ট্রীয় খাতের উদ্দেশ্যে গৃহীত সুচিন্তিত কার্যক্রম আদর্শিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেও নিশ্চিতভাবে বাস্তবধর্মী ছিল না, এটি স্থিতায়ন নীতির আরেকটি ত্রুটি (কলোদকো, নাটি ১৯৯৭)। ১৯৮৯ সালে বেশি মাত্রায় উদারীকরণের ফলে দাম অনিবার্যভাবে যেটুকু বাড়ত তার চেয়ে আরও বেশি বেড়েছে। পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রাগুলোর পূর্বে অব্যবহৃত বহু বিলিয়ন সম্পদ দ্বারা অর্থায়িত বেসরকারি আমদানি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট সরবরাহের হ্রাস রোধ করা হয়েছিল।

এর ফলে ১৯৯০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ৫৮৬ শতাংশের বিস্ময়কর স্তরে পৌঁছেছিল, এবং এক বছর পরে, এটি ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি। কোনোরকম ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই এই অভিঘাত আর্থিক আলম্বনকে মুদ্রাস্ফীতির সম্পর্কে রূপান্তরিত করে; এর পরিণতি বাস্তব অর্থনীতির পাশাপাশি জনগণের সম্পদ এবং আয় পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে ভয়াবহ।

প্রবাহের অর্থনীতি ও সম্পদের অর্থনীতি

অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য আমেরিকার পদক্ষেপ প্রশংসনীয় ছিল, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ থেকে পুনরুদ্ধারের চৈনিক উপায়টি ভালো ছিল, যদি শুধু অর্থনৈতিক দিকগুলো মূল্যায়নের মধ্যে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি, তবে একই অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধারের পোলিশ পদক্ষেপ ছিল যথেষ্ট অনভিপ্রেত। ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন হলেও এটি কল্পনা করা সম্ভব ছিল, অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি আবার দেখা দিয়েছে; এটি ছিল ৩.০ সংস্করণ। আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত এ কথা ভেবে যে, অর্থনীতিবিদেরা এটি লক্ষ করেন না এবং তারা চমকে ওঠেন যে, 'মুদ্রিত অর্থ' মুদ্রাস্ফীতির তরঙ্গকে তীব্র করেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ২০০৮-২০১০ সময়কালের পরিস্থিতি উল্লেখ করেছেন, যখন অর্থের সরবরাহও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কিন্তু, এ সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি ত্বরান্বিত হয়নি। এটি ঘটেছিল কারণ, সরবরাহের দিকটি অতিরিক্ত পুঞ্জিভূত অর্থকে কার্যকরভাবে কাজে লাগায়, ইতিবাচক সামঞ্জস্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ে, শুধু এক বছরব্যাপী মন্দার পর প্রকৃত অর্থনীতিকে হতাশা থেকে রক্ষা করে; শুধু ২০০৯ সালে বিশ্বের মোট উৎপাদন ১.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল, এর পরের বছর তা আবার ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থনৈতিক নীতির ওই অগতানুগতিক প্রতিক্রিয়াগুলোর সাথে, রীতিটি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপবাদের নতুন সাধিত্রের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বে একটি নতুন শব্দ—পরিমাণগত সহজীকরণ যোগ হয়েছে (ব্লানচার্ড ও অন্যান্য, ২০১২)। মাধ্যমিক বাজারে সংকটবিরোধী অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের অর্থায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যথেষ্ট পরিমাণে সরকারি বন্ডের ব্যবস্থা করে।

তবু, বর্তমান পরিস্থিতি বেশ কয়েক বছর আগের চেয়ে ভিন্ন, কারণ কেবল মূল্যসূচকের বিশ্লেষণ থেকে, যেমন ভোক্তা দাম সূচক এবং সেই সাথে উৎপাদক দামসূচক, এই উভয় দাম সূচকের বিশ্লেষণ থেকে যা জানা যায় সে তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যেই বেশি। আরও খারাপ দিক হলো—এই মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে, যদি চলতি আর্থিক এবং বাজার পরিস্থিতি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়; সম্পদের অর্থনীতিকে প্রবাহের অর্থনীতি হিসেবে ভুলক্রমে সমার্থক মনে করা হলে এমন অবস্থা হতে পারে। আমরা এখন যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান হিসেবে প্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যার অর্থ সামগ্রিক জোগানের প্রবাহের তুলনায় কার্যকর চাহিদা বেশি, বাজার পরিস্থিতির দ্বারা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, অর্থাৎ এই অবস্থা 'মুদ্রাস্ফীতিজনিত আলম্বন'।

মহামারি কমলে এবং পরিস্থিতির উন্নতি শুরু হলে, এই সম্পদের কিছু অংশ আবার প্রবাহে পরিণত হবে। বাস্তবে, সমগ্র সম্পদের একটি কাল্পনিক রূপান্তরের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি-মুক্ত চাহিদার প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়, রূপান্তরিত অংশটি যত ছোট হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা যত ধীর হবে ততই ভালো। অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। শুধু সুদের হার বাড়িয়ে খুব কমই অর্জন সম্ভব; কিন্তু, মুদ্রানীতির এই হাতিয়ারটি অবলম্বন ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

সর্বোপরি, এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার প্রচেষ্টাগুলো এ সময় অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস মহামারি কেবল মুদ্রাস্ফীতির একটি ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করেনি বরং সেইসাথে মারাত্মক বেকারত্বও সৃষ্টি করেছে। দাম-মুদ্রাস্ফীতি ত্বরান্বিত হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যদি সুদের হার খুব দ্রুত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তা সম্ভব হতে পারে। তবে এ জন্য দাম বৃদ্ধি রোধের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সংকটের কারণে মানুষ যেসব চাকরি হারিয়েছে, ধীর গতিতে সেগুলোর পুনরুদ্ধার এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজন। স্বল্প মেয়াদে এর সুস্পষ্ট বিকল্প রয়েছে: মুদ্রাস্ফীতি বনাম বেকারত্ব। এ পর্যন্ত, ১৯৭০-এর উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার পর, বাস্তবানুগ অনুশীলনসহ একটি মুদ্রাবাদী মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল, যে জন্য এমনকি অর্থনৈতিক গতিশীলতা কমিয়ে এবং বেকারত্ব বাড়িয়েও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা হয়েছিল।

এটি এখনকার তুলনায় ভিন্ন। উচ্চ বেকারত্ব ও সেইসাথে দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার—সামাজিক বর্জন থেকে শুরু করে অপরাধ পর্যন্ত, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনিবার্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। কোনো কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনীতিকে প্রণোদিত করে বেকারত্ব মোকাবিলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত বছর গৃহীত মুদ্রানীতির নতুন নিয়ম অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ তার নীতিসংক্রান্ত বিষয় হিসেবে তথাকথিত গড় মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে ফেড এখন কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়; কেননা, মুদ্রাস্ফীতি পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশ সাময়িকভাবে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত এটি আরও বেশিসংখ্যক মানুষকে কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। ব্যাংক অব জাপান তার পূর্বের অনুসৃত রীতি থেকে সরে এসেছে বলে ঘোষণা দিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউজিল্যান্ড এটি আরও আগে প্রবর্তন করেছিল, সম্ভবত ১৯৮০ সালের পরে এক্ষেত্রে এটি বিশ্বের সবচেয়ে সনাতন কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একদিকে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহামারি-সংকটের প্রভাবগুলো কাটিয়ে ওঠার কঠিন উদ্দেশ্য সাধনের এই পথ, এবং অন্যদিকে, যৌক্তিক পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতি কমানো—মুদ্রানীতিতে এ উভয় নীতিই অনুসরণ করা উচিত। কোনটি 'যুক্তিসঙ্গত' সেই প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক এবং দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

আশা করা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সংযমী হবে; কারণ, নামিক সুদের হার মুদ্রাস্ফীতির হারের নিচে থাকলে এবং এইভাবে নেতিবাচক প্রকৃত সুদের হার বজায় রাখলে, পারিবারিক এবং যৌথ সংস্থার আর্থিক মজুদের মূল্য কমবে। অবশ্যই রাজনৈতিক কারণে, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের উদ্দীপনা হিসেবে এ ধরনের আচরণ যৌক্তিক। যেভাবেই হোক, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ঋণাত্মক প্রকৃত সুদের হার আশা করা যেতে পারে, যা ২০০৮-২০১০ সময়কালের সংকট এবং এর পরবর্তী সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ।

ব্যাংক আমানতের উল্লেখযোগ্য অংশের ওপর ঋণাত্মক প্রকৃত সুদের হারকেও কর বৃদ্ধির একধরনের বিকল্প হিসেবে দেখা উচিত। বর্তমান আয়ের ওপর উচ্চ হারে কর বসানো হলে এই প্রবাহের কিছু অংশ নিষ্কাশিত হবে, যা প্রভাবিত অর্থনৈতিক সত্তাগুলোকে তাদের সঞ্চিত সম্পদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উৎসাহিত করতে পারে। এর অর্থ—এটি বাধ্যতামূলকসহ অনেক বড় পরিসরে সঞ্চয়। কিছু পরিমাণে, এটি শুধু যা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ এবং সামাজিক কর্মসূচির জন্য তহবিল সংগ্রহ নয়, এ হলো বিশেষ করে, ব্যবসায়ী এবং ধনী মানুষের ওপর রাজস্বের বোঝা সত্যিকার অর্থে বাড়ানোর লক্ষ্যে হোয়াইট হাউসের নীতির উদ্দেশ্যও বটে। অন্য কথায়, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দাম মুদ্রাস্ফীতি কমানোর ক্ষেত্রে উচ্চ কর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি সহজ বা বিকল্পের তুলনায় এটি অনেক বেশি জটিল সমস্যা। কারণ, নীতিটিতে অন্যান্য উদ্দেশ্য, বিশেষ করে—আয়ের পুনর্বণ্টন, কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব, উৎপাদন ক্রিয়াকলাপ ও এর মুনাফাপ্রদতা, এবং বিনিয়োগের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

পরিস্থিতিগুলো যথেষ্ট আকর্ষণীয়, কারণ মুদ্রা অর্থনীতির পরিবর্তে আচরণগত অর্থনীতি (থ্যালার ২০১৬), বিশেষ করে মানুষের প্রত্যাশাগুলোকে প্রভাবিত করে এমন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান এবং আর্থিক সম্পদগুলো কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সেক্ষেত্রে যৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য পরিবর্তনসংক্রান্ত আরও তথ্য পাওয়া সম্ভব (থ্যালার, সানস্টেইন ২০০৯)। এটি হতে পারে যে, প্রত্যাশাগুলোর প্রকৃতি অর্থনৈতিক সত্তাগুলোকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যদি উৎসাহিত করে তবে সুদের হার দ্রুত বাড়ালেও—এমনকি শতভাগ এবং তার চেয়েও বেশি হলে তা মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি রোধ করবে না। এ ছাড়া মহামারি-সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক সময়ে, প্রকৃত ঋণাত্মক সুদের হার এখনো আশা করা যেতে পারে এবং এটি সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করে।

মহামারির চরম বিপর্যয়ের বছরে, বিশ্বজুড়ে মোট উৎপাদন ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, সেই সাথে উৎপাদন স্তরে পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক বদলে গেছে; বৈশ্বিক গড়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন এটি ভারতে ৮ শতাংশ কমে গেছে, সেখানে চীনে ২.৩ শতাংশ বেড়েছে। ধনী দেশগুলোর মধ্যে, ২০২০ সালে জিডিপি হ্রাসের হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৫ শতাংশ এবং স্পেনে ১১ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ধারণা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী মোট খুচরা বিক্রি প্রায় ২ শতাংশ কমেছে, যেখানে অনলাইন বিক্রি বেড়েছে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। এটি ছিল অনলাইন ব্যবসা, যা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বৃদ্ধির আরও বড় মাত্রা থেকে আমাদের বিরত করেছে। আমরা শপিংমলে টাকা খরচ করতে পারিনি, আমরা অনলাইনে কিনতে পারতাম; আমরা সিনেমায় যেতে পারিনি, আমরা নেটফ্লিক্সে গ্রাহক হতে পারি; আমরা বইয়ের দোকানের তাক থেকে আকর্ষণীয় বই অনুসন্ধান করতে পারিনি, আমরা কিন্ডলে ই-বুক ডাউনলোড করেছি; আমরা রেস্তোরাঁয় যেতে পারিনি, আমরা ডিনার হোম ডেলিভারি অর্ডার করেছি। মহামারি বিপর্যয়ের ফলে এসব ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, তা অনেকাংশে স্থায়ী বলে প্রমাণিত হবে (কোলদকো ২০২১)।

হিসাব করে দেখা গেছে, ২১টি অতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে ২০২০ সালে অতিরিক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩ ট্রিলিয়নেরও বেশি মার্কিন ডলার (ইকোনমিস্ট ২০২১এ)। এগুলো এই অর্থে অত্যধিক যে, মহামারিপূর্ব প্রবণতা বজায় থাকলে এর পরিমাণ ধারণার চেয়ে অনেক বেশি হবে (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: বৃহৎ অগ্রসর অর্থনীতিগুলোতে অতিরিক্ত সঞ্চয় (জিডিপির শতাংশ হিসেবে)

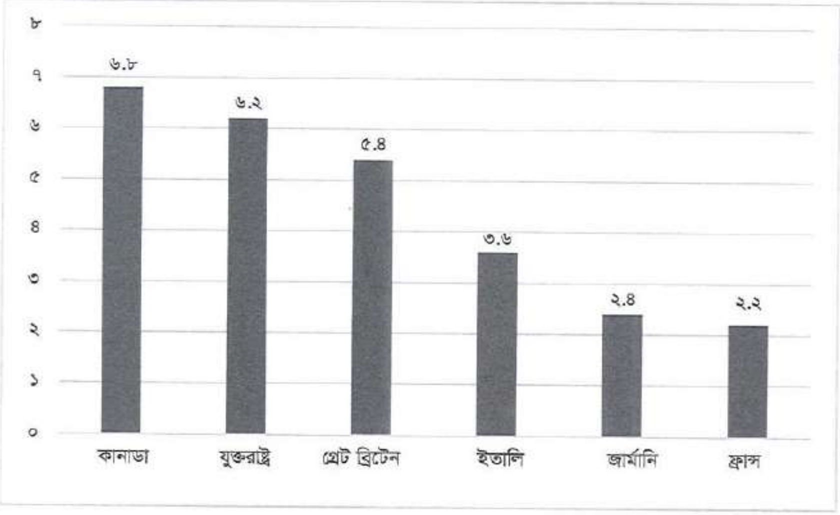

উৎস: ওইসিডি ও বিশ্বব্যাংক; দেখুন (ইকোনমিস্ট ২০২১এ)।

এ সত্ত্বেও, ধ্রুপদী দাম মুদ্রাস্ফীতি কম ছিল, ২০২০ সালে প্রধান পশ্চিমা অর্থনীতির গোষ্ঠী, জি ৭-এ, এর পরিমাণ ইতালিতে ০.৪ শতাংশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১.৪ শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাপানে দাম ০.৬ শতাংশ কমেছে। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) সদস্য দেশগুলোতে গড় মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১.৫ শতাংশ। ২০২১ সালে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এখনো কম হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে (এক্ষেত্রে, এগুলো ইআইইউ-এর অনুমান): জাপানে ০.২ শতাংশ এবং ফ্রান্সে ১.১ শতাংশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১.৯ শতাংশ এবং কানাডায় ২.১ শতাংশ। এসব পূর্বাভাস সম্পর্কে আশাবাদ বিস্ময়কর; কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতি বেশি হলে আমি এতটুকু অবাক হব না।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ২০২১ সালের বসন্ত মৌসুমে বৈশ্বিক বিশ্ব পণ্যের ব্যতিক্রমী শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে যে অনুমান ব্যক্ত করেছে, সেখানেও এ প্রত্যাশাটি প্রতিফলিত হয় এবং তা ৬ শতাংশ (২০২২ সালে ৪.৪ শতাংশ)। এটি অনুমান করা হয়—আবার, যথেষ্ট আশাবাদও ব্যক্ত করা হয় যে এক বছর মন্দার পরে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হবে, কিন্তু এটি কি বাস্তবসম্মত? (সারণি ৪)

যদি অবস্থা এ রকমই হয়, তবে এর অর্থ হলো—প্রথম প্রণালি অতিরিক্ত সঞ্চয় শোষণের জন্য চূড়ান্ত, এটি হলো একটি সম্পদকে কার্যকর চাহিদার প্রবাহে রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট অতিরিক্ত চাহিদা, যা উৎপাদনক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িয়ে অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করে। এটি সর্বোত্তম সম্ভাব্য দৃশ্যপট, কিন্তু এটি কি বাস্তবায়িত হবে?

সারণি ৪: নির্বাচিত দেশগুলোতে জিডিপির সংকোচন এবং প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস, ২০২০-২০২২ (শতাংশে)

বছর	২০২০	২০২১	২০২২
দেশ			
কানাডা	-৫,৪	৫,০	৪,৭
চীন	২,৩	৮,৪	৫,৬
ইউরো অঞ্চল	-৬,৬	৪,৪	৩,৮
ফ্রান্স	-৮,২	৫,৮	৪,২
জার্মানি	-৪,৯	৩,৬	৩,৪
গ্রেট ব্রিটেন	-৯.৯	৫,৩	৫,১
ভারত	-৮,০	১২,৫	৬,৯
জাপান	-৪,৮	৩,৩	২,৫
যুক্তরাষ্ট্র	-৩.৫	৬.৪	৩.৫

উৎস: ডব্লিউইও ২০২১বি।

পোল্যান্ডে ব্যবসায়ী ও জনগণ উভয়ের আর্থিক সব সম্পদও যথেষ্ট বেড়েছে। পোল্যান্ডের ন্যাশনাল ব্যাংকের মতে, প্রথম ক্ষেত্রে ২০২০ সালে জিডিপি ২.৮ শতাংশ কমে যাওয়া সত্ত্বেও তা প্রায় পিএলএন ৭০ বিলিয়ন বেড়েছে, অর্থাৎ যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২৫ বিলিয়ন বেশি। এই পরিমাণ জিডিপির ১ শতাংশেরও বেশি—সহজ কথায় বলতে গেলে, তাদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। উল্লেখ্য, ব্যাংকগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার অ্যাকাউন্টে ব্যবসায়িক খাত প্রায় পিএলএন ৭০ বিলিয়নের (জিডিপির প্রায় ৩ শতাংশ) সমপরিমাণ; কিছু অংশ—আমি মনে করি, অর্ধেকেরও বেশি—বাজারের বাস্তবতার কারণে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে রেখেছে। অর্থনীতির পর্যায়ক্রমিক স্থবিরতা এবং মন্দার কারণে ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণীয় উৎপাদন এবং বিনিয়োগ ব্যয়ের সুযোগের অভাবে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবাঞ্ছিত সঞ্চয় থেকে বোঝা যায়, এই স্থবিরতা একবার কেটে গেলে ব্যয়ের চাপ উৎপাদন ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উচ্চ দাম মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে উৎপাদন খরচ অতিরিক্ত বাড়লে ভোগ্যপণ্যের দামও বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকটবিরোধী নীতির ধারাবাহিক পর্যায়ে সরকার কর্তৃক স্থানান্তরিত বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে পরিণত হয়েছে। পোল্যান্ডের ন্যাশনাল ব্যাংকের (এনবিপি ২০২১) মতে, পরিবারগুলোর আমানত রাতারাতি হস্তান্তরযোগ্য ঋণাত্মক প্রকৃত সুদের হার ৩.৪ শতাংশ সত্ত্বেও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিউ১ ২০২১ এর শেষে তা প্রায় পিএলএন ৮২৭ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল যা, কোভিড-১৯ এর সূচনালগ্নে এবং অর্থনীতি নিশ্চল হওয়ার এক বছর আগের তুলনায় পিএলএন ১৮০ বিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ শতাংশ বেশি। তুলনার প্রশ্নে, ২০১৯ সালে মহামারির আগের বছর, অনুরূপ আমানত পিএলএন ৮০.৪ বিলিয়ন, অর্থাৎ ১৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেখানে ২০২১ এর প্রথম তিন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২.২ বিলিয়ন। অন্য কথায়, মহামারির সময় এই তহবিলগুলো আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ দ্রুত বেড়েছে (চিত্র ৪)। আমাদের মনে রাখা উচিত, প্রশ্নসাপেক্ষ এই পরিমাণ শুধু ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, কিন্তু স্টক মার্কেটে, বিভিন্ন বিনিয়োগের তহবিল, বীমা পলিসি এবং নগদ হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে। এসব তহবিলের কিছুটা, আধুনিক পরিভাষায় মুদ্রাস্ফীতিজনিত আলম্বনের (ইনফ্লেশনারি ওভারহ্যাং) সমতুল্য।

চিত্র ৫: পোল্যান্ডে চলতি আমানত এবং পরিবারগুলোর কাছে ব্যাংকগুলোর অন্যান্য দায়বৃদ্ধি, ২০১৭-২০২১ (শতাংশে)

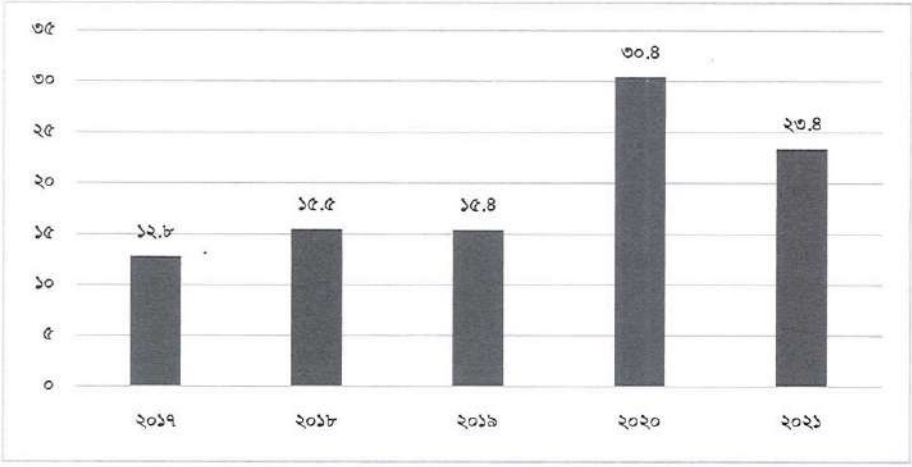

উৎস: এনবিপি ২০২১। ২০২০ সালের চতুর্থ প্রান্তিকের তুলনায় ২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকের প্রবৃদ্ধির সমগতিতে অন্যান্য প্রান্তিকগুলোর প্রবৃদ্ধি অনুমান সাপেক্ষে ২০২১ সালের তথ্যের বাৎসরান্তিক হিসাব।

এভাবে, অবাধ এবং অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি উভয়ই বিবেচনা সাপেক্ষে আমরা যখন ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০ এর পরিমাণ ব্যাপকভাবে হিসাব করছি—আমি বিশ্বাস করি, পোল্যান্ডে এর হার ৫ শতাংশের কাছাকাছি ওঠানামা করে, যা জিইউএস ঘোষিত সরকারি হারের তুলনায় দেড় গুণ বেশি। অন্য কথায়, এটি কীভাবে বেশি এবং সম্ভবত এমনকি আরও বেশি, যেখানে এটি নিজস্ব আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণের সিদ্ধান্ত আবেগপূর্ণ এবং সবসময় তা যৌক্তিক না হলেও মুদ্রাস্ফীতির হার যথেষ্ট পরিবর্তনশীল।

এ ধরনের যেকোনো হিসাব অবশ্যই আংশিকভাবে বিধিবহির্ভূত অনুমানের ভিত্তিতে করা উচিত; কারণ, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির হারের দ্বিতীয় উপাদানটির আকার অর্থাৎ উৎপাদন ও বন্টনের সম্পূর্ণ উদারীকরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাম স্তরের আনুমানিক অতিরিক্ত বৃদ্ধি সঠিকভাবে নিরূপণ সম্ভব নয়। ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ এর ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ একবার নেওয়া হয়েছিল। এ জন্য প্রথমে ঘাটতির কারণে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ নিরূপণ এবং সেগুলো শতাংশে প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে দাম মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে এই হার যোগ করা যায়।

ঘাটতির হার নিরূপণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মোট তরল সম্পদের ব্যালেন্স থেকে অবসর গ্রহণের জন্য রক্ষিত সঞ্চয়ের মজুদ এবং লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে রক্ষিত তারল্য সম্পদের ব্যালেন্স-এর যোগফল বাদ দেওয়া হয়:

$$rSH = \frac{Rm - (Sv + Tr)}{Y}$$

যেখানে:

$r_{SH} =$ ঘাটতির হার, জিএনপি, (ওয়াই) এর ভগ্নাংশ হিসাবে প্রকাশিত,

$R_m =$ জনসাধারণের মোট তরল সম্পদের ব্যালেন্স,

$S_v =$ অর্থ এবং সঞ্চয়ী হিসাব বাদে আর্থিক সম্পদসমূহ মূলত অবসর গ্রহণের জন্য রেখে দেওয়া হয়,

$T_r =$ লেনদেন ও সতর্কতামূলক (এবং ফাটকামূলক) উদ্দেশ্যে অর্থ এবং সঞ্চয়ী হিসাবের ব্যালেন্স।

দাম এবং অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির হার যোগ করার পর, ১৯৭৭-১৯৮৪ পর্যন্ত এই আট বছরে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গড় দাম এবং দমিত মুদ্রাস্ফীতির হার, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ছিল পূর্ব জার্মানিতে পরিমিত ৩ শতাংশ থেকে পোল্যান্ডে উল্লেখযোগ্য ৩০ শতাংশের মধ্যে (সারণি ৫)।

সারণি ৫: নির্বাচিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির গড় হার ১৯৭৭-১৯৮৪ (শতাংশে)

দেশ	ঘাটতিমুদ্রাস্ফীতির হার
বুলগেরিয়া	৬.৯
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫.১
পূর্ব জার্মানি	৩.১
হাঙ্গেরি	৮.৯
পোল্যান্ড	২৯.৪
রোমানিয়া	৮.৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৪.৬

উৎস: কোলদকো, ম্যাকম্যাহোন ১৯৮৭ ।

বর্তমান ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির ঘটনাটি এর আগের সংস্করণের তুলনায় মানুষের জন্য কম ক্ষতিকর এবং অর্থনীতির জন্য অনেক কম অসুবিধাজনক। তবে, কোনো অবস্থাতেই এটিকে কম গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। সেই সময় মুদ্রাস্ফীতির অবদমনের সাথে বাজার সম্পর্কের একটি সংযোগ ছিল: অপেক্ষমাণ মানুষের সারি, নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক বিকল্পন, কালোবাজারি, দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময়, জোগানদার এবং বিক্রেতাদের দুর্নীতি, কাউন্টারের বাইরে বিক্রি। পূর্বে, যে-কেউ ওয়াশিং মেশিনের বিক্রেতাকে ঘুষ দিতে পারতো। এর মজুদ ছিল না বলে অনুমান করা হলেও তা কিন্তু দোকানের পেছনে পাওয়া গিয়েছিল; আজকাল, বিমান থাকলেও তা যদি না ওড়ে, তাহলে বিমানের কাঙ্ক্ষিত টিকিট পাওয়া সম্ভব নয়। অতীতে কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিধাভোগী কিছু মানুষের জন্য বিক্রির বিশেষ ভালো মজুদ রয়েছে এমন অবস্থানগুলোর একটি ক্ষুদ্র নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল, যা তথাকথিত হলুদ পর্দার দোকান হিসেবে পরিচিত। আজকাল আপনি আপনার বিধিবহির্ভূত সম্পর্কগুলো ব্যবহার করে অপেরা প্রিমিয়ারের টিকিট পাবেন না, যদি থিয়েটারগুলো সাময়িকভাবে সবার জন্য বন্ধ থাকে। এসব অস্বাভাবিকতা অতিসূক্ষ্ম তারতম্যসহ যৎসামান্য প্রকাশ পায়।

অবশ্যই, বৃহত্তর বিশ্বে আজকাল এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেমন টোটালিটেরিয়ান উত্তর কোরিয়ার চরম অবস্থার মতো, যেখানে তিন ধরনের ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির—১.০, ২.০, এবং ৩.০-এর লক্ষণ সমকেন্দ্রিক

হয়, বা কিউবায় কালবিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, যেখানে ৩.০ এর সাথে ২.০ ভিন্ন ধরনও লক্ষ করা যায়। এ ধরনের সমসাময়িক তুলনা থেকে উৎপাদক এবং ভোক্তাদের দ্বারা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের আকারে মুদ্রাস্ফীতি দমনের তিন প্রকরণের সাদৃশ্যই শুধু ধরা পড়ে না, বরং তাদের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পায়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়মের বাইরে প্রশাসনিক আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ১.০ দেখা দিয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগ্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কাঁচামাল, মূলধন এবং শ্রম সবই ছিল; কিন্তু, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক সময়ে, অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এগুলো পর্যায়ক্রমে স্থানান্তর করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সহজাত ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির ভিন্নরূপ ২.০, ছিল একটি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য। আর এ কারণেই অর্থনীতি যখন রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত দাম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সম্মুখীন হয়, তখন তা উদ্দীপিত চাহিদা প্রবাহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেনি। এসব সহজলভ্য হওয়ার কথা ছিল যাতে পণ্য ও পরিষেবাগুলো সবাই পেতে পারে, কালক্রমে এগুলো তুলনামূলকভাবে সস্তা হলেও তা অনেকের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

অতএব, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০ আগের ১.০ ও ২.০ থেকে ভিন্ন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, অপর্যাপ্ত কার্যকরী চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন সক্ষমতাগুলো অনেক বেশি, কিন্তু মহামারি পরিস্থিতিতে অপ্রচলিত সংকটবিরোধী নীতিমালার মাধ্যমে তাদের ব্যবহারের ওপর অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। আর সে কারণেই একই সময়ে আরও বেশি উৎপাদন, বেচা-কেনা, এবং ভোগ—সবই সম্ভব হলেও কার্যত তা নিষিদ্ধ করা হয়। একইভাবে ১.০ এবং ২.০ প্রকরণের মতো বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষমতাগুলোর মজুদও রয়েছে। এ ছাড়াও এবং এটি একটি বড় পার্থক্য—১.০ প্রকরণের ক্ষেত্রে, এটি ছিল নগণ্য; যুদ্ধ অর্থনীতি সক্রিয় ছিল পুরোদমে। ২.০ প্রকরণে, কার্যত সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল না এবং যদি কোথাও এসবের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে এটি অর্থনীতির কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার কারণেই হয়েছিল। কারখানাটির একাংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কেননা, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তার ঘাটতি ছিল এবং একই সময়ে অন্য একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের উপকরণ গোপনে মজুদ করছিল এবং এসব উপকরণের অতিরিক্ত ইনভেন্টরিও ছিল।

উপসংহার

পরিস্থিতি বিশেষ ধরনের—কেননা, কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মহামারিসৃষ্ট সংকটের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। এবার, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার আলোড়নগুলো সরবরাহের এবং সেইসাথে চাহিদার ক্ষেত্রে—মূলত ভগ্ন সরবরাহ শৃঙ্খলের আকারে—বিশ্বায়নের যুগে যার আন্তর্জাতিক ভূমিকা ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং উৎপাদন ও বিশেষ করে পরিষেবাগুলোর ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অর্থোডক্স অর্থনৈতিক চিন্তাধারা নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলোর ক্ষেত্রে ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমন্বয়ের খরচ কমানোর পরামর্শ দিতে প্রায় ব্যর্থ হয়।

আমরা জানি, মহামারি পরিস্থিতিতে পাঁচটি প্রণালীর মাধ্যমে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০ এর লক্ষণগুলো থেকে অর্থনীতি নিজেকে পুনরুদ্ধার করবে:

$$\Sigma_{FS} \ d_{\Psi} + d_{IM} + d_{VS} + d_{AP} + d_{CPI}$$

যেখানে,

Σ_{FS}—মহামারিজনিত অস্থিরতায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয়,

d_{ψ}— চাহিদার অতিরিক্ত প্রবাহ, যা উৎপাদন ও সরবরাহের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে,

d_{IM}—পূর্বেকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় থেকে অতিরিক্ত আমদানির জন্য অর্থায়ন,

d_{VS}—পূর্বের বাধ্যতামূলকভাবে অব্যয়িত তহবিলের অধিকারীদের পছন্দগুলো পরিবর্তনের ফলে স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয় বৃদ্ধি,

d_{AP}—কাঁচামাল এবং সম্পদের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে বিশোষিত আর্থিক সম্পদসমূহ,

d_{CPI}—অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতিজনিত দাম বৃদ্ধির দরুণ তহবিল নিষ্কাশন।

উল্লিখিত সমীকরণের পাঁচটি উপাদানের অনুপাতগুলো আমরা আগে থেকে জানি না। আগে থেকে আমাদের জানা নেই, মহামারিপরবর্তী অর্থনীতিতে কী পরিমাণে এবং কোন গতিতে, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মজুদ অতিরিক্ত কার্যকর চাহিদার প্রবাহে রূপান্তরিত হবে, এবং এটি—পরবর্তী সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রাসহ সেইসব ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ অবাধ মুদ্রাস্ফীতি প্রক্রিয়ার তীব্রতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন পরিষেবা বিশেষ করে ভ্রমণ, পর্যটন, অবকাশযাপন এবং বিনোদনের সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যাওয়ার ফলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। মেক্সিকো, কেনিয়া, ইতালি এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয়ের একটি অপেক্ষাকৃত বড় অংশই আসে আতিথেয়তা খাত থেকে; কিন্তু সেখানে সেগুলোই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিমানের টিকেট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কনসার্ট, মিউজিয়াম এবং গ্যালারিগুলোতে ২০২০ সালে অব্যয়িত অর্থ ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয়ে পরিণত হয়েছে। তবে এর পরিমাণ কত, তা জানা নেই। এ সত্ত্বেও, এসব সেবা খাত যত দ্রুত সম্ভব আবারও গতি ফিরে পাবে, ব্যয় উৎসাহিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে ছাড় দেওয়ার পর দাম আকাশচুম্বী হবে। বাইরের দেশগুলোতে বিমানের টিকিট আরও বেশি ব্যয়বহুল হবে, পরের বিয়ন্স কনসার্টের জন্য আমরা আরও বেশি ব্যয় করব, আমাদের প্রিয় রেস্তোরাঁর মালিক ওই ব্যয়ের একটি অংশ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন, অঙ্গসংবাহনকারী আমাদের কাছে যথাযথ অর্থ দাবি করবেন, একজন প্লাম্বার (জলের কল, চৌবাচ্চা ইত্যাদি স্থাপন ও সংস্কারের কাজে দক্ষ শ্রমিক) আরও বেশি টাকা নেবেন, একটি বইয়ের দোকানে কেনাকাটা করলে আমাদের আরও বেশি খরচ করতে হবে।

ধারণা করা যায়, ২০২১ সালের বসন্তে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া মহামারিপরবর্তী বাস্তবতার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, শপিং সেন্টার এবং বিনোদন পার্কগুলোতে মহামারি শুরুর আগের তুলনায় অনেক বেশিসংখ্যক দর্শনার্থী ভিড় করেছিল এবং অস্ট্রেলিয়ায় ২০২১ সালের প্রথম দুই মাসে রেস্তোরাঁগুলোতে অতিথির সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৬৫ শতাংশ বেশি ছিল (দ্য ইকোনমিস্ট ২০২১বি)। উভয় ক্ষেত্রেই, কার্যকর চাহিদার এত বিপুল বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির চাপকে তীব্র করে তোলে এবং এর ফলে দাম অনেক বাড়তে পারে।

আমরা এও জানি না, দেশের বাইরে পণ্য ও সেবার চাহিদার পরিমাণ কত এবং অন্যত্র অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করলে, লেনদেনের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের অবনতি ঘটবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বাজেট ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যা জনগণের ভোগের মাত্রা বজায় রাখে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাগুলোকে উৎসাহ দেয়; বিশেষ করে, চীন থেকে আমদানির জন্য অর্থায়ন করে (হেসলার ২০২১), যার ওপর আমেরিকানরা অন্যথায়

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যেগুলো তেমন কার্যকর নয়। বিশ্বায়িত অর্থনীতি পরস্পরসংযুক্ত জাহাজের একটি বহর এবং এর প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে কাজ করে তা বোঝা এবং জানা প্রয়োজন (উলফ ২০০৪; গলব্রেইথ ২০১৪)। আজকাল, খুব বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা প্রয়োজন, যাতে সমস্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও, অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ থেকে পুনরুদ্ধারের আমেরিকান পদ্ধতির সাথে যত বেশি এবং পোল্যান্ডের ২.০ এর ক্ষেত্রে যত কম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়।

আমরা যা জানি, তা হলো—একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—যদিও আমরা জানি না যে, কী পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ, যা বাজারে প্রবাহিত হয়েছিল এবং মুদ্রাস্ফীতির আলম্বন হিসেবে সাময়িকভাবে স্থবির হয়ে পড়েছিল, তা পরিসম্পদের বাজারে সক্রিয় হয়েছে। এসব পরিসম্পদের দাম ইতিমধ্যেই বাড়ছে এবং কিছু সময়ের জন্য এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। এটি অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনাগুলোকে সুদৃঢ় এবং ফাটকা অনুমানকে উদ্দীপিত করে। পরিসম্পদের বাজারের কিছু অংশে, বিশেষ করে আবাসন বাজারে একটি ফাটকামূলক সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই লক্ষ করা গেছে। অনিবার্যভাবে, সময় আসবে যখন এ সম্ভাবনা বিস্ফারিত হবে এবং এতে আরও সংকট দেখা দেবে। ফাটকামূলক লেনদেনের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে এ সম্ভাবনা প্রতিহত করা যেতে পারে। অন্যান্য পরিসম্পদের দাম, সর্বোপরি অনেক কাঁচামালের ওপর, বিশেষ করে পেট্রোকেমিক্যালস এবং ধাতু, কিছু স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার এবং গোপন মুদ্রাগুলোর (ক্রিপ্টোকারেন্সি) দাম বিশৃঙ্খল আচরণ করবে, যদিও এই দাম বৃদ্ধির একটি জোরালো প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সিন্ড্রোম ৩.০, পূর্বেকার ১.০ এবং ২.০ অবস্থা থেকে গুণগতভাবে আলাদা। অতএব, মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রত্যাশাগুলো কমিয়ে আনা প্রয়োজন; সর্বোপরি, উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতে হবে। পরিপূরক সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়েও এটি সহজতর করা যেতে পারে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন বহু ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে বৃহৎ পরিসরে করতে আগ্রহী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুনরুদ্ধার এবং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সাধারণ তহবিল থেকে ২০২৬ সালের শেষে ৭৫০ বিলিয়ন ইউরো ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে। এই তহবিল, ঋণ ও অনুদান হিসেবে, নির্দিষ্ট অনুপাতে ২৭টি সদস্যরাষ্ট্রকে তাদের জাতীয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় বিতরণ করা হবে। এই সরকারি ব্যয় নিঃসন্দেহে বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে, যা বাজারের মাধ্যমে সঠিকভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলে, চাহিদার ক্রমবর্ধমান প্রবাহকে বিশোষিত করে নতুন উৎপাদনসক্ষমতা তৈরি করবে।

অন্যদিকে, জনসাধারণকে স্থিতিশীল সঞ্চয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী করা প্রয়োজন। যদি আমরা এক প্রকার সাময়িক চাপে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু অর্থ সঞ্চয় করি, তবে সুসময় এলে সেগুলোর জন্য অনবরুদ্ধ বাজারে আমাদের ছুটে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ—দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে এটিকে তারা স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয়ে রূপান্তরিত করবে: আরও ভালোভাবে ছুটি যাপনের জন্য, আবাসনের উন্নতির জন্য, ধারাবাহিক শিক্ষার জন্য, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য, অবসরভাতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য।

তথ্যনির্দেশ

Adirim, Issak G. (1983). "Stagflation in the U.S.S.R", Delphic, Falls Church, Va.

Bell, Daniel A. (2015). "The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy", Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Blanchard, Olivier J., David Romer, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz (eds.) (2012). "In the wake of crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy", The MIT Press, Cambridge Massachusetts - London, England.

Blejer, Mario I., Marko Skreb (eds.) (2001). "Transition: The First Decade", The MIT Press, Cambridge, Mass. - London.

Blinder, Alan S. (1979). "Economic Policy and the Great Stagflation", Academic Press, New York.

Dabrowski, Marek (2020), "Transition to a market economy: A retrospective comparison of China with countries of the former Soviet block", "Acta Oeconomica", Vol. 70, Special Issue, 15-45.

Economist (2021a). "The world's consumers are sitting on piles of cash. Will they spend it?", "The Economist", March 9th(https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/03/09/the-worlds-consumers-are-sitting-on-piles-of-cash-will-they-spend-it; access 23.04.2021).

Economist (2021b). "The Fed should explain how it will respond to rising inflation", "The Economist", April 17th (https://www.economist.com/leaders/2021/04/15/the-fed-should-explain-how-it-will-respond-to-rising-inflation; access 23.04.2021).

Economy, Elizabeth C. (2018). "The Third World Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State", Oxford University Press, New York.

Ellman, Michael (2021). "János Kornai: economics, methodology and policy", "Cambridge Journal of Economics", Vol. 45(2), 371-390.

Galbraith, James K. (2014). "The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth", Simon and Schuster, New York. F

Guitián, Manuel, Robert A. Mundell, (eds.) (1996). "Inflation and Growth in China: Proceedings of a conference held in Beijing, China, May 10-12, 1995", International Monetary Fund, Washington.

GUS (2021). "Produkt krajowy brutto w 2020 roku —szacunek wstępny", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt- krajowy-brutto-w-2020-roku-szacunek-wstepny,2,10.html; access 23.04.2021).

Harvey, David (2005). "A Brief History of Neoliberalism", Oxford University Press, Oxford - New York.

Hicks, John R. (1947). "The Empty Economy", "Lloyds Bank Review. New Series", No. 5, Lloyds Bank Limited, London.

Hessler, Peter (2021). "Manufacturing Diplomacy", "The New Yorker", March 15, 50-59 (https://archives.newyorker.com/newyorker/2021-03-15/flipbook/54/; access 24.04.2021).

Historical UK (2021). "Historical UK inflation rates and calculator" (https://inflation.iamkate.com/; access 27.04.2021).

Howard, David H. (1976). "A Note on Hidden Inflation in the Soviet Union", "Soviet Studies", Vol. 28, 599-608.

Hu, Bin (2019). "The Source of China's Confidence: How to Understand Socialism with Chinese Characteristics", Foreign Languages Press, Beijing.

Huang, Yukon (2017). "Cracking the China Conundrum: Why Conventional Economic Wisdom Is Wrong", Oxford University Press, New York.

Jakubowicz, Andrzej (2020). "Spadek i wzrost gospodarcZz w okresie transformacji polskiej gospodarkiæ ["Economic decline and growth in the period of transformation of the Polish economy"], Biuletyn PTE", No. 1(88), 49-57 (http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_PTE_2020_01.pdf; access 9.05.2021) (in Polish).

Kolodko, Grzegorz W. (1984). "Inflationary Alternative", "Polish News Bulletin of the British and American Embassies Economic Review", No. 18-84, 14-22.

Kolodko, Grzegorz W. (1986). "The Repressed Inflation and Inflationary Overhang under Socialism", "Faculty Working Paper", No. 1228, Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, Urbana-Champaign.

Kolodko, Grzegorz W. (1990). "Hyperinflation and stabilization in post socialist economies (the case of Poland, Viet Nam and Yugoslavia)", "Working Papers", No. 16, Institute of Finance, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/working/if/IF_working_papers_nr16.pdf; access 27.04.2021).

Kolodko, Grzegorz W. (1991). "Polish Hyperinflation and Stabilization 1989-1990", "Most. Economic Journal on Eastern Europe and the Soviet Union", No. 1, 9-36.

Kolodko, Grzegorz W. (1992). "Economics of Transition: From Shortageflation to Stagflation. The Case of Poland", in: Armand Clesse, Rudolf Tökés (eds.), "Preventing a New East-West Divide: The Economic and Social Imperatives of the Future Europe", Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 172-181.

Kolodko, Grzegorz W. (2000). "From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation", Oxford University Press, Oxford - New York.

Kolodko, Grzegorz W. (2018). "Socialism, Capitalism, or Chinism?", „Communist and Post-Communist Studies", Vol. 51(4), 285-298.

Kolodko, Grzegorz W. (2020a). "China and the Future of Globalization: The Political Economy of China's Rise", Bloomsbury I.B. Tauris, London - New York.

Kolodko, Grzegorz W. (2021). "The Quest for Development Success: Bridging Theoretical Reasoning with Economic Practice", Rowman & Littlefield Lexington Books, Lanham - Boulder - New York - London.

Kolodko, Grzegorz W., Walter McMahon (1987). "Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach", "Kyklos", Vol. 40(2), 176-197.

Kolodko, Grzegorz W., Danuta Gotz-Kozierkiewicz, Elzbieta Skrzeszewska-Paczek, "Hyperinflation and Stabilization in Post Socialist Economies", Kluwer Academic Publishers, Boston - Dordrecht - London.

Kolodko, Grzegorz W., D. Mario Nuti (1997). "The Polish Alternative: Old Myths, Hard Facts and New Strategies in the Successful Transformation of the Polish Economy", "Research for Action", 33, Helsinki: The United Nations University World Institute for Development Economics Research, WIDER (https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/RFA33.pdf; access 23.04.2021).

Kornai János (1980). "Economics of Shortage", North-Holland, Amsterdam.

Kornai, János (1982). "Growth, Shortage and Efficiency: A Macrodynamic Model of Socialist Economy", Basil Blackwell, Oxford.

Kornai, János(1986). "The Soft Budget Constraints", "Kyklos", Vol. 39(1), 3-30.

Kornai, János(1992), "The Socialist System: The Political Economy of Communism", Princeton University Press, New Jersey.

Kornai, János(1998). "From Socialism to Capitalism: Eight Essays", Central European University, Budapest - New York.

Kornai, János, Yingyi Qian(2009). "Market and Socialism: In the Light of the Experiences of China and Vietnam", Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire - New York.

Laski, Kazimierz (1990). "The Stabilization Plan for Poland", "Wirtschaftspolitische Blätter", No. 5, 444-458.

Lin, Justin Yifu (2004). "Lessons of China's Transition from a Planned to a Market Economy", „Distinguished Lectures Series", No. 16, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/lin.pdf; access 25.04.2021).

Lopez, Jose A., Kris James Michener (2018). "Uncertainty and Hyperinflation: European Inflation Dynamics after World War IÆ, "Working Paper 2018-06", Federal Reserve Bank of San Francisco (https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2018-06.pdf; access 27.04.2021).

Mundell, Robert A. (1995). "Great Contractions in Transition Economies", paper prepared for the First Dubrovnik Conference on Transition Economies, Dubrovnik, June.

Mundell, Robert A. (1996). "Inflation and Growth in the Transition Economies", w: Manuel Guitián, Robert A. Mundell, *op. cit.*, 100-106.

NBP (2021). "Statystyka i sprawozdawczość. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków", Narodowy Bank Polski, Warszawa (https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/ statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html; access 4.05.2021).

Nuti, D. Mario (1986). "Hidden and Repressed Inflation in Soviet-Type Economies:

Definitions, Measurements and Stabilization", "Contributions to Political Economy", Vol. 5, 37-82.

Nuti, D. Mario (1990). "Crisis, Reform, and Stabilization in Central Eastern Europe: Prospects and Western Response", w: "La Grande Europa, la Nuova Europa: Opportunità e Rischiæ, Monte dei Paschi di Siena, Siena.

Nuti, D. Mario (2018a). "Kornai: Shortage versus Surplus Economies", "Acta Oeconomica", Vol. 68, No. 1, 85-98.

Nuti, D. Mario (2018b). "The Rise and Fall of Socialism", Dialogue of Civilizations Research Institute, Berlin (https://doc-research.org/2018/05/rise_and_fall_of_socialism/; access 23.04.2021).

Podkaminer, Leon (1992). "Macroeconomic Policy for the Transitional Reforms in the Centrally-Planned Economies", in: János M. Kovács and Marton Tardos (eds.), "Reform and Transformation in Eastern Europe: Soviet-type economics on the threshold of change", Routledge, London and New York, 263-282.

Popov, Vladimir (2006). "Shock Therapy Versus Gradualism Reconsidered: Lessons From Transition Economies After 15 Years of Reforms", "TIGER Working Paper Series", No. 82, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/ TWPNo82.pdf; access 23.04.2021).

Popov, Vladimir (2014), "Mixed Fortunes: An Economic History of China, Russia, and the West", New York, Oxford University Press.

Portes, Richard (1977). "The Control of Inflation: Lessons from East European Experience", "Economica", Vol. 44(174), 109-129.

Poznanski, Kazimierz (1996). "Poland's Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth", Cambridge University Press, Cambridge.

Reinsdorf, Marshall B. (2020). "COVID-19 and the CPI: Is Inflation Underestimated?", "IMF Working Paper", WP/20/224, International Monetary Fund, Washington, DC (https://www.imf.org/en/Publications/WP/ Issues/2020/11/05/COVID-19-and-the-CPI-Is-Inflation-Underestimated-49856; access 24.04.2021).

Rosati, Dariusz K. (1991). "The Polish Road to Capitalism: A Critical Appraisal of the Balcerowicz Plan", "Thames Papers in Political Economy", School of Social Sciences, Thames Polytechnic, London.

Measuring Worth (2021). "What Was the U.K. GDP Then? The Historic Series", "MeasuringWorth.com" (https://www.measuringworth.com/datasets/ukgdpir/result.php; access 27.04.202).

Steiner, James E. (1982). "Disguised Inflation in Soviet Industry", "Journal of Comparative Economics", Vol. 3, 278-287.

Thaler, Richard H. (2016). "Misbehaving: The Making of Behavioral Economics", W.W. Norton Company, New York.

Thaler, Richard H., Cass R. Sunstein (2009). "Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness", Penguin Books, London.

US Inflation (2021). "US Inflation Rate by Year from 1929 to 2023", "The Balance" (https://www.thebalance.com/u-s-inflation-rate-history-by-year-and-forecast-3306093; access 23.04.2021).

US GDP (2021). "US GDP by Year Compared to Recessions and Events", "The Balance" (https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543; access 23.04.2021).

WDI (2021), "World Development Indicators", The World Bank, Washington, D.C. (https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#; access 23.04.2021).

WEO (2021a), "World Economic Outlook Update", International Monetary Fund, Washington, D.C., January (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update; access 23.04.2021).

WEO (2021b). "World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries", International Monetary Fund, Washington, D.C., April (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021; access 24.04.2021).

Wiles, Peter (1982). "Soviet Consumption and Investment Prices, and the Meaningfulness of Real Investment", "Soviet Studies", Vol. 34, 289-295.

Williamson, John (2005). "Differing Interpretations of the Washington Consensus", "Distinguished Lectures Series", No. 17, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/williamson.pdf; access 13.05.2021).

Winiecki, Jan (1991). "Costs of Transition That Are Not Costs: On Non-Welfare-Reducing Output Fall", "Rivista di Politica Economica", No. VI, 85-94.

Wolf, Martin (2004). "Why Globalization Works", Yale University Press, New Haven and London.

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৭-৫৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন": তত্ত্ব, প্রয়োগ ও "উচ্ছেদিত সম্ভাবনা"

আবুল বারকাত*

মূল শব্দ *বঙ্গবন্ধু দর্শন, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, সমাজকাঠামো, কল্পনাতীত সম্ভাবনা, দেশজ উন্নয়ন দর্শন, কৃষি-সমবায়, বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবী, খাদ্যের রাজনীতি, নয়া-উদারবাদী মুক্তবাজার, বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদন, সমতাবাদী সমাজ*

১. ভূমিকা

বিষয়বস্তুর নিরিখে এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত: "বঙ্গবন্ধু-দর্শন": তত্ত্ব, প্রয়োগ ও "উচ্ছেদিত সম্ভাবনা"। পরস্পরসম্পর্কিত পাঁচটি অনুচ্ছেদ নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধ। 'ভূমিকা'-র পরে অনুচ্ছেদসমূহ যথাক্রমে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" সারকথা ও বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ফল, "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—পূর্ণ বাস্তবায়নে সমাজকাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনটা কেমন হতো?" এবং "উপসংহার"। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলতে চেষ্টা করেছি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বলতে আমি কী বুঝি এবং ঐ দর্শন কীভাবে, কোন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, কোন রাজনৈতিক ভাবনাপ্রক্রিয়ায় বিনির্মিত হলো; তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলতে চেষ্টা করেছি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" যদি তত্ত্ব-কাঠামো হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রয়োগ হলো কীভাবে এবং প্রয়োগফলই বা কী, যদিও ঐতিহাসিকভাবেই প্রয়োগটা ছিল প্রারম্ভিক স্তরের এবং ক্ষণস্থায়ী; আর চতুর্থ অনুচ্ছেদে দেখাতে চেয়েছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি; কিন্তু যদি তা হতো, তাহলে তার প্রভাব-অভিঘাতটা আমাদের সমাজকাঠামোর ওপর কেমন হতে পারতো, এবং এ অনুচ্ছেদেই বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে আমরা হারিয়েছি কল্পনাতীত সম্ভাবনা ("unimaginable lost possibilities") অথবা বলা চলে নির্মূল-উচ্ছেদ ('eradication' অর্থে) করা হয়েছে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রায়োগিক সম্ভাবনা এবং একইসাথে বলতে চেষ্টা করেছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অন্তঃস্থিত ঐ সুপ্ত সম্ভাবনা নির্মূল-উচ্ছেদের কারণেই

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। ফোন: ০১৭৫৬১৪২৩১৫, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "রাজশাহীর উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক রাজশাহী আঞ্চলিক সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, রুয়েট মিলনায়তন, রাজশাহী; ১০ মাঘ ১৪২৬/২৪ জানুয়ারী ২০২০

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদ—"উপসংহার"-এ বলার চেষ্টা করেছি যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন' বাস্তবায়নের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোটিই ভেঙে ফেলা হয়েছে; সৃষ্টি হয়েছে নিও-লিবারেল মুক্তবাজার দর্শনের আওতায় স্বজনতুষ্টিবাদী পুঁজিবাদ, যা বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করেই চলছে। উপসংহারে এ কথাও বলার চেষ্টা করেছি যে এমনকি শেষোক্ত প্রতিকূল কাঠামোর মধ্যেও "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অবিচ্ছেদ্য অন্তত তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয় বাস্তবায়ন বিবেচনা করা যেতে পারে: (১) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, (২) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, (৩) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 'কৃষি-সমবায়' গঠন। সংশ্লিষ্ট এসব বিষয় নিয়ে আমি বিগত ১০-১৫ বছরে কয়েক দফা লিখেছি, বক্তব্য দিয়েছি। আর সবশেষে ২০১৫ সালে "বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে" শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি (প্রকাশক: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। আজকের সেমিনারের জন্য প্রস্তুত প্রবন্ধটির ভাবনা-ভিত্তি হিসেবে উল্লিখিত গ্রন্থসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার বক্তৃতা-লেখনিসমূহকে ধরে নিলে অত্যুক্তি হবে না।

২. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—সারকথা ও বিনির্মাণ প্রক্রিয়া

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন" হলো জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি (world view), জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ ভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতি ভাবনার যৌথরূপ। তবে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'—এসবের সাধারণ পাটিগাণিতিক যোগফল নয়, নয় তা বিচ্ছিন্ন। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" হলো এসবের পরস্পরসম্পর্কিত এক সমগ্রক রূপ (holistic form)। জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস; জনগণ এবং শুধু জনগণই হতে পারে প্রজাতন্ত্রের মালিক, যা হবে মর্মগতভাবে শোষিতের গণতন্ত্রব্যবস্থা; জনগণ এবং শুধু জনগণই সার্বভৌম, অন্য কেউ নন; জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে—এসবই ছিল বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শনের মূল ভিত্তি। জনগণের স্বার্থ বিশেষত দরিদ্র মেহনতি মানুষের স্বার্থ ছিল তার কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। "জনগণ-বোধ"-ই বঙ্গবন্ধু-দর্শনের মূল কথা। আর সে কারণেই দেশপ্রেমের যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি ভালোবাসার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি আস্থার যত ধরন আছে; মহানুভবতার যত রূপ আছে; ন্যায় প্রতিষ্ঠার যত সংগ্রামী রূপ আছে—এত বহুমুখী বিরল বৈশিষ্ট্য যে একক ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—তিনিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসবই বঙ্গবন্ধুর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ ভাবনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতি ভাবনা ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। এসবই বঙ্গবন্ধুকে করেছে "দেশজ উন্নয়ন দর্শনের" (home grown development philosophy) উদ্ভাবক, স্রষ্টা, বিনির্মাতা।

সামন্ত-সেনাশাসিত আধা ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান কাঠামোতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের সৃষ্টি এ দেশের মানুষের সুদীর্ঘ লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল। তা এ দেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা-ধনী-নির্ধননির্বিশেষে সবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ফসল। আর মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার বাঙালির এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি যে ব্যক্তি, যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জনগণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে তাঁর সারা জীবনে কখনো কোনো ধরনের আপস ব্যতীতই বাস্তবে রূপান্তরের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনিই বঙ্গবন্ধু—জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। এক কথায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭১-এ আমরা মুক্তিযুদ্ধ করলাম। যে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লাখ

মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানিসহ (এ সংখ্যাটি আমার হিসেবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ[১]) ব্যাপক মানবিক ও ভৌত অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে আমরা অর্জন করলাম স্বাধীনতা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু শুধু একটি 'দর্শন'ই বিনির্মাণ করেননি তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐ দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগও করেছেন। আবার একই সাথে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁরই বিনির্মিত দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ দর্শনকে উত্তরোত্তর শাণিত করেছেন।

এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে, "হাজারো ষড়যন্ত্রের" মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দিলেন স্বাধীনতা। "হাজারো ষড়যন্ত্র" কথাটি বলার আমার সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক কারণ আছে, যা হয়তো বা তরুণ প্রজন্মসহ এ দেশের অধিকাংশ মানুষের এখনো পর্যন্ত অজানা। ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এ রকম: ২১ মার্চ ১৯৭১ সকাল—মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর প্রাক্তন কর্মকর্তা তৎকালীন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্টদূত জোসেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রাক্-ধারণা ছিল এ রকম—*"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বুঝেছে যে বাঙালিরা পিছু হটবে না। ওরা বুঝেছে এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকে কোনো পথেই কোনো পদ্ধতিতেই আর ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই মার্কিন সরকারের রাষ্ট্রদূত মারফত প্রেরিত প্রস্তাব অনুরূপই হবে"*। তা-ই হলো। জোসেফ ফারল্যান্ড এলেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে মার্কিন সরকারের প্রস্তাবটি পেশ করলেন। তিনি বললেন, *"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সবধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত, এমনকি তারা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে এক শর্তে, শর্তটি হলো: চট্টগ্রাম থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দীর্ঘমেয়াদে ইজারা দিতে হবে"*। প্রস্তাবটি বঙ্গবন্ধু শোনামাত্র শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি জোসেফ ফারল্যান্ডকে মুখের ওপর বলেছিলেন,*"মিস্টারফারল্যান্ড আমি আপনাকে চিনি। ইন্দোনেশিয়া ও আর্জেন্টিনায় আপনি সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে ছিলেন তাও আমি জানি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আমার দেশকে পাকিস্তানি শেয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বাঘদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনাদের এ ধরনের শর্ত আমার কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। হতেও পারে না"*।[২]

মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা তো অর্জিত হলো। কিন্তু আসলে কী চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু? কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন? গড়তে চেয়েছিলেন কোন বাংলাদেশ? আমার মতে, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁরই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা; যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী; যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত; যে বাংলাদেশে মানবমুক্তি (liberty অর্থে) নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা; যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণহীন-বৈষম্যহীন-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ; যে বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ; যে বাংলাদেশে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশ হবে সুস্থ-সবল-জ্ঞান-চেতনাসমৃদ্ধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আলোকিত মানুষের দেশ।

---

১ আমার এ হিসেবের পদ্ধতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য দেখুন: বারকাত আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৫৫-৫৭।

২ বিস্তারিত দেখুন, মোতাহার হোসেন সুফী, ২০০৯, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৭৬-২৭৭।

কেমন বাংলাদেশ চাই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন *"আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথামাত্র নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো "*।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শন গণমানুষের স্বার্থ-কল্যাণ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামেরই ফসল। বঙ্গবন্ধুর প্রগতি দর্শনের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রতিফলন হয়েছে ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রস্তাবনায় যেখানে বলা হয়েছে *"আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"* এ কথা বলার পর বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শনের স্পষ্টতা নিয়ে আর কোনো কথা না বললেও চলে।

নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটি করলেন তা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন। এ ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু তাঁর গভীর দেশপ্রেম, বিরল প্রতিভা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ, আর সংবিধান রচিত হয়ে গেল ৪ নভেম্বর ১৯৭২—অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল। ইতিহাসে এও এক বিরল দৃষ্টান্ত যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এত কম সময়ের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল। তাও আবার যেনতেন সংবিধান নয়। জনগণের শক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আস্থা-বিশ্বাসনির্ভর দেশজ উন্নয়ন নিশ্চিত করার দর্শনগত ভিত্তির সংবিধান। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা নিরসনসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি ও বিকাশউদ্দিষ্ট চার স্তম্ভভিত্তিক (সংবিধানের মূলনীতি) বিরল এক সংবিধান। স্তম্ভ চারটি হলো: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা কেমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম তা স্বল্প কথায় বোঝানোর জন্য সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। ১৯৭২-এর সংবিধানে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে *"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগে ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে"*। আর সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, *"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"*।[৩] বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এ সংবিধানের

৩. অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতাদখলকারী অবৈধ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে প্রথমবার ও ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয়বার ঘোষণা দিয়ে এ অনুচ্ছেদটি সংবিধান থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯ প্রণয়ন করেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট ২৯ আগস্ট ২০০৫-এ পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে স্পষ্ট রায় দিল যে "পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯ সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক, বে-আইনি, অবৈধ, বাতিল এবং ঐতিহাসিক অপরিণামদর্শী"। রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক [বিস্তারিত দেখুন সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী সম্পাদিত The Bangladesh Law Times, The Constitution (Fifth Amendment) Act's Case Citation: 14 BLT (Special Issues), 2006, পৃ. ২৪০-২৪২]।

কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেই সহজেই বোঝা যাবে যে আসলে কেমন বাংলাদেশ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ, যা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মর্মবস্তুর সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই, মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই; শোষণহীন-বঞ্চনামুক্ত-বৈষম্যহীন সমাজ চাই, সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ চাই'; তিনি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন গরিব দুঃখী-আর্ত মানুষের 'ন্যায্য হিস্যার' কথা:

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে (*সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১*)

২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (*অনুচ্ছেদ ১৫.ক*)

৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)

৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.ঘ*)

৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (*অনুচ্ছেদ ১৯/১,২*)

৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (*অনুচ্ছেদ ১৭ ক,খ*)

৭. মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান (*অনুচ্ছেদ ১৪*)

৮. জীবনযাত্রার বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লবসহ গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধন (*অনুচ্ছেদ ১৬*)

৯. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (*অনুচ্ছেদ ১০*)

১০. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (*অনুচ্ছেদ ১১*)

১১. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (*অনুচ্ছেদ ৩২*)

১২. ... কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৮.১*)

১৩. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (*অনুচ্ছেদ ২৭*)

১৪. আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। ...স্থানীয় সরকার (সংসদে আইন পাশ সাপেক্ষে) যে সকল দায়িত্ব পালন করিবেন তার অন্তর্ভুক্ত হইবে: প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; জনশৃঙ্খলা রক্ষা; জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ৫৯)

১৫. (সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ২১.২)।

মোদ্দাকথা হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তিসংগ্রামে অর্জিত এ দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কমপক্ষে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৪৮ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিল: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানসকাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিকঠাকই শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী তিন-চার বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত-লন্ডভন্ড বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিল।

এতক্ষণ যা বললাম তার সারবস্তু এ রকম: সুদীর্ঘ ৩৮ বছরে (১৯৩৭-১৯৭৫) লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন-বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং এবং এ ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি-উন্নয়নদর্শন (বঙ্গবন্ধুর দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন (বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি), রাজনৈতিক দর্শন এবং উন্নয়ন (প্রগতি) দর্শনে নিঃসন্দেহে ভূমিকা রেখেছিল সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের মিথস্ক্রিয়া। এসব পরিবর্তনের অন্যতম হলো ১৯১৭ সালে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—রুশ বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবপরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুতগতি আর্থসামাজিক মৌলিক পরিবর্তন (যে সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১৫-২০-এর কোঠায়); সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা; ১৯২৯-৩৩ সালে মহামন্দায় (great depression) আর্থসামাজিক সিস্টেম হিসেবে পুঁজিবাদের প্রথম বৈশ্বিক পতন-লক্ষণসমূহ যা শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গিয়ে ঠেকল (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১০ বছর থেকে ২৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালে একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার আবির্ভাব এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে সমাজতন্ত্রের স্নায়ুযুদ্ধ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ বছর থেকে ৩৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে ঔপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় এবং এ আন্দোলনে ভারতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৮ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে); ১৯৪০-৫০ এর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীনা বিপ্লব, চীনের অগ্রযাত্রা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ থেকে ৪০ বছর); ১৯৬০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যেমন ল্যাতিন আমেরিকায় বিশেষত পানামা, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, কিউবার বিপ্লব ও বিপ্লবী চে-গুয়েভারা হত্যা (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছর); ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলন (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪৪ থেকে ৫০ বছর); দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসারতা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত শাসনের আওতায় শোষণ-নির্যাতনসহ বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৭ বছর থেকে ৫০ বছর)।

বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত দর্শনের মূর্ত রূপই হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের গণ-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কী এমন হলো যে ঐ জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। এর মূল কারণ কী? আমার মতে, কারণটি এ রকম: বঙ্গবন্ধু যেদিন থেকে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে) সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, বলছেন নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে—ঠিক তখন

ছক ১: বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, উন্নয়ন দর্শন—যোগসূত্র এবং মূলনীতি-ভিত্তিসমূহ

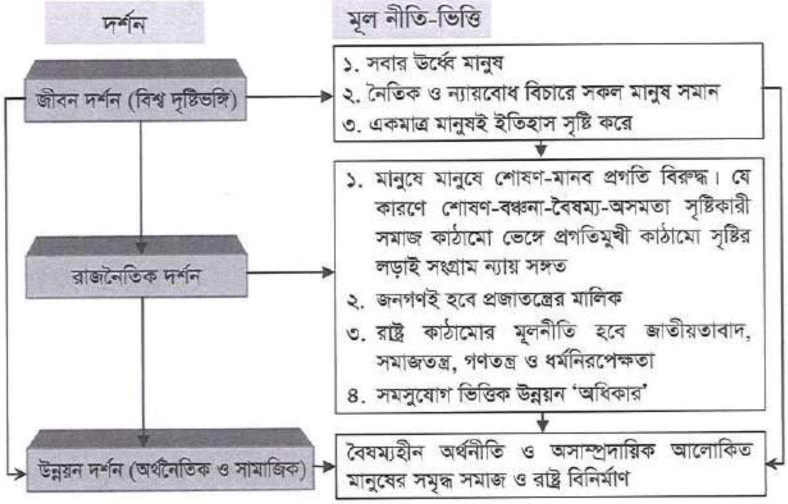

থেকেই ইতিপূর্বে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবীরা আরও দ্রুতলয়ে আরও বেশি শক্তি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দর্শনবিরোধী তাদের ষড়যন্ত্র-কর্মকাণ্ড জোরদার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের দালাল মোশতাক—তাহেরউদ্দিন ঠাকুর-মাহবুবুল আলম চাষী চক্রের ষড়যন্ত্র; জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল সেনা সদস্যের সরকার পতনের ষড়যন্ত্র;[৪] ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র;[৫]

৪. মোশতাক-ঠাকুর-চাষীসহ সমজাতীয় ষড়যন্ত্রকারীরা হয় ইতিহাসজ্ঞানে কাঁচা ছিলেন অথবা জ্ঞানপাপী ছিলেন অথবা জাস্ট বেঈমান চরিত্রের অমানুষ ছিলেন অথবা একই সাথে সবগুলো। এখানে বাংলার ইতিহাসের কিয়দংশ স্মরণ করা সমীচীন হবে। ১৭৫৭ সাল—ভারতবর্ষের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে ঔপনিবেশবাদী ইংরেজরা (১৭৫৭ সালের ২৯ জুন) মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে বসালেন। প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু ইংরেজদের হাতেই রয়ে গেল। মীরজাফরের অযোগ্যতা-অদক্ষতার কারণে তারই জামাতা মীর কাসিম হলেন বাংলার নবাব। তবে মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মচারীরা যখন ব্যক্তিগতভাবে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দাবি করে বসল, তখন মীর কাসিম আপত্তি জানালেন। এ নিয়ে নবাবের সাথে বিরোধ শেষপর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হলো। মীর কাসিমের দুই ঘনিষ্ঠ—নবাব সুজাউদ্দৌলাহ ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের সাথে হাত মেলালো। আর মীর কাসিম পলাতক অবস্থায় ১৭৭৭ সালে অজ্ঞাত অবস্থায় মারা গেলেন।

৫. ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন "উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনো বনেদি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের উপদেশ দিচ্ছি। এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব-রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।" বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী কালে দেশ উল্টোপথে পরিচালিত হয়েছে। ফলে আমার মতে, অবস্থাটা এখন এ রকম—দেশ চালায় rent-seeker-রা আর শাসন-প্রশাসনযন্ত্রের আমলারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ rent-seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা; রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছুই এখন rent-seeker-দের কথায় ওঠাবসা করে। আর এসবের ফলে জনগণের সাথে সরকারের নৈকট্য নয় দূরত্ব বেড়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান।

দুর্নীতি,[৬] সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকার-আলবদর-আল শামসসহ জামায়াতে ইসলামীর ষড়যন্ত্র; মূল্যস্ফীতি ডবল ডিজিটে পৌঁছে দেওয়ার সফল ষড়যন্ত্র; খাদ্যগুদাম লুট, মজুতদারিসহ[৭] খাদ্য সরবরাহব্যবস্থা অকেজো করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০-এর আওতায় সবচেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্র "খাদ্যের রাজনীতি" প্রয়োগ[৮] (উপলক্ষ হিসেবে শর্ত দিয়েছিল আমরা সমাজতান্ত্রিক কিউবায় পাট বেচতে পারব না)—এসবই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। প্রকৃত সত্য হলো, বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চিত করা হলো। সৃষ্টি করা হলো এমনই অস্থিতিশীল ও জটিল পরিস্থিতি যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করলেও কেউ সংগঠিতভাবে রুখে দাঁড়াবে না। প্রতিবিপ্লবী এ শক্তি তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কাজটি দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করে ফেলল—১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার

৬. পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "... বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।"

৭. ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ। ... সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ... এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারী ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে—তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুদ ও চোরাকারবার নিয়ে ষড়যন্ত্রটা হয় শুরু থেকেই। এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র।

৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আমি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত। সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক পরিবেশসহ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে রীতিমতো নির্মোহ গবেষণা করে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ-নীতি-দর্শন তারা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা-পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হয়েছিল। যার অন্যতম (১) বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার কথা বলেন, (২) বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (National Liberation Movement)-এর সমর্থক, যেখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বানুযায়ী উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমাজতন্ত্রের পক্ষের প্রাথমিক ধাপ, (৩) বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ২১ মার্চ পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব "বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদে ইজারা দিলে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেবে"টি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, (৪) বঙ্গবন্ধু কঠিন শর্তের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন; তিনি পরনির্ভরশীলতা পছন্দ করতেন না; স্বনির্ভর-স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী, (৫) বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে দুই মেরুর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, (৬) বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর সংবিধানে 'সমাজতন্ত্রকে' সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, (৭) ভূ-রাজনৈতিকভাবে এবং অস্ত্র ব্যবসায় পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র ছিল পরস্পরের বন্ধু, (৮) বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমীকরণে ছিল একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-চীন আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন-ভারত, যেখানে সোভিয়েত-ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শক্তি। এসব কারণে আমি সন্দেহাতীতভাবে মনে করি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই করেনি তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। আর এসব কারণে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়িসহ (bottomless basket)আরও অনেক ধরনের অন্যায় উক্তি, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও ব্যঙ্গ-কটূক্তি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ যে বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ মোশতাক-ফারুক-রশিদ-জিয়াউর রহমানের পুনর্বাসন করেছিল, তা এখন দালিলিকভাবেই প্রমাণিত। সিআইএসহ মার্কিন সরকারের দলিলপত্রেই উল্লেখ আছে: (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের প্রতি হেনরি কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত বিরাগ ছিল; কিসিঞ্জার বলেছেন 'মুজিব ছিলেন বিশ্বসেরা বোকাদের একজন'; সিআইএর ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'সরকার পরিবর্তন হবে এক আকস্মিক আঘাতে'; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা

মাধ্যমে।[৯] এই একই খুনি চক্র ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও মো. কামরুজ্জামান) হত্যা করল।

১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই মৌল আকাঙ্ক্ষার সোনার বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করল। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেওয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সব ধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি প্রগতিবিরুদ্ধ অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state) এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগাতার সেনা শাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতির ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত—এসবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা; দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সামরিক ছাউনিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বিষয়াদি বিশেষত "ধর্মনিরপেক্ষতা"সংশ্লিষ্ট ১৯৭২-এর

যুদ্ধে নিক্সন-কিসিঞ্জার ঐতিহাসিক পক্ষপাতদুষ্ট'; ফারুক-রশিদ তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির পক্ষে ১৯৭২ সালে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিল'; 'জিয়া পঁচাত্তরের অক্টোবরের আগে বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মার্কিন সাহায্য চান—তখন তিনি নেপথ্যের নায়ক'; ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার—খন্দকার মোশতাক ও জিয়া সরকার যেন টিকে থাকে সে জন্য তৎপর ছিলেন; বোস্টার সাহেব বলেছিলেন, '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট এর ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন তারা দায়িত্বহীন নন'; ১৯৭৫এর ২০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর সাথে প্রথম বৈঠকেই মোশতাক বোস্টারের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন 'যে সুযোগ একাত্তরেই হারিয়েছি, তা এবার আর হাতছাড়া করা যাবে না'; বঙ্গবন্ধুর খুনিদের প্রতি কিসিঞ্জার যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান যে কারণে 'ফারুক রহমানরা ব্যাংককে গিয়েও মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বৈঠক করেন'; কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পেরে ধন্য মনে করছি' (বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান খান, ২০১৪, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ১০, ৫২, ৬১-৬৬, ৭৩, ১০৮, ১৯০)।

৯. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন, "সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে কিছু বিপথগামী উচ্চাভিলাষী অফিসারের হাতে প্রাণ দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং এই কুচক্রিরা জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে তাঁর অনুসৃত কর্মসূচিকে বানচাল করে বাংলাদেশে প্রগতির ধারা পাল্টে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে" (শেখ হাসিনা, ২০১৫, শেখ মুজিব আমার পিতা, পৃ. ৩৭, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী")। এখানে আরও উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ভারতীয় মেজর জেনারেল (অব.) এসএস উবান তাঁর "Phantoms of Chittagong: The 'Fifth Army' in Bangladesh"গ্রন্থে লিখেছেন: "লক্ষ করলাম তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) বাসার কোথাও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। ...তাঁর সাথে দেখা করতে আসা মানুষজনের কোনো বাছবিচার নেই—এ কথা তুলতেই তিনি বললেন—'আমি জাতির জনক। দিন-রাতের যেকোনো সময়ে আমার কাছে প্রত্যেকের আসার অধিকার আছে। কেউ যদি কষ্ট-বেদনায় থাকে, তার সামনে তো আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিতে পারি না"। এর পর জেনারেল (অব.) উবান লিখছেন, "আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার এ অনুভূতিতে মুগ্ধ, তবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। ...আমার মনে হয়, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতারা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে মুজিব যতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন তত দূর খুব কমসংখ্যকই গিয়েছেন।" (মূল গ্রন্থের অনুবাদক হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ঘাস-ফুল-নদী প্রকাশনা, ২০১৪, ঢাকা: পৃ. ১৪২)।

সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি কর্তন-পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করা হয়েছে;[১০] স্বাধীনতাবিরোধী নিষিদ্ধঘোষিত রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে; যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; শুধু পুনর্বাসনই নয় স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতার-সরকারের অংশীদার করা হয়েছে; সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে "নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলার" যে কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সেটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেন চালকের আসনে কোনো না কোনোভাবে শক্তভাবে বসে পড়েন তারা, যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না—যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent-Seeker)[১১] হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ-কব্জাগত করে ফেলেন। এটাই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো অসম্ভব হবে।

---

১০. ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের "প্রস্তাবনার" উপরে (অথবা অন্য কোথাও) "বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম" লেখা ছিল না, যা বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী কালে তেমন সময়ক্ষেপণ না করেই সংযোজন করা হয়েছে। কাজটি করলেন সেনা শাসক রাজাকার পুনর্বাসনকারী "মুক্তিযোদ্ধা" জিয়াউর রহমান। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে 'ধর্মবিষয়ক চেতনা ছিল "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার" (যেটাই ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মবস্তু)। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে ছিল না "রাষ্ট্র ধর্ম" বলে কোনো কিছু। কিন্তু বঙ্গবন্ধুপরবর্তীকালে এখন সংবিধানে স্পষ্ট লেখা "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন" (সংবিধান, পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১, ২০১১ সালের ১৪ নং আইন-এর ৪ ধারাবলে ২ক অনুচ্ছেদে প্রতিস্থাপিত)। "রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম" করে ছাড়লেন স্বৈরশাসক-সেনাশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ। উল্লেখ্য, ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার" নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল; সংবিধানের "ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে (১২ নং অনুচ্ছেদে) রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্যতম মূলনীতি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে"। (১৯৭২-এর সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১২)।

১১. সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় Rent-seeker ও Rent-seeking বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিষয়টি এ রকম—বিত্তবান বাসম্পদশালী হওয়া যায় দু ভাবে বা দু পদ্ধতিতে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে (by creating wealth)—এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্তসম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুটতরাজ, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন অনৈতিক ও অসভ্য পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent-seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত (wealth) বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নিচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস—বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এ রকম: উপর তলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না—কীভাবে কি হয়ে গেল! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে, যা দুর্ভেদ্য—যে ত্রিভুজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। এ ত্রিভুজ যতদিন বহাল থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে (Rent-seeker ও Rent seeking বিষয়ের মর্মকথা বিস্তারিত জানতে দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৭, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ২৩-৩৪)।

বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি—বাতিল ঘোষিত হয়েছে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরবর্তীকালে দেশ পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিক উল্টোপথে। স্বপ্ন ছিল সমতাভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা গঠনের; কিন্তু তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে নয়া-উদারবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি (যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধব তো নয়ই), যা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর জনকল্যাণবিরোধী ব্যবস্থা। নয়া-উদারবাদী মুক্তবাজারব্যবস্থাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করেছে: বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বেড়েছে গুটিকয়েক সুপার-ডুপার ধনী, জনগণের জীবন পরিচালনে প্রয়োজনীয় পণ্যের (ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) মূল্য বৃদ্ধি, দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত শ্রমশক্তির অভাব, মনুষ্যশ্রমের স্বল্পমূল্য (মজুরি), কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, বিচারিক অন্যায্যতা, দুর্নীতি, দুঃশাসন, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা—পরস্পরসম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছে। এসব থেকে মুক্তির পথ একটাই। আর তা হলো বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত-বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত-অসাম্প্রদায়িক" উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়ন।

৩. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ফল

মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালাল-দোসররা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছিল—তা যেকোনো মাপকাঠিতেই ছিল অপূরণীয় ও অপরিমেয়। এ অবস্থায় 'বঙ্গবন্ধুর-দর্শন-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৭২ সালে দু'ধরনের বৃহৎ বর্গের কর্মকাণ্ডে। প্রথমটি, আশু-তাৎক্ষণিক-জরুরি প্রকৃতির এবং কিছুটা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক-উন্নয়নবিষয়ক; আর দ্বিতীয়টি, দেশের ভিতরে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ পুনঃগঠন-পুনঃনির্মাণ-এর মাধ্যমে বলা যায়, জিরো অবস্থা থেকে শুরু করে মুক্ত-স্বাধীন দেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলা। যা কোনো অর্থেই সহজ কাজ ছিল না, কারও কারও মতে কাজটি ছিল অসম্ভব।

তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তো মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' ('Bangladesh is a bottomless basket') আখ্যায়িত করে বলতে চেয়েছিলেন *'কথা তো শুনলে না, দেখি মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের নামে তোমাদের কোথায় নেয়'*। এ দলে কিসিঞ্জার একা ছিলেন না। অর্থনীতিবিদদের নমস্য তত্ত্বগুরু জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে রীতিমতো গুরুগম্ভীর এক পুস্তকই লিখে ফেললেন যার শিরোনাম "Bangladesh: The Test Case of Development" অর্থাৎ "বাংলাদেশ—উন্নয়নের এক টেস্ট কেস"। যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিয়ে তারা এ উপসংহারে উপনীত হলেন যে উন্নয়নের তেমন কোনো সম্ভাবনা বাংলাদেশের নেই। ফাল্যান্ড ও পারকিনসন সাহেব ঐ গবেষণা (!) গ্রন্থে যা বললেন তার সারকথা এ রকম: *"বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১ কোটি হলে ভালো হতো। কিন্তু জনসংখ্যা ৮ কোটি, তাও আবার ক্রমবর্ধমান। সে কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অবস্থা আরও খারাপ-ভয়ংকর রকমের খারাপ হতে বাধ্য (তাদের ভাষায় "certainly get worse, terribly worse")।* তাদের

বিশ্লেষণের শেষ কথাটি এ রকম: *"বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফল হতে পারে তাহলে পৃথিবীর যেকোনো দেশই তা পারবে"* ।[১২]

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ যে ফলপ্রদ হলো তা তিনি ১৯৭২ সালে যা যা করলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতাটি একবার চোখ বোলালেই সহজে বোঝা যায় (ছক ২ দেখুন)। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু উল্লিখিত বৃহৎ বর্গের অন্তর্গত প্রথম যে ধরনের কাজগুলি করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেসব অস্ত্র ছিল তা সমর্পণ করানো; ভারতফেরত ১ কোটি শরণার্থীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন; শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গকে সহযোগিতা প্রদান; স্বল্প সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন; সরকার পরিচালনে ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর গণমুখী পরিবর্তনসহ দক্ষ প্রশাসক সৃষ্টি; মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের আটক করে বিচারের আওতায় আনা; বাংলাদেশে অবস্থানকৃত প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো; পাকিস্তানে আটকেপড়া প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনা; প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন; স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট প্রণয়ন; স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের যত দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন; জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন; যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক অনুদান-সহযোগিতা প্রাপ্তির সর্বাত্মক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা; আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব মোকাবিলা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নস্যাতের প্রচেষ্টা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির দেশবিরোধী সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড মোকাবিলা; সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা; ব্যাংক-বীমা, পাট শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ; কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি। ছক ২ এ প্রদর্শিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত প্রথম বছরের (১৯৭২ সালের) কর্মকাণ্ডের মাসওয়ারি খেরোখাতা শুধু একটি তালিকা মাত্র নয়—তালিকায় কর্মকাণ্ডের যুক্তি পরম্পরা অনুধাবন না করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচার অসম্পূর্ণ হবে। এ তালিকাটি বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসহ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পরিচালনে অগ্রাধিকারক্রম বিবেচনায় তার মেধা-মনন, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। এক কথায় কর্মযজ্ঞের অগ্রাধিকার ক্রম (priority) এবং কালানুক্রম (sequence) স্পষ্ট নির্দেশ করে যে ১৯৭২ সাল থেকেই "বঙ্গবন্ধু-দর্শনের" বাস্তব প্রয়োগ শুধু শুরুই হয়নি তা স্বল্প সময়ে যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরপরই 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর বাস্তব প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিদর্শন নিম্নরূপ:

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার-পরিজনসহ জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ১ কোটি শরণার্থীসহ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু লক্ষ-লক্ষ বাস্তুচ্যুত-গ্রামচ্যুত-শহরচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসন, দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বিধ্বস্ত বাসগৃহ পুনর্বাসনসহ এসব পরিবারে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের কাজটি ছিল বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যা সমাধানে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল পাকিস্তানপন্থী স্থানীয় শাসন পরিষদ ও প্রশাসন। এসব বাধা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ এর ৪ মার্চ নাগাদ মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে সামগ্রিক পুনর্বাসনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত ৯ লক্ষ ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ করে। এর অর্থ জনগণের অধিকার

১২. দেখুন, জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন, ১৯৭৭, Bangladesh: The Test Case of Development, New Delhi: S. Chand & Company Ltd, পৃ. ১৯৭।

ছক ২: যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রথম বছরেই (১৯৭২ সালে) বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকারভিত্তিতে যে সকল পদক্ষেপ নিলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতা

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ	মাস (১৯৭২ সালে)											
	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১। মন্ত্রীসভা গঠন (১২ সদস্যবিশিষ্ট)	■											
২। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হয়: জাতীয় পতাকা: জাতীয় সঙ্গীত: রণসঙ্গীত	■											
৩। শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন	■											
৪। ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত			■									
৫। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৬। শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
৭। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের বিচারের জন্য "বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ" প্রণয়ন	■											
৮। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন গঠন	■											
৯। ধ্বংস প্রাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন/পুনর্নির্মাণ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১০। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা	■	■	■	■	■	■	■					
১১। কৃষি পুনর্বাসন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১২। ১৩৯টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৩। সংবিধান প্রণয়ন												■
১৪। প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ			■									
১৫। আন্তর্জাতিক অনুদান প্রাপ্তির কূটনীতি	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৬। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ			■									
১৭। ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্রকল জাতীয়করণ			■									
১৮। বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
১৯। ১৯৭১ এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ	■											
২০। প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ				■								
২১। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন							■					
২২। পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা	■											
২৩। বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ						■						
২৪। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজে নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২৫। শিক্ষকদের ৯ মাসের বন্ধ বেতন দেয়া							■	■	■	■	■	■
২৬। জরুরিভাবে ১৫০টি আইন প্রণয়ন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
২৭। কৃষকদের (২৫ বিঘা পর্যন্ত) খাজনা মওকুফ												■
২৮। পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন	■											
২৯। রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা	■											

উৎস: বারকাত আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ৭৫-৭৭। কালো রংএর বক্স সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাস নির্দেশ করছে।

আদায়ের সংগ্রামের প্রতিভূ মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটিতে হাত দিলেন তাহলো যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসন।

২। ১৯৭১-৭২ সময়কালে কৃষিই ছিল এ দেশের অর্থনীতির প্রাণ। কৃষিকে পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসররা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছিল। কৃষির চিরাচরিত কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু যথামাত্রা গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষিতে বিদ্যমান শ্রেণিকাঠামো জিইয়ে রেখে মুক্তিও আসবে না জনকল্যাণকামী উন্নয়নও হবে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষি-খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু যেসব বাস্তবভিত্তিক সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: কৃষকদের জরুরিভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান ও বীজ সরবরাহ করা; গভীর ও অগভীর নলকূপ মেরামত ও পুনঃখনন করা; হাল চাষের জন্য কয়েক লাখ গরু আমদানি করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা; ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা; এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তরের সবাত্মক প্রয়াস; খাসজমি ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকসহ বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন; চর এলাকায় বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ; উপকূল অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এসব ছাড়াও কৃষিতে শ্রেণি বৈষম্য হ্রাসে কৃষকদের মুক্তিসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ নেন এবং ঘোষণা করেন তার মধ্যে ছিল ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি খাস হিসেবে ঘোষণা; খাস জমি ও নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন; ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য খায়-খালাসী আইন পাশ; বন্ধকি ও চুক্তি কবলা জমি ৭ বছর ভোগ করা হলে তা মালিককে ফেরত প্রদান যাতে জোতদারদের কাছ থেকে কৃষক জমি ফেরত পায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে যেখানে বলা হয়েছে, *"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনগণের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"*। এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা যার ভিত্তি-দর্শন ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় তার দৃঢ়মূল বিশ্বাস।

৩। ১৯৭২ সালে দেশে মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সরকারের হাতে খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন। খাদ্য পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল সংকটময় আর সংকট গুণিতক হারে বাড়লো কারণ একদিকে আমাদেরই আধাভুক্ত-অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানোর পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী ও আটককৃত ৫০-৬০ হাজার দালাল-রাজাকারদের (যারা খাদ্য ঘাটতি পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মূল দায়ী) এবং সেইসাথে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় মিত্র সেনাবাহিনীকে। খাদ্য ঘাটতি আর অতি নগণ্য মজুত নিয়ে এ সমস্যারও সমাধান করলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। এ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এক বিরল যোগ্যতার প্রমাণ।

৪। অপূরণীয়-অপরিমেয় মানবসম্পদ ক্ষতির পাশাপাশি পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালালেরা সবচে' বেশি ক্ষতি সাধন করেছে অবকাঠামোগত-ভৌত সম্পদের যার মধ্যে অন্যতম রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ (উৎপাদন-সঞ্চালন-বিতরণ), টেলিযোগাযোগ।

অবকাঠামো ধ্বংস বিষয়টি যে শুধু পরিমাণের নিরিখে বিশাল ক্ষতি ছিল তাইই নয় তা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে কৌশলগত দিক থেকেও ছিল অপূরণীয়। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশে ফিরে ১২ জানুয়ারি ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পরেই কোনো বিলম্ব না করে ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসেই ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগব্যবস্থা সংস্কার-নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-পুনঃগঠনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে হাত দেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্কার কাজে হাত দেন মার্চ মাসে (দেখুন খেরোখাতা ছক ২)। বিধ্বস্ত রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্টসমূহ ১৯৭৩-এর শেষ নাগাদ চলাচল উপযোগী করা হয়; একই সময় রেল লাইনগুলো চলাচল উপযোগী করা হয়; চট্টগ্রাম বন্দর সমাজতান্ত্রীক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ১৯৭৪ নাগাদ মাইনমুক্ত করা হয়; টেলিযোগাযোগব্যবস্থা সচল করা হয়। অর্থাৎ বিচক্ষণ ও প্রায়োগিক দক্ষতাসহ অর্থনীতির অবকাঠামোর বিকল অবস্থা অতি স্বল্প সময়েই কার্যকরভাবে সচল করা হয়। অথচ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব", "বাংলাদেশ সচল করতে কমপক্ষে দশ বছর সময় লাগবে"।

৫। মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী যে কাজগুলি করলেন তা হলো ১৯৭১-এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাধীন-মুক্ত-জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা (উভয়ই ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে); ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ (অব্যাহত এ কাজের শুরু ১৯৭২-এর মার্চ মাসে); প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ (১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে শুরু); বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান (১৯৭২এর জুন মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বাজেটে); এবং ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষকদের ৯ মাসের মধ্যে বেতন প্রদান (উভয়ই ১৯৭২-এর জুলাই মাসে)। এসবের বেশ কয়েকটি কর্মকাণ্ড চলমান থাকলো। এ তো গেল ১৯৭২ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই দেশে দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারি স্কুল সরকারীকরণ-জাতীয়করণ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন। ফলে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪২ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকৃত হলো। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে জাতীয়করণ ছিল অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় শর্ত।

স্বাধীনতাত্তোরকালে বঙ্গবন্ধু যে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষাকে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে ও সমতাভিমুখী সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। বিজ্ঞানভিত্তিক-গণমুখী-কর্মমুখী-জীবনমুখী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্বপ্রদান—এটা বঙ্গবন্ধুর দেশজ উন্নয়ন দর্শনের (home grown development philosophy) অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাকে বঙ্গবন্ধু কখনো ব্যয় (expenditure)হিসেবে গণ্য করেননি, গণ্য করেছেন উন্নয়নে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ (investment) হিসেবে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট ধারণা প্রসঙ্গে যা বললাম তার স্বপক্ষে উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একাংশের শিরোনাম ছিল "শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ"। ১৯৭০-এর ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন "*সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর*

হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ...জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে।... দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে"।[১৩] শিক্ষা যে মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ আর তাই শিক্ষাখাতে যথেষ্ট মাত্রায় বিনিয়োগ করতে হবে, শিক্ষাকে যে হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত, শিক্ষক বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের যেন উচ্চ মর্যাদায় দেখা হয়, দারিদ্র্য যেন শিক্ষার মাধ্যমে মেধা বিকাশে বাধা না হয়—বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার এসবের কোনোটিই রাজনৈতিক স্লোগানমাত্র ছিল না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট; বাংলাদেশের সংবিধান; মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন (১৯৭৩ সাল); সেই সাথে প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাসহ প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ।

উল্লেখ্য যে, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহসহ যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল তার ভিত্তি-দর্শন হলো বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। আর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষ-কারিগর সৃষ্টির মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৬। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ জাতীয়করণ নীতি (Nationalisation Policy) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্যাংক (বিদেশি ছাড়া), বিমা (বিদেশি ছাড়া), পাট, বস্ত্র, কাগজ শিল্প, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, বৃহৎ পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান (১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে), বিমান ও জাহাজ কর্পোরেশনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এছাড়াও সামন্তবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে জমির মালিকানার সর্বোচ্চসীমা ১০০ বিঘা বেঁধে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিস্বত্ব সরকার গ্রহণ করে সেগুলোর সমন্বয়ে মোট ৬টি ব্যাংক গঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩ জানুয়ারি ১৯৭২-এ জারিকৃত ১ নং আদেশ (AOP 1) এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ ঘোষিত ১৬ নং আদেশ (PO 16) এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার ৮৫ শতাংশ শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত রাষ্ট্র এসবের মালিকানা ও দখল গ্রহণ করে। এসব পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত' হিসেবে অভিহিত হয়। উল্লেখ্য যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের PO 16 বিধি অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা ফেরত পাবার জন্য সরকার

---

১৩. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০-এর নির্বাচনী ভাষণটির জন্য দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (১৯৮৯), ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন, পৃ. ৩০।

বরাবর আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তবে এ আদেশে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফেরত পাবার কোনো সুযোগ ছিল না।

৭। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে যেখানে গরিব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হবেন; যেখানে সমবায়ের সংহত শক্তি গরিব মানুষকে জোতদার-ধনী কৃষকের শোষণ থেকে মুক্তি দেবে; যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরীবের শ্রমের ফসল আর লুট করতে পারবে না; যেখানে শোষণ ও কোটারি স্বার্থ চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

মানুষের যৌথ উদ্যোগ-যৌথ চিন্তার প্রতিষ্ঠান সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ ছিল তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যে যেখানে তিনি বলছেন, *"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বন্টনব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।... আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। ...অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন—কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে।... আমার প্রিয় কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে"*। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গরিব মানুষকে জোতদার-ধনীদের শোষণ থেকে মুক্তি,

মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসসহ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ ও গণতন্ত্র বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতভিত্তিক, পেশাভিত্তিক গণমুখী সমবায় আন্দোলন (pro-people co-operative movement) গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বক্তব্যে স্ব-ব্যাখ্যায়িত।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৯৭২ সালে ঘোষিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন সফল হয়নি। একদিকে বৃহৎ ভূ-স্বামী জোতদারদের জমি হারানোর ভীতিসহ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র আর অন্যদিকে বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্র-পেশাভিত্তিক বহুমুখী সমবায় গঠন ও পরিচালন কীভাবে হবে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব—এসবই গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়নি। সেই সাথে এ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যতটুকু সময় পাওয়া প্রয়োজন ছিল তাও পাওয়া যায়নি। বঙ্গবন্ধু তারপরও দমে যাননি। ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বললেন: *"... এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান-এ বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম-কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।... আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ... আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে"*। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়সহ বহুমুখী সমবায় গঠন নিয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এসব ঘোষণা দিলেন তার সাড়ে ৪ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো! এর কারণ—বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এমন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালি বিবৃত করা হয়েছিল যা থেকে সাম্রাজ্যবাদসহ তাদের দেশি-বিদেশি সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা চুপ করে বসে থাকা কোনো অর্থেই আর নিরাপদ মনে করেনি।[১৪]

৮। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলায়' রূপান্তর ও 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর' লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শুধু পুনর্বাসন, পুনঃগঠন, পুনঃনির্মাণ কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই (৩০ মার্চ ১৯৭২) দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন,

১৪. বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ১৯৮৮, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, পৃ. ২১৪-২১৮।

যার চেয়ারম্যান ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে।[১৫] কমিশন মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে রচনা করলেন এক ধ্রুপদী দলিল—বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে। ধ্রুপদী এ দলিলের ভিত্তিদর্শন হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসংশ্লিষ্ট বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়নদর্শন"—ধার করা কোনো উন্নয়নদর্শন নয়। উন্নয়নের এই ধ্রুপদী প্রথম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলটি রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল ১৯৭২-এর সংবিধানের আদর্শিক মূলনীতিসমূহকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বিষয়টি সঙ্গত কারণেই গুরুত্ব পেলেও মূল দিকনির্দেশনার বিষয় ছিল ভবিষ্যতের বাংলাদেশ—বৈষম্যহীন, জনকল্যাণকর, সমৃদ্ধ, উন্নত, প্রগতিবাদী এক আলোকিত বাংলাদেশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে উন্নয়ন-প্রগতি অগ্রাধিকারে দিকনির্দেশনাসমূহের গুরুত্ববহ কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। আর লক্ষ্যার্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল: কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, এবং সমতা-ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার ৩ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৫.৫ শতাংশে উন্নীত করা। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানবশক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকারকাঠামো শক্তিশালী করা।

৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজারমূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা স্থিতিশীল রাখা।

৫. পুনঃবণ্টনমূলক আর্থিক নীতিকৌশলসহ বণ্টন নীতিমালা এমন করা, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার দেশের সামগ্রিক গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা; অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

৭. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা—৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশে কমিয়ে আনা। স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ

১৫. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে একত্রিত করা হলো দেশের স্বনামখ্যাত দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের। মন্ত্রী পদমর্যাদায় ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো ড. নুরুল ইসলামকে আর প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হলো অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেনকে।

ও বহুমুখী করা এবং আমদানি কাঠামো পুনঃবিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

৮. গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৯. কৃষির প্রতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ণ, পানি সরবরাহ ইত্যাদি সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল নিয়ে যা উল্লেখ করলাম সেখানে অন্তত দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় বলে মনে করি। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী উন্নয়নদর্শনটি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য-কৌশলসহ স্বাধীনতার চেতনা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তুও সে অনুযায়ী বিনির্মাণ করা হয়েছিল (সব সীমাবদ্ধতাসহ), যেখানে মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাস নিমিত্ত শক্ত ভিত্তির জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল রচিত হলো তা বাস্তবায়নের মাত্র দুই বছরের মধ্যে গভীর এক আন্তর্জাতিক-সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসহ ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ-জনকল্যাণকর-বৈষম্যহ্রাসকারী-প্রগতিবাদী বাংলাদেশ বিনির্মাণের বাস্তবসম্মত স্বপ্নকে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হলো—১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে।

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও প্রয়োগ ফলের ধণাত্মক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবণতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যদি কোনোভাবে এমন কোনো হিসাব করা সম্ভব হয়, যেখানে "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের চেহারা কেমন হতে পারতো" এটা দেখানো যায়—সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের কার্যকারণ সূত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল সমীকরণও হয়তো বা উন্মোচিত হয়ে যাবে। এ ধরনের জটিল গবেষণা একটু হলেও হয়েছে। যেখানে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং সেইসাথে জাতীয়তাবাদ-সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতাসংশ্লিষ্ট চার-দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবণতা বহাল থাকতো তাহলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চেহারাটি কেমন হতে পারতো? এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকাঠামো, প্রবৃদ্ধি হার এবং বৈষম্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন কৌশল যদি বজায় থাকতো তাহলে মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়সহ আর্থসামাজিক শ্রেণিবৈষম্য হ্রাসে যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো, তা আজকের সময়ের বিচারে কল্পনাতীত এবং অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।[১৬]

৪. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—পূর্ণ বাস্তবায়নে সমাজকাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনটা কেমন হতো?

গবেষণায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে "বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে" এবং একই সাথে "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে অর্থনীতির প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডে বাংলাদেশ কল্পনাতীত মাত্রায় এগিয়ে যেতো।

---

১৬. এ গবেষণা ফলাফলের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, (পৃ. ১০৯-১৬০), ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।প্রকাশনা।

যেমন প্রমাণিত হয়েছে যে ২০০০ সাল নাগাদ মালয়েশিয়াকে পেছনে ফেলে দিতো বাংলাদেশ।[১৭] অর্থনীতির যেসব বড় মাপের মানদণ্ডে এসব ঘটত তার মধ্যে আছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), (এমনকি) মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন, মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয়, মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে)।

'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর অনুষঙ্গ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে অর্থনীতিতে কল্পনাতীত পরিবর্তন হতো এ নিয়ে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজ কাঠামোর ধণাত্মক পরিবর্তন ঘটায়—এ কথা নিঃশর্ত সত্য নয়। আর সে কারণেই ভাবনাটা জরুরি যে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সমাজে, সমাজ কাঠামোতে, শ্রেণিকাঠামোতে সম্ভাব্য কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারতো, যা হয়নি। যাকে আমি বলছি "কল্পনাতীত হারানো সম্ভাবনা" বা "unimaginable lost possibilities"।

এক কথায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে শ্রেণি বিভক্ত সমাজের পরিবর্তিত শ্রেণিকাঠামোটি কেমন হতে পারতো? প্রশ্নটি সহজ; কিন্তু উত্তর কঠিন। তবে সহজ এ প্রশ্নটি উত্থাপন এখন জরুরি কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী বাংলাদেশে আয় ও ধন বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। "বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে" এবং একইসাথে তাঁরই উদ্ভাবিত "সমাজ-অর্থনীতির উন্নয়ন-দর্শন" বাস্তবায়িত হলে আমার হিসেবে সম্ভাব্য সামাজিক পরিবর্তন যা হতো তার কয়েকটি প্রবণতা-সম্ভাবনা নিম্নরূপ:

- ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৭ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জের আব্দুল নূর, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা (যার জন্ম ১৯৭১ সালে) হোসনে আরাকে রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুটা বানিয়ে বিক্রি করে হাওড়ের জীর্ণ কুটিরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত সহানুভূতিশীল মানুষদের দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিস্পেষিত হতে হতো না। বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভ্যান চালায় আর ভ্যানে বসে রাজাকার সিগারেট ফুঁকে বলে "এই ব্যাটা মুক্তিযোদ্ধা জোরে চালাতে পারিস না"—এ অবস্থা কখনো হতো না।
- মহান মুক্তিযুদ্ধে ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার ১০ লক্ষ নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাজে বসবাসের সকল সুযোগ সৃষ্টি করা হতো।
- ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক-মানবিক-চেতনায়ন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানব মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনা-সংশ্লিষ্ট বোধ বৃদ্ধি পেত এবং তা কার্যকরভাবে দেশ-সমাজ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা রাখতো। এসবের ধনাত্মক প্রতিফল হতো অনেক গভীর-বহুমুখী-বহুবিস্তৃত। এবং বংশপরম্পরা।
- সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় শাসন (local governance) উৎসাহিত হতো এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীরা যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতেন; নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসন ভার অর্পণ করা হতো এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপসহ বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হতো। এসবের প্রকৃত

১৭. বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ। (পৃ. ১০৯-১৩৭); ঢাকা: মুক্তিবুদ্ধি প্রকাশনা।

অভিঘাত যা দাঁড়াত, তা হলো জনগণই হতেন প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করত। আর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উন্নয়নে জনগণের প্রকৃত অংশীদারিত্ব বাড়তো অন্যদিকে দুর্নীতি-লুণ্ঠন-পরজীবী প্রকৃতির উন্নয়ন-প্রগতিবিরোধী কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ হয়ে যেতো। "মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করতেন"—এটাই ছিল "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর নিহিতার্থ।

➢ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবার জন্য সব ধরনের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হেতু স্থূল জন্মহার (crude birth rate)এবংস্থূল মৃত্যুহার (crude death rate)—উভয়ই হ্রাস পেত। এসবের ফলে দারিদ্র্য-উদ্ভূত মৃত্যুহার বহুগুণ হ্রাস পেত। জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস পেলেও আজকের জনসংখ্যা হয়তো বা ১৬ কোটিতেই থাকতো কিন্তু জনসংখ্যায় বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটত। যা হতো তা হলো—এই ১৬ কোটি জন-সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উচ্চতর গুণমানসমৃদ্ধ আলোকিত জন-সম্পদে রূপান্তরিত হতো ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত মানে আমূল পরিবর্তন আসতো। আর এই রূপান্তর দেশজ মেধা-মননের বিকাশসহ দেশজ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চেহারাটাই পাল্টে দিতো (অন্তত শ্রমের অধিকতর ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে)। এসবের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল হতো আজকের বাংলাদেশের তুলনায় অন্য এক বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যেতো—যে বাংলাদেশকেই বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত করতেন।

➢ জনসংখ্যা ১৬ কোটি থাকতো তবে মোট জনসংখ্যায় গ্রামের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেত। গ্রাম তো আর আজকের মতো গ্রাম থাকতো না। গ্রামের মানুষ নগরের নাগরিক সমাজের সকল সুবিধা গ্রামে বসেই পেতেন—পেতেন বিদ্যুৎ, পেতেন জ্বালানি সুবিধা, পেতেন সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সুবিধাদি, পেতেন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সুযোগ, পেতেন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, পেতেন আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গণযোগাযোগ ও ব্যক্তি যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সহজ অভিগম্যতা (অর্থাৎ যাকে বলে PSURA, providing scientific urban amenities in rural areas)। এ সবের ফল দাঁড়াতো একদিকে গ্রামের মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন। আর অন্যদিকে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এখন গ্রামে বাস করেন যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ (যেখানে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯২ শতাংশ একই সময়ে মালয়েশিয়ায় তা ছিল ৬৭.৩ শতাংশ)। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিত্র আমূল পাল্টে যেতো—সংজ্ঞাগতভাবেই গ্রামকে আর প্রচলিত অর্থের গ্রাম বলা যেতো না এবং গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার এখন যে অনুপাতটা আছে (৭২:২৮) অর্থাৎ মোট ১৬ কোটি মানুষের ৭২ শতাংশ গ্রামে বাস করেন আর বাকি ২৮ শতাংশ শহরে বাস করেন সেটা ঠিক উল্টো হতো অর্থাৎ জনসংখ্যায় গ্রাম-শহরের অনুপাতটা হতো ২৮:৭২, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রাম থেকে শহরে যে গলাধাক্কা অভিবাসন হচ্ছে এবং সেইসাথে গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসিত এই মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্প মজুরিতে কাজ করে প্রথমে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হচ্ছেন আর তারপরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন—এই প্রক্রিয়া থাকতো না; কারণ গ্রাম থেকে মানুষ কোনো কারণে শহরে এলেও সে মানুষ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানসমৃদ্ধ সুস্থ-সবল দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত মানুষ হিসেবে নিদেনপক্ষে শিল্পায়নের আওতায় থাকতেন এবং উচ্চতর জীবনমানের অধিকারী হতেন।

- বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট ও গ্রাম-শহরের প্রভেদ দূরীকরণ নিমিত্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৬) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত (১৯৭৫ সালে) গণমুখী সমবায় আন্দোলন (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামীণ সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ ১৯৭২ এর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরত্বক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানার প্রতিশ্রুতি) ও কল-কারখানায় শ্রমিকের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে থাকতো না কোনো ভূমিহীন কৃষক, থাকতো না জল-জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত দরিদ্র কোনো জেলে, থাকতো না দরিদ্র কোনো মেহনতি শ্রমিক।
- বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্যের অনেকগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না, দারিদ্র্যের কিছু কিছু রূপ প্রশমিত হতো এবং আস্তে আস্তে সেগুলোও বিলুপ্ত হতো। বহুমুখী দারিদ্র্যের এসব রূপের মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য ইত্যাদি।[১৮]

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শন বাস্তবায়িত হলে যেসব প্রবণতা-সম্ভাবনা এতক্ষণ উল্লেখ করলাম সবকিছুই মোটামুটি তেমনটিই হতো—কারণ, এ সম্ভাবনা বাস্তব; কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটাই সম্পূর্ণ বদলে যেতো। শ্রেণিসমাজের রূপান্তর ঘটত এ কারণেও যে ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাসসহ সমজাতীয় বিষয়াদি নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি।

আজকের বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটি কেমন আর কেমনটা হতো ঐ শ্রেণিকাঠামো যদি বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হতো (বঙ্গবন্ধু 'যদি বেঁচে থাকতেন')? এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তাসহ হিসেবপত্তর কেউ কখনো করেছেন বলে আমার জানা নেই। এ নিয়ে আমার হিসেবপত্তরভিত্তিক বর্তমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হলে ঐ কাঠামো কেমন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের হতো[১৯] তা যথাক্রমে ছক ৩ ও ছক ৪এ দেখানো হয়েছে।

---

১৮. দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ এবং সংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৭, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", (পৃ. ৩৫-৬৯); ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

১৯. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক আমার হিসেবপত্তর নিয়ে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে ভিন্নমত অথবা দ্বিমত পোষণকারীদের এ বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আগে অনুরোধ করব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে তারা বিশ্বাস করেন কি না যে ১৯৭২-এর সংবিধানে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তারাই দরিদ্র। আর একই সাথে অনুরোধ করব মানেন কিনা যে দারিদ্র্যের বহুরূপ আছে, দারিদ্র্য বহুমুখী (যেসব রূপের কথা উপরে '৮'-এ উল্লেখ করেছি)। এসব রূপের যেকোনো একটি বা একাধিক রূপ যার জন্য প্রযোজ্য তিনিই 'বহুমুখী দরিদ্র', আর তার জীবনের অবস্থাটাই দারিদ্র্য।

ছক ৩: আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো, ২০১৮
(মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি)

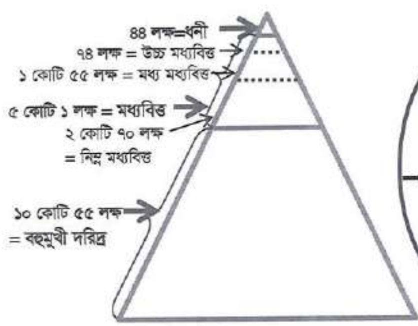

ছক ৪: 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো কেমন হতো?
(মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি)

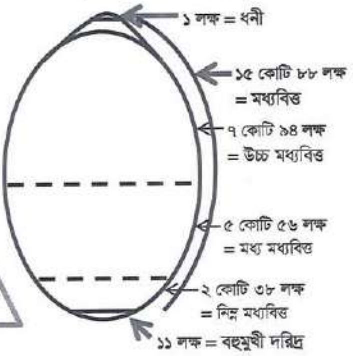

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত।

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। শুধু তাই নয় এ শ্রেণি বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। দেশে ক্রমবর্ধমান আয়-বৈষম্য ও ধন-বৈষম্য নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশপ্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সার্বিক বহুমুখী দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতার অধোগতি হচ্ছে।[২০] সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আর এদেরই মধ্যে ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের মোট বিত্তের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ (অর্থাৎ এরা হলো দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো মইয়ের উপরের ১ শতাংশ মানুষ যাদের বলা হয় super-duper elite)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেল বিজয়ী অথনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আখ্যায়িত করেছেন "Of the 1%, for the 1%, by the 1%" হিসেবে, এমনকি পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্বোচ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে সর্বোচ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান তাদের দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক; যেখানে ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity) হেতু ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে আর গরিবরা হচ্ছে আরও গরিব।[২১]

২০. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্যসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৭, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। মইনুল ইসলাম (২০১৯), "বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়-বৈষম্য: সমাধান কোন পথে?" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ঢাকা: ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

২১. এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন জোসেফ স্টিগলিজ, (২০১৩), The Price of Inequality, Penguin Books, পৃ. ix, xi, xiii, xxix-xxxii, xlii-xliii, xliv-xlvii, 1-3, 5, 19, 35, -38;পল ক্রুগম্যান, (২০১৩), End This Depression Now, WW. Norton & Company Ltd., পৃ. ৭৪-৮২; নোয়াম চমস্কি, (২০০৪), Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, Penguin Books, পৃ. ১৫৯; চাক কলিন্স.(২০১২). 99 To 1: How Wealth Inequality is Wrecking the World and What We Can Do About It.পৃ. ৩, ১৯-৩১, ৪১-৪৭.

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা নিম্নরূপ (ছক ৩ দেখুন) : মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪৪ লক্ষ) মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ হবে, যাকে বলে সুপার-ডুপার ধনী, ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত (মোট ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ), আর ৬৫.৯ শতাংশ বহুমুখী দরিদ্র (multiple poor, যাদের সংখ্যা ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। আর আর্থসামাজিক শ্রেণি মই-এর অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয় তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলেছে। এরা মোট জাতীয় পারিবারিক সম্পদ ও আয়ের (কালো টাকাসহ) ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। আর তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য (যা বহুমুখী) বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণি-সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বৃত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী-আত্মসাৎকারী, ফাওখাওয়া এই rent-seekers গোষ্ঠী সমগ্র আর্থসামজিক ব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ করার ফলে বাস্তব উন্নয়ন নীতি-দর্শনটাই এমন যে ধনী আরও ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে, এবং দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়ে নিঃস্ব হবেন আর তার পরে হবেন ভিক্ষুক (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে)। এসবই 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন" কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো—এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেমনটি দাঁড়াত, তা নিম্নরূপ (দেখুন ছক ৪, আর তুলনামূলক অবস্থার জন্য লেখচিত্র ১ দেখুন): আজকের বাংলাদেশে মোট ১৬ কোটি জনসংখ্যার যেখানে ২.৭ শতাংশ ধনী সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কমে দাঁড়াত ০.০৭ শতাংশ (অর্থাৎ আজকের ৪৪ লক্ষের বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ মানুষ); শ্রেণিকাঠামোর একদম নিচ তলার বহুমুখী দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আজকে যেখানে মোট জনসংখ্যার ৬৫.৯ শতাংশ (মোট ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষ) সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে (আজকের দৃষ্টিতে—এ সময়ে বসে) কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াতো (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হতো মাত্র ১১ লক্ষ); সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন ঘটত, সেটা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিবর্তন রূপান্তর—আজকে মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশ (মোট ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ) যা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রায় তিনগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩ শতাংশে উন্নীত হতো (অর্থাৎ মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হতো ১৫ কোটি ৮৮ লক্ষ মানুষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আজকের বাংলাদেশের তুলনায় একদিকে ধনী মানুষের মোট সংখ্যা ৪৪ গুণ কমে যেতো, অন্যদিকে বহুমুখী দরিদ্র মানুষের মোটসংখ্যা প্রায় ৯৯ গুণ কমে যেতো, আর মধ্যবিত্ত মানুষের মোটসংখ্যা ৩.২ গুণ বেড়ে যেতো।

'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। কিন্তু মধ্যবিত্তে ঘটত বড় ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর। মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এখানেই ঘটত আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ১০.৭ গুণ (আজকের বাংলাদেশের ৭৪ লক্ষ থেকে বেড়ে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ৭ কোটি ৯৪ লক্ষ মানুষে উন্নীত হতো), মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ৩.৬ গুণ (মোট ১ কোটি ৫৫

লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ মানুষ), আর সঙ্গত কারণেই মধ্যবিত্তের উপর তলায় এত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ হ্রাস পেত (মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ মানুষে দাঁড়াতো)। অর্থাৎ এক কথায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিবাদী আমূল রূপান্তর ঘটত—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিপরীতে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিকভাবে অনেক গুণ বেশি উন্নতি করেছে একথা সত্য; তবে আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে তেমন কোনো রূপান্তর ঘটেনি, যা বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঘটত। আর তা ঘটত "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়নের কারণেই অন্য কোনো অলৌকিক কারণে নয়।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে যে আমূল প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটত সে বিষয়ে নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হবার আগে আরও কিছু বিশ্লেষণাত্মক বিষয়াদি উল্লেখ জরুরি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী আরও কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

১. জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা কাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে 'রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হবে'—প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়।[২২] তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার (individual-household-family) পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোনো বৈষম্য থাকত না।

লেখচিত্র ১: 'বঙ্গবন্ধুহীন' ও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক অবস্থা: দু'অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত মোট ১৬ কোটি মানুষের শতকরা হার, ২০১৮

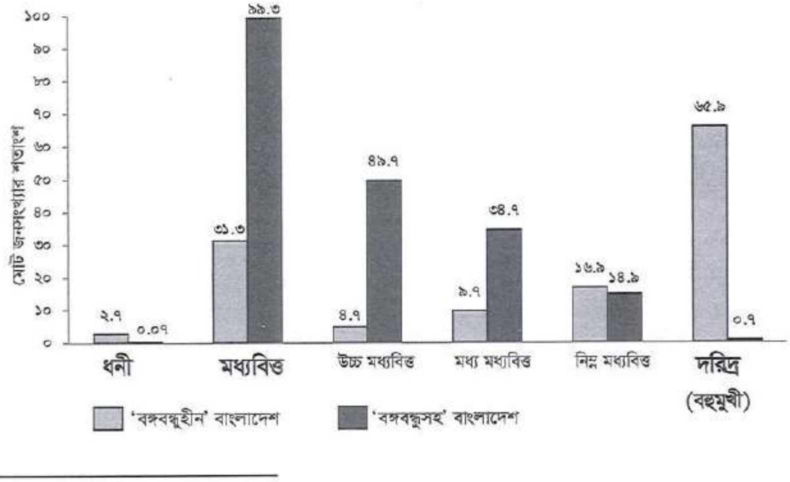

২২. আমার কাছে সংবিধানে বিধৃত এই সমবায়ের অর্থ অধুনা তথাকথিত 'অংশগ্রহণমূলক' (partnership) উন্নয়ন বলতে যা বোঝানো হয় তা নয়। তথাকথিত "অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন" আসলে নয়া-উদারবাদীদের প্রেসক্রিপশন। এক্ষেত্রে যা বোঝানো হয়, তাতে আমি বুঝি সম্পদ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়তেই থাকবে আর তারই মধ্যে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মেহনতি মানুষ অধিক হারে সম্পৃক্ত হবেন বা অংশগ্রহণ করবেন। আমার কাছে এই 'অংশগ্রহণের'

২. ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকতো তা বন্টন বৈষম্য হ্রাস নীতি অথবা বন্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে শ্রেণি-কাঠামো মই-এর উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোনো সুযোগই থাকত না। যেমন ঐ শ্রেণি মই-এর (class ladder)উপরের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবার-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের বড়জোর ১৫ শতাংশ (যা এখন ৭০-৮০ শতাংশ) আর শ্রেণি মই-এর সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের ৭-৮ শতাংশ। একই সাথে উল্লিখিত মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকতো ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। জাতীয় খানা ভিত্তিক আয়ের চেহারাটাও আমূল পাল্টে অনুরূপ হতো। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোনো বৈষম্য থাকতো না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩. জন্মসূত্রে মানুষের দরিদ্র হবার কোনো সুযোগ থাকতো না। বংশ পরম্পরা দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকতো না। দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন (মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ) তার কারণ হতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদীভাঙন, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপৎকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণভিত্তিক বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন" আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা (strong and efficient social protection system)নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারও দরিদ্র থাকার কোনো সুযোগই থাকতো না। এবং এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশানির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো। এসবই "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর মর্মবস্তু।

৫. উপসংহার

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন বোধ, রাষ্ট্র চিন্তা, সমাজ ভাবনা, রাজনীতি চিন্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভাবনার পরস্পরসম্পর্কিত এক সমগ্রক রূপ। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—এর মৌল ভিত্তি চেতনা হলো জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। এ দর্শন বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ সমাজ ও

অর্থ "শ্রমিক-কৃষক আরও বেশি কাজ করো, আরও বেশি উৎপাদন করো। আর আমরা মালিকেরা যত বেশি পাব, তার অংশ তো চুইয়ে তোমাদের কাছেই যাবে—trickle down হবে। তোমরা আগের চেয়ে ভালো থাকবে। মজুরির আন্দোলন করে অযথা ঝামেলা বাড়িও না। কারখানা বন্ধ হলে তোমাদের কাজ থাকবে না। আর তাতে দেশের মহা ক্ষতি হয়ে যাবে"। এই সম্পৃক্ততার বা অংশগ্রহণের মানে দাঁড়ায় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের যন্ত্র-হাতিয়ারের ওপর যেমন চাষের জমির ওপর প্রকৃত কৃষকের থাকবে বড়জোর অভিগম্যতা (access) মালিকানা (ownership) নয়। এসবই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখার জন্য নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud), যার পেছনে আছে সমাজতন্ত্রসহ অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ঠেকানোর প্রচেষ্টা আর অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দর্শন এবং যার বাস্তবায়ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক ও নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও), আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, এবং ইদানীংকালের বহু ধরনের 'থিংক ট্যাংক' (Think Tank, মহাচিন্তা-মহাদুশ্চিন্তার ল্যাবরেটরি)-কে।

রাষ্ট্র বিনির্মাণে সহায়ক। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—এর প্রারম্ভিক বাস্তব প্রয়োগ হয় ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে, যার অভিঘাত ছিল ধনাত্মক। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ হয়নি; বাধাগ্রস্থ হয় ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে। তবে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ-বাস্তবায়ন হলে ২০০০ সাল নাগাদ স্বাধীন বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত শ্রেণি বৈষম্যহীন শক্তিশালী অর্থনীতিসমৃদ্ধ ও আলোকিত মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতো। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বাস্তবায়নের অনুকূল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোকেই হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সমগ্র কাঠামোটিই ছিল প্রতিকূল। বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালের কাঠামো নিও-লিবারেল মুক্তবাজার দর্শন ভিত্তিক স্বজনতুষ্টিবাদী পুঁজিবাদ (crony capitalism) বিকশিত হবার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যও ছিল তাইই—শোষিতের গণতন্ত্র ভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের কাঠামো ভেঙেচুরে শোষণভিত্তিক স্বজনতুষ্টিবাদী ধনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা, যে কাঠামোতে দেশের মোট উৎপাদন বাড়তে পারে কিন্তু আয়বৈষম্য, ধন বৈষম্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য বাড়বেই। এখন প্রশ্ন এহেন ঐতিহাসিক পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—এর অনুষঙ্গ "বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়ন সম্ভব কি? আমার মতে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে চলমান কাঠামোতেই কয়েকটি সম্ভাবনা পরীক্ষা-নীরিক্ষা-প্রয়োগ করে ধনাত্মক ফল পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে আমি অন্তত তিনটি বড় মাপের ক্ষেত্র দেখি যেখানে ঐ সম্ভাবনা প্রয়োগ করে দেখা সমীচীন: (১) রাষ্ট্রীয় আয়োজনে সারা দেশে উচ্চতর গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার। যেখানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনভাতাসহ সামাজিক মর্যাদা হতে হবে সর্বোচ্চ যাতে মেধাবিরা প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট হন। (২) রাষ্ট্রীয় আয়োজনে দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। অসংক্রামক ব্যাধি যেমন ক্যান্সার, হার্টের অসুখ, কিডনির অসুখ, ডায়াবেটিস—এসব রোগে প্রতিবছর আমাদের দেশে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ অদরিদ্র মানুষ দরিদ্র হন। অসংক্রামক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা হতে হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে—রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে (অন্তত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য)। (৩) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বহুমুখী-গণমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা (এক্ষেত্রে খাস জমি-জলা সমবায়ী মালিকানায় দেওয়া যেতে পারে)। আমার ধারণা বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোতে অন্তত উল্লেখিত তিনটি পদক্ষেপ-কর্মকাণ্ড গ্রহণ সম্ভব যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য কমবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটাও হতে পারে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর আংশিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশে মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ফলপ্রদ পথ-পদ্ধতি।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ৫৫-৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য: সমাধান কোন্ পথে?

মইনুল ইসলাম*

মূল শব্দ: *বঙ্গবন্ধু, বিপ্লবাত্মক প্রয়াস, নরঘাতক, ক্রোনি ক্যাপিটালিজম, পুঁজি লুণ্ঠনমূলক রাষ্ট্র, ব্রিকস, ১১ উত্থানশীল অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, ধনকুবের প্রবৃদ্ধির শীর্ষে বাংলাদেশ, ঠুঁটো জগন্নাথ, 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব'*

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সমস্যার স্বরূপ

২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল নির্ধারিত 'স্বল্পোন্নত দেশের' ক্যাটেগরি থেকে 'উন্নয়নশীল দেশের' ক্যাটেগরিতে উত্তরণের ছয় বছরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এবং ঐ প্রক্রিয়ার সফল পরিসমাপ্তির পর ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের 'নিম্ন আয়ের দেশ' ক্যাটেগরি থেকে বাংলাদেশ 'নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ' ক্যাটেগরিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৩ শতাংশে পৌঁছে গেছে বলে সরকারি প্রাক্কলন ঘোষিত হয়েছে, যার ফলে জাতিসংঘের এবং বিশ্ব ব্যাংকের উল্লিখিত দুটো বিন্যাস পদ্ধতিতে উচ্চতর পর্যায়ে বাংলাদেশের উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। এই উত্তরণ সারা বিশ্বের উন্নয়ন চিন্তকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লগ্নে এই নব্য-স্বাধীন দেশটি অর্থনৈতিকভাবে আদৌ টিকে থাকতে পারবে কি না তা নিয়ে বিশ্বের অনেক উন্নয়ন-অর্থনীতিবিদ ও ওয়াকিবহাল মহলের গভীর হতাশা ছিল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে জনসন নামের যুক্তরাষ্ট্রের একজন কূটনীতিক যখন স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ 'ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট কেস' হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের তদানীন্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পরে (১৯৭৩ সাল থেকে) যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত সেক্রেটারি অব স্টেট ড. হেনরি কিসিঞ্জার তাতে সায় দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকা 'ইন্টারন্যাশনাল বটমলেস বাস্কেট' নাম দিয়ে বাংলাদেশের এই অপমানজনক অভিধাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে

---

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোন: ০১৭১১১৬৫৬১২, ই-মেইল০: dr.muinul@yahoo.com
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বাংলাদেশে আয় ও ধন বৈষম্য" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

বারবার ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের ওপর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ইউস্ট ফালান্ড ও জন পারকিনসনের বিশ্বখ্যাত গবেষণাগ্রন্থটির নামই ছিল ***বাংলাদেশ—এ টেস্ট কেস অব ডেভেলপমেন্ট***। ঐ বইয়ের পঞ্চম পৃষ্ঠায় রচয়িতাগণ দাবি করছেন,

If the problem of Bangladesh can be solved, there can be reasonable confidence that the less difficult problems of development can also be solved. It is in this sense that Bangladesh is to be regarded as the test case (Faaland & Parkinson, 1975, P. 5).

পরিষ্কারভাবে এই দুজন উন্নয়ন-গবেষক বলছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন ঐ পর্যায়ে তাঁদের বিবেচনায় খুবই কঠিন মনে হয়েছে। হয়তো খোদ বঙ্গবন্ধুর মনোজগৎ এবং চিন্তা-চেতনায়ও অর্থনীতির হতাশাজনক অবস্থার ছাপ পড়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারি ও ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার বিবেচনায় স্বাধীন বাংলাদেশে মার্কিন ঋণ-অনুদান গ্রহণ না করার পক্ষে অবস্থান নিলে বঙ্গবন্ধু ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবি থেকে বৈদেশিক ঋণ/অনুদান গ্রহণে তাঁর সরকারের বাছবিচার করার প্রাথমিক দৃঢ় অবস্থানকে পরিবর্তনের মধ্যেও হয়তো এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল অনেকটাই। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার অনেক সাধ্য-সাধনা করে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের 'স্বল্পোন্নত দেশের' ক্যাটেগরিতে অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্ষম হয়েছিল, যাতে বাংলাদেশ এর ফলে বৈদেশিক অনুদান, খাদ্য সহায়তা এবং 'সফট লোন' পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা পায়। স্বীকার করতেই হবে যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে চরম খাদ্যশস্য ঘাটতি এবং বিশেষ করে ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের কারণে বঙ্গবন্ধু ঐ পর্যায়ে বৈদেশিক অনুদান ও ঋণকে অপরিহার্য বিবেচনা করেছিলেন। একইসাথে এটাও বলতে হবে, বঙ্গবন্ধু স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদাহীন ইমেজের ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন। তাই, তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এক দশকের মধ্যেই বাংলাদেশকে ঐ অপমানজনক অবস্থান থেকে বের করে আনবেন। খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিপ্লবাত্মক প্রয়াসও শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নরঘাতকেরা সপরিবার তাঁকে হত্যা করে ঐ প্রয়াসকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। (১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে আমন ধান কাটার পর বাম্পার ফসলের প্রভাবে সাময়িকভাবে চালের দাম অনেক কমে গিয়েছিল।) এরপর বাংলাদেশের সমরপ্রভুদের অবৈধ সরকার বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বর্ধিত বৈদেশিক সহায়তার লোভে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণকে সযতনে এড়িয়ে চলেছে। পরবর্তী ৪৩ বছর বাংলাদেশ 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের' লুটেরা শাসনব্যবস্থার জালে বন্দী থাকার কারণে এক দশকের স্থলে বাংলাদেশের ৪৩ বছর লেগে গেছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সোপানে পৌঁছানোর জন্যে। বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান সংগ্রহের বিশেষ পারঙ্গমতা ও দক্ষতাকেই জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ অর্থমন্ত্রী ও অর্থনীতিসংক্রান্ত উচ্চতম পদমর্যাদার আমলাদের মেধার পরিচায়ক মনে করতেন। দুর্ভাগ্য, গত ২৮ বছরের ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোও এই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। বিএনপি সরকারগুলোর সময় দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী প্রয়াত সাইফুর রহমান এ বিষয়ে প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, 'যদ্দিন সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী থাকব, তদ্দিন এ দেশের টাকার অভাব হবে না।'

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের অভিমত দ্রুত বদলাতে শুরু করেছিল। ২০১১ সালে বিশ্বখ্যাত মার্কিন দৈনিক পত্রিকা 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অগ্রযাত্রার বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এ-বিষয়ে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ২০১২ সালে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্থানে অবস্থানকারী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দ্য ইকোনমিস্ট' নিশ্চিত করল যে সত্যি সত্যিই বাংলাদেশের অর্থনীতি

উন্নয়নের এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে যেখান থেকে অর্থনীতিবিদেরা প্রকৃতপক্ষেই আশাবাদী হয়ে উঠছেন যে বাংলাদেশ ক্রমেই অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠছে। ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর ব্রিটেনের আরেকটি খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকা 'দ্য গার্ডিয়ান' ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি ইউরোপের প্রধান প্রধান কয়েকটি অর্থনীতিকেও ছাড়িয়ে যাবে। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা দিলেন, ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও মানব উন্নয়নের অনেকগুলো ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অর্জন ভারতের চেয়ে ভালো। এর কিছুদিন পর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষক সংস্থাগুলোর অন্যতম গোল্ডম্যান স্যাক্স 'ব্রিকস' (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) নামে অভিহিত বিশ্বের দ্রুত উত্থানশীল অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ঠিক পেছনে অবস্থানকারী 'পরবর্তী ১১ উত্থানশীল অর্থনীতির' তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ডাইমেনশন বাংলাদেশের অর্থনীতির এই ইতিবাচক পরিবর্তনকে ধারণ করছে সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬' মোতাবেক ২০১৬ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার (মৌল প্রয়োজনসমূহের খরচ পদ্ধতি [কস্ট অব বেসিক নিডস বা সিবিএন] অনুসরণে পরিমাপকৃত) নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত মাত্র ২৪.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১০ সালে 'খানা আয়-ব্যয় জরিপে' দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৩১.৫ শতাংশ, ২০০৫ সালের জরিপে ঐ অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশ, আর ২০০০ সালে ছিল ৪৪ শতাংশ। ১৯৯০ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫৮ শতাংশ, এক নম্বর 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' অনুযায়ী ওখান থেকে ২০১৫ সালে তা অর্ধেকে নামানোর লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ দু বছর আগে ২০১৩ সালেই অর্জন করে ফেলেছে।

২। ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছর থেকে ১৯৮১-৮২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপির অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য ১০ শতাংশের বেশি ছিল এবং ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে ঐ অনুপাত ১৩.৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল বলে প্রফেসর রেহমান সোবহান প্রণীত ১৯৮২ সালে প্রকাশিত বই *দ্য ক্রাইসিস অব এক্সটারনাল ডিপেন্ডেন্স*-এর নবম পৃষ্ঠায় দাবি করা হয়েছে। নিচে উপস্থাপিত সারণি-১ এর তথ্য-উপাত্তে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রধানত জিয়া আমলের অর্থনীতির বৈদেশিক সহায়তা-নির্ভরতার করুণ চালচিত্রটি ফুটে উঠেছে। জিয়া সরকার ১৯৭২-৭৫ পর্বের বঙ্গবন্ধু সরকারের চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক সহায়তা আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণে। ফলে, ঐ সময়েই বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক অনুদান ও ঋণনির্ভরতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। গত ৩৭ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর এ দেশের অর্থনীতির নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির ১ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। (অবশ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কারণে বৈদেশিক ঋণপ্রবাহ খানিকটা বেড়েছে)। আরও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলো, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ঐ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের মাত্র ২ শতাংশের মতো ছিল খাদ্যসাহায্য, আর বাকি ৯৮ শতাংশই ছিল প্রকল্প ঋণ। এখন বাংলাদেশ আর পণ্য সাহায্য নেয় না। এর তাৎপর্য হলো, বৈদেশিক ঋণ-অনুদানের ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতির টিকে থাকা না থাকা এখন আর কোনোভাবেই নির্ভর করে না। বিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশ যে বৈদেশিক সাহায্য পেত, গড়ে তার ২৯.৪ শতাংশ ছিল খাদ্যসাহায্য, ৪০.৮ শতাংশ ছিল পণ্যসাহায্য, আর ২৯.৮ শতাংশ থাকত প্রকল্প সাহায্য (রেহমান সোবহান,

প্রাগুক্ত, [১৯৮২] পৃ. ৬২ দ্রষ্টব্য)। সারণি-১ দেখাচ্ছে, ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর বাংলাদেশের আমদানি বিলের ৭১.১৭ শতাংশই পরিশোধ করতে হয়েছিল বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ দিয়ে। ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ১০৪.৮ শতাংশ এবং ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর উন্নয়ন বাজেটের ৯৭.৮৩ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল (তার মানে, ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর সরকারের পৌনঃপুনিক ব্যয়ের অংশবিশেষও বৈদেশিক সহায়তার অর্থে মেটাতে হয়েছিল!)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়ন বাজেটের বৈদেশিক ঋণ/অনুদাননির্ভরতা এক-তৃতীয়াংশেরও নিচে নেমে গেছে। বৈদেশিক সাহায্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে একটা জুজুর ভয় দেখানো হতো, কারণ বৈদেশিক সাহায্য দুর্নীতির একটি সিস্টেম বা জালকে লালন করে থাকে। উপরন্তু, গত চার দশকে বাংলাদেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করা এনজিওগুলো বৈদেশিক সাহায্যের জন্যে লালায়িত। এখন যখন খাদ্যসাহায্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং পণ্যসাহায্য আর নিতে হচ্ছে না তাহলে বৈদেশিক সাহায্যকে বাংলাদেশের জনগণের জীবন-মরণের সমস্যা হিসেবে দেখানোর কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশ এখন আর খয়রাতনির্ভর দেশ নয়; এটা এখন একটি বাণিজ্যনির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে।

সারণি-১: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক সহায়তার করুণ চালচিত্র: ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮১-৮২ অর্থবছর

বৈদেশিক সহায়তার অনুপাতসমূহ	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২
১। জিডিপির শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৮.৩	১১.৮	১১.৬	১২.২	১০.৫	১৩.৭
২। আমদানি বিলের শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৬৭.৯০	৬৬.৩৮	৭১.১৭	৫৭.৬১	৫৩.৮৯	৬১.০৬
৩। মোট বিনিয়োগের শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৭৭.৬৭	৭৫.৮৩	৮৩.৩৫	৬৪.৮৭	৫৫.৫৬	৬৪.৯২
৪। উন্নয়ন বাজেটের শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৮১.৯৭	১০৪.৮	৯৭.৮৩	৮১.১৭	৭৯.১৩	৭৮.২৬

সূত্র: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিতব্য লেখকের গ্রন্থ *Role of the State in Bangladesh's Underdevelopment* এর সারণি-৬.২। ঐ সারণিটি (রেহমান সোবহান, ১৯৮২)-এর নবম পৃষ্ঠার সারণি ১.২ থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত।

৩। গত দু বছর বাদে এক দশক ধরে প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশ তার লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্জন করে চলেছে। এর মানে, বাংলাদেশ এখন তার আমদানি ব্যয় আর রপ্তানি আয়ের ব্যবধানটা প্রায় বছর মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। নিদেনপক্ষে, বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি এখন আর সংকটজনক নয়। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ পথে প্রেরিত রেমিট্যান্সের চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধির হার এবং বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বছরের পর বছর অব্যাহত চলমান প্রবৃদ্ধি দেশের লেনদেন ভারসাম্যের এই স্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে। গত ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় প্রতিবছর বেড়েই চলেছে, এবং ২০১৯ সালের মার্চের শেষ নাগাদ এই রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ছিল যা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

৪। জনসংখ্যার অত্যন্ত অধিক ঘনত্ব, জমি-জন অনুপাতের অত্যল্পতা এবং চাষযোগ্য জমির ক্রম-সংকোচন সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করে এখন ধান-উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ধান উৎপাদন ছিল মাত্র ১ কোটি ১০ লাখ টন, ২০১৮ সালে

তা সোয়া তিন গুণেরও বেশি বেড়ে ৩ কোটি ৬২ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। ধান, গম ও ভুট্টা মিলে ২০১৮ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ৪ কোটি ১৩ লাখ টন। ৭০ লাখ টন আলুর অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিপরীতে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ১ কোটি ৫ লাখ টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। (এখনো আমরা অবশ্য প্রায় ৫০/৫৫ লাখ টন গম আমদানি করি।) মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। তরিতরকারি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ। সারা বিশ্বের দৃষ্টিতেই কৃষি উৎপাদনের এই সাফল্য চমকপ্রদ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। খাদ্যশস্য, মাছ, তরিতরকারি উৎপাদনের এই সাফল্য বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সার্বিক খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়নে সহায়তা করেছে। এটাও খুবই গুরুত্ববহ যে, আকস্মিক খাদ্যসংকট মোকাবিলার জন্যে ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্যের বিশাল মজুদও গড়ে তোলা হয়েছে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই।

৫। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় প্রতিবছর বেড়েই চলেছে, এবং গত এক দশক গড়ে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশের মতো। নিচে উপস্থাপিত সারণি-২ এর তথ্য-উপাত্তে অর্থনীতির এই ক্রমবর্ধমান গতিশীলতা ও রূপান্তরের চিত্রটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক ও সূচকের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। (অবশ্য, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশনার কারণে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরগুলোর তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি।) সাম্প্রতিক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ, এবং ২০১৮-১৯ অর্থছরে তা ৮.১৩ শতাংশ হয়েছে বলে সরকারিভাবে প্রাক্কলিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিএনআই প্রাক্কলিত হয়েছে ১৯০৯ ডলার। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম গতিশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষত লক্ষণীয়, সারণির ৪ নম্বর আইটেমে জিডিপির খাতওয়ারি হিস্যার পরিবর্তন অর্থনীতির রূপান্তরের সাক্ষ্য বহন করছে, যেখানে শিল্পখাতের অবদান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপির ৩২.৪২ শতাংশে পৌঁছে গেছে। সারণির ৫ নম্বর আইটেমে বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ৩০.৫১ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারটিও খুবই আশাপ্রদ। বিশেষত, এই এক দশকে সরকারি বিনিয়োগ ২০০৭-৮ অর্থবছরের জিডিপির মাত্র ৪.৫০ শতাংশের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.৪১ শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি প্রশংসার্হ। এটাও আন্দাজ করা যায় যে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ৭.৮৬ শতাংশ এবং ৮.১৩ শতাংশে পৌঁছানোয় জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ আরও বেড়েছে, বিশেষত সরকারি বিনিয়োগ।

৬। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৪২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, অথচ ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৭৫২ মিলিয়ন ডলার। শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়ে থাকে। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশই আসছে বুনন ও বয়নকৃত তৈরি পোশাক খাত থেকে। চীনের পর বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। (মাঝে মাঝে ভিয়েতনামও দ্বিতীয় অবস্থানে চলে যায়।) সস্তা শ্রমশক্তির কারণে তৈরি পোষাকের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশের সুবিধেজনক অবস্থান অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে আবারো সঞ্জীবিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ, সিরামিক পণ্য, জাহাজ নির্মাণ ও কৃষিভিত্তিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি বাজারে ভালোই সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

সারণি-২: বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক রূপান্তরের কয়েকটি নির্দেশক: ২০০৭-৮ অর্থবছর থেকে এক দশক

	কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক	কয়েকটি নির্বাচিত অর্থবছর			
		২০০৭-৮	২০০৯-১০	২০১৩-১৪	২০১৬-১৭
১।	মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	৬৩৭	৭৮০	১১১০	১৫৪৪
২।	মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলার)	৬৮৬	৮৪৩	১১৮৪	১৬১০
৩।	স্থির দামে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)	৬.০১	৫.৫৭	৬.০৬	৭.২৮
৪।	স্থির দামে জিডিপির খাতওয়ারি শেয়ার (%)				
	কৃষিখাত	১৮.৬৮	১৮.৩৮	১৬.৫০	১৪.৭০
	শিল্পখাত	২৬.১৩	২৬.৭৮	২৯.৫৫	৩২.৪২
	সেবাখাত	৫৫.১৯	৫৪.৮৩	৫৩.৯৫	৫২.৮৫
৫।	জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ	২৬.২০	২৬.২৫	২৮.৫৮	৩০.৫১
	প্রাইভেট খাতের বিনিয়োগ	২১.৭০	২১.৫৭	২২.০৩	২৩.১০
	সরকারি বিনিয়োগ	৪.৫০	৪.৬৭	৬.৫৫	৭.৪১
৬।	জিডিপির শতাংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৯.১৯	২০.৮১	২২.০৯	২৫.৩৩
৭।	জিডিপির শতাংশ হিসেবে জাতীয় সঞ্চয়	২৭.৭৯	২৯.৪৪	২৯.২৩	২৯.৬৪

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018*, ঢাকা, বাংলাদেশ, সারণি ১১.০১, পৃ.৪০৯।

৭। বাংলাদেশের ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বিদেশে কাজ করছেন ও বসবাস করছেন। (গণনাবহির্ভূত আরও অনেক অভিবাসী বিদেশে কাজ করছেন বলে ধারণা করা হয়)। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের অভিবাসীদের সিংহভাগ অবস্থান করছেন। কিন্তু যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরও বাংলাদেশি অভিবাসীদের বড় গন্তব্যস্থল। বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বসতি ক্রমশ বড় হয়েই চলেছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদিও কম দক্ষ শ্রমজীবী; তবু গত তিন দশক ধরে প্রতিবছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েই চলেছে, এবং ২০১৮ সালে নিয়মানুগ মাধ্যমে বা প্রাতিষ্ঠানিক পথে (formal channels) রেমিটেন্স প্রবাহ ১৫৪২ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, হুন্ডির মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণও বেশ বড়। হয়তো এর পরিমাণ ৮-১০ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ। (এ ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক পথে সমান্তরাল অর্থনীতিতে ঠেলে দেওয়া বৈদেশিক আয় প্রধানত চোরাচালান অর্থায়ন, পুঁজি পাচার, কালোটাকা ধোলাই, ধনাঢ্য বাংলাদেশিদের পুত্র-কন্যাদের বিদেশে পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ, বিদেশে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ ও দ্রুত বেড়ে ওঠা ধনাঢ্য পরিবার গুলোর ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহে অপব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এ-অর্থের একাংশ বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের অবৈধ রেমিটেন্স এবং এ দেশে ব্যবসায়ে নিয়োজিত বিদেশি কোম্পানিগুলোর মুনাফা পাচারেও ব্যবহৃত হচ্ছে।)

৮। ক্ষুদ্র ঋণ আন্দোলনের সাফল্য গ্রামের ভূমিহীন নারীদের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছে দেওয়ার একটা অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের জীবন ও জীবিকাকে এই ক্ষুদ্র ঋণ বেশ খানিকটা সহজ করে দিয়েছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর এক-চতুর্থাংশের বেশি ঋণগ্রহীতা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে

সাফল্য অর্জন করেছেন। অবশ্য, ক্ষুদ্রতরসংখ্যক ঋণগ্রহীতা সাফল্যের সাথে দারিদ্র্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শুধু ক্ষুদ্র ঋণকে এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিস্টেম কর্তৃক লালিত দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবিলার যথার্থ প্রতিষেধক বিবেচনা করা সমীচীন নয়। কিন্তু, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছে দেওয়ার এই সফল উদ্ভাবনটিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক দিক উন্মোচনের কৃতিত্ব দিতেই হবে।

৯। দেশের দ্রুত বিকাশমান পোশাক শিল্পে ৪০ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, আর এই শ্রমিকদের ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী। সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক অবস্থানের এসব নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতে কাজের ব্যবস্থা করাটা তাঁদের বঞ্চনা ও চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিরোধক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতেই হবে, তৈরি পোশাক শিল্পখাত বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে।

১০। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) ও টার্গেট অর্জনে ২০১৫ সালের বহু আগেই বাংলাদেশ নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেছে। এগুলো হলো দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য অর্জন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের লিঙ্গ-সমতা অর্জন, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যকর সেনিটেশন ব্যবস্থায় ব্যাপক অভিগম্যতা, শিশুমৃত্যু ও ছোট বালক-বালিকাদের মৃত্যুহার হ্রাস সম্পর্কিত লক্ষ্য ও টার্গেটসমূহ।

অতএব, স্বীকার করতেই হবে যে জিডিপি ও জিএনআই প্রবৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচক গত দুই দশক ধরে সন্দেহাতীতভাবে জানান দিয়ে চলেছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনুন্নয়ন ও পরনির্ভরতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা করেছে, যেটাকে ১৯৬০ সালে ওয়াল্ট রস্টো একটি দেশের অর্থনীতির 'টেকসই প্রবৃদ্ধির পানে উড়াল (take-off into sustained growth)' স্তর নামে অভিহিত করেছিলেন। (আমি অবশ্য রস্টোর তত্ত্বকে খুব গ্রহণযোগ্য মনে করি না। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, টেইক-অফের ধারণাটি এখনো উন্নয়ন ডিসকোর্সে প্রভাবশালী রয়ে গেছে।) কিন্তু, মাথাপিছু জিডিপি যেহেতু একটি গড় সূচক তাই মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে যদি দেশে আয়বণ্টনে বৈষম্যও বাড়তে থাকে তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠির কাছে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে, যার ফলে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রবৃদ্ধির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। অতএব, আয়বৈষম্য ক্রমে বাড়তে থাকার প্রবণতাকে দেশের আসন্ন মহাবিপৎসংকেত বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রবৃদ্ধির সুখবরের পাশাপাশি এই একটি মহাবিপদ যে এ দেশের ১৯৭৫-পরবর্তী শাসকমহল তাদের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক দর্শন ও উন্নয়নকৌশলের মাধ্যমে ডেকে আনছে তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের জন্যে আমি গত সাড়ে তিন দশক ধরে সর্বশক্তি দিয়ে জাতির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আশির দশক থেকেই এ দেশে আয় ও সম্পদবৈষম্য ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এখন বাংলাদেশ একটি 'উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে' পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ দেশের শাসকমহল কিন্তু খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০০ (HIES 2000) এর মাধ্যমে ২০০০ সালেই বিপৎসংকেত পাওয়ার কথা, যে জরিপে প্রথম সরকারিভাবে জিনি (বা গিনি) সহগ হিসাব করা শুরু হয়েছিল! অর্থনীতিতে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পরিমাপ করার জন্য নানা পরিমাপক

ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে লরেঞ্জ কার্ভ এবং গিনি সহগ অন্যতম। কোনো অর্থনীতির গিনি সহগ যখন দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ০.৫ এর কাছাকাছি পৌঁছে যায় বা ০.৫ অতিক্রম করে তখন নীতি-নির্ধারকদের বোঝার কথা যে আয়বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিচে উপস্থাপিত সারণি-৩ মোতাবেক ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের গিনি সহগ ছিল মাত্র ০.৩৬, মানে প্রচণ্ড দারিদ্র্যকবলিত দেশ হলেও ঐ পর্যায়ে এ দেশে আয়বৈষম্য তুলনামূলকভাবে সহনীয় ছিল। ১৯৮৩-৪ অর্থ-বছর পর্যন্ত জিনি সহগ ০.৩৬ ছিল। এরপর আশির দশক ও নব্বই দশকে জিনি সহগ বেড়ে ২০০০ সালে তা ০.৪৫ এ পৌঁছে যায়। ২০০৫ সালে জিনি সহগ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ০.৪৬৭। ২০১০ সালেও জিনি সহগ ০.৪৬৫ এ রয়ে গেছে, তেমন কমানো যায়নি। ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ মোতাবেক জিনি সহগ আবার বেড়ে ০.৪৮৩ এ পৌঁছে গেছে। সারণি-৪ এ আরেকটি পরিমাপকের গতি-প্রকৃতির মাধ্যমে ২০১০ ও ২০১৬ সালের মধ্যে আয়বৈষম্য বিপজ্জনকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিপক্ষে এবং ৫-১০ শতাংশ ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি ফুটে উঠেছে: ২০১০ সালে দরিদ্রতম ৫ শতাংশ জনসংখ্যার মোট আয় ছিল মোট জিডিপির ০.৭৮ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে মাত্র ০.২৩ শতাংশে নেমে গেছে। ২০১০ সালে দরিদ্রতম ১০ শতাংশ জনসংখ্যার মোট আয় ছিল মোট জিডিপির ২ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা মাত্র ১.০১ শতাংশে নেমে গেছে। সমস্যার আরেক পিঠে দেখা যাচ্ছে, দেশের ধনাঢ্য ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠির দখলে ২০১০ সালে ছিল মোট জিডিপির ৩৫.৮৫ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বেড়ে ৩৮.১৬ শতাংশে পৌঁছে গেছে। আরও দুঃখজনক হলো, জনগণের সবচেয়ে ধনাঢ্য ৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দখলে ২০১৬ সালে চলে গেছে মোট জিডিপির ২৭.৮৯ শতাংশ, যা ২০১০ সালে ছিল ২৪.৬১ শতাংশ।

এই ধনাঢ্য সৃষ্টিকারী ও ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর দখলে জিডিপির ক্রমবর্ধমান অংশ পুঞ্জীভূত হতে দেওয়ার বিপদ সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর কৌশল কী ফল প্রসব করতে পারে, তা আরও নাটকীয়ভাবে ধরা পড়েছে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হেডলাইন সংবাদ 'বিশ্বে ধনকুবেরের সংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের শীর্ষে বাংলাদেশ' এর মাধ্যমে। ঐ খবরে জানানো হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'ওয়েলথ এক্স'-এর প্রতিবেদন *ওয়ার্ল্ড আল্ট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট*-২০১৮ মোতাবেক ২০১২ সাল থেকে ২০১৭ এই পাঁচ বছরে অতি ধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সারা বিশ্বে এক নম্বর স্থানটি দখল করেছে বাংলাদেশ। ঐ পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে বার্ষিক ১৭.৩ শতাংশ হারে। ঐ গবেষণা প্রতিবেদনে ৩০ মিলিয়ন বা ৩ কোটি ডলারের (প্রায় ২৫২ কোটি টাকা) বেশি নিট-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের 'আলট্রা-হাই নেটওয়ার্থ' (ইউএইচএনডাব্লিউ) ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে, বিশ্বে মোট ২৫৫,৮৫৫ জন ইউএইচএনডব্লিউ ইন্ডিভিজুয়ালের সবচেয়ে বেশি ৭৯,৫৯৫ জন রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জাপান, তাদের ধনকুবেরের সংখ্যা ১৭,৯১৫ জন। তৃতীয় থেকে দশম স্থানগুলোয় রয়েছে গণচীন (১৬,৮৭৫ জন), জার্মানী (১৫,০৮০ জন), কানাডা (১০,৮৪০ জন), ফ্রান্স (১০,১২০ জন), হংকং (১০,০১০ জন), যুক্তরাজ্য (৯,৩৭০ জন), সুইজারল্যান্ড (৬,৪০০ জন) ও ইতালি (৫,৯৬০ জন)। এই ২৫৫,৮৫৫ জন ধনকুবেরের সংখ্যাবৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ১২.৯ শতাংশ, কিন্তু তাদের সম্পদবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৩ শতাংশ। তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ ট্রিলিয়ন (মানে সাড়ে ৩১ লক্ষ কোটি) ডলারে। গত পাঁচ বছরে ধনকুবেরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গণচীনে ও হংকং-এ, কিন্তু ধনকুবেরের সংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি ১৭.৩ শতাংশ বাংলাদেশে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৭ সালে ধনকুবেরের সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন। গণচীনে ধনকুবেরের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৪ শতাংশ।

সারণি-৩: বাংলাদেশের আয়বৈষম্য পরিমাপক জিনি সহগের ক্রমাগত বৃদ্ধি: ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল

সাল	জিনি সহগ
১৯৭৩-৭৪	০.৩৬
১৯৮৩-৮৪	০.৩৬
১৯৮৮-৮৯	০.৩৮
১৯৯১-৯২	০.৩৯
১৯৯৫-৯৬	০.৩৯
১৯৯৫-৯৬	০.৪৩
২০০০	০.৪৫
২০০৫	০.৪৬৭
২০১০	০.৪৬৫
২০১৬	০.৪৮৩

সূত্র: রিজওয়ানুল ইসলাম, ২০১৪, "অমানবিক অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি," *দৈনিক বণিক বার্তা*, বিশেষ সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৯ জুন ২০১৪, পৃ. ৮ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018*, ঢাকা, বাংলাদেশ, সারণি ১৪.০২, পৃ. ৫৩১।

সারণি-৪: বিভিন্ন গ্রুপের খানার ভাগে মোট জিডিপির শতাংশ:
খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ ও ২০১৬ মোতাবেক

আয়ের ভিত্তিতে খানাসমূহের গ্রুপ	খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ মোতাবেক জিডিপির শতাংশ	খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ মোতাবেক জিডিপির শতাংশ
সর্বনিম্ন ৫% জিডিপি অর্জনকারী খানা	০.৭৮	০.২৩
সর্বনিম্ন ১০% জিডিপি অর্জনকারী খানা	২.০০	১.০১
সর্বোচ্চ ১০% জিডিপি অর্জনকারী খানা	৩৫.৮৫	৩৮.১৬
সর্বোচ্চ ৫% জিডিপি অর্জনকারী খানা	২৪.৬১	২৭.৮৯

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮: *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018*, ঢাকা, বাংলাদেশ, সারণি ১৪.২০, পৃ. ৫৩১।

অর্থনীতিবিদদের কাছে আয়বৈষম্য দেখানোর জন্যে আরেকটি পরিমাপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেটাকে বলা হয় পা'মা অনুপাত (Palma Ratio) বা পালমা অনুপাত। একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক দশ শতাংশ জনগণের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক চল্লিশ শতাংশ জনগণের মোট আয়ের কতগুণ বেশি সেই অনুপাতকেই পা'মা বা পালমা অনুপাত বলা হয়। কোনো দেশের পা'মা অনুপাত ১ অতিক্রম করলে এবং ক্রমবর্ধমান হলে দেশটি মধ্য আয়বৈষম্যের দেশে পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়, পা'মা অনুপাত ৩ এর কাছাকাছি গেলে দেশটি উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। অতএব, পা'মা অনুপাত ক্রমাগত বাড়তে থাকলে উন্নয়ন তত্ত্বের বৈষম্যবিরোধী তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষম্য নিরসনকারী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে ঐ দেশে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারে ১৯৮০ এর দশক থেকে ক্রমাগতভাবে ১৯৯০ এর দশক ও ২০০০-২০১০ এর দশকে বাংলাদেশের আয়বৈষম্য পরিমাপের পা'মা অনুপাতটি হিসেব করে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৮০ এর দশকে পা'মা অনুপাত ছিল ১.৬৬, ১৯৯০ এর দশকে ঐ অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ২.০৮ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং

২০০০-২০১০ এর দশকে সেটা আরও বেড়ে ২.৫৬ হয়ে গেছে। আরও মারাত্মক হলো, ২০১৬ সালের হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES 2016) মোতাবেক বাংলাদেশের পা'মা অনুপাত নির্ণীত হয়েছে ২.৯৩, যার ফলে বলা যায় বাংলাদেশ এখন 'বিপজ্জনক আয়বৈষম্য' এর স্তরের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

২. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে আয় ও সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলেও ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের আগেই সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর শর্তের চাপে এ দেশে ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মার্কিনপন্থী খোন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের সরকার পাকিস্তানী স্টাইলে স্বজনতোষী পটুজিবাদ (ক্রোনি ক্যাপিটালিজম) প্রতিষ্ঠাকে আবার এই রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ফিরিয়ে এনেছিল। ঐ সময়ের সরকারি নীতিগুলোতে রাষ্ট্রের এই মতাদর্শিক দিক পরিবর্তনের অজস্র প্রমাণ রয়েছে। জিয়াউর রহমান সরকারের ১৯৭৮ সালের বিনিয়োগ নীতিমালা এব্যাপারে একটা মাইলস্টোন, যেখানে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য অনেকগুলো নীতি ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৮২ সালে এরশাদ সরকার প্রবর্তিত 'নয়া শিল্প নীতি' এবং ১৯৮৬ সালে প্রবর্তিত 'সংশোধিত শিল্প নীতি' ও আমদানি উদারীকরণ নীতি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের প্রয়াস। আশির দশকে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আই এম এফ ও বিশ্ব ব্যাংকের 'কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচি' 'নিউ লিবারেল' নীতিমালা সংস্কারের ধারাবাহিকতাকে জোরদার করার জন্যই পরিচালিত হয়েছিল। আমদানি উদারীকরণ, বিরাষ্ট্রীকরণ, ব্যক্তিখাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ও অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকার সংকোচন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ তাদের প্রেসক্রিপশনগুলোর মূল ফোকাস ছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এ দেশে 'নিউ লিবারেল' অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি আরও তরান্বিত হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আমদানি উদারীকরণের রাশ টেনে ধরার প্রয়াস নিলেও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাধানিষেধের কারণে তারা তেমন সফল হয়নি। অন্যদিকে, ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার পালাক্রমে এ দেশে গত ২৮ বছরের মধ্যে ২৬ বছর সরকারে আসীন থাকলেও দেশে আয়বৈষম্য নিরসনে তাদের তেমন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ২০১০ সালের ঐতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংবিধানে সমাজতন্ত্র ফেরত এসেছে। কিন্তু, নামকাওয়াস্তে সমাজতন্ত্রকে সংবিধানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলেও বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট এব্যাপারে নীরবতা পালনকেই নিরাপদ মনে করছে। এর দুটো কারণ আন্দাজ করা যায়: প্রথমত, আওয়ামী লীগ নব্বই দশকের শুরুতেই "মুক্তবাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠাকে তাদের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র এখন আর রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় নয়।

১৯৭০ সালের পাকিস্তানে ২২টি কোটিপতি পরিবারের কথা বলা হতো, যারা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ঐ ২২ পরিবারের মধ্যে দুটো পরিবার ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, তা-ও একটি ছিল অবাঙালি। ঐ বাংলাদেশেই ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মোতাবেক ২৩,২১২ জন কোটিপতি ছিল। ২০১৪ সালে তারা ঐ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার অতিক্রম করেছে বলে দাবি করেছে। ২০১৫ সালের জুলাইয়ে ঐ সংখ্যা ৫৪,৭২৭ বলে বাংলাদেশ

ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। ২৬ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে অর্থমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন, দেশে এক কোটি টাকার বেশি আমানতের ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে ১ লাখ ১৪ হাজারেরও বেশি। এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির কাছে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে যাওয়ার বিপদ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে সে ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের কি কোনো করণীয় নেই? সারণি-৩ এ দেখানো হয়েছে, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ ছিল মাত্র ০.৩৬, মানে প্রচণ্ড দারিদ্র্য-কবলিত দেশ হলেও ঐ পর্যায়ে এ দেশে আয় বৈষম্য তুলনামূলকভাবে সহনীয় ছিল। ২০১৬ সালের হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভেতে জিনি সহগ বেড়ে ০.৪৮৩ এ পৌঁছে গেছে। সাধারণ জনগণের কাছে বোধগম্য যেসব বিষয় এই বিপদটার জানান দিচ্ছে সেগুলো হলো: ১) দেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে মাতাপিতার বিত্তের নিক্তিতে সন্তানের স্কুলের এবং শিক্ষার মানে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে; ২) দেশে চার ধরনের মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে; ৩) ব্যাংকের ঋণ সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে এবং ঋণখেলাপি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে; ৪) দেশের জায়গা-জমি, অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট, ফ্ল্যাট অর্থাৎ রিয়াল এস্টেটের দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে; ৫) বিদেশে পুঁজি পাচার মারাত্মকভাবে বাড়ছে; ৬) ঢাকা নগরীতে জনসংখ্যা এক কোটি পঁচাত্তর লাখে পৌঁছে গেছে, যেখানে আবার ৪০ শতাংশ বা ৭০ লাখ মানুষ বস্তিবাসী; ৭) দেশে গাড়ি, বিশেষত বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে; ৯) বিদেশে বাড়িঘর, ব্যবসাপাতি কেনার হিড়িক পড়েছে; ১০) ধনাঢ্য পরিবারগুলোর বিদেশ ভ্রমণ বাড়ছে; ১১) উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রবাহ বাড়ছে; ১২) উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ঘন ঘন বিদেশে যাওয়ার খাসলত বাড়ছে; ১৩) প্রাইভেট হাসপাতাল ও বিলাসবহুল ক্লিনিক দ্রুত বাড়ছে; ১৪) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে; ১৫) দেশে ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট স্কুল, পাবলিক স্কুল এবং ও লেভেল/এ লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মচ্ছব চলছে; ১৬) প্রধানত প্রাইভেট কারের কারণে সৃষ্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামের ট্রাফিক জ্যাম নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে; এবং ১৭) দেশে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বেড়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে পদে পদে। দুর্নীতিলব্ধ অর্থের সিংহভাগ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্যের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশের জাতীয় সমাজবিন্যাসকে (national social formation) সামীর আমিন বর্ণিত প্রান্তীয় পুঁজিবাদী সমাজ ফর্মেশন আখ্যায়িত করা যায়, যেখানে একটি ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিপরীতে বিপুল জনগণের আবাসস্থল গ্রামীণ সমাজে প্রাক-পুঁজিবাদী কিষাণ উৎপাদন পদ্ধতি আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরুর পর্বে দেশের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষি-নির্ভর, যেখানে কিষাণ উৎপাদন পদ্ধতি (peasant mode of production) ছিল প্রাধান্য-বিস্তারকারী উৎপাদন পদ্ধতি। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমিব্যবস্থায় আরোপিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারব্যবস্থা ১৯৫০ সালের ইস্ট বেঙ্গল স্টেট এক্যুজেশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট (EBSATA) এর মাধ্যমে নামকাওয়াস্তে বিলুপ্ত হলেও ভূমি মালিকানা ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় জোতদার ও বৃহৎ ভূমি মালিক গোষ্ঠীকে বাংলাদেশের কৃষি থেকে উৎখাত করা যায়নি, কিন্তু তবুও মানতে হবে যে মাঝারী ও ক্ষুদ্র ভূমি মালিক-কৃষক এবং প্রান্তিক জোতসমূহের মালিক ও ভাগচাষীরাই এ দেশের গ্রামীণ কিষাণ সমাজগুলোর প্রধান উৎপাদক গোষ্ঠী হিসেবে জীবনযাপন করতেন। (স্বাধীন

বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত কোনো সত্যিকার ভূমি সংস্কার নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়নি।) দেশের মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত নগরের অধিবাসী, বাকি ৯৩ শতাংশ মানুষ দেশের ছিয়াশি হাজারেরও বেশি গ্রামগুলোর বাসিন্দা। ঐ গ্রামগুলোকে তখন অনায়াসে শানিন-কথিত কিষাণ সমাজ (peasant society) আখ্যায়িত করা যেতো, যেখানে পরিবারকেন্দ্রিক আত্মপোষণমূলক কৃষি উৎপাদনব্যবস্থা, পারিবারিক শ্রমের ওপর প্রায় সর্বাত্মক নির্ভরশীলতা, কিষাণ পরিবারের আত্মশোষণ (self-exploitation), কৃষিজাতদ্রব্য ও কৃষি-উপকরণেরসীমিত বাজারীকরণ, খাদ্যশস্যকেন্দ্রিক কৃষি উৎপাদন ও সীমিত সংখ্যক বাজারমুখী ফসল উৎপাদন, গ্রামীণ সমাজে কৃষির পাশাপাশি কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রচলন, গ্রামীণ হাট-বাজারগুলোতে খুদে বণিকদের বাণিজ্য, মহাজনী ঋণপ্রথা, কৃষিজাতদ্রব্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, হাজার হাজার বছরব্যাপী গেড়ে বসে থাকা সনাতন চাষ পদ্ধতি, পরিবারভিত্তিক হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল-মহিষ-মাছ-তরিতরকারি চাষ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহকে সহজেই চিহ্নিত করা যেতো। জাতিসংঘ কর্তৃক তখনকার প্রচলিত ২১২২ দৈনিক কিলো-ক্যালরি তাপ-উৎপাদনকারী খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে বিন্যস্ত দারিদ্র্য সীমার বিচারে বিংশ শতাব্দীর পুরো সত্তর দশকে বাংলাদেশের জনগণের ৮২ শতাংশের অবস্থান ছিল দারিদ্র্য সীমার নিচে, শহরের ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী তখনো জনগণের দুই-তিন শতাংশও হতো কিনা সন্দেহ রয়েছে। গ্রামের বৃহৎ ভূমি মালিক কিংবা মাঝারী ভূমি-মালিক-কৃষক পরিবারগুলোকে বড়জোর মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো অন্তর্ভুক্ত করা যেতো। বাংলাদেশের ৮২ শতাংশ মানুষ ঐ পর্যায়ে স্রেফ দারিদ্র্যপীড়িত জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে পর্যুদস্ত নিম্নআয়ের মানবগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এটাই জাতিসংঘের পরিমাপ সাক্ষ্য দিচ্ছে। সারণি-৩ এর তথ্য বলছে, ১৯৭৩-৪ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ ছিল ০.৩৬। এর মানে হলো, সিংহভাগ জনগণ তখন চরম দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হলেও জনগণের মধ্যে আয়বৈষম্য তখনো গুরুতর সমস্যার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

পাকিস্তানি আমলে পূর্ব পাকিস্তানকে যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ' হিসেবে পুঁজি-লুণ্ঠন ও পুঁজি পাচারের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে পাকিস্তানের ২৪ বছরের শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধির ন্যায্য-হিস্যা দূরে থাক এমনকি ১০ শতাংশও পূর্ব-পাকিস্তানীদের কপালে জোটেনি। পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক, আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজি লণ্ঠনমূলক (extractive) রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধনাঢ্য ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানে ধন-সম্পদ আহরণের সুযোগ পেয়েছিল তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অতি ক্ষুদ্র একটি মহল শাসকমহলের কৃপাধন্য হয়ে কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার পেলেও তাদের অনুপাত পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশও হবে না, এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়। এই নিদারুণ বঞ্চনা থেকে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের পথ বেয়ে জাতিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে, যেজন্যে আমরা বলি শোষিত-বঞ্চিত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা।

১৯৭২-৭৫ পর্বের বাংলাদেশ ছিল ১ কোটি ভারত-প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থী এবং আরও দুই কোটি অভ্যন্তরীণ-বাস্তুচ্যুত জনগণের পুনর্বাসন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ, প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্যঘাটতি পূরণ এবং চরম বস্ত্রাভাব পূরণ চেষ্টায় রত সংকটজর্জরিত একটি চরম অভাবগ্রস্ত জনপদ। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বন্ধুভাবাপন্ন পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোসহ কিছু দেশ

ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ঐ সময় তাদের যথাসাধ্য সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ালেও নব্য-স্বাধীন দেশটি বিশ্বের করুণানির্ভর 'তলাবিহীন ভিক্ষার ঝুড়ি'র অবস্থান থেকে মুক্তি পাবে কি না সেটা বোঝা যাচ্ছিল না, যদিও এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে খাদ্যাভাবে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে এ দেশে কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রীয় খাতে জাতীয় সম্পদের যে বিপুল সমাবেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে তা লুটপাট ও ছারখার করতে শুরু করেছিল দুর্নীতিবাজ ও লুটেরারা। একইসাথে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পুঁজি লুণ্ঠনের বখরা-ব্যবস্থা গড়ে তুলল ব্রিফকেসধারী নব্য-ব্যবসায়ীরা এবং তাদের সাথে বখরা-সমঝোতায় আবদ্ধ ব্যাংকাররা। ১৯৭৩ সাল থেকে বেধড়ক দুর্নীতি ও লুটপাট, অদক্ষতা, অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক রাজনীতি এবং অপ্রয়োজনীয় শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভারে লোকসানের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে শুরু করল প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। এগুলোকে ভাসিয়ে রাখতে গিয়ে সংকটে পড়ল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। বৈদেশিক অনুদান ও রিলিফ লোপাট থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও লুটপাট আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় দ্রুত ধস নামিয়ে দিল। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুই আফসোস করেছিলেন,'আমি সারা দুনিয়া থেকে বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য ভিক্ষা করে আনি, আর তা সাবাড় করে দেয় চাটার দল'। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসানের পেছনেও চাটার দল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ে একশ্রেণির ব্রিফকেসধারী ঋণ-শিকারী ও ব্যাংক-কর্মকর্তার মচ্ছবের পেছনেও চাটার দল। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা টিসিবি এবং সেবা সংস্থা রেডক্রসও পরিণত হলো লুটপাটের প্রতীকে। এভাবে দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আমলা-যোগসাজশে যখন দুর্নীতিবাজ ও পুঁজি-লুটেরারা পুঁজিপতি বনে গেল তখন প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হলো আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই। পুঁজিবাদের বিশ্বমোড়ল মার্কিনিদের সাথে দহরম-মহরম গড়ে উঠল এসব নব্য-পুঁজিপতির। সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতার দায়ভার চাপানো হলো সমাজতন্ত্রের নামে গৃহীত নীতিগুলোর ওপর। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা পুঁজিবাদী লবি দিন দিন জেঁকে বসতে শুরু করল বঙ্গবন্ধুর চারপাশে। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে অসম্মানজনকভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো, আর খন্দকার মোশতাক হয়ে উঠল বঙ্গবন্ধুর আপনজন। দেশের শিল্পনীতিতে ক্রমশ ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থাদি গৃহীত হলো। কিন্তু, দেশের অর্থনৈতিক সংকট ও জনগণের দুর্দশা বেড়েই চলেছিল। ১৯৭৪ সালের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পর বঙ্গবন্ধু হয়তো তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৭৫ সালে প্রণীত তাঁর বাকশাল কর্মসূচি নিছক একদলীয় স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে পরবর্তী সময়ে বদনামের ভাগীদার হলেও ঐ কর্মসূচির মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপাদান যে নিহিত ছিল, তা তাঁর চরম শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছিলেন; আওয়ামী লীগ পরিণত হয়েছিল দুর্নীতি, দুঃশাসন ও নিপীড়নের জন্য জনপ্রিয়তা হারানো শাসকদলে। তাঁরই ছত্রছায়ায় দুধকলা দিয়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের পুষছিলেন বঙ্গবন্ধু। অতএব, তাঁকে আর দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়নি তাঁর হন্তারক শক্তি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডির নায়ক বনে গেলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক। যবনিকাপাত হলো অর্থনৈতিক মুক্তির পথ অন্বেষার।

যে সত্যটি উদ্‌ঘাটনের জন্যে উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি প্রদত্ত হলো তা হলো, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির বাস্তবতার পাশাপাশি এ দেশের দুর্নীতিবাজ ও পুঁজি-লুটেরা গোষ্ঠীগুলোর বিকাশ শুরু হলেও ১৯৭৫-৯০ পর্বের সামরিক শাসনামলেই জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সমস্যা গেড়ে বসেছে। সারণি-৩ সাক্ষ্য দিচ্ছে, ১৯৭৩-৪ অর্থবছর আয়বৈষম্য

পরিমাপক যে জিনি সহগ ০.৩৬ ছিল ১৯৮৩-৪ অর্থবছরেও তা ছিল ০.৩৬। সে জন্যেই বলা প্রয়োজন, রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে বিষয়টি প্রাথমিক গুরুত্বের দাবিদার তা হলো ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী নব্য-ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও পুঁজি পাচার পর্ব থেকে মুক্তি লাভের পর মাত্র তিন বছর আট মাসের মাথায় আবার বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পুরানো পাকিস্তানী শাসন, শোষণ ও পুঁজি-লুণ্ঠন ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পথ ধরে বাংলাদেশে আবারো প্রতিষ্ঠিত হলো পুরানো পাকিস্তানি কায়দার সামরিক বাহিনী ও সিভিল আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত নব্য-ঔপনিবেশিক, আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিলুণ্ঠনমূলক রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব মোড়লরা খোলাখুলি নেমে পড়ল এ দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির মোড় পরিবর্তনের খেলায়। বৈদেশিক সাহায্যের বান ডাকল। জিয়াউর রহমান প্রকাশ্যেই বলতেন, 'Money is no problem'। সমন্বয়ের রাজনীতির ধুয়া তুলে স্বাধীনতাবিরোধী মহলগুলোকে আবারো এ দেশে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিলেন তিনি। সুযোগ-শিকারী ডানপন্থী ও বামপন্থী নেতা-পাতিনেতা-কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও সিভিল আমলা, পেশাজীবী এবং ব্যবসায়ীদেরকে কেনাবেচার রাজনীতির মাধ্যমে অথবা নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জড়ো করে ক্যান্টনমেন্টে বসেই তিনি গড়ে তুললেন তাঁর তল্পিবাহক রাজনৈতিক দল বিএনপি। রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে তিনি নিজে দুর্নীতি না করলেও জিয়াউর রহমানের আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি ও পুঁজিলুণ্ঠন ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছিল। এ-ব্যাপারে কোসানেকের কাছে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমান সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি অপরিহার্য বাস্তবতা (fact of life)। কোসানেক বলছেন জিয়া আমলে, "Corruption was converted from a crime to a habit (Kochanek, 1993, p. 259)." মার্কাস ফ্রান্ডার মতামত এ-ব্যাপারে আরও খোলামেলা," "What Zia has done is to regularize corruption and make it almost necessary for everyone to become involved in it (Franda, 1982, p. 281)." আমার প্রকাশিতব্য গ্রন্থ *Role of the State in Bangladesh's Underdevelopment* এ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির মোড় পরিবর্তন প্রসঙ্গে আমি নিচের বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছি:

Zia drastically changed the policy regime of the Bangladesh economy by re-introducing the Pakistani-style policies of patronising the private sector. He also doled out import permits, bank loans, foreign currency allocations, industrial licenses, industrial plots, residential plots and lucrative government contracts to individuals recruited in BNP. Analysts have termed the policy of nurturing the capitalists of the private sector in Bangladesh during the Zia regime as 'state-sponsored capitalism'... The inflow of foreign loans and grants greatly increased during Zia's rule. 'Money is no problem' was his favourite utterance. The increased flow of foreign aid created a group of beneficiaries who made fortunes from the flourishing aid businesses of the period. This group of principal beneficiaries includes indenters, construction contractors, importers, clearing and forwarding agents, suppliers, consultant engineers and economists, bankers, executives of insurance companies, NGO functionaries, lawyers, travel agents,

shipping agents, bureaucrats, ministers, members of parliament (MPs) and the leaders of BNP with easy access to Zia. It implies that a class of comprador bourgeoisie and lumpen bourgeoisie (or pseudo-capitalists) emerged very rapidly during the Zia era (Islam, 2019, Pp. 262-3).

প্রফেসর রেহমান সোবহান ব্যাংকঋণের মোড় পরিবর্তন সম্পর্কে নিচের উদ্বৃতিটি ব্যবহার করেছেন,

This trend in promoting the private sector has acquired a special urgency after the change of regime in 1975. Prior to that only Tk. 120 million or 4% of the total had been sanctioned as loans to the private sector. After 1975 the pattern was completely reversed, so that of a much larger sanction of Tk.9,124 million between 1975/81, 96% now went to the private sector. The policy after 1975 to channel the overwhelming bulk of public credits to the private sector was consistent with the change in the direction of state policy from one of containing the growth of a capitalist class to one of building up such a class (Sobhan, 1982, p. 49).

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া (comprador bourgeoisie) ও মুৎসুদ্দি সরকার (comprador government) ধারণাগুলো ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত পল বারানের বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ *Political Economy of Growth* এ সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি মুৎসুদ্দি পুঁজি বা প্রচলিত অর্থে দালাল পুঁজি কনসেপ্টটির সংজ্ঞা দিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর নব্য-ঔপনিবেশিক বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলোর প্রচণ্ড শক্তিধর বহুজাতিক করপোরেশানগুলোর উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিপতিদের ছোট তরফ বা এজেন্টের ভূমিকা পালনের বিষয়টিকে ফোকাস করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইন্ডেন্টর, আমদানিকারক, সোল এজেন্ট, পরিবেশক, অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট স্থাপনকারী শিল্পপতি, ফ্র্যাঞ্চাইজি কিংবা সেলস এজেন্টের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যেসব বাণিজ্যনির্ভর পুঁজিপতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মুনাফা আহরণে ব্যাপৃত থাকে, তাদেরই পল বারান মুৎসুদ্দি বা দালাল পুঁজির এই সংজ্ঞার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই নতুন কনসেপ্টটির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল উপনিবেশ-উত্তর বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নব্য-সাম্রাজ্যবাদী মেট্রোপলিটান ক্যাপিটালিস্ট সেন্টারস বা পুঁজিবাদী মূল কেন্দ্রগুলোতে আধিপত্য বিস্তারকারী রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে বিকাশমান পুঁজিপতিদের সম্পর্ক এবং তাদের চরিত্রগত পার্থক্য উভয়ই ব্যাখ্যা করার তাগিদে। আর, আধিপত্য-পরনির্ভরতা সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত নব্য-ঔপনিবেশিক বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রের সরকারকে তিনি 'মুৎসুদ্দি সরকার' অভিহিত করেছেন। সামরিক একনায়ক জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সরকারের শাসনামলে তাঁদের দুজনেরই মার্কিন বশংবদতার কারণে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক সহায়তার ওপর সর্বব্যাপ্ত নির্ভরতাহেতু তাত্ত্বিকভাবে তাঁদের নেতৃত্বাধীন সরকারকে মুৎসুদ্দি সরকার আখ্যায়িত করলে ভুল হবে না। ১৯৭৫ সাল থেকে গত ৪৪ বছর ধরে বাংলাদেশে যে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছে তাদের চরিত্র বর্ণনার জন্যে মুৎসুদ্দি পুঁজি কনসেপ্টটিও খুবই জুৎসই হবে। ১৯৭৫ সাল থেকে বর্ধিত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ থেকে মার্জিন আহরণ এবং আমদানি বাণিজ্যে বহুল প্রচলিত নানা পদ্ধতিতে এ দেশে পুঁজি লুণ্ঠন ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করতে শুরু করেছিল, যে প্রক্রিয়াগুলো স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ১৯৯১ সালে ভোটের রাজনীতি চালু হওয়ার পর গত ২৮ বছর একই প্রক্রিয়াগুলো

হুবহু চালু রয়েছে। তাই, এ দেশের কয়েক লাখ ব্যবসানির্ভর পুঁজিপতি, মার্জিন-আত্মসাৎকারী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, দুর্নীতিবাজ আমলা, সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদার এবং বৈদেশিক সহায়তার পাইপলাইনের ঘাটে ঘাটে সুবিধাভোগীরাই যে গত ৪৪ বছরে নব্য-ঔপনিবেশিক, প্রান্তীয় পুঁজিবাদী, আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিলুণ্ঠনমূলক চরিত্রের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ধনাঢ্য ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন—তাতে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। ২০১৯ সালে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছে গেছে, মানে ৩০২ বিলিয়ন ডলার জিডিপির তুলনায় রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের যোগফল প্রায় ১০২ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের কয়েক লাখ ধনাঢ্য ব্যক্তি ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৯৫ শতাংশই হয়তো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যখাতে ব্যবসায়ী হিসেবে ধনার্জনে ব্যাপৃত রয়েছেন। অতএব, তাদের সিংহভাগই যে প্রকৃত বিচারে মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু, প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অনুপাত জনগণের ১ শতাংশও হবে কি-না সন্দেহ! এ দেশে শিল্পপতিদের সিংহভাগও কোনো না কোনোভাবে ব্যবসার সাথে জড়িত।

সত্তরের দশকের শেষ এবং আশির দশকের শুরু থেকে এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্প দ্রুত বর্ধিষ্ণু শিল্প হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করেছে এবং গত চার দশকে এই শিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই নারীশ্রমিক। এই নারীশ্রমিকেরা পোশাক শিল্পে কর্মরত থাকায় তাদের পরিবার বেকারত্ব ও চরম দারিদ্র্য থেকে নিষ্কৃতি পেলেও এই পরিবারগুলো এখনো নিম্নবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। অন্যদিকে, তৈরি পোশাক শিল্পে যারা উদ্যোক্তা শিল্পপতি হিসেবে সাফল্যের সাথে বিনিয়োগ করেছেন তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এখন দেশের ধনাঢ্য ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হচ্ছেন। তাঁরা এখন আরও অনেক বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে বিনিয়োগ করে দ্রুত দেশের ধনকুবেরদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলেছেন। উপরে উল্লিখিত ওয়েল এক্স-এর জরিপে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ গার্মেন্টস মালিকরাই। দুঃখজনক হলো, দেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারকারী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের অধিকাংশই গার্মেন্টস মালিক। মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোমের মালিক এবং টরোন্টোর 'বেগমপাড়ার' বাড়ির মালিকদের মধ্যেও দুর্নীতিবাজ ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল আমলা, সামরিক অফিসার ও রাজনীতিবিদদের পরিবারের পাশাপাশি গার্মেন্টস মালিকদের পরিবারই বেশি অনুপাতে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দেওয়া নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি (NRB) পরিবারের মধ্যে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের পরিবারই সংখ্যাগুরু। দেশের বাণিজ্য ও সেবা খাতেও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণশিল্প, টেলিভিশন চ্যানেল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ, প্রাইভেট ব্যাংক-বীমা, প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজ-কিন্ডারগার্টেন, সংবাদপত্র, এনজিও, হোটেল-রেস্তোঁরা, বিলাসী পরিবহন, হসপিটাল-ক্লিনিক-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার—এগুলো দেশের দ্রুতবর্ধনশীল মুনাফাদায়ক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র।

এটাও আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে দেশের কৃষিব্যবস্থা (agrarian system) গত ৪৪ বছরে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিকীকরণ, প্রান্তিকীকরণ (marginalization) এবং নিঃস্বকরণ (pauperization) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেকখানি রূপান্তরিত হয়ে গেছে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলো হলো: ক) জমির মালিকানা ও কৃষি-জোতের (operational holding) ক্রমহ্রাসমান আকার, খ) জমির আকারের প্রান্তিকীকরণ ও ভূমিহীন গ্রামীণ পরিবারের অনুপাত বৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, গ) ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনৈতিক নেতাকর্মী, শহুরে অনুপস্থিত ভূমিমালিক পেশাজীবী ও প্রবাসী

মালিকদের কাছে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে জমির মালিকানার হস্তান্তর ও পুঞ্জীভবন এবং এর ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ভূমিমালিকদের ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার ও খেতমজুরে পরিণত হওয়ার হার বৃদ্ধি, ঘ) বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমির মালিকানার খণ্ডিতকরণ ও প্রান্তিকীকরণ, ঙ) মাঝারি ও ছোট ভূমিমালিক-কৃষকদের সংখ্যা ও অনুপাতের দ্রুত হ্রাস এবং এর ফলে বর্গাদারি ও ভাগচাষের ব্যাপক অনুপাত বৃদ্ধি, চ) একই জোতে অন্তর্ভুক্ত জমির খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে ছড়িয়ে থাকা এবং এর ফলে চাষের প্লটের সাইজ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হওয়ার প্রবণতা, ছ) ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় বর্গাদারি ও ইজারাদারির দ্রুত প্রবৃদ্ধি, যেখানে ক্ষুদ্র ভূমিমালিক-কৃষক কর্তৃক নিজেদের মালিকানাধীন জমির সাথে অনুপস্থিত ভূমিমালিকদের জমি বর্গা নিয়ে চাষের জোতকে 'অর্থনৈতিক জোতে' পরিণত করার প্রবণতাই প্রধানত ক্রিয়াশীল, জ) কৃষিজাতপণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের অব্যাহত আধিপত্য, ঝ) কৃষি-উপকরণ জোগানব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বাজারীকরণ, যেখানে ক্ষমতাশীল দল বা জোটের নেতাকর্মীদের মুনাফাবাজির তাণ্ডব এবং চাঁদাবাজ ও মাস্তানদের উপদ্রব কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে, ঞ) প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা সমস্যা ও মহাজনী ঋণের অব্যাহত দাপট, ট) কৃষিতে মৌসুমী বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব সমস্যার অব্যাহত প্রাদুর্ভাব, ঠ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলহানি, ড) ব্যয়বহুল বিয়ে, যৌতুক, বিদেশে অভিবাসন-ব্যয় মেটানো এবং মারাত্মক অসুস্থতার কারণে জমি বিক্রয় ইত্যাদি। উপরে উল্লিখিত নেতিবাচক প্রক্রিয়াগুলোর বিপরীতে কৃষিখাতে অনেকগুলো ইতিবাচক পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে, যার মধ্যে উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, সেচব্যবস্থার আওতায় আসায় দেশের অধিকাংশ জমিতে বোরো চাষের সম্প্রসারণ, কৃষিখাতে যথাযথ ভর্তুকি প্রদান, কৃষিঋণ পদ্ধতির সহজীকরণ, ফসলের বহুধাকরণ, কৃষির লাগসই যান্ত্রিকীকরণ, উচ্চফলনশীল ফসল, তরিতরকারি, মাছ, হাঁস-মুরগি ও ফলমূল চাষের ব্যাপক প্রচলন, আধুনিক রাসায়নিক সার, বীজ ও কীটনাশকের সহজলভ্যতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ফলে কৃষিব্যবস্থার নেতিবাচক প্রবণতাগুলোকে ছাপিয়ে উৎপাদনশীলতার উল্লম্ফন দেশে একটি কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছে। দেশ ধান ও আলু উৎপাদনে উদ্বৃত্ত অবস্থানে পৌঁছে গেছে। তরিতরকারি, মাছ ও হাঁস-মুরগি উৎপাদনেও দেশের সাফল্য প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও দেশের কৃষকসমাজ তাদের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে যে নিজেদের উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছে, তা বলা যাচ্ছে না। এটাও প্রণিধানযোগ্য যে দেশের জিডিপির মাত্র ১৪ শতাংশ এখন কৃষিখাত থেকে আসছে। অবশ্য কৃষিতে এখনো দেশের ৪১ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ কর্মরত। আরও বলা প্রয়োজন, জিডিপিতে অবদান সংকুচিত হচ্ছে দেখে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্বও অতখানি সংকুচিত হয়ে গেছে মনে করা হলে সেটা বড়সড় ভুল হবে।

বরং, বাংলাদেশ থেকে যে ১ কোটি ২০ লাখ অভিবাসী বিশ্বের নানা দেশে কর্মরত, তারা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রতিবছর যে ১৫ বিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি অর্থ এবং অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ চ্যানেলে যে আরও ৮-১০ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন এই বিপুল বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহ অর্থনীতির জন্যে সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ২৩-২৫ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স প্রবাহ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের যে ক্ষীণ প্রবাহ ছিল সে অভাবকে ভালোভাবে মিটিয়ে চলেছে। এই ১ কোটি ২০ লাখ অভিবাসীর শতকরা নব্বই জন যেহেতু গ্রামীণ জনপদের অভিবাসী, তাই এই বিশাল রেমিটেন্স প্রবাহের সুফলের সিংহভাগও গ্রামের অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে চলেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দ্রুত নিরসনের অন্যতম বড় কারণ এই রেমিটেন্স প্রবাহ। রেমিটেন্স প্রবাহের সুফলভোগী পরিবারগুলোর বর্ধিত ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড়সড় সমৃদ্ধির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বাড়িঘর পাকা হচ্ছে, অন্যান্য ধরনের বসতঘরেরও মান বৃদ্ধি

পেয়েছে, ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, পরিবারের সদস্যদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থ্য বাড়ছে, শিশুমৃত্যুর হার কমছে, সেনিটারি পায়খানার প্রচলন বাড়ছে, ঘরে ঘরে টিউবওয়েল বসে গেছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ চলে এসেছে, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত হচ্ছে, গ্রামের রাস্তাঘাটেও আধুনিক পরিবহনব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে, সর্বোপরি গ্রামের নারী সমাজের ক্ষমতায়নের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে, গ্রামীণ জনগণের মধ্যে প্রায় আশি লাখ থেকে এক কোটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ৪-৫ কোটি জনগণ এখন নিম্ন-মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে ধারণা করা যায়। অবশ্য, এটাও অনস্বীকার্য যে এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার মূল ফায়দাটা তুলে নিচ্ছে কয়েক হাজার আদমবেপারি, যাদের বেশির ভাগই আদম ব্যবসার মাধ্যমে দ্রুত কোটিপতির কাতারে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে দ্রুত কোটিপতি হওয়ার আরেকটি ন্যক্কারজনক পন্থা হলো দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হওয়া। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ, পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, আয়কর-ভ্যাট-কাস্টমসসহ সরকারি-আধা সরকারি-স্বায়ত্তশাসিত-আধা স্বায়ত্তশাসিত সকল বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আদালতসমূহ, শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাস্থ্যবিভাগ ও সরকারি হাসপাতালসমূহ—এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যাবে না যেটা খানিকটা দুর্নীতিমুক্ত। দুর্নীতিলব্ধ অনার্জিত আয় দুর্নীতিবাজদের পরিবারের সদস্যদেরকে অতিদ্রুত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে। এই অর্থের একটা বড়সড় অংশ বিদেশেও পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর একটি অংশ মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ায় আবার দেশের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ছে। দেশে বিত্তবান হওয়ার আরেকটি লোভনীয় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাংকঋণ লুণ্ঠন দেশে এখন ৬১টি ব্যাংক চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিবছর কয়েক লাখ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ঋণগ্রহীতার মাধ্যমে কয়েক বিলিয়ন ডলার লুটপাটের আয়োজন দিন-দিন গেড়ে বসছে। রাঘববোয়াল ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের ব্যাংকঋণ ফেরত না দেওয়া এখন ক্রমশ দুরারোগ্য ক্যানসারে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এই লুণ্ঠিত পুঁজির সিংহভাগও বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অতএব, দেশে আয়বৈষম্য বেড়ে যে বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেশের সরকারগুলো যেহেতু 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র পথ অনুসরণ করে গত ৪৪ বছর ধরে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম'কে সোৎসাহে চালু রেখেছে তাতে আয়বৈষম্য নিরসনের কোনো তাগিদ সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে পরিদৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। আয়বৈষম্যের ব্যাপারে বাংলাদেশের সরকারগুলোর দুঃখজনক অমনোযোগের আলোকেই বিষয়টির বিশ্লেষণকে উপস্থাপন করতে হবে।

৪. ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদবৈষম্য সম্পর্কে বিশ্বের উন্নয়ন-ডিসকোর্সে মহাবিপৎসংকেত ও ধারণাগত পরিবর্তন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আয়বৈষম্যের মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটা অনিবার্যতার সম্পর্ক থাকে বলে সাইমন কুজনেৎস বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন. তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ডিসকোর্সে 'ইনভার্টেড-ইউ হাইপথেসিস' কিংবা 'কুজনেৎস কার্ভ' তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল, যার মূল কথা হলো—কোনো দেশের মাথাপিছু আয় নিম্ন অবস্থান থেকে প্রাথমিকভাবে বাড়তে শুরু করলে ঐ দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্যও প্রাথমিকভাবে একটা পর্যায় পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। তবে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, মাথাপিছু আয় বেড়ে একটা লেভেলে পৌঁছার পর আয়বৈষম্য আর বাড়ে না। মানে, কুজনেৎসের তত্ত্ব মোতাবেক প্রাথমিকভাবে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং বৈষম্য বৃদ্ধির মধ্যে একটা trade-off থাকে। এই তত্ত্বের নিহিতার্থ হলো, বৈষম্য হ্রাসকে একটি দেশের উন্নয়ন নীতিতে বেশি গুরুত্ব দিলে

প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বেশ কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে কুজনেৎস এই তত্ত্ব প্রদানের পর তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিপ্রণেতারা ষাটের দশকে আয়বৈষম্যকে অগ্রাধিকার প্রদানের পরিবর্তে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর প্রতি মনোনিবেশ করায় বেশি উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। বিশেষত, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শিক প্রতিযোগিতার 'ঠান্ডাযুদ্ধ পর্বে' ঐ উন্নয়ন-কৌশল দক্ষিণপন্থী রাজনীতির অনুসারী শাসকমহলের কাছে 'holy writ'এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু, সত্তরের দশক থেকেই 'কুজনেৎস কার্ভ তত্ত্ব' সঠিক নয় বলে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের গবেষণায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সাম্প্রতিককালে কুজনেৎসের এই তত্ত্ব মারাত্মক ভুল বলে সিংহভাগ উন্নয়ন তাত্ত্বিক এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ২০১২ সালে প্রকাশিত ফরাসী অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটির সাড়াজাগানো গবেষণাগ্রন্থ *Capital in the Twenty First Century* তে কুজনেৎসের বাছাই করা বছরগুলো যথাযথ ছিল না দাবি করে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে পিকেটি এই তত্ত্বকে 'ভুয়া' প্রমাণ করে ছেড়েছেন। কিন্তু, মানবজাতির বড়সড় ক্ষতি তো এর মধ্যেই হয়ে গেছে। বিশেষত, গত চার দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির ডামাডোলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ শরিক হওয়ায় উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত নির্বিশেষে প্রায় সব দেশে আয় ও সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বেড়ে এখন বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে। বিশ্বখ্যাত এনজিও অক্সফামের ২০১৭ সালের এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনাঢ্য আটজন ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ জমা হয়েছে এবং ঐ সম্পদ থেকে যে আয় অর্জিত হচ্ছে তা নিম্নতর আয়ের মালিক বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের (মানে তিন'শ ষাট কোটি জনগণের) আয়ের চাইতেও বেশি। অক্সফাম আরও দাবি করছে, বিশ্বের এক শতাংশ ধনাঢ্য জনগণের আয় বাকি নিরান্নব্বই শতাংশ জনগণের আয়ের চাইতে বেশি হয়ে গেছে। উন্নত দেশের শ্রমজীবী জনগণের দৃষ্টিতে আরও গুরুতর হলো, সাম্প্রতিক দুই দশক ধরে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পঞ্চাশ শতাংশ নিম্নতর আয়ের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে। অথচ, ঐসব দেশের সবচেয়ে ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর আয় ও সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে উন্নয়ন সম্পর্কিত 'মৌল প্রয়োজন এপ্রোচ' (basic needs approach) এবং আশির দশক থেকে বিকশিত অমর্ত্য সেন ও মাহবুবুল হকের 'মানব উন্নয়ন অ্যাপ্রোচ' (human development approach) উন্নয়ন ডিসকোর্সে মাথাপিছু জিডিপির এক কেন্দ্রিক প্রতাপ ক্রমশ খর্ব করতে সক্ষম হয়। অমর্ত্য সেনের দুটো ধারণা 'entitlement & capabilities'আশির দশকে উন্নয়ন কনসেপ্টকে জিডিপির একাধিপত্য থেকে মুক্ত করে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য—সে বিষয়টাকে উন্নয়ন চিন্তায় যথাযথ ফোকাসে নিয়ে আসে। সবশেষে, ১৯৯৯ সালে প্রদত্ত অমর্ত্য সেনের 'উন্নয়ন হলো স্বাধীনতা' (Development as Freedom) তত্ত্ব উন্নয়নকে আরও অনেক বিস্তৃত আঙ্গিকে নিয়ে যায়। 'স্বাধীনতাহীনতার সূত্রগুলো থেকে মুক্তিই উন্নয়ন'—এই তত্ত্বের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা, যথা ১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), ২) অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ (economic facilities), ৩) সামাজিক সুযোগসমূহ (social opportunities), ৪) স্বচ্ছতার অঙ্গীকারসমূহ (transparency guarantees) এবং ৫) নিরাপত্তা রক্ষাকবচ (protective security) উন্নয়ন কনসেপ্টকে শুধু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতাহীনতার নানা ডাইমেনশন থেকে মানবমুক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে, কোনো দেশ উন্নয়ন নীতিতে বৈষম্য হ্রাসকে অগ্রাধিকার দিলে প্রবৃদ্ধি কমে যাবে বলে যে ভুল ধারণাকে কুজনেৎসের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটাও একটার পর একটা দেশে ভুল প্রমাণিত হয়ে চলেছে। বরং, যেসব দেশ উন্নয়ন নীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি সব ধরনের বৈষম্য হ্রাসকে গুরুত্ব দিয়েছে সেসব দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার গত

চার দশক ধরে ক্রমাগতভাবে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ইসরায়েল, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলংকার উন্নয়ন-অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যে বণ্টনের ন্যায্যতাকে অবহেলা করার কোনো যুক্তি নেই। উপরে উল্লিখিত সঠিক তত্ত্ব ও উন্নয়ন-অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি' ('inequality alleviating growth') বা 'বণ্টনের ন্যায্যতাসহ প্রবৃদ্ধি' ('equitable growth') অর্জনের কনসেপ্ট ও উন্নয়ন-কৌশল। 'বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি' বা 'বণ্টনের ন্যায্যতাসহ প্রবৃদ্ধি' অর্জনের কৌশলের মূল দর্শন হলো: তু সমাজব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অবশ্যম্ভাবীভাবে অন্যান্য ধরনের বৈষম্য বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করার জন্যে প্রধানত দায়ী, এবং সমাজ এবং অর্থনীতিতে বাজার ও ব্যক্তিখাতের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দাপট যতই বাড়তে থাকবে ততই আয়বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য, শিক্ষায় বৈষম্য, স্বাস্থ্যসেবার বৈষম্য এবং গণদ্রব্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতার বৈষম্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়াগুলোও শক্তিশালী হতে থাকবে। অতএব, বৈষম্য বৃদ্ধির শক্তিগুলোকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করার জন্যে রাষ্ট্রকে জনগণের স্বার্থের পাহারাদারের ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে হবে।

এই পরিবর্তিত উন্নয়ন ডিসকোর্সের ফলশ্রুতিতেই ২০১৫-৩০—এই পনের বছরের জন্যে ঘোষিত জাতিসংঘের ১৭টি 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে' (sustainable development goals—SDGs) এবং ১৬৮টি লক্ষ্যমাত্রা বা টার্গেটে উন্নয়নকে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর' চাইতে অনেক বিস্তৃত পরিসরে বিবেচনার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই সতেরটি লক্ষ্যেরদশম লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে 'reduce inequality within and among countries' (দেশের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশের বৈষম্য নিরসন কর)। এই লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনেকগুলো টার্গেট এবং প্রতিটি টার্গেটে এক বা একাধিক নির্দেশক (indicator)। ২০১৯ সালে এই লক্ষ্যটিকে আরও গভীর সমীক্ষার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করার অঙ্গীকারও লিপিবদ্ধ হয়েছে জাতিসংঘের ২০১৫ সালের এসডিজি ঘোষণায়। এর আগে সুইজারল্যান্ডের দ্যাভোসে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক প্রতিবেদন 'আউটলুক অন দ্য গ্লোবাল এজেন্ডা ২০১৫'-এ বিশ্বের ১ নম্বর অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য। বিলম্বে হলেও ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সম্পর্কে জাতিসংঘ এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এই উপলব্ধি খুবই গুরুত্ববহ। কারণ, বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র ছদ্মনামধারী পুঁজিবাদের যে চরম দক্ষিণপন্থী ভার্সনের ডামাডোলে বিশ্ব মেতে রয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলই হলো ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য। এর অন্যথা হওয়ার কোনো উপায় নেই। বাজার ব্যবস্থাকে অর্থনীতির তাবৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল সিগন্যালদাতার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তিখাত বা প্রাইভেট সেক্টরকে অর্থনীতির অনিয়ন্ত্রিত চালিকাশক্তির আসনে বসিয়ে দিলে এরকম ফলাফল আসতে বাধ্য, এটা উচ্চতর অর্থনীতির তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত তু ছাত্রছাত্রীরই উপলব্ধি করার কথা। শুধু পুঁজিবাদের জ্ঞানপাপী স্তাবকেরাই সেটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করবে। প্রাথমিকভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সামষ্টিক চাহিদা ব্যবস্থাপনায় সরকারি ভূমিকার অকার্যকারিতা ব্যাখ্যা করার জন্য এই 'নিউ লিবারেল স্কুলের' তাত্ত্বিক চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছিল সত্তর দশকে। 'রাষ্ট্র ব্যর্থতা' (স্টেট ফেইল্যুর) এবং 'শাসন ব্যর্থতা'কে (গভর্নেন্স ফেইল্যুর) বিশ্লেষণের মূল ফোকাসে নিয়ে এসে এই 'নিউ লিবারেল' তাত্ত্বিকরা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকোচনের মতাদর্শিক রাজনীতিকে উৎসাহিত করার অবস্থান গ্রহণ করে। ঐ সময়ে এই তত্ত্বগুলোকে অভিহিত করা হতো 'সাপ্লাই সাইড ইকোনমিকস'। ব্রিটেনে মার্গারেট থেচার ১৯৭৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে তাঁর দেশে একের পর এক বাজারমুখী সংস্কারগুলো প্রবর্তন করতে শুরু করেন।

একইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির যুগল সংকট (স্ট্যাগফ্লেশন) মোকাবিলায় সরকারি নীতির ব্যর্থতাকে টার্গেট করে নিউ লিবারেল অর্থনীতিবিদরা তাঁদের সমর্থিত রাজনীতির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়াতে সক্ষম হয়। ঐ প্রেক্ষাপটেই সারা বিশ্বে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৭৯ সালে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্থাপিত হয়েছিল, যাকে খ্যাতনামা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ উইলিয়ামসন ১৯৮৯ সালে 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' নামে অভিহিত করেছেন। ১৯৮০ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী রোনাল্ড রিগানের প্রচারণার মূল বক্তব্যই ছিল 'Get the government off the back of the people'। রিগান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক তাদের মূল মিশনে পরিণত করে। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার নামে রাষ্ট্রতন্ত্র (স্টেটিজম) প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রগুলো যখন বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বইয়ের দশকে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে একের পর এক বিলুপ্ত হয়ে গেল তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন বিশ্বে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল বলা চলে।

কিন্তু, জোসেফ স্টিগলিৎজ ও পল ক্রুগম্যানের নেতৃত্বে একদল অর্থনীতিবিদ ঐ আশির দশক থেকেই প্রমাণ করে চলেছেন যে "মুক্তবাজার অর্থনীতি' ছদ্মবেশধারী 'বাজার মৌলবাদী পুঁজিবাদ' একটি ভ্রান্ত দর্শন। 'বাজারব্যবস্থা ও ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান মিলবে, অতএব রাষ্ট্রের ভূমিকাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে ফেলো'—এমন ধারণাকে স্টিগলিৎজ নাম দিয়েছেন বাজার মৌলবাদীদের 'অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস' (irrational exuberance)। ২০১২ সালে প্রকাশিত বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফরাসী অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি'র বেস্ট সেলার *Capital in the Twenty First Century* বইয়েও যে হাইপোথেসিসটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা হলো, রাষ্ট্র যদি অত্যন্ত কঠোরভাবে আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টনকারীর ভূমিকা পালন না করে তাহলে উন্নত-অনুন্নতনির্বিশেষে বিশ্বের সকল দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য বাড়তে বাড়তে অতি দ্রুত বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে যাবেই। সাইমন কুজনেৎস যে এক পর্যায়ে উন্নত দেশগুলোতে বৈষম্য আর বাড়বে না বলে তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেটাকে পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে পিকেটি'র বইয়ে। তিনি মনে করেন, অত্যন্ত প্রগতিশীল আয়করব্যবস্থা, সম্পত্তি করব্যবস্থা এবং বিশ্বব্যাপী পুঁজির ওপর 'গ্লোবাল ট্যাক্স' বসানোর মাধ্যমে এই আসন্ন মহাবিপদকে ঠেকানোর প্রয়োজনকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। পিকেটি অবশ্য ইউরোপীয় কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোকে এ ব্যাপারে তাঁর আদর্শ মনে করেন। টমাস পিকেটি তাঁর বইয়ে কার্ল মার্ক্সকে কঠোর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও 'বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি কৌশল' অবলম্বনের জন্য তাঁর আকুতি ফুটে উঠেছে তাঁর বইয়ের উপসংহারে।

৫. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের নানাবিধ ডাইমেনশন

আয়বৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য বাড়তে থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজে ও অর্থনীতিতে আরও অনেকগুলো ডাইমেনশনে বৈষম্য, বঞ্চনা ও স্বাধীনতাহীনতা (unfreedom) চরমাকার ধারণ করে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 'সিস্টেম' প্রতিনিয়ত সমাজে বৈষম্য ও বঞ্চনা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করে চলেছে। এর মানে, আয় ও সম্পদবৈষম্যবৃদ্ধি সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পারলে দেশের জনগণের দারিদ্র্য নিরসন আরও বেগবান হতো, ভিয়েতনাম এবং গণচীন গত চার দশকে যেটা প্রমাণ করেছে। (অবশ্য, এসব দেশের জনগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাহীনতার

শিকার।) দারিদ্র্য বিষয়ে মাঠপর্যায়ের গবেষণা এবং তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে রচিত আমার বই *The Poverty Discourse and Participatory Action Research in Bangladesh* এ মোট ১২টি প্রধান ডাইমেনশনে বা প্রক্রিয়ায় এ দেশে বৈষম্য বৃদ্ধি, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য সৃষ্টি হচ্ছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ১২টি ডাইমেনশন হলো:

১. দারিদ্র্য সৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র কৃষিব্যবস্থা (agrarian system);
২. ক্রমবর্ধমান বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা;
৩. স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বাজারীকরণ;
৪. সরকারি রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আহরণ ও উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ;
৫. ব্যাংকিংব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের সঞ্চয়কে উচ্চবিত্ত জনগণের খেদমতে পাচার;
৬. বৈদেশিক ঋণ/অনুদান আত্মসাৎ এবং দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
৭. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অব্যাহত ব্যর্থতা;
৮. আমদানি উদারীকরণ ও চোরাচালান এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ওপর এগুলোর মিলিত প্রভাব;
৯. সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার রাজধানী-কেন্দ্রিকতা এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এর ফলে সৃষ্ট বঞ্চনা;
১০. স্থানীয় সরকারব্যবস্থার অকার্যকরকরণ ও বি-ক্ষমতায়ন (disempowerment);
১১. রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন; এবং
১২. রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা (governance failure) এবং সুশাসনের অভাব।

উপরে উল্লিখিত ১২টি ডাইমেনশনের প্রধান কয়েকটি বৈষম্য বৃদ্ধিকারী ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করছি:

৫.১ কৃষিব্যবস্থায় বৈষম্যবৃদ্ধি, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য সৃষ্টি

দেশের কৃষিব্যবস্থায় নিচে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে বৈষম্য, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য সৃষ্টি হচ্ছে:

ক) জমির মালিকানাব্যবস্থায় মাঝারী ও ক্ষুদ্র কৃষক-ভূমি মালিকদের প্রাধান্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে, এবং জমির মালিকানা অনুপস্থিত ভূস্বামীদের কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে যাচ্ছে।

খ) কৃষিতে ভূমিহীনতা সমস্যা বাড়তে বাড়তে এখন গ্রামীণ পরিবারগুলোর ৮২ শতাংশই ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে।

গ) কৃষিকাজে মালিক-কৃষকের তুলনায় বর্গাদার কৃষকের অনুপাত ক্রমবর্ধমান। এখন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ভূমিমালিক-কৃষকেরা অপরের জমি বর্গা বা ইজারা নিয়ে কৃষিকাজে নিয়োজিত থেকে পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজন মেটানোর সংগ্রামে নিয়োজিত।

ঘ) কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের অব্যাহত দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষক ফসলের ন্যায্যদাম থেকে আজও চরমভাবে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন।

ঙ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারগুলো ঋণের ফাঁদে দিন-দিন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্রঋণের প্রসারের কারণে মহাজনী ঋণের দৌরাত্ম্য খানিকটা কমলেও একাধিক এনজিও

থেকে বারবার ঋণ নিয়ে ব্যয়বহুল ভোগে অপব্যয় করে ঋণের ফাঁদে আটকা পড়ছেন কৃষক। ব্যাংকিংব্যবস্থা আজও কৃষকের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে।

চ) বন্যা, সাইক্লোন, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মহীনতা ও বেকারত্বের শিকার হয়ে কৃষিখাতে এখনো প্রান্তিকীকরণ ও নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, যা গ্রাম থেকে নগরমুখী অভিগমনকে বেগবান করে চলেছে।

ছ) কৃষকের সন্তান মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে আজও বঞ্চিত। যুগোপযোগিতাহীন মাদ্রাসাগুলোই কৃষক সন্তানের শিক্ষার অন্যতম প্রধান জোগানদার রয়ে গেছে আজও। সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক লেভেলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ছে প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষকের ছেলেমেয়ে।

জ) কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে ছদ্মবেকারত্ব ও মৌসুমী বেকারত্ব এখনো গেঁড়ে বসে রয়েছে কৃষিখাতে। বৈদেশিক অভিবাসন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় অধিকাংশ কৃষক পরিবারের সন্তানেরা এখনো জমি বিক্রয় ছাড়া বিদেশে যেতে পারে না।

৫.২ বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

আশির দশক থেকে 'মুক্তবাজার অর্থনীতির' ডামাডোলে শরিক হয়ে গত ৩৯ বছরে আমরা শিক্ষার বাজারীকরণ ও পণ্যকরণের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আর এ জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা মহাসুখে বাজারের হাতে সোপর্দ করে চলেছি। এর পরিণামে শিক্ষা আজ এ দেশে বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে, যেখানে ধনাঢ্য মা-বাবার সন্তানদের জন্য প্রাথমিক লেভেল থেকে উচ্চতম শিক্ষার পর্যায়ে মহার্ঘ্য পণ্য হিসেবে উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষা বিক্রয়ের হাজার হাজার মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি নাটকীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে, নিম্নবিত্ত মা-বাবার সন্তানদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে। উন্নত পুঁজিবাদী কোনো দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বাজারব্যবস্থাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, অথচ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া—কোনো দেশেই প্রাথমিক শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বাজারকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। একক মানসম্পন্ন একক পাঠ্যসূচির বাইরে যার যা ইচ্ছা পড়াতেও দেওয়া হয় না। দেশের সংবিধানের ১৭ (ক) ধারায় রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছে অঙ্গীকার করছে যে 'রাষ্ট্র সকল শিশুর জন্য একটি একক মানসম্পন্ন, গণমুখী, সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত চালু করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে'। এই সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালেই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করার পাশাপাশি দেশের সকল প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণ করেছিল। ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনের যে প্রতিবেদনটি সরকার গ্রহণ করেছিল তাতে ঐ বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও একক মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব ছিল। জাতির দুর্ভাগ্য, কুদরত-ই খুদা কমিশনের রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করেছে মর্মে সরকারি গেজেট প্রকাশিত হওয়ার আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছিলেন। ঐ রিপোর্টের সুপারিশগুলো ১৯৭৫-১৯৯৬ এর ২১ বছরে কোনো সরকারেরই সুবিবেচনা পায়নি, যদিও জিয়াউর রহমান, এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়ার সরকার নিজেদের পছন্দমাফিক একাধিক শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠন করেছে এবং শিক্ষা নিয়ে এন্তার 'তুঘলকি এক্সপেরিমেন্ট'

চালিয়েছে। এমনকি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের সরকার কর্তৃক গঠিত 'শামসুল হক কমিটির' রিপোর্টেও এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার কর্তৃক প্রফেসর কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারটিকে বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং বর্তমানে তা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কিন্তু, বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের বিষয়ে বর্তমান সরকারকে বেশ খানিকটা দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে।

শিক্ষাজীবনের শুরুতেই শিশুকে ১১ ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার জালে আটকে ফেলার এহেন নৈরাজ্যকর বন্দোবস্তের নজির বিশ্বের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিতামাতার বিত্তের নিক্তিতে ওজন করে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে কে কিন্ডারগার্টেনে যাবে, কে সরকারি বা বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে সুযোগ পাবে, কার এনজিও স্কুলে ঠাঁই হবে, আর কাকে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় পাঠিয়ে বাবা-মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন যে 'লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে' ভাতটা তো অন্তত জুটল! এভাবে সারাজীবনের জন্যে ঐ শিশুকে বৈষম্যের অসহায় শিকারে পরিণত করে ফেললাম আমরা, যা তার মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বড় হয়ে সে বাবা-মাকে অভিশাপ দেবে কিংবা পরিবারের দারিদ্র্যকে দোষ দেবে তাকে ভুল স্কুলে বা মাদ্রাসায় পাঠানোর জন্যে, কিন্তু তখন আর ভুল সংশোধনের কোনো উপায় থাকবে না। এর অপর পিঠে দেশে ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যাবৃদ্ধিকেও নাটকীয় বলা চলে। মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্য এখন আর বাংলা মাধ্যম প্রাইমারি স্কুলগুলোকে উপযুক্ত মানসম্পন্ন মনে করছেন না, কিন্ডারগার্টেনে পড়ানোটাই নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে গত চার দশকে। মাধ্যমিক শিক্ষায়ও চারটি ধারার সমান্তরাল অবস্থান এখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে—ইংরেজি মাধ্যমের নানান কিসিমের মহার্ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মূলধারার বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুল, বাংলা মাধ্যম বেসরকারি স্কুল এবং কয়েক ধরনের মাদ্রাসা। এই বিভাজিত ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা এক দেশের মধ্যে চার চারটি পৃথক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে চলেছি।

৫.৩ স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাজারীকরণ

আশির দশক থেকে বাংলাদেশে চিকিৎসাব্যবস্থার বাজারীকরণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ফলে, দেশের নগর-গ্রামনির্বিশেষে আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের দ্রুত বিকাশ পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে মুনাফাবাজির অসহায় শিকারে পরিণত করেছে। এহেন বাজারীকরণ স্বাস্থ্যখাতকে মহার্ঘ্য পণ্যের বাজার ও অমানবিক বৈষম্যের লীলাক্ষেত্র করে ফেলেছে, যেটাকে আমি দারিদ্র্য সৃষ্টির কারখানা অভিহিত করে চলেছি। কারণ, ব্যক্তিখাতের মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগণের সাধ্যের বাইরে হলেও সহায়-সম্পত্তি বিক্রয় করে তারা ঐ মহার্ঘ্য সেবা পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হওয়াই স্বাভাবিক। আবার, ব্যক্তিখাতের স্বাস্থ্যসেবার এহেন দৌরাত্ম্যের কারণে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ পঙ্গু হয়ে 'মরণের কারখানায়' পরিণত হচ্ছে।

৫.৪ ব্যাংকিংব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের সঞ্চয়কে উচ্চবিত্ত জনগণের খেদমতে পাচার

দেশের ব্যাংকিংব্যবস্থায় কয়েক হাজার ধনাঢ্য রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের কারণে ব্যাংকিং এখন পুঁজি লুণ্ঠনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আরও ন্যক্কারজনক হলো, ব্যাংকের ঋণ ফেরত না দেওয়ার কালচার এখন দুরারোগ্য ক্যানসারে পরিণত হয়েছে রাঘববোয়াল

ঋণখেলাপিদের সাথে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর যোগসাজশের কারণে। ব্যাংকিং এখন দেশ থেকে পুঁজি পাচারেরও সারবান ক্ষেত্র।

৫.৫ ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি আয় ও সম্পদ বৈষম্য বাড়াচ্ছে। দুর্নীতি এখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

৫.৬ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার রাজধানী-কেন্দ্রিকতা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও বঞ্চনা সৃষ্টি করছে। স্বাধীনতার পর গত ৪৮ বছরে রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা বিস্ফোরণমূলক প্রবৃদ্ধির শিকার হওয়ায় ঢাকা এখন প্রায় দু'কোটি জনসংখ্যার মেগাপলিসে পরিণত হয়েছে, যার ৪০ শতাংশ অধিবাসী বস্তীবাসী। ফলে, ঢাকাকে এখন বিশ্বের 'দ্বিতীয় বসবাস-অযোগ্য' নগরী (second most unlivable city) আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

৫.৭ সরকারি রাজস্বব্যবস্থা ও ব্যয়ব্যবস্থা দেশে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে। রাজস্বব্যবস্থা এখনো পরোক্ষ করসমূহের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল। ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোকে আয়কর ও সম্পত্তি করের আওতায় আনতে সরকার এখনো অনেকখানি ব্যর্থ রয়ে গেছে। সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ এখনো সিভিল প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতের মতো অনুৎপাদনশীল খাতসমূহের খাই মেটাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে।

৫.৮ স্থানীয় সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক দুর্বলতা, বি-ক্ষমতায়ন (de-empowerment) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের থোক অর্থ-বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীলতা গ্রামীণ জনগণকে উন্নয়নের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে চলেছে।

৫.৯ রাজনীতির বৈশ্যকরণ (commercialization) ও দুর্বৃত্তায়ন (criminalization), চাঁদাবাজি, মাস্তানতন্ত্র ও দখলবাজির অসহায় শিকার সাধারণ জনগণ চরম স্বাধীনতাহীনতার কবলে বন্দী। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সংসদের ৬১.৭ শতাংশ সদস্য ব্যবসায়ী। অতএব বলা চলে, বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতি এখন লোভনীয় ব্যবসায়ে পর্যবসিত হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সমস্যার সমাধান কোন্ পথে?

ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সমস্যা মোকাবিলা করা দুরূহ, কিন্তু অসম্ভব নয়। রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের সদিচ্ছা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টন খুবই কঠিন রাজনৈতিক নীতি-পরিবর্তন ছাড়া অর্জন করা যায় না। সমাজের শক্তিধর ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর কায়েমী স্বার্থ আয় পুনবণ্টন নীতিমালাকে ভণ্ডুল করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেই। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, গণচীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, ইসরায়েল এবং শ্রীলংকায় রাষ্ট্র নানারকম কার্যকর আয় পুনবণ্টন কার্যক্রম গ্রহণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জিনি সহগ বৃদ্ধিকে শ্লথ করতে বা থামিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বিশ্বে জিনি সহগ কমানোর ব্যাপারে কিউবা ছাড়া অন্য কোনো উন্নয়নশীল দেশকে তেমন একটা সাফল্য অর্জন করতে দেখা যাচ্ছে না। এই দেশগুলোর মধ্যে কিউবা, গণচীন ও ভিয়েতনাম এখনো নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবি করে, বাকি দেশগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসারী হয়েও শক্তিশালী বৈষম্য-নিরসন নীতিমালা গ্রহণ করে চলেছে। উপরের বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে সফল ভূমি সংস্কার এবং/অথবা কৃষি সংস্কার নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়েছে। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানির মতো ইউরোপের কল্যাণ-রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রীয় নীতি অনেক বেশি

আয়-পুনর্বণ্টনমূলক, যেখানে অত্যন্ত প্রগতিশীল আয়কর এবং সম্পত্তি করের মতো প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে জিডিপির ৩০-৩৫ শতাংশ সরকারি রাজস্ব হিসেবে সংগ্রহ করে ঐ রাজস্ব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা (প্রধানত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর পেনশন, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসন), পরিবেশ উন্নয়ন, নিম্নবিত্ত পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা, গণপরিবহন, বেকার ভাতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়। এই রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা বাহিনী, সিভিল আমলাতন্ত্র ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর জন্যে সরকারি ব্যয় জিডিপির শতাংশ হিসেবে খুবই অনুল্লেখ্য। এই কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোতে এবং বৈষম্য-সচেতন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে কয়েকটি বিষয়ে মিল দেখা যাচ্ছে সেগুলো হলো:

১. রাষ্ট্রগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল লেভেলের শিক্ষায় একক মানসম্পন্ন, সর্বজনীন, আধুনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে।

২. রাষ্ট্রগুলোতে অত্যন্ত সফলভাবে জনগণের সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালু রয়েছে।

৩. রাষ্ট্রগুলোতে প্রবীণদের পেনশনব্যবস্থা চালু রয়েছে।

৪. রাষ্ট্রগুলোতে সর্বজনীন বেকার ভাতা চালু রয়েছে।

৫. এসব দেশে নিম্নবিত্ত জনগণের জন্যে ভর্তুকি মূল্যে রেশন বা বিনামূল্যে খাদ্যনিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে।

৬. প্রবীণ জনগণের আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্যনিরাপত্তার জন্যে অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা উন্নত-উন্নয়নশীল নির্বিশেষে এসব দেশে চালু রয়েছে।

৭. এসব দেশে গণপরিবহন সুলভ ও ব্যয়সাশ্রয়ী, এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়।

৮. এসব দেশে রাষ্ট্র 'জিরো টলারেন্স অগ্রাধিকার' দিয়ে দুর্নীতি দমনে কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা চালু করেছে।

৯. এসব দেশ 'মেগাসিটি' উন্নয়নকে সফলভাবে নিরুৎসাহিত করে চলেছে এবং গ্রাম-শহরের বৈষম্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে খুবই মনোযোগী।

১০ দেশগুলোতে 'ন্যূনতম মজুরির হার' নির্ধারণ করে কঠোরভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

১১. নিম্নবিত্তদের আবাসনকে সব দেশেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

১২. এসব দেশে কৃষকেরা যাতে তাঁদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য দাম পান তার জন্যে কার্যকর সরকারি নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৩. ব্যক্তিখাতের বিক্রেতারা যেন জনগণকে মুনাফাবাজির শিকার করতে না পারে সে জন্যে এসব দেশে রাষ্ট্র কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

'কেরালা মডেল' থেকে বাংলাদেশের শিক্ষণীয়

দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট রাজ্য কেরালা বিশ্বকে 'উন্নয়নের কেরালা মডেল' উপহার দিয়েছে। উইকিপিডিয়ার তথ্য মোতাবেক ২০১৮ সালে কেরালার জনগণের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২৪০০ ডলার, যা ভারতের জনগণের গড় মাথাপিছু জিডিপি ১৯৮৩ ডলারের চাইতে সামান্য বেশি। ক্রয়ক্ষমতার সাম্য বা পিপিপি ভিত্তিতে কেরালার মাথাপিছু জিডিপি ২০১৮ সালে ৯২০০ পিপিপি ডলার। কিন্তু, মানব উন্নয়ন সূচকের

স্কোরে কেরালা ভারতের সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে ১৯৯০ সাল থেকেই। সর্বশেষ ২০১৮ সালের কেরালার এইচডিআই সূচক ০.৭৮৪ ভারতের এইচডিআই সূচক ০.৬৪ এর তুলনায় এত বেশি যে সেটাকে বরং বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ের বলে বিবেচনা করা হয়। শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, জন্মহার, মৃত্যুহার, মোট প্রজনন হার (total fertility rate), জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার, সর্বপর্যায়ের শিক্ষিতের হার, মৌল স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা, ভর্তুকি দামে খাদ্য-রেশন ও ফিডিংব্যবস্থা, চিকিৎসক-জনসংখ্যা অনুপাত—এধরনের তাবৎ সামাজিক সূচকেও কেরালা অনেক উন্নত দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। কেরালার জনগণ প্রায় শতভাগ শিক্ষিত এবং প্রায় শতভাগ মৌল স্বাস্থ্যসুবিধা ও চিকিৎসা সুবিধার আওতায় চলে এসেছে। কেরালার নিম্ন-আয়ের মানুষ বিপুল ভর্তুকি-দামে রেশনের চাল কিনছেন। কেরালার সকল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিং-এর আওতায় চলে এসেছে। কেরালার সকল প্রবীণ কৃষক মাসিক পেনশন পান। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকেও কেরালাই ভারতের পথিকৃৎ। জনগণের মাথাপিছু জিডিপি কম হলেই যে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্যপীড়িত হবে—বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রতীচ্যের উন্নয়ন-তাত্ত্বিকদের এই মাথাপিছু আয়কেন্দ্রিক ধারণাকে যে দুটো উন্নয়ন-মডেল সবার আগে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছিল তার একটি হলো সমাজতান্ত্রিক কিউবা, অপরটি কেরালা। মাথাপিছু জিডিপি বিভিন্ন দেশের মানবকল্যাণ তুলনার জন্যে উপযুক্ত নয়—এই ধারণার ক্ল্যাসিক উদাহরণ কেরালা। মাথাপিছু জিডিপি বেশি না হলেও যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মতো একটি নিম্ন আয়ের দেশেও ঈর্ষণীয় জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়—কেরালার জনগণ তৃতীয় বিশ্বে তার সফলতম নজির সৃষ্টি করেছে। ন্যায়বিচার সমুন্নতকারী প্রবৃদ্ধি (equitable growth) মডেলের এক অনন্য নজির কেরালা। আয় ও সম্পদবৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জনগণের মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে দ্রুত বাড়িয়ে চলেছে রাজ্যটি। কেরালায় পরমতসহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)। নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে এই দুটো জোট পালাক্রমে ক্ষমতায় এলেও কোনো সরকারই পূর্ববর্তী সরকারের গণমুখী পরিবর্তনগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে না, নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

১৯৫৬ সালে যখন ত্রাবাঙ্কোর, কোচিন ও মালাবার অঞ্চল নিয়ে কেরালা রাজ্য গঠিত হয় তখন এর পরিচিতি ছিল ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ ভূস্বামী-অধ্যুষিত রাজ্য হিসেবে। ষাট ও সত্তরের দশকে কেরালার আরেকটি বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ছিল বিএ-এমএ পাস রিকশাওয়ালা—বেকার সমস্যা ছিল এতই প্রকট। ১৯৫৭ সালে কেরালায় অত্যন্ত প্রগতিশীল কৃষি সংস্কারকে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান অগ্রাধিকার ঘোষণা করে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নির্বাচনে জিতে ক্ষমতাসীন হয়। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে অবাধ নির্বাচনে জিতে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সর্বপ্রথম কেরালায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষমতায় এসে ১৯৫৯ সালেই কেরালার কম্যুনিস্ট-নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতে প্রথম ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারি করে, যেটাকে তখনকার ভারতের কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভণ্ডুল করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। জওহরলাল নেহরুর সরকার কেরালার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করে, কিন্তু বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট আবার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসে। ১৯৬৯ সালে আরেকটি কম্যুনিস্ট-নেতৃত্বাধীন সরকার 'লাঙল যার জমি তার' নীতির ভিত্তিতে ভূমি মালিকানার ব্যাপক পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যাভিমুখী কৃষি সংস্কার আইন পার করে, যার প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছিল: ১) কোনো পরিবারকে আট হেক্টরের বেশি জমির মালিকানা রাখতে না দেওয়া, ২) ভাগচাষি (tenant farmer) ও বর্গাদার কৃষকদেরকে তাদের চাষকৃত জমির কার্যকর মালিকে (virtual owners) পরিণত করা, ৩)

মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে উৎখাত, ৪) কৃষিজোতের একত্রীকরণ, এবং ৫) তৃণমূল জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের কৃষি সংস্কারের কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ (mass mobilization)। কেরালার ভূমির মালিকানা পুনর্বণ্টন কর্মসূচি থেকে ১৫ লক্ষ কৃষক পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে, যেটা পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত ভূমি সংস্কার আইনমালা 'অপারেশন বর্গা' এর তুলনায় অনেক কমসংখ্যক। কিন্তু, কেরালার কৃষি সংস্কারমালা খেতমজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে এবং গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের সংগঠন জোরদারকরণে অনেক বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পেরেছে, যার ফলে তৃণমূল গণতন্ত্র ও 'কল্যাণ অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠায় কেরালা মডেল অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। নিচের পরিবর্তনগুলো কেরালা মডেলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে প্রশংসনীয়: ১) কার্যকর ও কম দুর্নীতিপূর্ণ রেশনব্যবস্থা ও ফিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভর্তুকি-দামে নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলোর মধ্যে চাল-বিতরণ. ২) খেতমজুরদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাবিধান এবং নিম্নতম মজুরি আইন বাস্তবায়ন, ৩) অবসরপ্রাপ্ত ও বর্ষীয়ান কৃষিশ্রমিকদের জন্যে পেনশন চালু, ৪) দলিত শ্রেণির জনগোষ্ঠীসমূহের জন্যে বর্ধিত সরকারি চাকরি, ৫) বর্গাদারদের ভূমিস্বত্বের নিরাপত্তা (security of tenure) জোরদারকরণ এবং জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের আশঙ্কা নিরসন, ৬) গ্রামীণ ভিটেমাটিতে বসবাসরতদের দখলিস্বত্ব প্রদান, ৭) ভূমিহীন পরিবারগুলোকে বসতবাটি নির্মাণের জন্যে প্লট প্রদান, ৮) কৃষিশ্রমিকদের দৈনিক সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা নির্ধারণ এবং তাদের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম চালু, ৯) গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসুবিধা বৃদ্ধির জন্যে সরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতাল নেটওয়ার্কের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং ১০) অনুপস্থিত ভূমি মালিকানা উৎসাদন। যেহেতু কেরালার জনগণ প্রায় শতভাগ শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রবল সচেতন তাই তারা সংগঠিত হয়ে রাজনীতিবিদ ও আমলাদেরকে সার্বক্ষণিক সজাগ ভূমিকা পালনে বাধ্য করে চলেছে। নির্বাচনে মাঝে মাঝে বামপন্থীরা হেরে গেলেও জনগণের জোরদার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ও সার্বক্ষণিক মনিটরিং কয়েকবার নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকারগুলোকেও সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে বাধ্য করেছে। আরও চমকপ্রদ হলো, মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ মানবপুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রে কেরালা ভারতে চ্যাম্পিয়ন। কেরালার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বিশ্বখ্যাত এনজিও অক্সফাম কর্তৃক বৈষম্য কমানোর প্রতিশ্রুতি সূচকের (commitment to reducing inequality index) বিবেচনায় ১৫৭টি দেশের যে র‍্যাংকিং প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৮, যেটা দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে সপ্তম (মানে খুবই হতাশাজনক)। সামাজিক খাতসমূহে ব্যয়, করারোপ এবং শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় সরকারের প্রয়াস— এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে সূচকটি তৈরি করা হয়েছে। একমাত্র ভুটান বাংলাদেশের চাইতে এই সূচকে খারাপ অবস্থানে রয়েছে ১৫২ নম্বরে। ঐ র‍্যাংকিং-এ দক্ষিণ এশিয়ার বাকি ছয়টি দেশের অবস্থান: মালদ্বীপ-৬৮তম, শ্রীলংকা-১০২তম, আফগানিস্তান-১২৭তম, পাকিস্তান-১৩৭তম, নেপাল-১৩৯তম এবং ভারত-১৪৭তম। এর মানে, বৈষম্য নিরসনের ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তেমন মনোযোগী নয়, এবং সূচকের তিনটি বিষয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির অভাব প্রকটভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈষম্যের ব্যাপারে এহেন অবজ্ঞার মানসিকতাকে আমি 'সংকটজনক' অভিহিত করতে চাই। 'ধনকুবেরের সংখ্যাবৃদ্ধির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ' এই সংকটেরই ঢক্কা-নিনাদ বাজিয়ে গেল। 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের' মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার এই কলঙ্কতিলক এখন বাংলাদেশের কপালে শোভা পাচ্ছে বৈষম্য নিরসনের প্রতি রাষ্ট্রের এই নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। কেরালা মডেল ২০১৭ সালে প্রকাশিত আমার বই "*বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্র ও অনুন্নয়ন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দৃষ্টিকোণ*

থেকে" এর উপসংহারে আমি বলেছি, 'বাংলাদেশে 'রাজনীতিক-সামরিকএস্টাবলিশমেন্ট-সিভিল আমলাতন্ত্র-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি—এই চার গোষ্ঠীর 'গ্র্যান্ড এলায়েন্স' রাষ্ট্রক্ষমতাকে একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা পুঁজি আহরণের লোভনীয় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই, ভোটের রাজনীতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে 'ঘুষ ও ঘুষির' রাজত্বে পর্যবসিত হয়েছে। আজকের বাংলাদেশে গণতন্ত্র যে সন্ত্রাসী-মাস্তান-কালো টাকার কাছে জিম্মি হয়ে গেছে তার পেছনে রাজনীতির বৈশ্যকরণ (commercialization) ও দুর্বৃত্তায়ন (criminalization) প্রক্রিয়া প্রধান ভূমিকা পালন করছে, এবং রাষ্ট্রচরিত্রই নিঃসন্দেহে তার জন্যে সঞ্চটক উপাদান। গ্রন্থের মূল অনুসিদ্ধান্ত হলো, রাষ্ট্রচরিত্রই বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ, এ দেশের রাষ্ট্র উৎপাদনশীল জনগণের স্বার্থের পাহারাদার না হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী অধিপতি গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত উপরে উল্লিখিত 'গ্র্যান্ড এলায়েন্সের' অনর্জিত দুর্নীতিজাত খাজনা এবং মুনাফা আহরণের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার পরিণামে আন্দ্রে গুন্দার ফ্রাঙ্ক কথিত 'উদ্বৃত্ত আহরণ ও উদ্বৃত্ত আত্মসাতের' (surplus expropriation and surplus appropriation) প্রধান ধারাটির পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এসেমগলু ও রবিনসন এ ধরনের রাষ্ট্রকেই 'পুঁজি লুণ্ঠনমূলক রাষ্ট্র' (extractive state) বলে অভিহিত করেছেন। অথচ, নিউলিবারেল বাজার মৌলবাদী কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচির (structural adjustment program) প্রেসক্রিপশান অনুসারে ১৯৭৫ সাল থেকে, এবং বিশেষত আশির দশক থেকে, উৎপাদন ও বণ্টন থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুটিয়ে নিয়ে 'মুক্তবাজার অর্থনীতিকে বিকল্প হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চাওয়ায় অর্থনীতিতে গত চার দশকে অনেকগুলো ক্ষতিকর অভিঘাত সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, দেশে দুর্নীতি এবং পুঁজি লুণ্ঠন বেলাগামভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে, বৈধ অর্থনীতির সমান্তরালে একটি কালো অর্থনীতি বিস্তার লাভ করছে। এহেন কালো অর্থনীতি ইতিমধ্যেই বৈধ অর্থনীতির ৭০-৭৫ শতাংশের মতো আকার ধারণ করেছে বলে কেউ কেউ দাবি করছেন, তবে এ ধরনের দাবির সমর্থনে বিশ্বাসযোগ্য গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা দুরূহ। খ্যাতনামা ব্রিটিশ পত্রিকা *দ্য ইকোনমিস্ট* বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থাকে 'চৌর্যতন্ত্র' (kleptocracy) নামে অভিহিত করেছে। আমি এই শাসনকে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম (crony capitalism) বা স্বজনতোষী পুঁজিবাদ'-এর ক্লাসিক নজির হিসেবে অভিহিত করে চলেছি। জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলের তিন সরকার-প্রধান এরশাদ, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমকে লালন করে চলেছেন, যার ফলে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, ক্ষমতাসীন দল বা জোটের নেতা-কর্মী এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, সামরিক অফিসার এবং আমলারা পুঁজি লুণ্ঠনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ধন-সম্পদ আহরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে এ দেশে সৎভাবে ধন-সম্পদের মালিক হওয়া প্রায় অসম্ভব বিবেচিত হয়ে থাকে। ব্যাংক-ঋণ লোপাট, সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারি, বৈদেশিক ঋণের অর্থে বাস্তবায়িত উন্নয়ন-প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতা, শেয়ার বাজার ম্যানিপুলেশান, ব্যাংকের মালিকানা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের মালিকানা, টিভি নেটওয়ার্কের মালিকানা, চোরাচালান, মুনাফাবাজি ও কালোবাজারি, আমদানি বাণিজ্য, রিয়াল এস্টেট, চাঁদাবাজি ও মাস্তানি—এগুলোই এ দেশে দ্রুত ধন-সম্পদ আহরণের লোভনীয় ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সাফল্যের অপরিহার্য উপাদান। রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এ দেশে ক্রমেই 'সিস্টেমে' পরিণত হয়ে যাচ্ছে। ঘুষ ছাড়া কোনো সরকারি সেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। পূর্বে কাস্টমস, আয়কর, ভ্যাট, পুলিশ বিভাগ, বিজিবি (বিডিআর), ভূমি সংক্রান্ত বিভাগসমূহ, পূর্ত বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বিআরটিএ—

ওগুলোকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এখন এমন একটি সরকারি বিভাগ বা এজেন্সির নাম করা যাবে না যেখানে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেনি। যেটা আরও দুঃখজনক তাহলো, গত ২৮ বছর ধরে ভোটের রাজনীতি চালু থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ দোর্দণ্ড প্রতাপে এগিয়ে চলেছে। এ ব্যাপারে জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনো ফারাক করা যাচ্ছে না। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারেও তাই এই তিনটি দলের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যা জনগণের হয়রানি, বঞ্চনা, হতাশা ও ক্ষোভকে দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্ষমতাসীন সরকারের সদিচ্ছার অভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) 'নখ-দন্তহীন ব্যাঘ্রে' পরিণত হয়েছে বলে খোদ দুদকের দু'জন সাবেক চেয়ারম্যানই অভিযোগ তুলেছেন। এ দেশে সততা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা ও দেশপ্রেম যেন বোকামি!

উপরে উল্লেখিত 'ক্লেপ্টোক্রেসি' এবং 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' এ দেশে আয়বৈষম্য এবং অন্যান্য ধরনের বৈষম্যকে ক্রমেই পর্বতপ্রমাণ করে তুলছে। বৈষম্য নিরসনের জন্যে প্রথম করণীয় হলো, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে হবে। অবাধ, সুষ্ঠু ও জালিয়াতিমুক্ত নির্বাচনে জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা যাতে কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল নির্বাচনে নির্বাচিত হতে পারেন সে ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই হবে। জনগণের কাছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সার্বক্ষণিক জবাবদিহি যাতে নিশ্চিত করা যায় তার ব্যবস্থাকেও প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হবে। বর্তমানে সংবিধানের কয়েকটি ক্রটির কারণে গণতন্ত্রের নামে যে 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব' কায়েম হয়ে গেছে তা সংশোধনের জন্যে সংবিধান সংশোধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সংবিধানের ৭০ ধারার আওতা সংকুচিত করে শুধু সরকারের বিরুদ্ধে 'নো কনফিডেন্স মোশনের' ক্ষেত্রে সরকারি দল বা জোটের সাংসদদের সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অধিকার খর্ব করে অন্য যে কোন+- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীন ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। সরকারের তিনটি অঙ্গ সংসদ, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে অন্য দুটো বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই, এক্ষেত্রেও সংবিধান সংশোধন ছাড়া গত্যন্তর নেই। সংসদের কাছে মন্ত্রিসভার যৌথ জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে, এক্ষেত্রেও শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে মন্ত্রীদের জবাবদিহি গণতন্ত্রের জন্যে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। রুলস অব বিজনেসেও প্রধানমন্ত্রীকে যে ঢালাও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে একক ক্ষমতাশালী করার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে যেভাবে ক্ষমতাহীন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করে ফেলা হয়েছে সেটাও খুব লজ্জাজনক। সরকারের এহেন ভারসাম্যহীনতা সংশোধন না করা হলে 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব' থেকে জাতির পরিত্রাণ মিলবে না।

আয়বৈষম্যের লাগাম টেনে ধরতে চাইলে 'বাজার ব্যর্থতা' কেন হয় তা ভালোভাবে বুঝে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে যৌক্তিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। বাজার ব্যর্থ হয় গরীবের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে, ব্যর্থ হয় পরিবেশ দূষণের মতো নেতিবাচক বাহ্যিকতাগুলো ঠেকাতে, ব্যর্থ হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলায়, ব্যর্থ হয় নানারকম মনোপলি ও অলিগোপলির কারণে, ব্যর্থ হয় গণদ্রব্য বা 'পাবলিক গুড' জোগান দিতে। মূল কথা হলো, রাষ্ট্রকে বৈষম্য নিরসনকারীর ভূমিকা নিতেই হবে, যেরকম করা হয়েছে ভিয়েতনামে, গণচীনে কিংবা ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোতে। সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে প্রধানত সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের আয়কর ও সম্পত্তি কর থেকে। সরকারি ব্যয়ের প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে বৈষম্যহীন ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষায়, গরীবের জন্য ভালো মানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলায়, মানসম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে,

গরীবের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে। যেখানে সুযোগ থাকে সেখানেই কৃষক সমবায় সমিতি গড়ে তুলে কৃষককে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যদাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শ্রমজীবী জনগণকে ন্যায্য মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে রাষ্ট্র কঠোর অভিভাবকের ভূমিকা নেবে। যেখানে সম্ভব সেখানে গণচীন ও ভিয়েতনামের মতো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা শ্রমিক সমবায় সমিতিগুলোর হাতে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। গণচীনের Township and Village Enterprise (TVE) মডেল এক্ষেত্রে অনুকরণীয় হতে পারে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, ইত্যাদি পাবলিক ইউটিলিটিজ সরবরাহ ক্রমশ ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দিয়ে সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে জনগণকে মুনাফাবাজির শিকার করতে না পারে সেজন্যে সরকারকে কঠোর দাম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যান্য ব্যক্তিখাতের বিক্রেতারাও যাতে জনগণকে মুনাফাবাজির শিকার করতে না পারে সে জন্য রাষ্ট্রকে কঠোর 'প্রতিযোগিতা আইনের' সহায়তায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে। নিউ লিবারেলিজমের মৌতাতে মশগুল হয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা যেনতেনভাবে সংকোচন মোটেও যৌক্তক হতে পারেনা।

আমি বিশ্বাস করি, ২০১১ সালে সংবিধানে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে পুনর্বহাল হলেও একুশ শতকের বাস্তবতায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে 'রাষ্ট্রতন্ত্র' (স্টেটিজম) এবং একদলীয় পুলিশি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে মডেলগুলো বিংশ শতাব্দীর আশির ও নব্বইয়ের দশকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে সেগুলোকে আর ফেরত আনা যাবে না। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের ঘটনাগুলো থেকে যে বিষয়টা সামনে চলে এসেছে তাহলো, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি খাত ও বাজারকে প্রতিপক্ষ অবস্থানে ঠেলে দেওয়া যৌক্তিক নয়। বাজার এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা হওয়া উচিত পরিপূরকের। কিছু কাজ বাজার ও ব্যক্তিখাত ভালো করবে, আর কিছু কাজ রাষ্ট্র ভালো করবে। কতগুলো বিষয়ে বাজার ব্যর্থ হবে, আবার ব্যক্তিখাতের অক্ষমতা ও বাজার ব্যর্থতা (মার্কেট ফেইল্যুর) থেকে মুক্তির আশায় রাষ্ট্রের হাতে ঐ বিষয়গুলো অর্পণ করা হলে রাষ্ট্রব্যর্থতা (স্টেট ফেইল্যুর) ও দুর্নীতি এড়ানো কঠিন হবে। রাষ্ট্র ও বাজারের পরিপূরক ভূমিকাকে মেনে নিয়ে এই দুটো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণের সঠিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। বাজার ও রাষ্ট্রের যৌক্তিক ভূমিকা নির্ধারণের যে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট গণচীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইসরায়েল, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বলিভিয়া, এল সালভাদর, ইকুয়েডর ও কিউবায় প্রযুক্ত হয়ে চলেছে তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। এই দেশগুলোতে রাষ্ট্রকে আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টনের এজেন্সি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার, ব্যক্তিখাত ও বাজারব্যবস্থাকেও অযৌক্তিকভাবে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে না। মানে, জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও দারিদ্র্য-নিরোধক কার্যক্রম, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ—এ ধরনের গণমুখী খাতে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে, প্রগতিশীল আয়কর ও সম্পত্তি করের মাধ্যমে সরকারি রাজস্বের সিংহভাগ আহরণ করে ঐ পুনর্বণ্টনমূলক সরকারি ব্যয়ের অর্থায়ন করা হচ্ছে। ফলে, এই দেশগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং বিকাশমান ব্যক্তিখাত ও সুশাসিত বাজারের (governed market) সমন্বয়ে ক্রমেই উন্নয়নের সফল মডেল হিসেবে বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রে চলে এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাষ্ট্র যদি প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সিভিল প্রশাসনের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সমর্থ হয় তাহলে যে ব্যয় সাশ্রয় হবে তা দিয়ে উপরে উল্লিখিত সামাজিকভাবে কাম্য কার্যক্রমগুলোতে রাষ্ট্র অর্থবহ সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হবে।

উপরে উল্লেখিত দর্শনকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও বাজারের ভূমিকার সঠিক বিভাজন ও সমন্বয়ের দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করে নিম্নের প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করা হলো:

১। অর্থনীতির বৃহত্তম ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদন খাত কৃষিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিব্যবস্থা অব্যাহত রেখে প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার এবং কৃষি সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়নকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে গুরুত্ব দিতে হবে। জমির মালিকানার সিলিং অবনমনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন যেমনি এরূপ সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তেমনি বর্গা প্রথার সংস্কার, অনুপস্থিত ভূমি মালিকানাব্যবস্থা বিলোপ, কৃষিশ্রম বাজার সংস্কারের মাধ্যমে খেতমজুরদের অধিকার সংরক্ষণ, কৃষিঋণ ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিপণ্যের ন্যায্যদাম নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, খাস জমিতে সমবায় খামার বা যৌথ খামার গঠন, ভূমি রেকর্ডব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশান, জমি ক্রয়-বিক্রয়ব্যবস্থার সংস্কার, ভূমি প্রশাসনব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ভূমি ব্যাংক ও গবাদী পশু ব্যাংক স্থাপন, পুকুর, দিঘি, জলমহাল, বিল-হাওর প্রভৃতির মালিকানা ও ইজারাব্যবস্থার সংস্কার, নদী-শিকস্তি ও -পয়স্তি জমির মালিকানা ও ইজারাব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিজাত পণ্যের দাম-সহায়তা ব্যবস্থার সংস্কার, সেচব্যবস্থায় ওয়াটার লর্ড উচ্ছেদ—এগুলো সবই জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনার দাবি রাখে। মনে রাখতে হবে, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও গণচীনের মত এশিয়ার সফল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে, শিল্পায়নে সাফল্য অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে এসব দেশে রাষ্ট্রের উদ্যোগে সুদূরপ্রসারী ভূমি সংস্কার ও কৃষি সংস্কার কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

২। অর্থনীতির সকল উৎপাদন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং ব্যক্তি উদ্যোগের যৌক্তিকতার সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিমিত মাত্রায় বাজারব্যবস্থাকে উৎপাদন সংগঠনে ব্যবহার করতে হবে। ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো, গণচীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া এবং ইসরায়েল এই ব্যাপারে আমাদেরকে পথ-নির্দেশনা দিতে পারে। উৎপাদনে দক্ষতা অর্জনে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার (স্টেট ফেইল্যুর) আলোকে রাষ্ট্রকে বাজারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক (regulator), সহায়ক (facilitator) এবং শাসকের (governor) ভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করতে হবে। রাষ্ট্র উৎপাদকদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। বাজারের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রকে নিয়মনিষ্ঠ রেফারির ভূমিকায় শক্তভাবে হাল ধরতে হবে। বাজার আয় ও সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধি করবেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত জীবনের মৌল প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বাজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সমুন্নত করতে ব্যর্থ হবে, এটা মেনে নিতে হবে। সতের কোটি মানুষের আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষারব্যবস্থা বাজার কখনোই করবে না, সতের লাখ ধনাঢ্য পিতামাতার সন্তানদের জন্যে বাজার উচ্চমানের শিক্ষার আয়োজন গড়ে তুলবে। সতের লাখ উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের জন্যে বাজার উচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবা জোগান দেবে, কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্যে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ বাজারের থাকবে না, কারণ ঐ মানের স্বাস্থ্যসেবা কেনার ক্রয়ক্ষমতা নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্তের থাকবে না। দরিদ্র জনগণের মানসম্পন্ন খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান জোগানোর ব্যবস্থা বাজার কখনো করবে না। এ ধরনের বাজার ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলোতে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব পালন করতে দিতেই হবে।

৩। উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় সফল দেশগুলোর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার মতো মানব উন্নয়ন ক্ষেত্রে সত্যিকার সফল কোনো দেশ বেশি দিন উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে থাকে না।

অতএব, এ দেশে সর্বজনীন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান-নির্ভর, বৈষম্যহীন ও সকল নাগরিকের অভিগম্য অভিন্ন মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ন্যূনতম সময়ে নিরক্ষরতা নির্মূল করার জন্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ও প্রয়াস চালানো জাতীয় উন্নয়ন ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান লাভের দাবি রাখে। এ জন্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল নাগরিকের সন্তানদের জন্যে একক মানসম্পন্ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক প্রাইমারি ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবে রাষ্ট্র। উচ্চশিক্ষায় ব্যক্তিখাত এবং রাষ্ট্রীয় খাতের ভূমিকা পাশাপাশি থাকলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানের বৈষম্য যাতে সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রের অর্থে বৈষম্যমূলক ক্যাডেট কলেজ, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল-কলেজ, বাংলা মিডিয়াম স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশানি, নোটবই এবং কোচিং সেন্টারের ব্যবসা নিষিদ্ধ করতেই হবে।

৪। একক মানসম্পন্ন আধুনিক, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা পরিচালনা করবে রাষ্ট্র। এ-ব্যাপারে ভারতের কেরালা এবং কিউবা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। জনগণের কাছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ রদ করতে হবে, যদিও বিশেষজ্ঞদের প্রাইভেট কনসালটেশনের সীমিত সুযোগ রাখতে হতে পারে।

৫। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, সড়ক পরিবহন, নৌ পরিবহন, রেলওয়ে, শিল্প-কারখানা, পর্যটন—এসব খাতে এখনো রাষ্ট্রকে উৎপাদকের ভূমিকায় কেন রেখে দেওয়া হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এগুলোকে 'পাবলিক ইউটিলিটিজ' বলা হলেও এগুলোর কোনোটাই পাবলিক গুড বা গণদ্রব্য নয়, প্রাইভেট দ্রব্য ও সেবা। আবার, এগুলোর উৎপাদনে প্রাথমিকভাবে অনেক বেশি পুঁজি বিনিয়োগ দরকার হওয়ায় উৎপাদন খরচের মধ্যে স্থির খরচ পরিবর্তনীয় খরচের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে। ফলে, এই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো 'স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারে' (natural monopoly) পরিণত হয়, যেখানে ক্রেতাদেরকে মুনাফাবাজির দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করার জন্যে রাষ্ট্রকে কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হয়। অতীতে এসব খাতে প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী বা সক্ষম ছিল না বলে রাষ্ট্রকে এগুলোর জোগান দিতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এ দেশে দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা কায়েমী স্বার্থ মৌরসী পাট্টা গেঁড়ে বসেছে। এগুলোতে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অদক্ষতা ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য গেঁড়ে বসায় 'সিস্টেম লসের' যে মারাত্মক প্রাদুর্ভাব দেশের অর্থনীতি ও জনগণকে জিম্মি করে ফেলেছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে দ্রুত এগুলো থেকে রাষ্ট্রকে গুটিয়ে নিতে হবে। এখন আর এসব সেবা ও দ্রব্য উৎপাদনকে রাষ্ট্রের হাতে রেখে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। ব্যক্তি খাতে এ দেশের মোবাইল টেলিফোন কী নাটকীয় গতিতে বিকশিত হয়েছে তা দেখার পরও আমরা এ-ব্যাপারে কালক্ষেপণ করছি কেন? রাষ্ট্রকে এসব ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় প্রতিস্থাপনই এখন সময়ের দাবি।

৬। দেশের ব্যাংকিংব্যবস্থা পুঁজি লুণ্ঠনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। ব্যাংকিংব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ সমস্যা এবং বিভিন্ন পুঁজি লুণ্ঠনের কেলেংকারী থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত শক্তিশালী ও কঠোর regulatory system এবং কার্যকর ও দুর্নীতিমুক্ত বিচারব্যবস্থা গড়ে না তুললে ব্যাংকিংব্যবস্থার শনিদশা কাটবে না।

শেয়ারবাজারকে শক্তিশালী না করে ব্যাংকিংকে পুঁজি বাজারের বিকল্প হিসেবে ভূমিকা পালনে বাধ্য করা হলে খেলাপি ঋণ সমস্যা ও পুঁজি লুণ্ঠন থেকে ব্যাংকিং সিস্টেমকে মুক্ত করা যাবে না।

৭। উৎপাদন থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্তের গন্তব্যকে রাষ্ট্র দিকনির্দেশনা দেবে। পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও পুঞ্জীভবনকে রাষ্ট্র প্রতিরোধ করবে, কিন্তু সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরে অর্থবাজার ও পুঁজিবাজারকে রাষ্ট্রীয় কিংবা রাজনৈতিক জবরদস্তির শিকার করবে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যক্তিখাতের উদ্যোগকে রাষ্ট্র কার্যকর সহায়তা দেবে, বড় এবং ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে।

৮। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের জন্যে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে সর্বোতভাবে জনপ্রনিধিত্বমূলক এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। বাজারব্যবস্থা ও ব্যক্তিখাতকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিপক্ষ হিসেবে না দেখে পরিপূরকের ভূমিকা পালনের উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে বাজারব্যবস্থা governed market-এ রূপান্তরিত হয়।

৯। অর্থনীতির যাবতীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা ও মেধার যথাযথ প্রণোদনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে। একইসাথে জবাবদিহি ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।

১০। রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধারণ ও লালন করতে হবে। একের ধর্ম পালন অপরের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না করে সে জন্য সজাগ প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে রাষ্ট্র। এমনকি আস্তিকতা-নাস্তিকতা প্রশ্নেও কোনো পক্ষাবলম্বন করবে না রাষ্ট্র। একইসাথে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অপপ্রয়াসকে কঠোরভাবে দমন করবে রাষ্ট্র।

১১। দেশের বিচারব্যবস্থাকে নির্ভেজাল স্বাধীনতা দিতেই হবে। বিচারব্যবস্থা যেন সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকে তারও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

১২। আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ক সংস্থার ছড়াছড়ি, রাষ্ট্রীয় সিভিল আমলা ও মিলিটারি অফিসারদের বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসেবে গণবিরোধী 'শ্রেণি'তে রূপান্তর, স্বজনপ্রীতি ও দলবাজি পরিহার করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনোই বিকল্প নেই। তাই, উপজেলা ব্যবস্থা ও ইউনিয়ন কাউন্সিলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি নির্বাচিত জেলা গভর্নর পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক।

১৩। সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশনের মতো মতপ্রকাশের মাধ্যমগুলোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, সাহিত্য, সিনেমা ও নাট্য চর্চাকে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে।

১৪। উৎপাদনকে দক্ষ ও গতিশীল করার প্রয়োজনে রাষ্ট্র পর্যাপ্ত ও আধুনিক ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলবে, তবে সেগুলোর পরিচালনায় মাঠপর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকারব্যবস্থা এবং সংগঠিত ব্যক্তিখাতের উদ্যোগ কার্যকর এজেন্ট হতে পারে।

১৫। প্রতিরক্ষার জন্যে রাষ্ট্র শুধু বৃহদাকার সশস্ত্র বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সমগ্র জনগণের অংশগ্রহণমূলক রিজার্ভ গণবাহিনীকে প্রস্তুত করে তুলবে, যাতে বৈদেশিক আগ্রাসনের আশঙ্কা দেখা দিলে পুরো জাতিকে ন্যূনতম সময়ে মাঠে নামিয়ে দেওয়া যায়। উপর্যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে যে

সরকারি ব্যয় সাশ্রয় হবে রাষ্ট্র তা বরাদ্দ করবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে।

১৬। রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিই বর্তমান পর্যায়ে দেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। দুর্নীতি ও লুটপাট দেশের পুরো উৎপাদনব্যবস্থাকে যেভাবে তছনছ করে দিচ্ছে তা মোকাবিলা করার জন্যে রাষ্ট্র দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর ও সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে এবং সংবিধানে বিধৃত ন্যায়পালব্যবস্থা অবিলম্বে কায়েম করবে। দুর্নীতি দমনে আন্তরিক না হলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র পরিবর্তনের যাবতীয় আয়োজন শুধুই নামকাওয়াস্তে বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই হবে না।

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থপঞ্জি

Acemoglu, D. and J. A. Robinson 2012, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, Random House Inc. New York.

Amin, S. 1976, *Unequal Development,* Harvester Press, Hassocks, and Monthly Review

Press, New York, originally published in French in 1973.

Amin, S. 1977, *Imperialism and Unequal Development*, Harvester Press, Hassocks and

Monthly Review Press, New York, Originally published in French in 1976.

Baran, P. 1957, *The political Economy of Growth,* Penguin, Harmondsworth.

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018,*ঢাকা, বাংলাদেশ।

Faaland, J. & J. Perkinson, 1975, *Bangladesh: The Test Case of Development,* University Press limited, Dhaka.

Franda, M. 1982, *Bangladesh: The First Decade*, South Asia Publishers, New Delhi.

Frank, A. G. 1969, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, New York, Modern Reader Paperbacks, first edition published in 1967.

Islam, M. 2009, *The Poverty Discourse and Participatory Action Research in Bangladesh*, Research Initiatives, Bangladesh (RIB), Dhaka.

ইসলাম, ম. ২০১৭, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র ও অনুন্নয়ন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে*, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম।

Islam, M. 2019, *Role of the State in Bangladesh's Underdevelopment*, Manuscript Accepted

For Publication and being printed by the University Press Limited, Dhaka.

Kochanek, S. A. 1993, *Patron-Client Politics and Business in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka.

Kuznets, S. 1966, *Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread*, New Haven, Yale University Press.

Piketty, T. 2014, *Capital in the Twenty-First Century*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Sen, A. 1999, *Development as Freedom*, Alfred Knopf, New York.

Sobhan, R. 1982, *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka.

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ৯১-১১৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?

আবুল বারকাত*

এ প্রবন্ধের মূল বিষয়টি প্রবন্ধের শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত : "বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?" বিষয়টি নিয়ে বিগত ১০-১৫ বছরে ইতোমধ্যে কয়েক দফা লিখেছি, বক্তব্য দিয়েছি। আর সবশেষে ২০১৫ সালে প্রকাশিত "বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ" শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি (প্রকাশক: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত আজকের সেমিনারে উল্লেখিত গবেষণা গ্রন্থে বিবৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিই হবে আমার বক্তব্যের মূল ভিত্তি।

মূল শব্দ: *বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র, প্রতিবিপ্লব, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সেনাশাসন, মৌলবাদের অর্থনীতি ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত, 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, জিডিপি, জিএনআই 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশ, জাতীয় আয়ে উল্লম্ফন, সংশয়-সন্দেহবাদী কূটতর্কবাগীশ*

১. 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর স্বরূপ ও বঙ্গবন্ধু হত্যা

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কমপক্ষে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৪৬ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিল: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানসকাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিকঠাকই

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।ফোন: ০১৭৫৬১৪২৩১৫, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কতদূর যেতো?" শীর্ষক সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১২ আগস্ট ২০১৮

শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী তিন-চার বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত-লন্ডভন্ড বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনটা যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত মাত্র ৫৫ বছরের (১৯২০-৭৫)। সুদীর্ঘ ৩৮ বছরে (১৯৩৭-১৯৭৫) লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন-বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তার রাজনৈতিক দর্শন এবং এ ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি-উন্নয়ন দর্শন ("বঙ্গবন্ধু দর্শন" এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন' কোনো অলৌকিক বিষয় নয়। এ দর্শনের বিনির্মাতা বঙ্গবন্ধু নিজেই; এবং সময় (time) ও পরিপ্রেক্ষিত (context) এ বিনির্মাণে সহায়ক মাত্র; এ এক সচেতন-সৃজনশীল কর্মফল।

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন (বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি), রাজনৈতিক দর্শন এবং উন্নয়ন (প্রগতি) দর্শনে নিঃসন্দেহে ভূমিকা রেখেছিল সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের মিথস্ক্রিয়া। এসব পরিবর্তনের অন্যতম হলো ১৯১৭ সালে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—রুশ বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুতগতি আর্থ-সামাজিক মৌলিক পরিবর্তন (যে সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১৫-২০-এর কোঠায়); সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা; ১৯২৯-৩৩ সালে মহামন্দায় (great depression) আর্থসামাজিক সিস্টেম হিসেবে পুঁজিবাদের প্রথম বৈশ্বিক পতন-লক্ষণসমূহ যা শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গিয়ে ঠেকলো (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১০ বছর থেকে ২৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার আবির্ভাব এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে সমাজতন্ত্রের স্নায়ুযুদ্ধ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ বছর থেকে ৩৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে ঔপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের

ছক ১: বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, উন্নয়ন দর্শন—
যোগসূত্র এবং মূলনীতি-ভিত্তিসমূহ

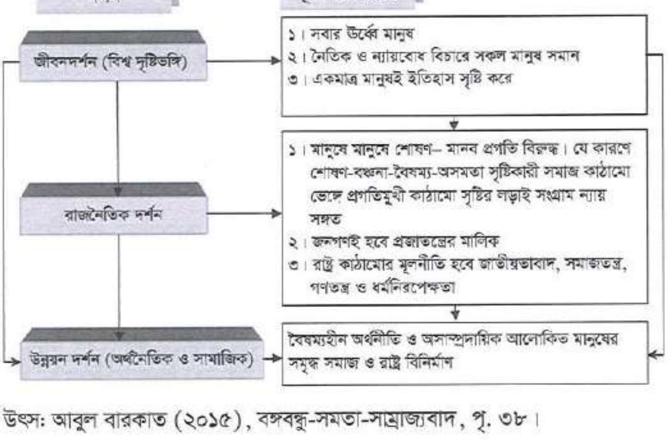

উৎস: আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, পৃ. ৩৮।

অভ্যুদয় এবং এ আন্দোলনে ভারতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৮ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে); ১৯৪০-৫০ এর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীনা বিপ্লব, চীনের অগ্রযাত্রা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ থেকে ৪০ বছর); ১৯৬০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যেমন ল্যাতিন আমেরিকায় বিশেষত পানামা, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, কিউবার বিপ্লব ও বিপ্লবী চেগুয়েভারা হত্যা (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছর); ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলন (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪৪ থেকে ৫০ বছর); দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসারতা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত শাসনের আওতায় শোষণ-নির্যাতনসহ বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৭ বছর থেকে ৫০ বছর)।

বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত দর্শনের মূর্ত রূপই হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের গণ-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কি এমন হলো যে ঐ জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। এর মূল কারণ কি? আমার মতে কারণটি এরকম: বঙ্গবন্ধু যে দিন থেকে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে) সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, বলছেন নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে ঠিক তখন থেকেই ইতোপূর্বে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবীরা আরও দ্রুতলয়ে আরও বেশি শক্তি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দর্শনবিরোধী তাদের ষড়যন্ত্র-কর্মকাণ্ড জোরদার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের দালাল মোশতাক—তাহের উদ্দিন ঠাকুর- মাহবুবুল আলম চাষী চক্রের ষড়যন্ত্র; জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল সেনা সদস্যের সরকার পতনের ষড়যন্ত্র; ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র; দুর্নীতি[১] সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকার-আলবদর-আল শামসসহ জামায়াতে ইসলামের ষড়যন্ত্র; মূল্যস্ফীতি ডবল ডিজিটে পৌঁছে দেওয়ার সফল ষড়যন্ত্র; খাদ্য গুদাম লুট, মজুতদারসহ[২] খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অকেজো করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০-র আওতায় সবচে মারাত্মক মারণাস্ত্র "খাদ্যের রাজনীতি" প্রয়োগ (উপলক্ষ হিসেবে শর্ত দিয়েছিল আমরা সমাজতান্ত্রিক কিউবায় পাট বেচতে পারব না)—এসবই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। প্রকৃত সত্য হলো বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চিত করা হলো।সৃষ্টি করা হলো এমনই অস্থিতিশীল ও জটিল পরিস্থিতি যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার পরিজনসহ হত্যা করলেও কেউ সংগঠিতভাবে রুখে দাঁড়াবে না। প্রতিবিপ্লবী এ শক্তি তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের

১. পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "... বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ"।

২. ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ। ... সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ... এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারি ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে—তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুত ও চোরাকারবার নিয়ে ষড়যন্ত্রটা হয় শুরু থেকেই। এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।

কাজটি দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করে ফেললো—১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে। এই একই খুনি চক্র কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও মো. কামরুজ্জামান) হত্যা করল।

১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই মৌল আকাঙ্ক্ষার **সোনার বাংলাদেশ** গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করল। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেওয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সবধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি প্রগতিবিরুদ্ধ অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state)এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগাতার সেনা শাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতির ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত—এসবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা; দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সামরিক ছাউনিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বিষয়াদি বিশেষত "ধর্মনিরপেক্ষতা" সংশ্লিষ্ট ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি কর্তন-পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করা হয়েছে; স্বাধীনতাবিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে; যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; শুধু পুনর্বাসনই নয় স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতার-সরকারের অংশীদার করা হয়েছে; সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে "নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলার" যে কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সেটাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেন চালকের আসনে কোনো না কোনোভাবে শক্তভাবে বসে পড়েছেন তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না—যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent-Seeker) হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ-কব্জাগত করতে চান। এটাই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো অসম্ভব হবে।

২. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব থেকে ২৫ বছর বঞ্চিত হলাম!

যেহেতু বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তাঁরই উদ্ভাবিত "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়নদর্শন" (home grown development philosophy)বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোষণমুক্ত, সমাজতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন এবং যেহেতু বঙ্গবন্ধুর এ উন্নয়নদর্শনবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দেশীয় দালাল-দোসররা মতাদর্শগত কারণেই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বর্জন করেছিল, সেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল ঐ চক্রের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত ছিল তাদের পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে বর্বরভাবে হত্যা করা—এটাই ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু স্বাধীন দেশের মানুষের ঐতিহাসিক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ প্রশ্ন উত্থাপন যুক্তিযুক্ত যে, **বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় দাঁড়াতো? কতদূর পর্যন্ত যেতে পারতো বাংলাদেশ? বৈশ্বিক অর্থনীতি-সমাজে বাংলাদেশের**

অবস্থানটা কী হতে পারতো? এ প্রশ্নের ১০০ ভাগ সদুত্তর দেবার ক্ষমতা কারও নেই। কারণ এ এক জটিল সম্ভাব্যতা নিরূপণ সংশ্লিষ্ট (possibilities বা probability)প্রশ্ন। তবে জটিল এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান অযৌক্তিক নয়। অনেক ধরনের অনেক বৈশিষ্ট্যের যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অঙ্ক কষে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। ঐসব অনুসিদ্ধান্তসহ আমার হিসেবপত্তর পেশ করার আগে আবারও বলে রাখা উচিত যে বাংলাদেশের বয়স এখন ৪৬ বছর। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের বাংলাদেশের বয়স ৪৫ বছর, আর ইতিহাসের বর্বরতম-নৃশংসতমভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা পরবর্তী 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের বয়স ৪৩ বছর। উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধুকে যখন বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করল, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫৫ বছর, যার মধ্যে জীবনের শেষের মাত্র সাড়ে ৩ বছর অর্থাৎ মাত্র ১ হাজার ৩১৪ দিন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শাসনকাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, এ দেশে উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাও যদি বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও সুস্থ-সবল-সুঠাম দেহের অধিকারী বঙ্গবন্ধু (১৯৭৫-এর পরে) আরও কমপক্ষে ২৪-২৫ বছর তো বাঁচতেন (কমপক্ষে বলছি এ জন্য যে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশের ঊর্ধ্বমুখী মানব উন্নয়নের কারণে মানুষের গড় আয়ু এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৫ বছর বেড়ে যেতো)। অর্থাৎ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন-প্রগতি কর্মযজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে কমপক্ষে ২৪-২৫ বছর।

৩. বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ: পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ আজ কোথায় পৌছাতো! হিসেবপত্তর করে [যাকে অর্থশাস্ত্রসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানীরা সিমুলেশন (simulation model)বলে থাকেন] এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পাঁচটি পদ্ধতিতত্ত্বীয় (methodological)বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত: কয়েকটি যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত (hypothesis) ব্যবহার করা হয়েছে; আর অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণে যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বিদেশি-দেশি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ইতিহাসের নৃশংসতম ও বর্বরোচিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অর্থাৎ ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশ হলো "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ নয়"—"বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" বা "আজকের বাংলাদেশ"। হিসেব-পত্তরের ভিত্তি হিসেবে আমি যেসব অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করেছি তা নিয়ে যে কেউই বিতর্ক করতে পারেন (এ বিষয়ে পরে আসছি)। পদ্ধতিতত্ত্বীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হলো "বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ" অর্থাৎ "আজকের বাংলাদেশ" (যা সরকারি পরিসংখ্যান এবং/অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশভিত্তিক পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে হিসেব-পত্তর করা হয়েছে) এবং "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশ" (যা সিমুলেশন মডেল ভিত্তিক আমার হিসেব)। আর তুলনার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে বেছে নিয়েছি। দেশ হিসেবে অন্য যেকোনো দেশ বেছে নেওয়া যেতো, তবে তা না করে মালয়েশিয়াকে বেছে নেওয়ার পেছনে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে। কারণ দুটি হলো (১) ১৯৭০-৭৩ সময়কালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) ছিল প্রায় সমান। তবে ১৯৭০ সালে মালয়েশিয়ার মোট জনসংখ্যা ছিল আমাদের (পূর্ব পাকিস্তানের) তুলনায় প্রায় ৬.৫ গুণ কম (আমাদের ছিল ৬ কোটি ৯১ লক্ষ আর মালয়েশিয়ার ১ কোটি ৬ লক্ষ)। যে কারণে মোট দেশজ উৎপাদন অথবা মোট জাতীয় আয় সমান বা কাছাকাছি হলেও মালয়েশিয়ার মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন অথবা মাথাপিছু জাতীয় আয় আমাদের তুলনায় ৫-৬ গুণ বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক—তাইই ছিল ১৯৭০-৭৩-এর দিকের অবস্থা। (২) মালয়েশিয়ার অর্থনীতি

বিনির্মিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতা ড. মাহাথির মোহাম্মদ-এর নেতৃত্বে এবং বলা যায় "দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়নদর্শনের" ভিত্তিতে। সমজাতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং "দেশজ উন্নয়নদর্শন" উভয়ই আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ততদিন, যতদিন বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনে নেতৃত্ব দিয়েছেন (অর্থাৎ ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ভোর রাত পর্যন্ত)। তবে মালয়েশিয়ার সাথে আমাদের পথচলা শুরুর একটা বড় পার্থক্য আছে, তা হলো আমাদের পথচলার শুরুটা (ধরা যাক ১৯৭২ সাল) যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ[৩] থেকে আর মালয়েশিয়ার পথচলা শুরু কোনো যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে নয়। আরও একটা বড় পার্থক্য আছে যা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত; আর তা হলো মালয়েশিয়ার নেতৃত্ব "সমাজতন্ত্রের" কথা বলেননি—ড. মাহাথির মোহাম্মদআসলে নিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন, আর আমাদের বঙ্গবন্ধু তাঁর উন্নয়নদর্শনের অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য মৌল হিসেবে সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন (যা সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ)। পদ্ধতিতাত্ত্বিক তৃতীয় বিষয়টি হলো 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের সম্ভাব্য চিত্র বিনির্মাণে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মোট জাতীয় আয়-এর গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ৫ শতাংশ, ৬ শতাংশ, ৭ শতাংশ, ৮ শতাংশ, ৯ শতাংশ ও ১০ শতাংশ ধরে ভিন্ন ভিন্ন হিসাব (সিমুলেশন) করা হয়েছে। তবে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চিত্র উপস্থাপনে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হলে যা দাঁড়াতো সেটাকেই সবচে যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। গড়ে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরার পেছনের যৌক্তিক কারণগুলো পরে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। পদ্ধতিতত্ত্বগত চতুর্থ বিষয়টি হলো সময় বা সময়কালসংশ্লিষ্ট (বছর, বছরকাল) । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পরিসংখ্যানের প্রাপ্যতা যা বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার তুলনা-সহায়ক হয় সেটাকেই মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭০-২০১১ সময়কাল, মোট জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ১৯৭৩-২০১১ সময়কাল ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ধতিতাত্ত্বিক সর্বশেষ, পঞ্চম ক্ষেত্রটি হলো মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়সহ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক চলকসমুহের মূল্যবিষয়ক (price)। বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি তুলনীয় রাখার স্বার্থে মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয় (মাথাপিছুসহ) হিসেব করা হয়েছে ২০০০ সালের ভিত্তিতে স্থির মূল্যে (in constant price, বর্তমান মূল্য বা current price-এ নয়), আর মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে)[৪] হিসেব করা হয়েছে ২০০৫ সালের স্থির মূল্যে। বাংলাদেশি টাকা আর মালয়েশিয়ার রিংগিত-ভিত্তিক সব হিসেবপত্তর তুলনীয় করার স্বার্থে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হয়েছে।

আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ'-এর অর্থনীতি ও সমাজ আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা নিরূপণে বেশকিছু যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হিসেবপত্তর করেছি। এসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ধরে নিয়েছি যে "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশের" মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হতো ৯ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই বার্ষিক জিডিপি ৫.৫ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। যেসব অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে" মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো সেসব

৩. এমন এক ধ্বংসস্তূপ থেকে যা বিশ্লেষণ করে ১৯৭২ সালের দিকেই বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ ও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন এবং অনাহারে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাবে।

৪. মাথাপিছু প্রকৃত আয় অর্থাৎ অর্থের (আমাদের ক্ষেত্রে টাকার আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে রিংগেট এর) ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ এক একক অর্থ দিয়ে কি পরিমাণে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করা যায়। প্রায়শই এক্ষেত্রে পিপিপি ডলার (purchasing power parity dollar) ব্যবহার করা হয়।

অনুসিদ্ধান্ত উপস্থাপনের আগে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার স্বার্থে আর একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি। বিষয়টি এ রকম—"বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশে" মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ হতো কি না এ নিয়ে যে-কেউই তর্ক-বিতর্ক অথবা কূটতর্কে অবতীর্ণ হতে পারেন। এসব তর্কবাগীশদের প্রতি পেশাগত যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক অন্তত কয়েকটি কথা বলা জরুরি। জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: যে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) পরিমাণে স্বল্প অথবা অপেক্ষাকৃত স্বল্প—সে দেশে সঠিক, ঐতিহাসিকভাবে বাস্তবায়নসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত ও জনকল্যাণকামী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হলে ঐ দেশে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও তার প্রবৃদ্ধির হার বাড়তে বাধ্য। এমনকি প্রবৃদ্ধির হার সে দেশে দুই অঙ্কের (ডবল ডিজিট) হতে পারে অর্থাৎ ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। এ কোনো অসম্ভব প্রস্তাবনা নয়। এ উদাহরণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইতিহাসে নতুন কোনো বিষয়ও নয়। পৃথিবীর অনেক দেশই নির্দিষ্ট সময়কালে ইতিমধ্যে এ ধরনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত: যে দেশের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি অথচ মোট দেশজ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম—সে দেশে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় নিশ্চিতকরণ জরুরি: (১) জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে, দক্ষ-জনশক্তিতে রূপান্তর, যে দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা (productive capacity) বৃদ্ধি করে; (২) সে ধরনের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অভিঘাত (long-term social impact)ধনাত্মক।

তৃতীয়ত: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশের পরিবর্তে ৭ শতাংশ ধরলেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়—উভয়ই মালয়েশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি হতো।

চতুর্থত: সংশয়বাদী, সন্দেহপ্রবণ, কূটতর্কবাগীশ ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা(!) বিদেশি-দেশি অর্থনীতিবিদ ও তথাকথিত সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন জরুরি বোধ করি। প্রশ্নসমূহ সন্দেহাতীতভাবে রাজনৈতিক। রাজনৈতিক ঐ প্রশ্নসমূহ হলো: আপনারা কি ১৯৭০ সালেও ভাবতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করব? আপনারা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে আমরা ৯ মাসেই হাজার-লক্ষ প্রতিকূলতার মধ্যে একটি সশস্ত্র বলবান-নিয়মিত পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী ও তাদের দেশীয়-আন্তর্জাতিক দালাল-দোসরদের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঐ 'অসীম শক্তিধর'(!) বর্বর পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারব? আপনারা কি ভেবেছিলেন যে আমরা এতই দুর্বল যে মুক্তিযুদ্ধকালীন মোশতাক চক্রসহ বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের আবারও পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে যেকোনো ফর্মুলায় ফেরত যেতে বাধ্য করবে, আর আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য হব? তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হবে এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ তাঁদের সহযোগী এ দেশের আপামর জনগণ একপর্যায়ে হাঁপিয়ে উঠে রণেভঙ্গ দিয়ে হাটু গেড়ে ক্ষমা চাইবে। তারা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু শুধু বক্তৃতা-পারদর্শী মানুষ, দেশ গড়া—তাও আবার অপূরণীয়-অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর কাজ নয়; এ বিষয়ে নন তিনি বিশেষজ্ঞ—নন

তিনি পারদর্শী, সুতরাং পারবেন না তিনি। এসব প্রতিক্রিয়াশীল ভাবুকদের অনেকেই সচেতনভাবেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল অথবা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের কেরানি অথবা শাস্ত্রীয়ভাবে সে পক্ষের ব্যক্তি, যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতিশাস্ত্রের বাইরে যেতে অপারগ[৫] অথবা 'জনগণের শক্তি সবকিছুর উর্ধ্বে'—এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন। আমি নিশ্চিত—এদের অধিকাংশই বঙ্গবন্ধুর যোগ্যতা-দক্ষতা-দেশপ্রেম সম্পর্কে জানতেন না অথবা ভাবতেন অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে দরিদ্রবিরোধী ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী বৈষম্য সৃষ্টিকারী বাজারব্যবস্থাটাই উন্নয়নের একমাত্র মহৌষধ। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংস-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের যখন খুবই প্রয়োজন ছিল, তখন বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতা দেশগুলো দাবি তুলল যে, *"বাংলাদেশ যদি সাবেক পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একাংশের (যে অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিল বলে তারা দাবি করেছিল) দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে সাহায্য প্রদান অসম্ভব"*। যাদের উদ্দেশ্যে এত কথা বলছি তারা কি জানেন যে ঐ দুর্দিনেও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন *"দাতামহল দাবি না ছাড়লে আগামীকালই তারা চলে যেতে পারেন। আমরা সাহায্য নেবো না। ওইসব শর্তে আমরা সাহায্য নিতে পারি না"*। তারা কি জানেন, যে এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও নীতির প্রশ্নে অটল বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাংকের ঐ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবকে স্পষ্ট বলেছিলেন *"শুনেছি আপনারা বলেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে দাতামহলের শর্ত মানতে হবে আগে। ভদ্র মহোদয়গণ, এই যদি আপনাদের শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সাহায্যই আমরা নেবো না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, আমাদের বাঁচতে হলে জনগণের সে শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বাঁচতে হবে। আমরা আপনাদের সাহায্য ছাড়াই চলবো"*[৬]।

এতক্ষণ যেসব সংশয়-সন্দেহবাদী কূটতর্কবাগীশ এ দেশি অথবা এ দেশের ভিনদেশি অথবা বিদেশি অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম-নীতি-আদর্শ-জনগণের অপার শক্তির প্রতি আস্থার কিছু নমুনা উল্লেখ করলাম তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আক্রোশ-শত্রুতা নেই (আসলে এদের বেশির ভাগকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা চিনি না; তাদের লেখাজোখা পড়েছি মাত্র)। তবে এদের জন্য দুঃখ হয় এ জন্য যে, এদেরই বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী কালে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবিসহ সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করেছেন অথবা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে (সম্ভবত দুদেশি পাসপোর্টধারী হিসেবে) হয় বিদেশে অথবা বাংলাদেশে এখন প্রত্যক্ষ সরকারঘনিষ্ঠ উন্নয়ন পরামর্শক (সরকারে যে দলই থাকুক না কেন)

৫. 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'র একাংশ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' এসব 'ভাবুক' যারা ক্ষুদ্রার্থের অর্থনীতিশাস্ত্রের বাইরে বিচরণে অপারগ তাদের উদ্দেশ্যে বলা সমীচীন যে তাদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতিশাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত; দোষ তারা অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট-উদ্ভূত—প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট।

৬. এ অংশের অধিকাংশ তথ্য-উৎস হলো বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের স্মৃতিচারণ এবং মোতাহার হোসেন সুফী রচিত গ্রন্থ "ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক", ২০০৯, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, পৃ. ৪০৫-৪০৭।

হিসেবে কাজ করছেন এবং/অথবা উন্নয়ন পরামর্শ-প্রেসক্রিপশন প্রদানকারী সংস্থার মালিক এবং/অথবা আমাদের দেশের "উন্নয়ন" কীভাবে কোন পথে হতে পারে এসব নিয়ে চিন্তা-দুশ্চিন্তার দোকান "Think Tank" খুলে বসেছেন!

আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতো ৯ শতাংশ। এ হিসেব নিরূপণে বিভিন্ন যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ধরে নিয়েছি যে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সাল নাগাদ (তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স হতো ৯০ বছর) তিনি মোট ৭টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণ সময়সহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম ৩ বছর সময় পেতেন। ধরে নিয়েছি যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) শেষ বছর নাগাদ প্রবৃদ্ধির হার গিয়ে দাঁড়াতো ৫.৫ শতাংশে (যে টার্গেট বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতেই ছিল)। ক্রমান্বয়ে একটি পর্যায় পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ডাবল ডিজিটে (দুই অঙ্কে) উন্নীত হতো। বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত উন্নয়নদর্শনের" প্রভাব-অভিঘাত হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন সম্ভাবনাসহ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির যুক্তিতে ধরে নিয়েছি যে ঐ প্রবৃদ্ধির হার হতো: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৭৮-৮৩) ৭.৫ শতাংশ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৩-৮৮) ৮.৫ শতাংশ, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮৮-৯৩) ৯.৫ শতাংশ, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৩-৯৮) ১০ শতাংশ, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৯৮-২০০৩) ১০.৫ শতাংশ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (২০০৩-০৮) ১১ শতাংশ এবং অষ্টম পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে একই ধারা বজায় থাকতো অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার হতো ১১ শতাংশ।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সম্ভাব্য অনুমিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এসব হিসেব করলে ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়কালে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার হতো বার্ষিক গড়ে ৯ শতাংশ। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির হারে ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে শুধু মোট দেশজ উৎপাদনের কয়েক গুণ বৃদ্ধিই ঘটত না সেইসাথে ধরে নেওয়া অনুসিদ্ধান্তসমূহের বৈশিষ্ট্যের কারণে আর্থসামাজিক বৈষম্যও বহুগুণ হ্রাস পেত। আমার মতে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত "দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়নদর্শনের" অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, যাকে এককথায় যেসব নামে সূত্রায়িত করা যায়, তা হলো— "বৈষম্য হ্রাসকারী ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেল" অথবা "বৈষম্য হ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী প্রগতির মডেল" অথবা "অসমতা হ্রাসকারী উন্নয়ন মডেল"।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কী হতো, কেমন হতো অর্থনীতি ও সমাজের আজকের রূপ? সেক্ষেত্রে প্রক্ষেপণের (projections)ভিত্তি হিসেবে যেসব যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অনুসিদ্ধান্তসমূহে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে বা ঘটানো হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে বিধৃত চার মূলনীতির (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ও) ভিত্তিতে জনগণের সার্বভৌমত্ব—জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭) ও জনগণের মৌলিক অধিকারসংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অন্যতম হলো: মালিকানার নীতি (অনুচ্ছেদ ১৩), মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫), বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব (অনুচ্ছেদ ১৬) এবং ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য প্রদর্শন না করা (অনুচ্ছেদ ২৬), অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ১৭), জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা (অনুচ্ছেদ ২০), নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ২১), চিন্তা ও বিবেকের

স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯), ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪১), স্থানীয় শাসন (অনুচ্ছেদ ১১,৫৯,৬০), সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আইন প্রণয়ন ও অর্থসংগ্রহ পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯২), বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৬), এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট বিধানাবলি (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)। সেই সাথে সংবিধানের মূল বিধান অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে [অনুচ্ছেদ ৭ (২)]—অর্থাৎ জনগণকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না; মালিকানার নীতি সংবিধানে বর্ণিত বিধি মোতাবেক হতে হবে (অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ তুষ্টি চলবে না; রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বেসরকারীকরণ সংবিধানবিরোধী); গ্রাম-শহরের বৈষম্য হ্রাস করবেন কিন্তু কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করবেন না—তা হবে না; বস্তিবাসী বাড়তেই থাকবে—তা হবে না; জাত-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষে বৈষম্য প্রদর্শন করবেন—তা হবে না; শিক্ষাকে পণ্যে (বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিদ্যাবস্তু'তে) রূপান্তরিত করবেন—তা সম্পূর্ণ সংবিধানবিরোধী; ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মানুষকে নিরন্তর উচ্ছেদ প্রক্রিয়াভুক্ত করে রাখবেন—তা হবে না; স্থানীয় শাসনব্যবস্থা কার্যকর করবেন না—তা সম্পূর্ণ সংবিধানবিরোধী; সমাজতন্ত্রের নাম-নিশানা নেবেন না—তা হবে না; ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনবেন—তা শুধু সংবিধানবিরোধীই নয় তা মুক্তিযুদ্ধের মৌলচিন্তাবিরোধী; শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য বাড়াতেই থাকবেন—তা চলবে না; অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন—তা হবে না; আইনের শাসনের ব্যত্যয় ঘটাবেন—তা হবে না।

২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে (বাস্তবে হয়নি; পরিকল্পনাকাল ছিল ১৯৭৩-৭৮ আর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫-এ)।

৩. বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন বাস্তবায়িত হয়েছে (যা বাস্তবে হয়নি), যার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায়সহ গ্রামীণ কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়, জেলে সমবায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায়।

৪. অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)—খাদ্য উৎপাদন ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বৈদেশিক পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে।[৭]

৫. মানবসম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে[৮] (যা আসলে হয়নি)।

৭. বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভায় (২৬ মার্চ ১৯৭৫, রেসকোর্স ময়দানে) বলেছিলেন "আমি ভিক্ষুক জাতির নেতা থাকতে চাই না"। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল "বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশের মধ্যে কমিয়ে আনা"।

৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ছিল জ্ঞান-সমৃদ্ধ দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনশক্তি গঠনের এবং এ লক্ষ্যের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ এর দিকে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মানুষের অভিজ্ঞান-সচেতনতা-দক্ষতা বৃদ্ধি পেত অন্যদিকে অর্থনীতিতে মানুষের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন সক্ষমতা ও ফলপ্রদতা বৃদ্ধি পেত। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বঙ্গবন্ধু বহুবার বলেছেন এবং সর্বশেষ বলেছেন ১৯৭৫-এর ২৬ মার্চ জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে।

৬. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার কর্মকাণ্ড সাংবিধানিক ও ন্যায়বিধানিক দৃষ্টিতে বাস্তবায়িত হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৭. জাতীয়করণকৃত কলকারখানা-ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পিত উন্নয়ন ও উত্তরোত্তর বিকাশ হয়েছে (যা আসলে হয়নি)।

৮. অবকাঠামোর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়েছে—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে যার ভবিষ্যৎ নির্দেশনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল রাস্তাঘাট-ব্রিজ, কালভার্ট, জলপথের/নদীর নাব্য রক্ষা করে দেশব্যাপী একক জলপথ-জাল, সমুদ্র-নদী-স্থলবন্দর, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে (যা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হয়নি)।

৯. সরকারি স্বাস্থ্যখাতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিস্তৃতি ও মান বৃদ্ধি হয়েছে (যা কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনানুযায়ী আসলে হয়নি)।

১০. লাইসেন্স পারমিট ও সংশ্লিষ্ট ঘুষ-দুর্নীতি নির্মূল হয়েছে (আসলে আদৌ হয়নি। যা ১৯৭৪-এর দিকে পরিলক্ষিত হয় এবং যা rent-seeker-দের এক নব্য-ধনী গোষ্ঠী সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ জনসভার ভাষণে—২৬ মার্চ ১৯৭৫—বলেছিলেন *"পাকিস্তান সব নিয়ে গেছে, কিন্তু এই চোরাদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম"*)।

১১. পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের দালাল-দোসর যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার চরম লঙ্ঘনকারীদের বিচার ও বিচারিক রায় কার্যকর হয়েছে (যা আসলে হয়নি। প্রক্রিয়াধীন। এ প্রক্রিয়ার শেষ হবে কবে—কেউই জানে না। এরাই পরবর্তীকালে একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধু সরকারবিরোধী ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক ছিল আর অন্যদিকে এরাই ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জঙ্গিত্বের বাহক হলো)।

১২. পাকিস্তানফেরত সেনা কর্মকর্তাদের পুনর্বাসিত করা হলো না (আসলে করা হলো। বস্তুত এরাই তারা, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোনো কিছুই ধারণ করতেন না, বরঞ্চ উল্টোটাই করেছেন। আর এদের অনেকেই এখন ভেতর থেকে অথবা বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন)।

১৩. মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই যেসব বাঙালি আমলা পাকিস্তানিদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিল তাদের পুনর্বাসিত না করে শাস্তি দেওয়া হলো (বাস্তবে হয়েছিল ঠিক উল্টোটা। ঐসব আমলার অনেককেই পুনর্বাসিত করা হলো। ঐ আমলারা মানসিকভাবে ছিলেন উপনিবেশিক ও মুসলিম লীগ—সামন্তবাদী মানসিকতার আমলা। চেয়ারে বসিয়ে যাদের দিয়ে আর যা-ই হোক সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের কোনোটিই বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না)।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' যে বাংলাদেশ হবার কথা ছিল সে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা যায়নি। সেই সাথে এটাও বলা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' উপরোল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহের কোনটা কোন মাত্রায় অথবা কোন অনুসিদ্ধান্তের মান কত হতো তা বলা দুষ্কর। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' মূল অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হতো এবং অনুসিদ্ধান্তসমূহের যৌথ মিথক্রিয়ায় সৃষ্টি হতো নতুন এক বাংলাদেশ যাকে আমি বলছি "বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ"। যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এবং বৈষম্য হ্রাস পেত অনেক গুণ। হিসেব-পত্তর কষে এসব বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে যা পেয়েছি তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তার আগে

আবারও স্মরণ করে দিতে চাই যে, ১৯৭০-২০১১ অথবা ১৯৭৩-২০১১ সময়কালের জন্য বৃহৎ বর্গের মানদণ্ডে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দেখা হয়েছে দু'ভাবে: "আজকের বাংলাদেশ" (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ফলে যে বাংলাদেশ পেয়েছি অথবা 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ') এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ' (অর্থাৎ যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হতো)। আর এ দুই বাংলাদেশকে তুলনা করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মালয়েশিয়ার একই সময়ের অর্থনীতির সাথে। সেই সাথে অর্থনীতিতে পরিবর্তন-রূপান্তরের পাশাপাশি সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে কি ঘটেছে এবং কি ঘটতে পারতো সেটাও হিসেব-পত্তর করে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

৪. বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কেমন হতো আমাদের অর্থনীতি ও সমাজ?

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হলে (যা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যর কারণেই অবশ্যই কার্যকর হতো বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কার্যকারিতার মাত্রা যাই হোক না কেন) অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে ২০১১ সালের দিকের 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অর্থনীতি মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অনেকগুণ ছাড়িয়ে যেতো যদিও ১৯৭৩ সালের দিকে ঐ দুই অর্থনীতির অবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। সেইসাথে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিগত বৈষ্যম্যের চেহারা কাঠামোটি পাল্টে যেতো এবং শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পেয়ে তা সমতাভিমুখী হতো যা আজকের বাংলাদেশে চরম বৈষম্যমূলক এবং যে পরিবর্তনটি মালয়েশিয়ায় আদৌ হয়নি (বিষয়টি পরে বিস্তারিত বিশ্লেষিত হয়েছে)।

প্রথমে আসা যাক বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বড় দাগে অর্থনৈতিক পরিবর্তনটা কেমন হতে পারতো, কোন অবস্থায় দাঁড়াতো ২০১১ সালের দিকে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার অর্থনীতির তুলনায় সম্ভাব্য অবস্থাটা কেমন হতো? 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের[৯] (২০১১ সালের) বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার যা একই সময়ের মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ ২০১১ সালে বাংলাদেশের জিডিপি মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি হতো (লেখচিত্র ১); এমনকি মাথাপিছু জিডিপি মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো—মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জিডিপি ৫,৩৪৫ ডলার আর 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আমাদের হতো ৬,০৬১ ডলার (লেখচিত্র ২)। আর এটা ঘটত তখন যখন আমাদের মোট জনসংখ্যা মালয়েশিয়ার চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশি (১৯৭০ সালে ৬.৫ গুণ বেশি ছিল, লেখচিত্র ৩ দেখুন)। এতো গেল মোট দেশজ উৎপাদনের কথা। সংগত কারণেই মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ক্ষেত্রেও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের অনুরূপ উর্ধ্বগামী পরিবর্তনের ফলে ২০১১ সাল নাগাদ আমাদের মোট জাতীয় আয় দাঁড়াতো ৪২ হাজার ৫১৪ কোটি ডলারে। যা মালয়েশিয়ায় ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয়ের তুলনায় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আমাদের মোট জাতীয় আয় ২.৮ গুণ বেশি হতো (লেখচিত্র ৪ দেখুন)। শুধু তাই নয়—মালয়েশিয়ার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা ৪ গুণ বেশি হলেও ২০১১ সালে আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় হতো ৫,৫৯৮ ডলার যা মালয়েশিয়ায় ৫,১৯৯ ডলার (লেখচিত্র ৫ দেখুন), অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৩৯৯ ডলার বেশি। আর পিপিপি ডলারে হিসেবকৃত মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে বলা চলে ঘটনাটা ঘটতে পারতো বিপ্লবাত্মক (পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। এ তো গেল 'বঙ্গবন্ধুসহ'

৯. হিসেব-পত্তর উপস্থাপনে যেখানেই 'আজ', 'আজকে', 'আজকের', 'এখন', 'এখনকার', 'বর্তমান', বর্তমানের'—এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই ২০১১ সাল ধরে নিতে বা পড়তে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনীতির প্রধান দুই সূচক মোট দেশজ উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ে যে আমূল পরিবর্তন হয়ে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে অতিক্রম করার মোটা দাগে মোদ্দা কথা। এখন একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণে আসা প্রয়োজন যেখানে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে আজকের (২০১১ সালে) মালয়েশিয়ার, 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের সাথে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের, এবং 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অর্থনীতির (যা কিছু মাত্রায় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তুলনীয় অবস্থা দেখানো সম্ভব।

লেখচিত্র ১: মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি): ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

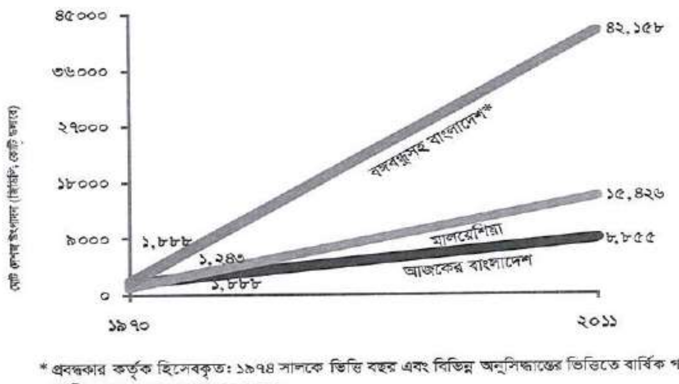

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ২: মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন: ১৯৭০-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩: বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা (মিলিয়নে): ১৯৭০-২০১১

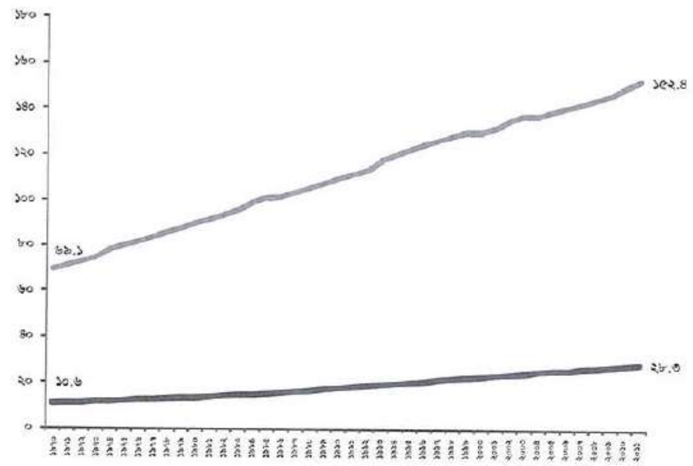

তথ্য উৎস: বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন সনের "Statistical Year Book"; ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ প্রবন্ধকার কর্তৃক জনসংখ্যার গতি প্রবণতা ধরে হিসেবকৃত। আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

লেখচিত্র ৪: মোট জাতীয় আয় (জিএনআই): ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, কোটি ডলারে)

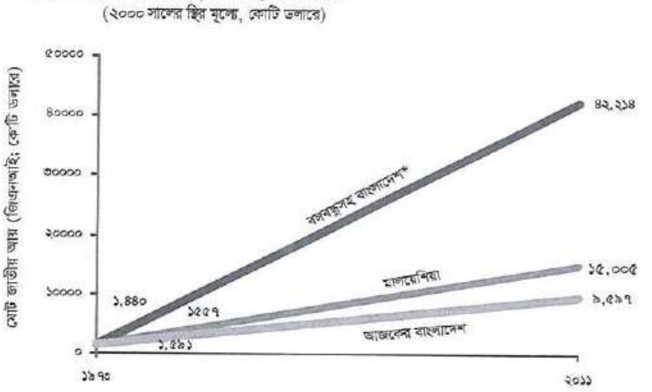

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: মাথাপিছু জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০০ সালের স্থির মূল্যে, ডলারে)

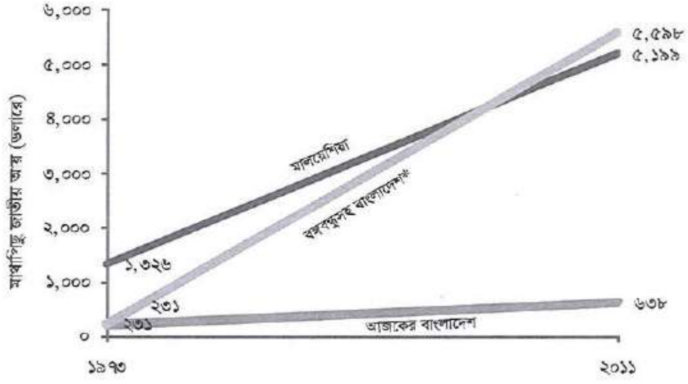

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে (যা অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ইতোমধ্যে বিবৃত হয়েছে) অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর সম্ভাব্য পরিমাণ হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে (২০১১ সালে) তার পরিমাণ মাত্র ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার[১০] (লেখচিত্র ৩ দেখুন)। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সেনা-স্বৈরশাসন ও স্বৈরশাসনের মোড়কে তথাকথিত গণতান্ত্রিকতার নামে লুণ্ঠনকারী rent-seeker গোষ্ঠী সৃষ্টিসহ অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট নয়া উদারবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি দর্শন যা উন্নয়নবান্ধব নয় দরিদ্রবান্ধব তো নয়ই। আর এ জনকল্যাণবিমুখ স্বদেশবিমুখ উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়নের ফলে বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সাল নাগাদ সম্ভাব্য মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ যা হতে পারতো তা আদৌ হয়নি, হয়েছে তার মাত্র ২১ শতাংশের সমপরিমাণ। অর্থাৎ মোটা দাগে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের তুলনায় 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে আমরা ২০১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদন হারিয়েছি (৪২,১৫৮ বিয়োগ ৮,৮৫৫) ৩৩ হাজার ৩০৩ কোটি ডলারের সমপরিমাণ। এ ক্ষতি বলা চলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কারণে মাত্র এক বছরের (২০১১ সালের) আনুমানিক ক্ষতি। এভাবে ১৯৭৫ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৩৬ বছরে প্রতি বছরের ক্ষতি যোগ করলে পুঞ্জীভূত যে ক্ষতি হবে তার সম্ভাব্য পরিমাণ আমার হিসেবে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮৯

১০. হিসেবপত্তরসংশ্লিষ্ট বিভ্রান্তি এড়ানোর স্বার্থে বাংলাদেশে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬-কে ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৫,৫০২ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০ টাকা হিসেবে); আর ২০০৫-২০০৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ বলা হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ২৩৩ কোটি ডলার (দেখুন: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, পৃ. ২৮৫-২৮৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)। আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার, যেটাই লেখচিত্র ১-এ দেখানো হয়েছে।

কোটি ডলার। ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন ৮ হাজার ৮৫৫ কোটি ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৪২৬ কোটি ডলার অর্থাৎ মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন আমাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ অথচ বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং তার উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে ২০১১ সালে আমাদের মোট দেশজ উৎপাদন হতো মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৭৩ গুণ বেশি (আমাদের হতো ৪২ হাজার ১৫৮ কোটি ডলার;লেখচিত্র ১ দেখুন)। শুধু তা-ই নয় 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনে কল্পনাতীত উর্ধ্বগামিতা অর্জন সম্ভব হতো—'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে ২০১১ সালে (২০০০ সালের স্থির মূল্যে) মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন ৫৮৮ ডলার আর মালয়েশিয়ার ৫,৩৪৫ ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ৯ গুণ বেশি), কিন্তু 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ঐ মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে হতো ৬,০৬১ ডলার (অর্থাৎ মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ৭১৬ ডলার বেশি)। মাথাপিছু ব্যাপারটা নেহায়েতই গড়ের ব্যাপার। আর "গড়" (average, mean) মাথাপিছু বিষয়টি সত্য গোপন করে অথবা অন্যভাবে বলা চলে তা লুকিয়ে রাখার ভালো পদ্ধতি সুতরাং 'গড়' হিসেব প্রকৃত উন্নয়নের খুব ভালো মানদণ্ড নাও হতে পারে যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য-বঞ্চনা ক্রমাগত বাড়ে (যেটাই আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই বাস্তব চিত্র)[১১]। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে একদিকে মাথাপিছু সম্ভাব্য দেশজ উৎপাদন হতো ৬,০৬১ ডলার আর অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্তর্নিহিত বেশিষ্ট্যের কারণেই বৈষম্য হ্রাস পেত অনেকগুণ অর্থাৎ এই মাথাপিছু উচ্চ দেশজ উৎপাদন হতো বৈষম্য হ্রাসকারী মাথাপিছু উৎপাদন।

এতক্ষণ যা বললাম তা মূলত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনের কথা। আসা যাক জাতীয় আয়ের (জিএনআই) প্রসঙ্গে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে ২০১১ সালে মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার[১২] আর মালয়েশিয়ার ১৫ হাজার ৫ কোটি ডলার (অর্থাৎ আমাদের তুলনায় ১.৫৬ গুণ বেশি; দেখুন, লেখচিত্র ৪)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ঐ একই সময়ে আমাদের মোট জাতীয় আয় হতো ৪২ হাজার ২১৪ কোটি ডলার যা মালয়েশিয়ার তুলনায় ২.৮ গুণ বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ৪.৪ গুণ বেশি। অন্যভাবে বলা যায় ২০১১ সালে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় হতো মালয়েশিয়ার চেয়ে ২৭ হাজার ২০১ কোটি ডলার বেশি, আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় সেটা হতো ৩২ হাজার ৬১৭ কোটি ডলার বেশি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে এ উল্লম্ফন বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের কারণেই ঘটত। একই সাথে বঙ্গবন্ধু

---

১১. সাম্রাজ্যবাদী সকল দেশসহ আজকের সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাথাপিছু দেশজউৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য-অসমতা ক্রমাগত বাড়ছে এবং একই সাথে গুটিকয়েক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানেরহাতে ক্রমবর্ধমান অতুচ্চ হারে যে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা যে সমাজে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, যা দূরনা করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদসহ বিভিন্ন ধনী দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়তে পারে—এসব বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন জোসেফ স্টিগলিজ, পল ক্রুগম্যান, জেফরি স্যাকস, থমাস পিকেটি, চাক কলিন্স, নোয়াম চমস্কি ও আন্দ্রে ভ্লাটচেক প্রমুখ।

১২. আমার হিসেবে ২০০০ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় ৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯ হাজার ৫৯৭ কোটি ডলার (১ ডলারে ৭০ টাকা হিসেব করা হয়েছে)। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের স্থির মূল্যে ২০১১ সালে মোট জাতীয় আয় বলা হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬ হাজার ১ কোটি ডলার। ২০০৫-২০০৬ সালের স্থির মূল্যে হিসেব করলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত ২০১১ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৫ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ১০ হাজার ৭৪ কোটি ডলার।

'বেঁচে থাকলে' জনবহুল বাংলাদেশে ২০১১ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ৫,৫৯৮ ডলারে দাঁড়াতো যেখানে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জাতীয় আয় ৫,১৯৯ ডলার আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশে তা মাত্র ৬৩৮ ডলার (২০০০ সালের স্থির মূল্যে)।

এ তো গেল মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিষয়াদি। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক ভালো পরিমাপক হলো মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (percapita real national income)। ১৯৭৩ সালে মাথাপিছু প্রকৃত আয় (পিপিপি ডলারে) ছিল মালয়েশিয়ায় ১,৪০০ ডলার আর বাংলাদেশে ৩০০ ডলার (লেখচিত্র ৬)। 'বঙ্গবন্ধুহীন' ২০১১ সালের, বাংলাদেশে তা ১,৮৯০ ডলার আর মালয়েশিয়ার ১৩,৮২২ ডলার অর্থাৎ মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে ২০১১ সালের মালয়েশিয়া একই সময়ের বাংলাদেশের তুলনায় ৭.৩ গুণ বেশি এগিয়ে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' ২০১১ সালের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় মালয়েশিয়াকে অতিক্রম করে ১৪,১০০ ডলারে দাঁড়াতো অর্থাৎ যেটা একই সময়ের মালয়েশিয়ার তুলনায় মাথাপিছু ২৭৮ ডলার বেশি আর 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় মাথাপিছু ১২,২১০ ডলার (অথবা ৭.৫ গুণ) বেশি (দেখুন, লেখচিত্র ৬)।

লেখচিত্র ৬: মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়: ১৯৭৩-২০১১
(২০০৫ সালের স্থির মূল্যে, পিপিপি ডলারে)

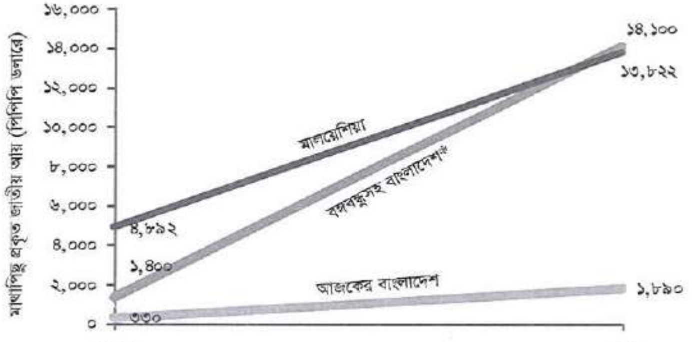

* প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত: ১৯৭৪ সালকে ভিত্তি বছর এবং বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উদ্ভাবিত উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারার যে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার কথা এতক্ষণ বিশ্লেষিত হলো তা অসম্পূর্ণ—পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ এতক্ষণ মোটাদাগে অর্থনীতির কিছু মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সমাজ পরিবর্তনের বিশেষত শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন বিষয়াদি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়নি। সমগ্রতার স্বার্থে সম্ভাব্য সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টির বিশ্লেষণ উত্থাপন জরুরি। আসলে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন (যার অধিকাংশই ইতোমধ্যে 'অনুসিদ্ধান্ত'সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে) বাস্তবায়নের ফলে আমূল পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটত রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আর সেই সাথে তার উন্নয়ন-প্রগতি দর্শন ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হলে কেমন হতো আজকের বাংলাদেশ সমাজের চেহারা? কেমনটি হতে পারতো শ্রেণি বিভক্ত সমাজের পরিবর্তিত শ্রেণিকাঠামো? আমার হিসেবে যা হতো তার কয়েকটি প্রবণতা-সম্ভাবনা নিম্নরূপ:

১. ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের চার দশক পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জের আব্দুল নূর, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা (যার জন্ম ১৯৭১ সালে) হোসনে আরাকে রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুটা বানিয়ে বিক্রি করে হাওড়ের জীর্ণ কুটিরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো না। ঢাকার নওয়াবগঞ্জের শহীদ আমির হোসেন, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা সেলিনা খাতুনকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পে কোদাল হাতে মাটি কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত সহানুভূতিশীল মানুষদের দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিষ্পেষিত হতে হতো না। বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভ্যান চালায় আর ভ্যানে বসে রাজাকার সিগারেট ফুঁকে বলে "এই ব্যাটা মুক্তিযোদ্ধা জোরে চালাতে পারিস না"—এ অবস্থা কখনও হতো না। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের কারণে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক (১৯৭৩ সালে) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বা তার স্ত্রী, কন্যা-পুত্র বা এখনও জীবিত পিতা-মাতাদের প্রায় ৫৮ শতাংশ আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকতেন না।[১৩]

২. মহান মুক্তিযুদ্ধে ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার ১০ লক্ষ নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাজে বসবাসের সকল সুযোগ সৃষ্টি করা হতো।

৩. ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক-মানবিক-চেতনায়ন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানব মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনা-সংশ্লিষ্ট বোধ বৃদ্ধি পেত এবং তা কার্যকরভাবে দেশ-সমাজ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা রাখতো। এসবের ধনাত্মক প্রতিফল হতো অনেক গভীর-বহুমুখী-বহুবিস্তৃত। এবং বংশপরম্পরা।

৪. সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় শাসন (local governance) উৎসাহিত হতো এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীরা যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতেন; নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসন ভার অর্পণ করা হতো এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপসহ বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতো। এ সবের প্রকৃত অভিঘাত যা দাঁড়াতো তা হলো জনগণই হতেন প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করত। আর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উন্নয়নে জনগণের প্রকৃত অংশীদারিত্ব বাড়তো অন্যদিকে দুর্নীতি-লুণ্ঠন-পরজীবী প্রকৃতির উন্নয়ন-প্রগতিবিরোধী কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ হয়ে যেতো। "মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করতেন"—এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শনের নিহিতার্থ।

৫. মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবার জন্য সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হেতু স্থূল জন্মহার (crude birth rate)এবং স্থূল মৃত্যুহার (crude death rate)—উভয়ই হ্রাস পেত। এসবের ফলে দারিদ্র্য-উদ্ভূত মৃত্যুহার বহুগুণ হ্রাস পেত। জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস পেলেও আজকের জনসংখ্যা হয়তো বা ১৫ কোটিতেই থাকতো কিন্তু জনসংখ্যায় বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটত। যা হতো তা হলো এই ১৫ কোটি জনসংখ্যাটি নিঃসন্দেহে

১৩. এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন জনতা ব্যাংক কর্তৃক গবেষিত ও প্রকাশিত আকর গ্রন্থ "একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাথা: খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারকগ্রন্থ", জনতা ব্যাংক লিমিটেড, জুন ২০১২, পৃ. ১-৮।

উচ্চতর গুণমান সমৃদ্ধ আলোকিত জনসম্পদে রূপান্তরিত হতো ফলে মানুষের জীবন যাত্রা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত মানে আমূল পরিবর্তন আসতো। আর এই রূপান্তর দেশজ মেধা-মননের বিকাশসহ দেশজ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চেহারাটাই পাল্টে দিতো (অন্তত শ্রমের অধিকতর ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে)। এ সবের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল হতো এত দিনে অন্য এক বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যেতো—যে বাংলাদেশকেই বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত করতেন।

৬. জনসংখ্যা ১৫ কোটি থাকতো তবে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়নের ফলে মোট জনসংখ্যায় গ্রামের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেত। গ্রাম তো আর আজকের মত গ্রাম থাকতো না। গ্রামের মানুষ নগরের নাগরিক সমাজের সকল সুবিধা গ্রামে বসেই পেতেন—পেতেন বিদ্যুৎ, পেতেন জ্বালানি সুবিধা, পেতেন সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সুবিধাদি, পেতেন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সুযোগ, পেতেন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, পেতেন আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গণযোগাযোগ ও ব্যক্তি যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সহজ অভিগম্যতা (অর্থাৎ যাকে বলে PSURA, providing scientific urban amenities in rural areas)। এ সবের ফল দাঁড়াতো একদিকে গ্রামের মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন। আর অন্যদিকে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এখন গ্রামে বাস করেন যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ (যেখানে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯২ শতাংশ একই সময়ে মালয়েশিয়ায় তা ছিল ৬৭.৩ শতাংশ)। উপরের বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শনটি গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিত্র আমূল পাল্টে যেতো—সংজ্ঞাগতভাবেই গ্রামকে আর প্রচলিত অর্থের গ্রাম বলা যেতো না এবং গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার এখন যে অনুপাতটা আছে (৭২:২৮) অর্থাৎ মোট ১৫ কোটি মানুষের ৭২ শতাংশ গ্রামে বাস করেন, আর বাকি ২৮ শতাংশ শহরে বাস করেন—সেটা ঠিক উল্টো হতো অর্থাৎ জনসংখ্যায় গ্রাম-শহরের অনুপাতটা হতো ২৫:৭৫—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রাম থেকে শহরে যে গলাধাক্কা অভিবাসন হচ্ছে এবং সেই সাথে গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসিত এই মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্প মজুরিতে কাজ করে প্রথমে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হচ্ছেন আর তারপরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন—এই প্রক্রিয়া থাকতো না; কারণ গ্রাম থেকে মানুষ কোনো কারণে শহরে এলেও সে মানুষ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানসমৃদ্ধ সুস্থ-সবল দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত মানুষ হিসেবে নিদেনপক্ষে শিল্পায়নের আওতায় থাকতেন এবং উচ্চতর জীবনমানের অধিকারী হতেন।

৭. বৈষম্য হ্রাসউদ্দিষ্ট ও গ্রাম-শহরের প্রভেদ দূরীকরণনিমিত্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৬) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত (১৯৭৫ সালে) গণমুখী সমবায় আন্দোলন (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামীণ সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ ১৯৭২ এর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরুত্বক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানার প্রতিশ্রুতি) ও কল-কারখানায় শ্রমিকের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে থাকতো না কোনো ভূমিহীন কৃষক, থাকতো না জল-জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত দরিদ্র কোনো জেলে, থাকতো না দরিদ্র কোনো মেহনতি শ্রমিক।

৮. বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্যের অনেকগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না, দারিদ্যের কিছু কিছু রূপ প্রশমিত হতো এবং আস্তে আস্তে সেগুলোও বিলুপ্ত হতো। বহুমুখী দারিদ্র্যের এসব রূপের মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প-মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারী-প্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ'-পেশা, চর-হাওর-বাওর-এর মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানসকাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য ইত্যাদি।[১৪]

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধু উদ্ভাবিত উন্নয়নদর্শন বাস্তব রূপ নিলে উপরে যা যা উল্লেখ করেছি সবকিছুই মোটামুটি তেমনটিই হতো—কারণ এ সম্ভাবনা বাস্তব, কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটাই সম্পূর্ণ বদলে যেতো। শ্রেণিসমাজের রূপান্তর ঘটত এ কারণেও যে ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাসসহ সমজাতীয় বিষয়াদি নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি।

আজকের 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটি কেমন আর কেমনটা হতো ঐ শ্রেণিকাঠামো যদি বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হতো (বঙ্গবন্ধু 'যদি বেঁচে থাকতেন')? এ সংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তর কেউ আগে করেছেন বলে আমার জানা নেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার হিসেবপত্তরভিত্তিক ২০১১ সালের দিকের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে ঐ কাঠামো কেমন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের হতো[১৫] তা যথাক্রমে ছক ২ ও ছক ৩-এ দেখানো হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। শুধু তা-ই নয় এ শ্রেণি বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতার অধোগতি হচ্ছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-

১৪. দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ এবং সংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে"। ঢাকা : মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

১৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক আমার হিসেব পত্তর নিয়ে যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে ভিন্নমত অথবা দ্বিমত পোষণকারীদের এ বিতর্কে অবর্তীণ হবার আগে অনুরোধ করবো এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে তারা বিশ্বাস করেন কিনা যে ১৯৭২ এর সংবিধানে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তারাই দরিদ্র। আর একই সাথে অনুরোধ করবো মানেন কিনা যে দারিদ্র্যের বহুরূপ আছে, দারিদ্র্য বহুমুখী (যেসব রূপের কথা উপরে 'জ' এ উল্লেখ করেছি)। এসব রূপের যেকোনো একটি বা একাধিক রূপ যার জন্য প্রযোজ্য তিনিই দরিদ্র, আর তার জীবনের অবস্থাটাই দারিদ্র্য।

ছক ২: আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো, ২০১১
(মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

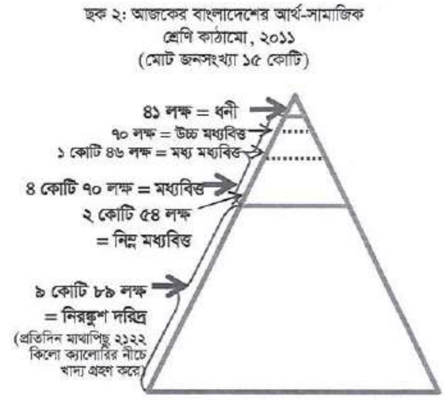

উৎস: আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত, রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", পৃ: ৪৭, ২০১২ সালের শ্রেণি পিরামিডকে ২০১১ সালের জন্য হিসেব করা হয়েছে।

ছক ৩: 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো, ২০১১ সাল নাগাদ কেমন হতো?
(মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি)

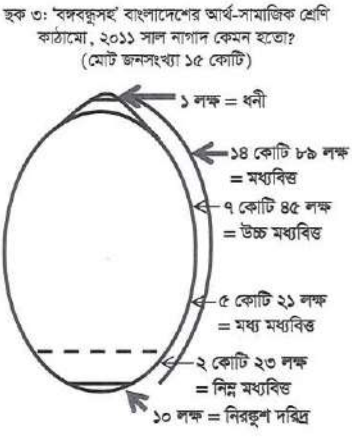

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত।

মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আর এদেরই মধ্যে ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের মোট বিত্তের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ (অর্থাৎ এরা হলো দেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর যে মই সে মইয়ের উপরের ১ শতাংশ মানুষ যাদের বলা হয় super-duper elite)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার অত্যুচ্চ এক শতাংশের এক সমীকরণ যাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আখ্যায়িত করেছেন"Of the 1%, for the 1%, by the 1%,"হিসেবে,এমনকি পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্বোচ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সর্বোচ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান তাদের দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক; যেখানে ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাব (lack of opportunity) হেতু ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে আর গরিবরা হচ্ছে আরও গরিব।

'বঙ্গবন্ধুহীন' ২০১১ সালের দিকের ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা নিম্নরূপ (ছক ২ দেখুন) : মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪১ লক্ষ) মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ হবে যাকে বলে সুপার-ডুপার ধনী, ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত (মোট ৮ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ), আর ৬৫.৯ শতাংশ নিরঙ্কুশ দরিদ্র (absolute poor, যাদের সংখ্যা ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। আর আর্থ-সামাজিক শ্রেণি মই-এর অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয় তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলেছে। এরা মোট জাতীয় পারিবারিক সম্পদ ও আয়ের (কালো টাকাসহ) ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। আর তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য (যা বহুমুখী)—বৈষম্য-অসমতা বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণি-সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বৃত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী-আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া এই rent-seekers গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত বাস্তব উন্নয়ন নীতি-দর্শনটাই এমন যে ধনী আরও ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে, এবং দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়ে নিঃস্ব হবেন আর তার পরে হবেন ভিক্ষুক (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে)। এসবই 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন" কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো—এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে ২০১১ সাল নাগাদ ১৫ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেমনটি দাঁড়াতো তা নিম্নরূপ (দেখুন ছক ৩, আর তুলনামূলক অবস্থার জন্য লেখচিত্র ৫ দেখুন): ২০১১ সালের বাংলাদেশে মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার যেখানে ২.৭ শতাংশ ধনী সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কমে দাঁড়াতো ০.০৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪১ লক্ষের বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ মানুষ); শ্রেণিকাঠামোর একদম নিচতলার নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যেখানে মোট জনসংখ্যার ৬৫.৯ শতাংশ (মোট ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ) সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াতো (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হত মাত্র ১০ লক্ষ); সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন ঘটত সেটা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিবর্তন রূপান্তর—২০১১ সালের হিসেবে মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশ (মোট ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ) যা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রায় তিনগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৯৯.৩ শতাংশে উন্নীত হতো (অর্থাৎ মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হতো ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ মানুষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' ২০১১ সালের বাংলাদেশের তুলনায় একদিকে ধনী মানুষের মোট সংখ্যা ৪১ গুণ কমে যেতো, অন্যদিকে নিরঙ্কুশ দরিদ্র মানুষের মোটসংখ্যা প্রায় ৯৯ গুণ কমে যেতো, আর মধ্যবিত্ত মানুষের মোটসংখ্যা ৩.২ গুণ বাড়তো। শুধু তাইই নয় যে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত সেই সাথে মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এখানেও ঘটত আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ১০.৬ গুণ (২০১১ সালের বাংলাদেশের ৭০ লক্ষ থেকে বেড়ে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষে উন্নীত হতো), মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ৩.৬ গুণ (মোট ১ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ২১ লক্ষ মানুষ), আর সংগত কারণেই মধ্যবিত্তের উপর তলায় এত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ২০১১ সালের তুলনায় প্রায় ১৪ শতাংশ হ্রাস পেত (মোট ২ কোটি ৫৪ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ২৩ লক্ষ মানুষে দাঁড়াতো)। অর্থাৎ এক কথায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে'

লেখচিত্র ৭: 'বঙ্গবন্ধুহীন' ও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক অবস্থা: দু'অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত মোট ১৫ কোটি মানুষের শতকরা হার, ২০১১

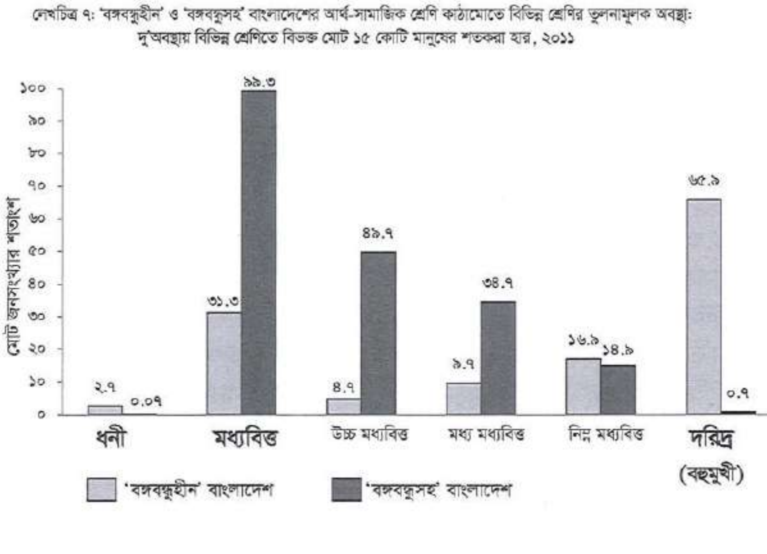

এবং "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিবাদী আমূল রূপান্তর ঘটত—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিপরীতে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিকভাবে অনেক গুণ বেশি উন্নতি করেছে একথা সত্য তবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে তেমন কোনো রূপান্তর ঘটেনি যা বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঘটত। আর তা ঘটত "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়নের কারণেই অন্য কোনো অলৌকিক কারণে নয়।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়ন হলে (যার ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি) বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে যে আমূল প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটত সে বিষয়ে নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হবার আগে আরও কিছু বিশ্লেষণাত্মক বিষয়াদি উল্লেখ জরুরি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী আরও কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

১. জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা কাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে 'রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হবে'—প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়। তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোনো বৈষম্য থাকত না।

২. ব্যক্তিগত-খানা-পরিবারপর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকতো তা বন্টন বৈষম্য হ্রাস নীতি অথবা বন্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে শ্রেণি-কাঠামো মই-এর উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোনো সুযোগই থাকত না। যেমন ঐ শ্রেণি মই-এর (class ladder) উপরের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবার-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের বড়জোর ১৫ শতাংশ (যা এখন ৭০-৮০ শতাংশ) আর শ্রেণি মই-এর সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ-এর হাতে থাকতো উক্ত সম্পদ ও আয়ের ৭-৮ শতাংশ। একই সাথে উল্লিখিত মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকতো ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। জাতীয় খানাভিত্তিক আয়ের চেহারাটাও আমূল পাল্টে অনুরূপ হতো। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোনো বৈষম্য থাকতো না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩. জন্মসূত্রে মানুষের দরিদ্র হবার কোনো সুযোগ থাকতো না। বংশ পরম্পরা দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকতো না। দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন (মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ) তার কারণ হতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপৎকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণভিত্তিক বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন" আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা (strong and efficient social protection system)নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারও দরিদ্র থাকার কোনো সুযোগই থাকতো না। এবং এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো।

৫. উপসংহার

এ প্রবন্ধে অর্থনীতি ও সমাজ বিকাশসংশ্লিষ্ট হিসেবপত্তরসহ যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি তা একদিকে দেখায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' আমরা সম্ভাব্য কোন উচ্চতায় পৌঁছে যেতাম আর অন্যদিকে দেখায় বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাব্য আংশিক প্রতিফল। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং সেইসাথে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে ২০১১ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সব মানদণ্ডেই আমরা কাঙ্ক্ষিত শিখরে পৌঁছে যেতাম। আমরা অতিক্রম করতাম আধুনিক মালয়েশিয়াকে—শুধু অর্থনীতির মানদণ্ডেই নয়, সামাজিক বৈষম্যহ্রাসের সকল মানদণ্ডে। কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করা হয়; ইতিহাসের চাকা উল্টে দেওয়া হয়। পিছিয়ে গেলাম, আমরা অনেক পিছে পড়লাম। এর জন্য কে দায়ী, কীভাবে দায়ী, কী তারা চেয়েছিল সে প্রসঙ্গে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ কিছু বিশ্লেষণ ইতোমধ্যে উত্থাপন করেছি, আর বাকিটা দায়িত্বশীল-দেশপ্রেমিক-জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ইতিহাস রচয়িতাসহ সামাজিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জনগণকে অবহিত করবেন। তবে এক্ষেত্রে বিশ্লেষণভিত্তিক আমার কয়েকটি উপসংহার নিম্নরূপ:

১. যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল তারাই বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের মূল পরিকল্পনাকারী ষড়যন্ত্রকারী।

২. সাম্রাজ্যবাদ—সমাজতন্ত্রবিরোধী তো বটেই এমনকি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদবিরোধী (secular nationalism) বিধায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদই 'বঙ্গবন্ধুসহ' সোনার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অভিযান চালিয়েছিল এবং তাদের এ কর্মকাণ্ড এখনও অব্যাহত।

৩. বঙ্গবন্ধুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে—তা মুক্তিযুদ্ধের আগের বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ৩৩ বছরে (১৯৩৮-১৯৭১) হোক আর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে (১৯৭২-১৯৭৫) হোক—যারা তাঁর আদর্শের শত্রু ছিল তারাই ঐ হত্যা পরিকল্পনাকারী।

৪. বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শত্রু—বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারীরাই প্রথমে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রধান শত্রু ছিল। এবং পরে তারাই মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের চেতনায় বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেওয়ার এজেন্ট, তারাই বাংলাদেশকে মর্যাদাহীন অকার্যকর রাষ্ট্র ও দরিদ্র দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করা ও তা জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল।

৫. বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারা শুধু বঙ্গবন্ধু নামক স্বাধীনচেতা-দেশপ্রেমিক মুক্ত-স্বাধীন দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ গঠনের দর্শন প্রণেতা ও তা বাস্তবায়নকারী এক ঐতিহাসিক বিশাল ব্যক্তিত্বকেই হত্যা করেনি, তারা হত্যা করেছে একটি দ্রুত উদীয়মান প্রগতিশীল রাষ্ট্র-সমাজের ভবিষ্যৎ।

৬. হত্যার সময়কাল হিসেবে বেছে নিয়েছিল সম্ভাব্য দ্রুততম হারে বৈষম্যহ্রাসসহ অর্থনৈতিক প্রগতির সময়কাল—এ ঐতিহাসিক সময় চয়নটিও গভীরতম এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন মাত্র অর্থাৎ এসব করে তারা হত্যা করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্রুততম বিকাশের ঐতিহাসিক যুগপর্বকে। আমার হিসেবপত্তরসহ ইতিহাসই তো যা কিছু বললাম তার সাক্ষ্য বহন করছে।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১১৫-১২৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

করোনাভাইরাস: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র*

আবুল বারকাত**

মূল শব্দ: *কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশ, কোভিড-১৯ ঝুঁকি না-কি অনিশ্চয়তা, কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা, কোভিড-১৯ ও জনস্বাস্থ্য, কোভিড-১৯ ও দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা, কোভিড-১৯ ও মানুষ বাঁচাও কর্মসূচি।*

১. করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ কী?

খোলা চোখে অদৃশ্যমান আকার-আয়তনে এত ক্ষুদ্র একটা জিনিস যে বিশ্বের প্রায় সব মানুষকে এতটা দৃশ্যমান অসহায় করতে পারে তার চাক্ষুষ প্রমাণ করোনাভাইরাস-১৯ বা কোভিড-১৯। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমার মতো সামাজিক বিজ্ঞানীর পক্ষে মন্তব্য করা ধৃষ্টতা এবং তা যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত না-ও হতে পারে। আর সে কারণেই করোনা ভাইরাস-১৯ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণাটা বলে রাখা প্রয়োজন। ধারণাটা এ রকম: আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য একটা সিস্টেম আছে, যাকে বলা হয় ইমিউন সিস্টেম। এ সিস্টেমকে তুলনা করা চলে বিশাল এক সশস্ত্র বাহিনীর সাথে। এ বাহিনীর কাজ হলো—হয় কোনো শত্রুকে শরীরে ঢুকতে না দেওয়া, নয়তো ঢুকলেও তাকে বাড়াবাড়ি করতে না দেওয়া, ক্ষতি করতে না দেওয়া, অথবা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। কিন্তু করোনা ভাইরাস এক মহাধড়িবাজ শত্রু, যে অতি সন্তর্পণে ফাঁকি দিয়ে বন্ধুবেশে আমাদের দেহে অনুপ্রবেশ করে—মুখ, নাক, চোখ দিয়ে। করোনার চারপাশে একটা দেয়াল বা পোশাক আছে। পোশাক পরা অবস্থায় সে যথেষ্ট 'ভদ্রলোক'। ধড়িবাজ এ ভদ্রলোকটি আশ্রয় নেয় আমাদের দেহের কোষে। থাকে সুযোগের অপেক্ষায় কখন সে আমাদের দেহকোষে ঢুকে তার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সুইচ অন করবে। এ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাওয়ামাত্রই একসময় তার পোশাকের মধ্যে যে আরএনএ ভাইরাস আছে তা বিস্তারের জন্য সে সুইচ অন করে। তখনই চালু হয়ে যায় ধড়িবাজ করোনাভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি। একপর্যায়ে সংখ্যা এতই বাড়ে যে

* এই প্রবন্ধের প্রকাশকাল ৩০ মার্চ ২০২০। অর্থাৎ প্রবন্ধটি প্রকাশ হয় বাংলাদেশে শনাক্তকৃত কোভিড-১৯-আক্রান্ত প্রথম ব্যক্তির (৮ মার্চ ২০২০) ২০ দিন পরে এবং লকডাউন শুরু হওয়ার (১ এপ্রিল ২০২০) ঠিক ২ দিন আগে। এই প্রবন্ধ একটি জনসম্পদ বা পাবলিক প্রপার্টি—যে-কেউ প্রবন্ধটির যেকোনো অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে উৎস উদ্ধৃতি বাঞ্ছনীয়।

** অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান অর্থনীতি বিভাগ; অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। ফোন: ০১৭৫৬১৪২৩১৫, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

আক্রান্ত কোষগুলো ভাইরাসকে ধারণ করার ক্ষমতা অতিক্রম করে এবং কোষটি ফেটে যায়। এভাবে এক-একটা করোনা ভাইরাস থেকে তৈরি হয় লক্ষ লক্ষ করোনা ভাইরাস। আর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দ্রুত জন্ম নেয় কোটি কোটি কোটি করোনা ভাইরাস, এবং আক্রমণ করে সে আমাদের শ্বসনতন্ত্রকে। একপর্যায়ে শ্বসনতন্ত্র তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করতে অক্ষম হয়ে যায়; বিকল হতে থাকে পুরো শ্বাসযন্ত্রটি। এরপর হয় অসুস্থতা; আর শ্বসনতন্ত্র দুর্বলতর হলে আশঙ্কা থাকে মৃত্যুর।

২. কোভিড-১৯: ঝুঁকি না-কি অনিশ্চয়তা?

বিজ্ঞানীরা এ ভাইরাসে আক্রান্ত অথবা আক্রান্ত-সম্ভাব্যদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভ্যাকসিন আবিষ্কার, চিকিৎসা, আক্রান্ত-সম্ভাবনা কমিয়ে আনা, বিস্তার রোধ, উৎপত্তির কারণ, ভাইরাসের বিস্তার রোধের পথ-পন্থা উদ্ঘাটন থেকে শুরু করে ক্ষতি হ্রাস কৌশল নিয়ে দিবানিশি কাজ করছেন। সিরিয়াস সমাজচিন্তক বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন, "'করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯' হলো আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান।" কথাটি বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু যেটা দিবালোকের মতো সত্য, সার্বজনীন সত্য, নিরঙ্কুশ সত্য—তা হলো এই ভাইরাস আমাদের জন্য সাধারণ কোনো ঝুঁকি বা রিস্কের কারণ নয়, এই ভাইরাস আমাদের জন্য—বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য নিরঙ্কুশ অনিশ্চয়তা বা আনসার্টেইনিটির কারণ। কারণ, যদি শুধু ঝুঁকি হতো তাহলে আমরা ঝুঁকির বিভিন্ন দিক পরিমাপ করতে পারতাম এবং সে মাফিক সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে পারতাম। কিন্তু অনিশ্চয়তা তো মাপজোখ করা যায় না; আর তাই অনিশ্চয়তার বিভিন্ন দিক মোকাবিলার বিজ্ঞানসম্মত পথ-পদ্ধতি বাতলানোও সম্ভব নয়—এসব নিয়ে পরীক্ষিত কোনো তত্ত্বও নেই। তবে আমার মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার এক বা একাধিক সিনারিও বা কল্পচিত্র বিনির্মাণ করে প্রতিটির বিপরীতে সম্ভাব্য সমাধান চিত্র আঁকতে হবে। এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় এক্ষেত্রে যে তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে তা হলো শক্তিশালী 'সাধারণ জ্ঞান' বা 'কমনসেন্স'। তবে বলে রাখি এ ধরনের কমনসেন্স যথেষ্ট 'আনকমন'। আর বিষয়টা যখন বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস-১৯ তখন তা আরও অনেকগুণ বেশি প্রযোজ্য। এটাও সত্য যে, খণ্ডচিত্র পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়, আবার খণ্ডচিত্রনির্ভর উপসংহার হতে পারে যথেষ্ট মাত্রায় বিভ্রান্তিকর অর্থাৎ বিষয়টিকে সমগ্রকতার নিরিখে দেখতে না পারলে সমাধানের কল্পচিত্রও হবে খণ্ডিত। এটাও বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা।

করোনা ভাইরাস-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা এবং সমাধানের লক্ষ্যে উত্থাপিত কল্পচিত্রটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব ভাবনা। কোনো প্রমাণিত তত্ত্ব অথবা প্রাক্-অভিজ্ঞতা উদ্ভূত নয়। তবে সমাধান-উদ্দিষ্ট ভাবনার পেছনে বেশকিছু যুক্তি আছে, যা পরে বলেছি।

আমার মূল বক্তব্যটি এ রকম: বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে হবে এবং তা সম্ভব; ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব।

৩. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে করণীয় কী, কেন, কীভাবে?

কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধে এখন পর্যন্ত ভাইরাস-আক্রান্ত রোগী নির্ণয় বা ডিটেকশন, সঙ্গরোধ বা কোয়ারেন্টাইন, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে চলা, সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, ব্যক্তিপর্যায় থেকে সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস শ্রম—আর এসবের পাশাপাশি ভ্যাকসিন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ও চিকিৎসা সহায়তা—সম্মিলিতভাবে এসবই একদিকে যেমন

দেশে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এবং অবস্থান-ঠিকানা সম্পর্কে সঠিক তথ্যচিত্র দেবে, তেমনি তা করতে পারলে এমন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে, যার ফলে রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে অথবা বিস্তার-গতি কমবে। অর্থাৎ বিস্তারের উর্ধ্বমুখী গতিপথ নিঃসন্দেহে নিম্নমুখী হবে।

একটি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কোনো দ্বিমত নেই যে, যেকোনোভাবেই হোক না কেন আক্রান্ত মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যাকে কমিয়ে আনতে হবে। আসলে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাটা কত হলে 'কম' বলা যাবে তা নিয়ে মতানৈক্য স্বাভাবিক। কারণ, প্রতি ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১০ জন আক্রান্ত হলে রোগতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আক্রান্ত 'কম' নাকি 'সহনীয়' নাকি 'বেশি'? সম্ভবত রোগতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা এ প্রশ্নের সম্ভাব্য সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। তবে আমাদের মতো আমজনতা যুক্তি দেখাতে পারে যে, ওইসব 'কম', 'সহনীয়', 'বেশি' নির্ভর করতে পারে জনসংখ্যার ঘনত্বের ওপর। অর্থাৎ ঢাকার ছোট একটা বস্তিতে যেখানে মানুষ গাদাগাদি করে বসবাস করেন সেখানে ঐ সংখ্যাটি 'বেশি'। আর যেখানে একলক্ষ মানুষ ১০ বর্গকিলোমিটারে মোটামুটি সমান দূরত্বে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছেন সেক্ষেত্রে ঐ একই সংখ্যাটি 'কম' বলে বিবেচিত হলেও হতে পারে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা বলতে পারব কোথায় কতটুকু জোর দিতে হবে। সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে পারব যে একই দেশের মধ্যে মানুষ চলাচলে কোথাও কোথাও একধরনের বর্ডার বা বেড়াজাল বানাতে হবে—অস্থায়ীভাবে হলেও। আর যদি ওই বিস্তার-এর সাথে 'কম', 'সহনীয়', 'বেশি'-র কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে জোর দিতে হবে সর্বত্র। সেক্ষেত্রে সম্পদও সে অনুযায়ী বেশি লাগবে। এসব নিয়ে আমার ব্যক্তিগত মত হলো "কম-সহনীয়-বেশি"—এসব বিবেচনা যতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার চেয়ে বহু শতগুণ গুরুত্বপূর্ণ হলো রোগের বিস্তার রোধ করতে হবে এবং বিস্তার-গতি কমাতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন হবে আত্মঘাতী।

আগেই বলেছি, সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা হতে হবে সম্মিলিত উদ্যোগে। তবে বিষয়টি যেহেতু মহামারিসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, সেহেতু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আর সেক্ষেত্রে প্রচলিত গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতি অথবা অসমন্বিত ব্যবস্থাপনা অথবা বহু অনভিপ্রেত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসংবলিত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ফল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করা, যা প্রচলিত গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

কঠোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মত হলো, পৃথিবীর অন্যান্য সফল দেশের মতো আমাদের দেশেও কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য মূল দায়িত্ব দিতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন জ্ঞানসমৃদ্ধ দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে, যিনি জনগণের পক্ষে সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করবেন; আর অন্যসব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-বিভাগ-দপ্তর-অধিদপ্তর থাকবে একক দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির অধীন এবং সম্পূর্ণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সমন্বয় ও পরিচালনের জন্য তিনি জরুরি অবস্থা বা ইমারজেন্সি বিবেচনায় প্রয়োজনে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা-নিরাপত্তা-জনপ্রশাসনসংশ্লিষ্ট সকলের নিঃশর্ত সর্বাত্মক সহায়তা নেবেন। এ যুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হবেন চিফ অব কমান্ড আর একক দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিটি হবেন চিফ অব অপারেশনস। এর কোনো বিকল্প নেই।

করোনা ভাইরাস-১৯ একদিকে যেমন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না, ঠিক অন্যদিকে করোনাভাইরাসের বিস্তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোধও হবে না। মনে রাখা দরকার যে বিশ্বে করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এ যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রথম ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন প্রথম ৬৭ দিনে, পরবর্তী ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন পরবর্তী ১৪ দিনে, তার পরের ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন পরবর্তী মাত্র ৪ দিনে। এ তথ্যই বলে দিচ্ছে যে, কোনো সময়ক্ষেপণ না করে প্রতিরোধ বেড়াজাল তৈরি করতে হবে সংশ্লিষ্ট

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে। ইতিমধ্যে যেসব দেশ কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছে, তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। এ নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়াদি নির্ধারণ করবেন কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ব্যবস্থার চিফ অব কমান্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় একক দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্ঞানসমৃদ্ধ-দেশপ্রেমিক ওই ব্যক্তি—যিনি হবেন চিফ অব অপারেশনস, যার অধীনস্থ হবে সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগ-দপ্তর-অধিদপ্তর-হাসপাতাল-চিকিৎসাকেন্দ্র-ল্যাবরেটরি এবং তার হাতেই ন্যস্ত থাকবে সর্বময় কর্তৃত্ব; একইসাথে তাঁর থাকবে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের একগুচ্ছ নিবেদিতপ্রাণ উপদেষ্টা।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কোনোরকম কালক্ষেপণ না করে ১৭ কোটি মানুষের আমাদের দেশে যা দরকার তা হলো: পিসিআর বা পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন মেশিনে মলিকুলার ডায়াগনোসিস-এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রি-এজেন্ট, যাতে প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ হাজার টেস্ট করা সম্ভব হয় (এ মুহূর্তে আমাদের দেশের তুলনায় অর্ধেক জনসংখ্যার দেশ জার্মানিতে প্রতিদিন টেস্ট হচ্ছে ৭০ হাজার); দ্রুত বা র‍্যাপিড টেস্টের জন্য কমপক্ষে ২ লক্ষ রোগ নির্ণয় কিট, যে কিটের কার্যকারিতা ইতিমধ্যে শতভাগ প্রমাণিত (অর্থাৎ পরীক্ষামূলক কোনো কিট নয়); সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, ল্যাব-বিজ্ঞানী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান-কর্মীবাহিনী নিয়োগ; নির্ণীত রোগীর চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন এবং গুরুতর রোগির জন্য ডেডিকেটেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা আইসিইউ ব্যবস্থা; প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রোগীর কফ-রক্ত ইত্যাদি বহনের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোল্ড চেইন ব্যবস্থা; দেশের ভেতরেই সংশ্লিষ্ট যেসব উপাদান-উপকরণ আছে তার পূর্ণ ইনভেন্টরি; রোগতত্ত্বীয় ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ডেটাবেইজ প্রতিষ্ঠা ও তা সংরক্ষণের ত্রুটিহীন নিচ্ছিদ্র ব্যবস্থা; হাসপাতাল-চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীদের ঢোকা এবং বেরোনোর জন্য রোগের ধরন অনুযায়ী (যাকে বলা হচ্ছে ওয়ানওয়ে ইন এন্ড আউট)—সংক্রমিত রোগী, সংক্রমণ-সম্ভাব্য রোগী, অসংক্রমিত রোগীর ঢোকার জন্য তিনটি ভিন্ন পথ আর বেরোনোর সময় সংক্রমিত রোগী ও অসংক্রমিত রোগীর জন্য দুটো ভিন্ন পথ; মানবস্বাস্থ্য, জীবজন্তু ও পরিবেশস্বাস্থ্যের ডেটা ইন্টিগ্রেশনের ব্যবস্থা; জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে জননিরাপত্তাব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন; চিকিৎসক-স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের জন্য পরীক্ষিত নিরাপত্তা পরিধেয় এবং প্রণোদনাব্যবস্থা; কার্যকর সঙ্গরোধব্যবস্থা; স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধি যেকোনো মূল্যে কঠোরভাবে পালনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা; সামাজিক মেলামেশা রোধ; ভাইরাস প্রতিরোধী সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা; বিদেশ থেকে রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ-ডাক্তার-নার্স আনা; অসংক্রমিত রোগ যেমন ক্যানসার, কিডনি, হার্ট, ডায়াবেটিস—যেসব রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে দেশে প্রতিবছর ৫০ লক্ষ অদরিদ্র মানুষ দরিদ্রদের কাতারে যুক্ত হচ্ছেন—এসব রোগের চিকিৎসা চালু রাখা; চালু রাখা গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর চিকিৎসাসেবা; গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের কো-মরবিডিটি অর্থাৎ অন্য রোগে আক্রান্ত মানুষ যদি করোনাভাইরাসের কবলে পড়েন, সেক্ষেত্রে তার মৃত্যুসম্ভাবনা অথবা গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসাব্যবস্থা সাজানো। এককথায় দরকার হলো সমগ্র স্বাস্থ্য সেক্টর ও জনস্বাস্থ্য সেক্টরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া ও সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা।

করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে যেসব কর্মকাণ্ডের কথা বললাম তা বাস্তবায়নে সম্পদ ব্যয় করতে হবে। অর্থ লাগবে। সম্ভাব্য কী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ (ব্যয় নয়) করতে হবে এবং ওই অর্থ আহরণের উৎস কী হতে পারে? আগেই বলেছি হিসেবটি খণ্ড চিত্রভিত্তিক নয় সমগ্রক চিত্র বিবেচনায় রেখেই করতে হবে। এ ধরনের কল্পচিত্র অনুযায়ী আমার হিসাবে প্রয়োজন হবে কমপক্ষে ১ লক্ষ কোটি টাকা। সম্পূর্ণ অর্থ একইসাথে এখনই প্রয়োজন হবে না, কারণ বেশ কিছু জিনিসপত্তর যেমন রি-এজেন্ট,

বেতনভাতা, পরিবহন ব্যয়—এসব সামনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাগবে। আনুমানিক ১ লক্ষ কোটি টাকার এ বিনিয়োগ কোথা থেকে আসতে পারে? আমার জানামতে বৈশ্বিকভাবে ইতিমধ্যে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ তহবিল গঠন করা হয়েছে, যা আক্রান্ত দেশগুলো ব্যবহার করবে। আর পাশাপাশি এ বাবদ প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট ও চ্যারিটি সংস্থা। অর্থাৎ এ মুহূর্তে করোনা প্রতিরোধে বৈশ্বিক তহবিলে আছে কমপক্ষে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (এ অঙ্ক বাড়বে)। যৌক্তিক কারণেই বৈশ্বিক জনসংখ্যা অনুপাতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা হওয়া উচিত ওই ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কমপক্ষে ৩ শতাংশ। অর্থাৎ ন্যায্যত আমাদের পাওনা হতে পারে কমপক্ষে ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। এ হিস্যা পেতে হলে প্রয়োজন হবে শক্তিশালী অতি জরুরি ফলপ্রদ কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড। এক্ষেত্রেও ভ্যানগার্ড হতে পারেন বিশ্বসমাজে আদৃত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈশ্বিক তহবিল থেকে ওই অর্থ পাওয়া গেলে ঘাটতি থাকবে ৮৭ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। ঘাটতি এ অর্থ পূরণের উৎস হতে পারে জরুরি অবস্থায় সম্পদশালীদের ওপর কর অর্থাৎ ওয়েলথ ট্যাক্স আরোপ (৩০ হাজার কোটি টাকা), পাচারকৃত অর্থ ও কালোটাকা উদ্ধার (৬০ হাজার কোটি টাকা)। এখানে অর্থনীতিশাস্ত্রের কয়েকটি প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য কথা উল্লেখ জরুরি: ওয়েলথ ট্যাক্স বৈষম্য হ্রাস করে; অর্থ পাচার ও কালোটাকা বৈষম্য বাড়ায়; সম্পদশালীদের ওপর ট্যাক্স কমালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে না; সমাজের নিচতলার ৯০ শতাংশ মানুষের ওপর ট্যাক্স কমালে তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এই ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগফল হবে বহুমুখী পজিটিভ—স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদেই। স্বল্প মেয়াদে আক্রান্ত মানুষ বাঁচবে, সংক্রমণ হার কমবে, সংক্রমণ বিস্তার রোধ হবে, কম্যুনিটিতে ছড়িয়ে যাওয়া কমবে, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, মানুষের মানসিক দুশ্চিন্তা-উদ্ভূত দুর্দশা কমবে, কো-মরবিডিটি (সহ-অসুস্থতা) কমবে একই সাথে কমবে সংশ্লিষ্ট মৃত্যুহার। আর দীর্ঘ মেয়াদে লাভ হবে অনেক সুদূরপ্রসারী—ভাইরাস প্রতিরোধসংশ্লিষ্ট সুরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। সমগ্র স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে, বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী আমাদের অবস্থান বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১১৩তম, যেখানে রোগ প্রতিরোধসংশ্লিষ্ট সূচক জীবাণুবাহিত অসুখ-বিসুখ, বায়োসিকিউরিটি, বায়োসেফটি, জীবাণু কন্ট্রোল প্র্যাকটিস ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, স্বাস্থ্য সিস্টেম, র‍্যাপিড রেসপন্স, রোগ নির্ণয় ও রিপোর্টিং—এসব সূচকে আমাদের অবস্থান বেশ নিচের দিকে। ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থাকে উন্নততর করবে, যার অভিঘাত হবে কল্পনাতীত পজিটিভ এবং বংশপরম্পরা। নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বলয় দৃঢ়তর হওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জনস্বাস্থ্যসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক বলয় সুসংহত হবে; দৃঢ়তর হবে সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা সুশাসনের পূর্বশর্ত; দুর্বল প্রতিষ্ঠান সবল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে, যা টেকসই প্রবৃদ্ধি ও প্রগতি নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যের জন্য এ বিনিয়োগ হবে উপরিপাওনা অর্থাৎ তখন তাদের এ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন পড়বে না; শুধু রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। এ বিনিয়োগ সুস্থ মানবসমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি সুপ্রশস্ত করবে, যা ভবিষ্যতে জনসমৃদ্ধি ও মানবকুশলতা নিশ্চিত করবে। এককথায় এ হলো সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের আবশ্যিক বিনিয়োগ।

৪. কোভিড-১৯: 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচি কী, কেন, কীভাবে?

আসা যাক আমার দ্বিতীয় বর্গের বক্তব্যে, যেখানে আমি বলেছি "ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব"। সম্ভাব্য অপরিমেয় ক্ষতিটা হতে পারে কীভাবে? মানুষের অকাল মৃত্যু ও বিভিন্ন মেয়াদি বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার কথা তো আগেই বলেছি— এসব হলো প্রথম ক্যাটাগরির ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ক্ষতিটা হবে একই সঙ্গে পাশাপাশি, তবে ক্ষতির রূপটা হবে ভিন্ন এবং সম্ভবত ক্ষতির গভীরতা হতে পারে কল্পনাতীত ও অপরিমেয়। বিষয়টার উদ্ভব হবে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ার কারণে। ইতিমধ্যেই আমরা এসব লক্ষ্য করছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায়: শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (বিশেষত বস্ত্র, গার্মেন্টস, লেদার ইত্যাদি); বন্ধ হচ্ছে সবধরনের ট্রান্সপোর্ট; বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাত—রিকশা, ভ্যানসহ শহর-উপশহর-গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা জীবিকানির্বাহ কর্মকাণ্ড; বেকারত্ব বাড়ছে এবং বাড়বে—সর্বত্র; কৃষক কৃষিজ ফসল বিক্রির জন্য হাটবাজারে যেতে পারছেন না, কারণ করোনার কারণে হাট বসতে দেওয়া হচ্ছে না; বৈদেশিক বাণিজ্যে-আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই কমছে; ইতিমধ্যে বস্ত্র ও গার্মেন্টসের প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে; ব্যাংকের এলসি প্রায় স্থবির; প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কমে আসছে—এসবই বড় ধরনের অনিশ্চয়তা এবং এ অনিশ্চয়তা কতদিন চলবে, তা কেউই জানে না। আমার মতে, এসব কারণে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টা সমাগত—এপ্রিল-মে মাসের মধ্যেই সম্ভবত—তা হলো হয়তো বা খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি থাকবে না; কিন্তু গ্রাম-শহরনির্বিশেষে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে খাবার থাকবে না, তারা সন্তান-সন্ততিসহ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হবেন। কারণ, যেসব মানুষ (খানা) 'দিন আনে দিন খায়' তাদের 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে গেলে, তারা খাবেটা কী? আর কাজ না থাকলে তো 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে যাবে।

এ এক সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো ক্ষুধার্ত-অভুক্ত-অর্ধভুক্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাতে অর্থ থাকুক বা না থাকুক তাদের চুলায় নিম্নতম প্রয়োজনমতো খাবার থাকতেই হবে। সরকারি পরিসংখ্যানানুযায়ী এসব মানুষের সংখ্যা ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে কমপক্ষে ৩ কোটি ৪০ লাখ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন "দিন আনে দিন খায়" মানুষের কাজ থাকবে না, তখন এসব মানুষের সংখ্যাটা দাঁড়াবে আনুমানিক ৬ কোটি। অর্থাৎ এরা হলেন দেশের মোট খানার আনুমানিক ৩৭ শতাংশ। এই ৬ কোটি মানুষ বাস করেন আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ খানায়, যার মধ্যে গ্রামে ১ কোটি খানা আর শহরে ৫০ লক্ষ খানা।

যদি করোনা ভাইরাস অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হয়, তাহলে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে খাবার সরবরাহ সম্ভব হবে না। আসা যাক কিছু হিসেবের কথায়। মূল কথা হলো এসব দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত প্রতিটি মানুষকে খাদ্যবাবদ দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৭৫ টাকা বরাদ্দ করতে হবে (হিসেবটি করা হয়েছে খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর দারিদ্র্যের নিম্নরেখার সাথে মূল্যস্ফীতি যোগ করে)। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সারাদেশে লাগবে ৪৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাসে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৬ মাস চালাতে হলে লাগবে ৮১ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য অনিশ্চিত এ অবস্থা পরিবর্তিত হলে অথবা নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে এ অঙ্ক কম-বেশি হতে পারে। উল্লেখ্য, যেখানে শিল্পমালিকদের জন্য আপাতত ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আর্থিক ও নীতি সুবিধাসহ আরো অনেক সুবিধে দিতে হবে, সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষ বাঁচাতে তাদের মধ্যে খাদ্যবাবদ ৬ মাসের জন্য ৮১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ

যেকোনো বিবেচনায় ন্যায্য বরাদ্দ। আবার ঐ বরাদ্দফল কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুঁজির মালিকেরাই আনুপাতিক বেশি হারে ফেরত পাবেন। কারণ, তাদের দরকার হবে সুস্থ শ্রমিক। আর ঐ সুস্থ শ্রমিকেরাই দেশজ উৎপাদন বাড়াবেন এবং একই সাথে সত্যিকার অর্থে সুস্থ থাকলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে, বাড়বে প্রবৃদ্ধি। শেষ বিচারে আনুপাতিক হারে এসবের বেশি অংশের ফল ভোগ করবেন পুঁজির মালিক ও তাদের স্বার্থবাহীরাই।

সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়াতে জরুরি খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুটো বিষয় নির্ধারণ জরুরি। প্রথমত, যেসব খানা খাদ্য বরাদ্দ প্রাপ্তির যোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ন; দ্বিতীয়ত, তালিকাভুক্ত খানার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বরদাস্ত না করা। দুটো কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং হতে হবে তুলনামূলক অভিযোগহীনভাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—এখনই। তালিকা প্রস্তুতের নীতিমালা হতে হবে জনগণের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সময়নির্ধারিত। তবে এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত হলো গ্রাম এবং শহরে যেসব খানা নারীপ্রধান যার প্রায় শতভাগই আর্থিকভাবে দুর্বল ও ভঙ্গুর, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তালিকাভুক্ত হবেন (তবে কেউ সঙ্গত কারণে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে না চাইলে তাকে বাদ দেওয়া উচিত), তালিকাভুক্ত হবেন সরকারি হিসাবের সব দরিদ্র খানা, সেসব খানা যাদের কোনো সদস্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে পারেনি অথবা পারছে না, এবং সেসব খানা যাদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো আবাসন নেই এবং গৃহহীন খানা, শহরের বস্তিবাসী এবং ভাসমান মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট অংশ, করোনা আক্রান্ত অথবা সম্ভাব্য-আক্রান্ত সকল দরিদ্র খানা, চর-হাওড়-বাওড়ের মানুষ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এবং যারা ইতিমধ্যে বয়স্কভাতাসহ অন্যান্য ভাতা পাচ্ছেন তাদের বাদ না দেওয়া। এ তালিকা প্রণয়নে দল-মত-গোষ্ঠী-সমাজ যেন কোনোভাবে প্রভাব না ফেলতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না। তালিকাটি গ্রামে গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে, মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যোগ্য কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে কালক্ষেপণ ও গাফিলতি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

এর পরের প্রশ্ন—তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা খাবার কীভাবে পৌঁছাবে? বরাদ্দকৃত অর্থ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন ব্যাংকিং অথবা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে যে একই খানার জন্য যেন শুধু একটি (একাধিক নয়) মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও ফলপ্রদ সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী অথবা সামাজিক সেফটি নেট কর্মসূচির মাধ্যমে যে শতাধিক ধরনের বরাদ্দ মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেটা অনুসরণ করা যেতে পারে। খাদ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা বরাদ্দকৃত খাদ্য সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী বিলি-বণ্টন ও মনিটরিং ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ নেবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জনগণের সেবা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তা-শৃঙ্খলা ও আইনি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। কেন্দ্রীয়ভাবে রিপোর্ট যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে, যিনি প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে সরাসরি রিপোর্ট করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ খাদ্যব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চিফ অব কমান্ড হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিটি হবেন চিফ অব অপারেশনস। অর্থাৎ সমগ্র মেকানিজম হবে মোটামুটি "করোনা ভাইরাস-১৯ প্রতিরোধ" কার্যক্রম যে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে, ঠিক একই ধরনের গুরুত্ব দিয়ে।

এখন প্রশ্ন—অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বাঁচাতে ৬ মাসের খাদ্যসহায়তা বাবদ যে ৮১ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ লাগবে তা কোথা থেকে আসবে? এ প্রশ্নের পাটিগাণিতিক উত্তর তেমন কঠিন নয়।

আমাদের চলমান ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট বাজেট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা হলো উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ, যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। মোট ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সর্বমোট যে পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ দেওয়া হয় তার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় প্রথম ১০ মাসে। আর পরের ২ মাস অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি প্রবল অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় মিস-অ্যালোকেশন অথবা অপচয়। এ হিসেবে চলমান উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ এখনো ব্যয় হয়নি। বরাদ্দকৃত অব্যয়িত এ অর্থের মোট পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৮৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। যদি ধরেও নিই যে আগামী ২ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অথচ অব্যয়িত একাংশ ব্যয় হতেই হবে (যেমন খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, গৃহায়ণ, মহিলা ও শিশু, জনশৃঙ্খলা), সেক্ষেত্রেও বর্তমান জরুরি অবস্থায় ওই অব্যয়িত অংশের সর্বোচ্চ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়কে যুক্তিসঙ্গত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ তারপরেও হাতে থাকবে ৭৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। এ মুহূর্তে যে কাজটি করা প্রয়োজন বলে মনে করি, তা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই উল্লিখিত ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে খাত-উপখাতওয়ারি এ তথ্যাদি জেনে নিন যে, প্রত্যেকের কাছে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অথচ এখনো ব্যয় হয়নি এমন অর্থের পরিমাণ কত; নির্দেশনা দিন আগামী ২ মাসে ব্যয় না করলেই নয় এমন খাত-উপখাতগুলো কী কী এবং সংশ্লিষ্ট যুক্তি। দেখবেন অর্থের অভাব তো হবেই না, বরঞ্চ অর্থবছরের শেষের দিকে 'ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি' উল্টে যাবে। এটাও তো হতে পারে কোভিড-১৯ এর কারণে বহুদিনের পচনশীল বাজেট বাস্তবায়ন সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এসবের পাশাপাশি দেশের মধ্যেই সরকারি রাজস্ব অর্থাৎ অর্থ আহরণের বহু উৎস আছে, যাতে কখনো হাত দেওয়া হয়নি। যেমন গত বাজেট বক্তৃতায় (২২১ অনুচ্ছেদে) মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন "বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই...। অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না"। একইসাথে সামনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধপরবর্তী সময়ে খাদ্যসহায়তা, কর্মসৃজনসহায়তা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণসহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহায়তার লক্ষ্যে বহু ধরনের বৈশ্বিক তহবিল গঠিত হবে। আগেই বলেছি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমরা এসব তহবিলের ৩ শতাংশ হিস্যা পেতে পারি। তাহলে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ৬ মাসের খাদ্যসহায়তা বাবদ ৮১ হাজার কোটি টাকা আহরণ আদৌ কোনো কঠিন কাজ হবে না।

আগেই বলেছি, মানুষের 'কাজ' না থাকলে 'দিন আনা দিন খাওয়া' বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে করি 'কাজ' নিয়ে নিরাশ না হয়ে পথ-পন্থা খুঁজতে হবে। এ ধরনের অবস্থায় কেইনসীয় সমাধান পথ যথেষ্ট কার্যকর। আর তা হলো অবস্থা একটু উন্নতির দিকে গেলে গ্রাম-শহরে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগে পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের কর্মকাণ্ড চালু করা। হতে পারে তা রাস্তার কাজ, নির্মাণকাজ, নদ-নদী খননের কাজ, পুকুর-দিঘি খননের কাজ, স্কুলঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ। কাজ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে হবে। কাজ নিয়ে উদ্ভাবনের স্বরূপ সময়ই বলে দেবে।

আরও একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো ধরনের সিন্ডিকেশন বরদাস্ত না করা। অতীতের ইতিহাস বলে, সিন্ডিকেটওয়ালারা বিভিন্ন অজুহাতে অযথা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য বাড়িয়ে বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ

থেকে হাতিয়ে নেন। ফলে মানুষ দরিদ্রতর হয় এবং বৈষম্য বাড়ে। করোনা আক্রান্তকালে ও পরবর্তী কিছু কাল এসবের সম্ভাব্য মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে, যদি শক্ত হতে তা দমন না করা যায়। এ ধরনের সবকিছু ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে। আর এসবের পাশাপাশি এ মুহূর্তে (মার্চ-এপ্রিল) যেসব চৈতালি ফসল মাঠে আছে অথচ কৃষক হাটবাজারে বিক্রি করতে পারছেন না, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল, গম, মরিচ, আর সামনে (মে মাসে) যে ফসল উঠবে যেমন ভুট্টা, ধান ইত্যাদি সেসব যেন সরকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূর করার এটাও এক সুযোগ। অন্যথায় কৃষক আবারও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনস্থ হবে, আর রাজত্ব করবে সিন্ডিকেটওয়ালারা। এর সবই দমন করতে হবে—কঠোর হাতে।

আমার প্রস্তাবিত 'মানুষ বাঁচাও' কল্পচিত্র কর্মসূচিতে আরও দু-একটি বিষয় বলে রাখা জরুরি: কৃষিখাতকে সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য খাত হিসেবে বিবেচনা করে তদানুযায়ী যতদিন করোনা ভাইরাস ও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আমরা মুক্ত না হচ্ছি, ততদিন কৃষিখাতে সবধরনের উৎপাদন প্রণোদনা থেকে শুরু করে ঋণ মওকুফ, ক্ষুদ্রঋণের সুদ মওকুফ, স্বল্প সুদে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বিনা সুদে কৃষিঋণ প্রদানসহ কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির সকল কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু রাখতে হবে। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন কর্মসূচি ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাস-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার আগেই শুরু হয়েছে। আগামী বাজেটে করোনা ভাইরাস-১৯ এর ঘাত-প্রতিঘাতসহ সংশ্লিষ্ট 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বাজেটের প্রচলিত-গতানুগতিক কাঠামো পরিবর্তিত হবে। অর্থনীতি আবারও জেগে উঠবে, কিন্তু ভঙ্গুর হয়ে পড়বে অনেক খাত-ক্ষেত্র-শিল্প-ব্যবসা।

৫. কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও 'মানুষ বাঁচাও': শেষ কথাটা কী?

ইতালিসহ কিছু দেশে ব্যাংকিং সংকটের আশঙ্কা আছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার আঘাত ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান, একই সাথে এ মুহূর্তে ৩০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বেকারত্ব-ইন্সুরেন্স দাবি করছেনযা আরও বাড়বে; গণচীনে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৩.৫ শতাংশ কমেছে; যুক্তরাজ্যে করোনার আঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে—সব মিলিয়ে বৈশ্বিক আর্থসামাজিক অবস্থা দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে; সম্ভবত পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ ও মেরুকরণ। আমরা এসব ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাত থেকে মুক্ত নই। সুতরাং আমাদেরও ভাবতে হবে—কঠিন ভাবনা; কারণ, 'অনিশ্চয়তার' মধ্যে সুস্থ ভাবনা শুধু মানসিকভাবেই নয় যৌক্তিক কারণেই সহজ নয়। জটিল এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথরেখা বিনির্মাণে ধৈর্য্য, সততা ও জ্ঞানবুদ্ধির সম্মিলনের বিকল্প নেই। আমরা এখন যে সময় পার করছি তার প্রাক্-অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। অনিশ্চিত সময়টা হলো 'ডিজিটাল সংযোগের যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট"। সুতরাং মানব উন্নয়নসংশিষ্ট সকল চিন্তা-ভাবনা-পরিকল্পনায় এ বিষয়টি মূল নীতি-কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আমার আপাত শেষ কথা: করোনা ভাইরাস-১৯ প্রতিরোধে 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির যে কল্পচিত্র প্রস্তাব করেছি, তা যথেষ্ট মাত্রায় যৌক্তিক। কারণ, একদিকে যেমন মানুষকে ভাইরাস থেকে প্রতিরোধ করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে কোনোভাবেই দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করা যাবে না এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলে উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘোরাতে হবে। আমরা এসব মোকাবিলায় সক্ষম। কারণ, আমাদের নেতৃত্বের শিখরের

ব্যক্তিটির মানবিক দায়বোধ সম্পর্কে কারও সন্দেহ নেই। আর এসব মোকাবিলা করতে সক্ষম হলে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সমন্বয়-প্রভাব বা স্পিল ওভার ইফেক্ট হবে উচ্চ মাত্রায় ধনাত্মক; শ্রম ও পুঁজির বাইরে উন্নয়নে আরও যেসব উপাদান কাজ করে তার প্রভাব হবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি, যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা; মোট দেশজ উৎপাদন-এর ভাবনাজগতে নির্ধারক স্থান করে নেবে মানুষের জীবনসমৃদ্ধি অথবা জীবনকুশলতা; অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ফ্যাক্টরের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাক্টর বেশি প্রভাব ফেলে—আমরা সেদিকেই এগোবো; এবং সর্বশেষ কথা—আমাদের দেশে বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়নি, সেসব গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসংবলিত প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে; ফলে সুশাসন নিশ্চিত হবে, নিশ্চিত হবে শুধু জবাবদিহি নয় মানবিক দায়বদ্ধতাও। শেষ বিচারে আমরা অবশ্যই পারব এমন এক সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি বিনির্মাণ করতে, যা "আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান"-এ দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম, যা সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে "ডিজিটাল যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট" কাটিয়ে উঠতে সক্ষম, এবং যা শেষ বিচারে প্রকৃতির প্রতি আস্থা-সম্মান রেখে মানুষের জীবনসমৃদ্ধি ও জীবনকুশলতা বাড়াতে সক্ষম।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১২৫-১৪৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে নীতি ও ন্যায্যতা চিন্তার ভূমিকা এবং অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতার ভাবনা

আহমেদ জাভেদ*

মূল শব্দ: *নীতি ও ন্যায্যতা ভাবনা, অমর্ত্য সেন ও ন্যায্যতা, চুক্তিমূলক ন্যায্যতা, সামাজিক চুক্তি, সমস্থিতি, ন্যায্যতা প্রশ্নে হবস, জিউম, রলস ও স্মিথ।*

১. ভুল থেকে শেখা

প্রথম ঘটনা

২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখের ঘটনা। আমি ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রী। দু সপ্তাহ আগে আমি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছি। ভাড়ায় চালিত একটি সিএনজি অটোরিকশায় উঠলাম আমরা দুজন। ভাড়া ঠিক হলো ২০০ টাকা। ভেবেছিলাম যাত্রাপথে সিএনজি চালককে অনুরোধ করে থেমে এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলে নেব। কিন্তু বিধিবাম। সে রকম কোনো কিছু আসার আগেই সিএনজিটির ব্রেক বা ক্লাচ-এর (কোনো একটি হবে) তার ছিঁড়ে যায়। সিএনজির চালক ভাইটি বললেন যে, এখন গাড়ির ইঞ্জিন গরম কাজ করা যাবে না। সবমিলিয়ে দেড় ঘন্টার বেশি লাগবে। আমরা অপেক্ষা বরতে রাজি হলাম। কিন্তু তিনি সেটি গ্রহণ করবেন না। তিনি বললেন, আপনারা অসুস্থ রোগী, হাসপাতাল যাচ্ছেন, আপনাদের দেরি করানোটা ঠিক হবে না। তার বিবেচনা বোধ দেখে আমরা দুজনেই হতবাক। তিনি একইরকম অন্য একটি সিএনজি অটোরিকশা থামালেন। কিন্তু নতুন চালকের জন্য ৪০ শতাংশ পথ বাকি থাকলেও তিনি ভাড়া হাঁকলেন দেড় শ টাকা। অতপর নতুন চালক বললেন আমি ১২০ টাকা হলে যাব, অন্যথায় না। এরপর আমি পুরোনো সদয় চালকটির দিকে তাকালে আমাকে তিনি বললেন, আমাকে ১০০ টাকা দিলেই চলবে! আমরা বললাম এটি অপনার জন্য কম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে নগদ অর্থ না থাকায় সে টাকাটুকুও নতুন চালক থেকে আমাদের ধার করে পুরোনো চালককে দিতে হয়। এতে আমার স্ত্রী ও আমি দুজনেই বেশ বিব্রত বোধ করছিলাম। সংবেদনশীল সেই পুরোনো চালকটি কষ্ট পেলেও মুখে হাসি নিয়েই আমাদের সঙ্গের ব্যাগগুলো নতুন বাহনে উঠিয়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, দ্য পিপল্স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন
ফোন: ০১৯১৪৪৪৪৩২০, ই-মেইল: ronieleo@gmail.com

নতুন বাহনে চড়ে আমাদের বারবারই আগের চালকটির মায়াভরা মুখটির কথা মনে হচ্ছিল। অবশেষে এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠিয়ে দ্বিতীয় চালকের ভাড়া দেওয়ার সময় ১২০ পরিবর্তে ২০০ টাকা দিয়ে দিলাম। এবার আমার স্ত্রী আগের চেয়ে বেশ সরব হলো, বলল—এটি কোনোভাবেই 'ন্যায্য' হয়নি। আমারও মনে হলো, ও তো ঠিকই বলছে—এটি ঠিক হয়নি। কিন্তু কেন? এই ঘটনাটির বিশ্লেষণ দিয়েই ন্যায্যতার আলোচনা শুরু করব।

কোনো কাজ যখন আমরা করি, তার মূল্যায়ন আমরা কীভাবে করি? কাজটি করার আগে যেসব বিবেচন করি, আর কাজটি করে ফেলে পেছনে ফিরে দেখে যখন সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করি—এই দুই বিবেচনার ভিত্তিগুলোই বা কী? অতীতের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কি আমরা 'নিস্পক্ষ দর্শক' হিসেবে করতে পারি? বিশেষ করে এই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটানোর প্রবল উপযোগিতার আকর্ষণ থেকে মনকে নিস্পক্ষ দর্শকে পরিণত করে সু-স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি? আমাদের যাত্রাপথের ঘটে যাওয়া ঘটনায় কি আমরা অতীত সিএনজি চালক ভাইটির জন্য কিছুটা 'ইচ্ছাকৃত' ও অসংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নিইনি? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, হ্যাঁ করেছি। যেটি আমার স্ত্রীর বোধে ধরা পড়েছে এবং এটি নিয়ে সে কথা বলতে শুরু করেছে। যেটুকু পথ আমরা পুরোনো চালকের ঘাড়ে চড়ে এলাম, তার অবদানটির কথা বর্তমান উপযোগিতার বা বাড়তি তৃপ্তির টানে তা 'উপেক্ষা' করলাম।

উল্লিখিত ঘটনাটির ভেতর কী কী রয়েছে, তা নিয়ে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। আমরা দুজন গাড়ি চালকের প্রতি কোনো রকম বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা, সমাজের বিদ্যমান অসম শ্রেণি অবস্থানের ক্ষমতা থেকে কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরোক্ষ কোনো চাপ ছিল কিনা তার বিশ্লেষণ করতে পারি। আমাদের দেশে বৈষম্য ও অন্যায্যতা নিয়ে আলোচনা হলেও এগুলোর বিচারের ভিত্তিমূলীয় চিন্তাভাবনা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা চোখ পড়েনি। বৈষম্যের বিপরীতে সমদৃষ্টির আলোচনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সে আলোচনা জোরালোভাবে আসেনি। যখন আমরা বৈষম্যের কথাটি বলি, তখন আমরা আসলে কী বোঝাই? বোঝাই যে, কোনো কিছু মূল্যায়নের মূলভিত্তি হবে সমদৃষ্টি। সমদৃষ্টির জায়গাটি বাস্তবে টিকে থাকছে না বলেই বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও আবার বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বস্তুগত আয়োজনও চালু রয়েছে। আবার সমদৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে বর্তমানে ও অতীতের ক্ষেত্রেও নানা প্রচেষ্টা ঘটার জ্ঞানগত ও চর্চার নানা ক্ষেত্রও রয়েছে।

সমদর্শিতাই ন্যায্যতা

আধুনিক সময়ে সমদৃষ্টির ভিত্তিতেই ন্যায্যতার দাবিটি অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে তোলা যায়,যার ধারাটি প্রায় এককভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন দার্শনিক জন রলস। এবিষয়ে তাঁর প্রথম লেখা 'জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস'। ১৯৫৮ সালে এ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনই রলসের চিন্তাটি ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। পরে ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'আ থিওরি অব জাস্টিস' গ্রন্থে এ তত্ত্বটিকে তিনি আরও পরিশীলিতভাবে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যান। রলসের আসল কথাটি ছিল ন্যায্যতাকে বুঝতে হবে সমদৃষ্টির দাবির ভিত্তিতে। অর্থাৎ সমদর্শিতাই হলো ন্যায্যতা নির্মাণের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যদি ন্যায্যতায় পৌঁছাতে চায়, তবে তাকে সমদর্শিতার ভিত্তিভূমিতেই হাঁটতে হবে। এই পথে হেঁটেই সেখানে পৌঁছতে হবে। আমার মতে, রলসের এই ধারণার সমান্তরালে আমরা অমর্ত্য সেনের 'ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম' গ্রন্থে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ফ্রিডমের (তাঁর ভাষায় যেটি সক্ষমতা) পরিধি বাড়িয়ে

তুলতে হলে ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ (সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি) গ্রহণ করতে হবে। সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গিটি বাংলাদেশের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা একটু ভালোভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে আমাদের বিদ্যায়তনিক পরিসরগুলো থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজের সব প্রতিষ্ঠান ও অপ্রতিষ্ঠানে এই অতিপ্রয়োজনীয় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি কতটা উপেক্ষিত।

রলসের সমদর্শিতা ন্যায্যতা ধারণাটি কেবল সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকে বোঝাই যথেষ্ঠ নয় বরং ন্যায্যতার প্রায় সব তত্ত্বে এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখানে তত্ত্বকথা আসবে কেন? কারণ, কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের ও স্থানের ঘটনাকে 'বদ্ধ নিস্পক্ষ' গণ্ডির বাইরে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক ঘটনার ভেতরের সারবস্তুর মূল্যায়নের অনুসন্ধানে নেমেই এই ভ্রমণ করতে হচ্ছে। কার্যত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, অভিপ্রায় ও সর্বজনীন ভাবধারারও সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করার একটি সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর যদি সেটি করা সম্ভব হয়, তবে সমদর্শিতার পথে হাঁটার বাধাগুলো কাটিয়ে ন্যায্যতার সদর দরজায় উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

নিস্পক্ষ দর্শক

এই জায়গায় এসে আমাদের অর্থশাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার সাহায্য নিতে হবে। যদিও সময়ের ক্রমে রলস আমাদের নিকটবর্তী এবং অ্যাডাম স্মিথের সময় আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগের এবং তিনি আমাদের থেকে বহুদূরের, অন্য গোলার্ধের (স্কটিশ) বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু রলসের চিন্তাটি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে এবং এর কিছু সীমাবদ্ধতা কাটাতে স্মিথ আমাদের আরও প্রশস্ত রাস্তা দেখান। আর তাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার মূল্যায়নে অ্যাডাম স্মিথের 'নিস্পক্ষ দর্শক' (ইমপারশিয়াল স্পেক্টেটর) ধারণাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্মিথের বন্ধু দার্শনিক ডেভিড হিউম যুক্তিশীলতার প্রয়োগে মানব সংবেদনশীলতার গুরুত্ব জোরালোভাবে সামনে আনলেও স্মিথ হিউমের মতো ভাবতেন না। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক উপলব্ধির জোরালো অনুভূতির যেকথা হিউম তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধাবলিতে বলেছেন, তার সঙ্গে স্মিথ একমত হলেও বহু ধরনের পরিস্থিতি ও তার পরিণামকে কার্যকারণ সম্পর্ককে স্মিথ যুক্তি দিয়েই বিচারের কথা বিপুলভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী দার্শনিক প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেছেন। ধারণাটি হলো 'নিস্পক্ষ দর্শক' (স্মিথের 'দ্য থিওরি অব মরাল সেন্টিমেন্টস' গ্রন্থে)।

ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতার ধারণা

নিজেদের জীবনযাপনের ভেতর দানা বেঁধে ওঠা কায়েমি স্বার্থ, নিজেদের সামনে এগিয়ে রাখার ঝোঁক, অযৌক্তিক ভাবনা, নানা ধরনের সংস্কার ইত্যাদি থেকে প্রভাবমুক্ত হয়ে স্মিথের নিস্পক্ষতার দাবিকে প্রধানভাবে সামনে আনতে হবে। কারণ, রলস প্রবর্তিত 'সমদর্শিতাই ন্যায্যতা'—এই পথে চলতে গেলে স্মিথের নিস্পক্ষতার মৌলিক দাবিটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রলসের চিন্তার এই সুতাটি হাতে তুলে নেন অমর্ত্য সেন। আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক অমর্ত্য সেন রলস-উত্তর ন্যায্যতা তত্ত্বের সমূহ উন্নয়ন ঘটান। তিনি রলসের ধারণার 'আদর্শবাদী চিন্তা' থেকে বেরিয়ে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন অধিকতর ন্যায্যতার পথপদ্ধতির তত্ত্ব নির্মাণ করেন। অমর্ত্য সেনের মতে, রলসের ন্যায্যতা চিন্তাটি 'ট্রান্সেনডেন্টাল থিওরি অব জাস্টিস' বা ন্যায্যতার 'সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি'র ভিত্তিতে সৃষ্ট সে কথাটি

আমাদের সামনে আনেন। অমর্ত্য সেনের ঝোঁকটি হলো এই মুহূর্তের বাস্তব অবস্থার গুণগত পরিবর্তনের জন্য ন্যায্যতার ধারণা ও প্রয়োগ কীভাবে কাম্য সমাজের দিকে নিয়ে যাবে, তার ভিত্তি নির্মাণ করা। মোদ্দা কথা হলো, আমরা কীভাবে এগোতে পারি, তার পথ-পদ্ধতির অনুসন্ধানের তাগিদ তিনি আমাদের দিয়েছেন। আমার মতে, অমর্ত্য সেন অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে সময় পরিবর্তনের আঙ্গিকটি তার ন্যায্যতার গতিশীল ভাবনায় সু-স্থায়ীভাবে ধারণ করতে পেরেছেন।

আমি এ বিষয়টির নাম দিয়েছি 'ইনক্রিমেন্টাল জাস্টিস' বা 'ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতা'। এই লক্ষ্যে আমরা কীভাবে এগোবো, সে ধারণা ও চর্চার পথে সংগ্রাম করা। রলসের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ন্যায্যতা চিন্তার সীমাবদ্ধতা অমর্ত্য সেন আমাদের সামনে তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণী কাঠামোর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কারণ, অমর্ত্য সেন মনে করেন, আমরা যে পৃথিবীটায় বাস করি, সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো ভুল-ত্রুটিমুক্ত নয় এবং যথাযথ আচরণও করে না। অমর্ত্য সেনের লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, তিনি মনে করছেন প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতার ওপর আমাদের একমাত্র নির্ভরতা থাকলে, যেটি রলসের ন্যায্যতা চিন্তার একটি সীমাবদ্ধতা বলে তিনি (সেন) ব্যাখ্যা করেন—ব্যক্তির ন্যায্যতা পাওয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাবে। অমর্ত্য সেন বর্তমান সময়ের মহান এক শিক্ষক। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, পরিস্থিতি নির্ভরতার কথা বলে প্রতিষ্ঠানের চয়নের অন্যায্যতা থেকে ব্যক্তির ন্যায্যতা ও যৌক্তিক আচরণ নিশ্চিত করতে না পারলে ন্যায্যতা প্রাপ্তির 'ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতা'র পথে হাঁটা সম্ভব হবে না। তাঁর মতে, 'বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের মানুষের সক্ষমতা, সক্ষমতা ও কল্যাণকে প্রসারিত করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে' প্রচলিত 'নিয়মনীতি ও অভ্যাসকে বাস্তবের দৃষ্টিকোণ থেকে' মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। অমর্ত্য সেনের মতে, ন্যায্যতার পথে 'সামাজিক বিভিন্ন অবস্থার মূল্যায়নে শুধু তৃপ্তিযোগের ওপর নির্ভর করার কোনো আবশ্যকতা নেই,... এমনকি অন্তিম অবস্থার ওপর নির্ভর করারও দরকার নেই। আমরা যথাযথ কাজ করছি, না আরও ভালো করতে পারতাম, সেটা বিচার করার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন পরিণামের খুবই গুরুত্ব রয়েছে।' তিনি বলেন, 'ন্যায্যতার লক্ষ্যে যে জরুরি প্রশ্নটি নিরবচ্ছিন্নভাবে থেকেই যায় তা হলো, সবকিছু বাস্তবে কেমন চলছে, এবং তাদের আরও ভালো করে তোলা যায় কি না।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ১১০)।

নারীর সংবেদনশীলতা ন্যায্যতার পথে শক্তিবর্ধক

আমার কাছে মনে হয়, ন্যায্যতার প্রশ্নে নারীর সংবেদনশীলতা ও যুক্তি প্রয়োগের প্রখরতা পুরুষের তুলনায় বেশি। দার্শনিক ডেভিড হিউমের চিন্তা ও অনুজ্ঞাগুলো আমাদের শেখায় যে, 'মানব সংবেদনের (সেন্টিমেন্টস) জোরালো ভূমিকাটাকে অগ্রাহ্য না করেও যুক্তির গুরুত্বকে মেনে নেওয়ার'—যদিও প্রচলিত চিন্তায় সংবেদনের ভূমিকাটাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অমর্ত্য সেনের ভাষায়: 'হিউমের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের শেখায়, যারা এই পৃথিবীর অন্যত্র আমাদের থেকে বহু দূরে বাস করেন; এমনকি যারা এখনো জন্মাননি, ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর বাসিন্দা হবেন, তাদের কথা ভাবাও আমাদের দায়িত্ব।' হিউম যদিও সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অগ্রসরতার কথা সরাসরি বলেননি, তা সত্ত্বেও, যুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সংবেদনশীলতার চমৎকার সম্পর্কের প্রতি আমার আকর্ষণ তৈরি হলো। রবীন্দ্রনাথ ও অমর্ত্য সেন এ প্রসঙ্গে অনেক মূল্যবান দিক আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। সেনের মতে, 'নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যটি নানারূপে দেখা দিতে পারে। ... বস্তুত এটি বহুবিধ সমস্যার একটি মিশ্র রূপ।' (সেন, তর্কপ্রিয় ভারতীয়, ২০০৫)। কিন্তু ন্যায্যতার অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠায় নারীর যুক্তিচর্চার সঙ্গে নিজস্ব সংবেদনশীলতার জোরালো ব্যবহার পুরো পরিস্থিতির ওপর কতটা অগ্রসর প্রভাব রাখতে পারে, সেটি একটি বাস্তব ঘটনার মধ্যে দিয়েই উজ্জ্বল আলো ফেলল, অন্তত আমার জীবনে।

বিচ্ছিন্নতা মোকাবিলা

বাংলাদেশে যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, এ দেশে বসবাসের কিছু বিশেষ আকর্ষণীয় দিক থাকলেও কতগুলো ঘাটতির দিকও রয়ে গেছে। আমাদের যাপিত জীবনে দুটো বড় ধরনের সমস্যা জীবনের গুণগত মানকে অবনমন করছে বলে আমার মনে হয়, যেগুলোর সমাধান আমাদের হাতের মধ্যেই রয়েছে। প্রথমটি হলো ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা। আর এই বিচ্ছিন্নতা চর্চার ফলে দ্বিতীয় সমস্যাটির সৃষ্টি। সেটি হলো আমাদের মনে নিজেদের যাপিত জীবন সম্পর্কে হীনম্মন্যতার বোধ নিয়ে একধরনের আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে ডুবে থাকা। একটি সমৃদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় হলো যেসব সম্পর্ককে আমরা মূল্যবান মনে করি, সেগুলোর প্রতি আমাদের অনুভূতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলা। চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষ হলো গঠনমূলক অভিজ্ঞতার বিশাল এক ভান্ডার। আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে কম বা বেশি যেটুকু জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হোক না কেন, সেটুকুই বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে যাপিত জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছি—তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? সুন্দর জীবনের মূল কথা হলো আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে যেমন জীবনই যাপন করি না কেন, তার প্রতি আমাদের শতভাগ সততার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। সততা না থাকলে জীবন অসুন্দর হয়ে যায়। কারণ, সত্যই সুন্দর। একথা জানলেও আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করছি না কেন? আমাদের জীবনে যেসব অভিজ্ঞতা হয়, আমরা শুধু সেগুলো নিয়েই কথা বলতে পারি। আমরা আসলে যা নই, তা উপস্থাপনের চেষ্টা হলো অসুন্দরের পূজা। আমাদের জীবনের অভিমুখ হোক অনুন্নত জীবনবোধ থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনবোধের দিকে।

২. চুক্তিমূলক ন্যায্যতা

দ্বিতীয় ঘটনা

এই ঘটনটি ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখের। সকাল আটটা কি সাড়ে আটটা হবে। আসমা আপা বাসায় এলেন। আমি তখন বাসায় বসেই প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করছিলাম। কোভিডের কারণে আমাদের অনেকেরই বাসাকেই কর্মস্থল বানাতে হয়েছে। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এটি শিখতেও হয়েছে। আসমা আপা আমাকে কথা বলার জন্য বেডরুমে আসতে বললেন। আমার স্ত্রীও কিছু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। আসমা আপা এসেছেন বাসার কাজের জন্য নতুন চুক্তি করতে, যেটি শুরু হবে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে। আসমা আপাকে আমরা আগে থেকে চিনতাম না। তাকে এনে দিয়েছেন আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচিত সাহিদার মা। তিনি আমাদের বাসার কাছের প্রতিষ্ঠান জি-মার্টে কাজ করেন। অবশ্য আসমা আপার সঙ্গে আমাদের পরিচয় গত ২০ আগস্টে। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ১০ দিনের জন্য আমাদের বাসার কিছু গৃহস্থালি কাজের জন্য ১ হাজার ২০০ টাকায় চুক্তি করেন। সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র দুদিন বাকি। তাহলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী মাস থেকে কী হবে? সেজন্যই তিনি আমার ও আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন।

কোভিডপূর্ব সময়ে ও কোভিডের সময়ে আমাদের বাসায় গৃহস্থালি কাজের জন্য সুদূর নেত্রকোণা থেকে তামান্নার মাকে এনে দিয়েছিলেন এই সাহিদার মা। তামান্নার মা ছিলেন আমাদের বাসার গৃহস্থালি কাজের জন্য স্থায়ী চুক্তির (প্রচলিত ভাষায় বাঁধাকাজে সহায়তাকারী) ভিত্তিতে মাসিক ৫ হাজার টাকা বেতনের ভিত্তিতে কাজ করতেন। তিনি শুরুতেই বলে দিয়েছিলেন যে তিনি সব মিলিয়ে দুই বছরই থাকবেন আমাদের বাসায়, এর বেশি নয়। তাকে বিনামূল্যে থাকাখাওয়া, অসুখ হলে চিকিৎসা ও বাড়িতে

যোগাযোগের জন্য ফোন দিতে হবে। এগুলো সবই একেবারে মৌলিক বিষয়। এতে আমরা কেন, যে-কেউই রাজি না হয়ে পারবে না। আমি ও আমার স্ত্রী সানন্দে এতে রাজি হয়েছি। কিন্তু তামান্নার মায়ের দুই বছর শেষ হয়েছে গত মাসে, কোরবানির ঈদে। ঈদের দিনই তিনি রাতে এই এলাকায় নেত্রকোণা থেকে আগত কিছু মানুষের সঙ্গে একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে চলে গেছেন। একটি তাড়া তখন ছিল যে, ঈদের একদিন বাদেই সরকার আবার কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছে, ফলে তড়িৎ ফিরে না গেলে তাকে আটকা পড়তে হবে।

তখন অবশ্য বুঝিনি, তামান্নার মা একজন নারী উদ্যোক্তা হবেন এমন সংকল্পে ঢাকায় তিনি ব্যবসার প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহে এসেছেন। কারণ, গ্রামে তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেখানে তার পক্ষে এই প্রাথমিক সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর কে না জানে, ঢাকায় আয়ের সুযোগ বেশি এবং অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে, যদিও নিরাপত্তা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত নয়। সে জন্যই তারা দেশের বাড়ির পরিচিতি সূত্র ও সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে শহরে এসে পুঁজি সংগ্রহ করে এবং নিজেদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটান। তামান্নার মা আমাদের বাসায় কাজের পরিশ্রমিক হিসেবে দুই বছরে পেয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, যেগুলো তিনি কিছু মাস পরপরই গ্রামে বিকাশে পাঠিয়ে উর্বর জমি বর্গা চাষের চুক্তি করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। এই কাজে তিনি স্বামীকে বেশি ভরসা করেন না, বিধায় তার ভাইয়ের সহায়তা নিয়েছেন।

তামান্নার মায়ের রেশ অবশ্য আমাদের বাসা থেকে এখনো যায়নি। আমরা তো তার একেবারে গুণমুগ্ধ ছিলামই এর চেয়েও বড় কথা ছিল তার সঙ্গে আমাদের ছোট্ট দুটি সন্তানের সম্পর্ক ছিল অতুলনীয়। তারা তামান্নার মাকে খালাদাদু বলে ডাকত। আমাদের সন্তানদের ভাষায় খালাদাদুর হাতে মাখানো ভাত পৃথিবী সেরা। খালাদাদু তাদের তার নেত্রকোনার বাড়ির গল্প করত, আর এই শুনে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে গ্রামের পরিবেশ নিজেদের চোখে দেখার আগ্রহের কথা প্রায়ই বলত। তবে ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় আসমা আপা তার মূলসূত্র সাহিদার মাকে নিয়ে বাসায় এসেছিলেন নতুন একটি চুক্তি করতে, যদিও সেটি কোনো আলোর মুখ দেখেনি। আমরা দুই পক্ষ একমত হতে পারিনি। নতুন চুক্তিতে পৌঁছাতে পারা ছিল তাই আমাদের জন্য ছিল এক আনন্দেরই ঘটনা। এখানে উভয়পক্ষের জন্য সেই ব্যর্থ চুক্তির অভিজ্ঞতার কথা না বললে, আমাদের আনন্দের বিষয়টি ঠিক বোঝানো যাবে না।

আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই তামান্নার মায়ের অভাববোধ পীড়া থেকে মুক্তির জন্য নতুন এমন একজনকে গৃহস্থালি কাজের জন্য খোঁজ করছিলাম, যিনি তামান্নার মায়ের মতোই আমাদের বাসায় থেকে বাঁধাকাজ করবেন ও একই রকমের মাসিক বেতন নেবেন। কিন্তু সাহিদার মা আসমা আপাকে ছাড়া কাউকে পাননি। আসমা আপা যে রুমটায় ভাড়া থাকেন, সেটি আমাদের পরের রাস্তার একটি ছোট্ট বাড়ির চিলেকোঠার রুম। সেখানে তার সন্তানের, যার নাম সিয়াম তার সঙ্গে আপার নিজের ভাইয়ের ছেলেও থাকে। আসমা আপা প্রথমেই বলে দিলেন, তামান্নার মায়ের মতো তিনি রাতে থাকতে পারবেন না। কারণ হলো তার পরিবার নিয়ে তিনি রাতে বাসায় ঘুমাতে চান। এটা তো খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তিনি সারাদিন অর্থাৎ সকাল সাতটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত থাকবেন এর জন্য তাকে অন্য সব বাসায় চলমান তার ছুটাকাজগুলো ছাড়তে হবে। আর তাই তিনি মাসিক বেতন হাঁকলেন ৮ হাজার টাকা। আমার স্ত্রী এ বেতন শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। তার রেফারেন্স পয়েন্ট হলো তামান্নার মায়ের মাসিক ৫ হাজার টাকার বেতন। আমার স্ত্রীর যুক্তি হলো বাঁধামানুষের বেতন ৫ হাজার টাকা হলে ছুটাকাজের জন্য এতটা কেন হবে? যদিও সিয়ামের মা বা আমাদের আসমা আপার কাজের যে পরিমাণ সময় দিতে হবে, তা

বাঁধামানুষের সময়ের প্রায় সমানই। উভয়পক্ষের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সমস্থিতি বিন্দুর খোঁজে আলোচনা করতে করতে আমরা শেষপর্যন্ত মাসিক ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হলাম এবং সঙ্গে দুই বেলা খাবার ও বিভিন্ন উৎসবপর্বে তার পরিবারের সকলকে পোশাক-আশাক ও মেহমান এলে বাড়তি কাজের সম্ভাব্য অর্থ এসবই আলাপ করলাম। কিন্তু আসমা আপা এ প্রস্তাবে রাজি নন। তাঁর এক কথা। মাসিক বেতন ৮ হাজার টাকার কমে তিনি এই পরিমাণ সময় দেবেন না। আমার স্ত্রী তার ওপর কিছুটা মনোক্ষুণ্ন হলো। আমার কাছে এখানে আমরা দুই পক্ষই সমান ও ফ্রি এজেন্ট হিসেবে মনে হলেও আমার স্ত্রী আসমা আপার চুক্তিতে না করার দৃঢ় সিদ্ধান্তটি প্রশস্ত মনে গ্রহণ করলেন না। আমার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমি আমার স্ত্রীর মনোভাবের পরিবেশটি আমি কিছুতেই এড়াতে পারছিলাম না। ফলাফল হলো, আমরা কোনো চুক্তিতে পৌঁছতে পারলাম না।

ফিরে আসি আসমা অপার কথায়। এই দশ দিনে আসমা আপার যে বিষয়টি আমার ও আমার স্ত্রীর মন কেড়েছে, তা হলো বাচ্চদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। আমার বাচ্চারা মানুষ তো মানুষ, আমাদের ফ্ল্যাট বাসাটির বারান্দার গাছগুলোর কথাও নাকি তারা বোঝে, তাদের কারণে আমাদের বাসার তেলাপোকা মারা যায় না, বারান্দায় দিনের কোনো একটা সময়ে হঠাৎ খেলতে আসা কিছু চড়ুইপাখির কিচিরমিচির শব্দ ও ঝগড়ায় তারা উত্তেজিত হয়, কোনো অজানা জায়গা থেকে নিয়মিত চলে আসা বেড়ালের জন্য তাদের অতিথিপরায়ণতার সংবেদনশীলতার সঙ্গে আসমা আপা একেবারে মিশে গেছেন। আসমা আপাই এ কদিনে বাচ্চাদের সঙ্গে এসব চমৎকার অভিজ্ঞতা বিনিময় ও এসব প্রাণীদের দূর্বোধ্য ভাষা অনুবাদের ঘনিষ্ট বন্ধু হয়ে উঠেছেন। বাচ্চাদের একঘেয়ে জীবন কিছুটা সহজ করতেই আমরা বাসায় একটি অ্যাকুয়ারিয়াম ও ছোট্ট দুটি লাভ বার্ড রেখেছি। আমি ও আমার স্ত্রী এসব সমৃদ্ধ মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত। অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর কথাটিই সত্য, আমাদের চেয়ে আমাদের পরের প্রজন্ম প্রাণ ও পরিবেশের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। আমার মতে, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তো উল্টো, যেগুলো পরিবেশের দূষণ বেশি সৃষ্টি করে সেগুলোই আমরা বেশি করে করতে পছন্দ করছি। আমাদের পরিবেশের বিবেচনা কেবল মুখেই। আমার মনে হয় যে, আমাদের উত্তর প্রজন্ম কেবল সংবেদনশীলতাই নয়, সামষ্টিক নৈতিকতার ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রসর হবে। যে সমাজটি তারা গড়ে তুলবে সেটি আমাদের করা ভুলগুলোর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে নতুন সংবেদনশীলতা ও যুক্তির ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে উচ্চতর সমাজ গড়ে তুলবে। আমরা মরে যাব, কেউ আমাদের মনেও রাখবে না। কারণ, আমরা মনে রাখার মতো কোনো কাজ করতে পারছি না, কিন্তু তারা আয়ু শেষ হলেও তারাই বেঁচে থাকবে, কারণ, তারা ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীর নির্মাণকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে।

বাসার গৃহস্থালি কাজের অতিপ্রয়োজনীয় এ চুক্তির আলোচনায় ফিরে আসি। কথা শুরু হলো আসমা আপার সঙ্গে। আমাদের এলাকায় প্রতিটি গৃহস্থালির কাজের দর মাসে ৭০০ টাকা। ঠিক হলো ৫টি কাজ করবেন তিনি। মাসে মোট পাবেন ৩ হাজার ৫০০ টাকা। এখানে গৃহস্থালির কাজের বাজারদর যে স্থানভেদে ভিন্ন হয়, সে কথাটিও বলে রাখি। আমার বন্ধু একরামুল মিল্লাত। তিনি পরিবার নিয়ে থাকেন মিরপুর ১৪ নম্বর সেকশনে, কাফরুলে। তিনি একটি অডিট ফার্মে হিসাবরক্ষণ ও ট্যাক্সের কাজ করেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যেতাদের বাসার গৃহস্থালির কাজের প্রতিটির জন্য কত টাকা দেন। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, তাদের এলাকায় প্রতি কাজের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়। এই পার্থক্যের কারণ কী? কারণ হলো লিভিং কস্ট। দেখুন ঢাকার মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় জীবনযাপন ব্যয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ঢাকা তো ঢাকা, মিরপুর ১ নম্বর সেকশন আর ১৪ নম্বর সেকশনের মধ্যে জীবন ধারনের ব্যয়ে কতটা পার্থক্য।

আসমা আপার কথায় আসি। আসমা আপা পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন আমার স্ত্রীর 'সামান্য' একটি আবদারে। আমার স্ত্রী বলেছিলেন, যে পাঁচটি কাজের কথা বলা হয়েছে তার ভেতর শুধু আমাদের দুজনের জন্য নাশতা বানানোর সঙ্গে দুটি ডিম ভাজা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের আরও তিনটি ডিম ভেজে দিতে হবে। কারণ, আমার দুই ছেলে ও শাশুড়ি মায়ের নাশতায় এটি দরকার। কিন্তু আসমা আপা তাতে রাজি নন। আমার স্ত্রীর কাছে এটি সামান্য বাড়তি কাজ, যা বিনা আয়াসেই সম্ভব! কিন্তু আসমা আপার যুক্তি হলো, আপনি তো ভাবছেন একটি দিনের কথা, কিন্তু আমার জন্য তো এটি সারা মাসে প্রতিদিন তিনটি করে ডিম ভাজতে কত সময় লাগবে, তার বিনিময়ে আমি কী পাব? তিনি আরও বললেন, এবার আপনি হিসাব করুন, আমি তো আর এক মাস কাজ করেই চলে যাব না, এই হিসাব বছরে করলে কী দাড়াবে? আসমা আপার যুক্তি অকাট্য। আমি এই অচলায়তন কাটানোর জন্য বললাম যে, তিনটি ডিম ভাজার বাড়তি কাজের জন্য আপনার সাড়ে তিন হাজার টাকার সঙ্গে কত যোগ করতে হবে? তিনি বললেন, এটি তো ৭০০ টাকার মতো একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ নয়, তাই আমাকে মাসের টাকার সঙ্গে ৫০০ টাকা যোগ করে দিলেই চলবে। আমি সানন্দে রাজি হলেও আমার স্ত্রীর মনটা বেশ ভার। আমার কথা ছিল প্রতিটি শ্রমের এখানে বিনিময়মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে, ফলে এখানে বিনিময়মূল্য ছাড়া আসমা আপার একবিন্দু শ্রমও আমাদের আইনত তো নয়ই, কোনো অর্থেই চাওয়া যাবে না। আমার স্ত্রী অন্য একটি বাড়তি কথাও বলেছিল। আর তা হলো, ঘর ঝাড়ু ও ঘর মোছার কাজ, যেটি সেই পাঁচটি কাজের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ ছিল, সেখানে বিছানা ঝাড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আসমা আপা এটিও গ্রহণ করবেন না। তিনি বললেন যে, ঘর ঝাড়ু ও মোছার কাজ করার সময় আমি তো সোফা ঝাড়ু দিচ্ছিই, তার জন্য তো কোনো আলাদা দাম চাইনি, সেখানে আপনাদের বাসার তিনটি বেডরুমের তিনটি বিছানা ঝাড়ু দিতে হবে, তাতে আমার অন্য বাসার কাজের সময় ক্ষতিগস্ত হবে। তার এ কথাটিও খুবই শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বললাম সেটির জন্যও বেতনের সঙ্গে কত দিতে হবে? তিনি বললেন, সেটি আপনাদের বিবেচনা। আমি বললাম আপনার সঙ্গে মৌখিক ভিত্তিতে হোক আর লিখিত হোক, চুক্তি তো চুক্তিই। ঠিক হলো সর্বমোট সাড়ে ৪ হাজার টাকা তিনি বেতন পাবেন মাসে। আমি এর সঙ্গে আমাদের পক্ষ দুইবেলা (সকাল ও দুপুর বেলার) খাবার যোগ করে দিতে বললাম আমার স্ত্রীকে। যদিও আমাদের এলাকায় বাঁধা-সাহায্যকারী ছাড়া ছুটাসহায়তাকারীদের কেউ খাবার দেন না। তবু আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, তার পুষ্টির অভাব রয়েছে, দেখে বোঝা যায়। ফলে, এটুকু সাপোর্ট দিলে তিনি আনন্দের সঙ্গে কাজ করবেন, খুশি থাকবেন।

তথ্য, সমস্থিতি (ইকুইলিব্রিয়াম) ও ন্যায্যতা

কিন্তু ফ্ল্যাটমালিক হিসেবে আসমা আপার সঙ্গে একটি স্বতঃস্ফূর্ত চুক্তিতে পৌছাতে কোনো অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক কাজ করেছে কিনা, সেটি অবশ্য অন্য প্রশ্ন। আমি আসমা আপার সঙ্গে এইমাত্র পাকা হয়ে যাওয়া নতুন চুক্তি, যা সেপ্টেম্বরের পহেলা তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে, তার ন্যায্যতা নিয়ে ভাবছি। যেমন আমার মনে আসছে যে, চুক্তির সঙ্গে কি ন্যায্যতার কোনো সম্পর্ক আছে? থাকলে সেটি কী? আসমা আপার থেকে যে বিষয়টি আমি শিখলাম, তা হলো যে ক্ষেত্রে আমরা কোনো বিষয়ে দরদাম করে একটি সমস্থিতি (ইকুইলিব্রিয়াম) বিন্দুতে আসি, তার জন্য বাস্তবতা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ। তথ্য জানা বা না জানা এসবকে আমরা যতই 'অবহেলা' করি না কেন, এটিই শেষ দাগে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের গুণগত প্রভাব ফেলে। এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে আছে নিজের জীবনমান তো বটেই সঙ্গে অন্যরাও। আর বাজারে দরদাম করতে গেলে ভেতর দিয়ে নানা রকমের সমস্থিতি

(ইকুইলিব্রিয়াম) বিন্দু আমরা পেয়েই যাব, এটি অনেকটা যান্ত্রিক বিষয়, কিন্তু কোন সমস্থিতি বিন্দুটি অধিক ন্যায্য—অন্তত দুটি পক্ষের ভেতর—সেটি কিন্তু সমস্থিতি বিন্দু বিচার করতে পারবে না। অর্থাৎ সমস্থিতি বিন্দুর সঙ্গে ন্যায্যতা চিন্তার ফারাক রয়েছে।

যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে অদৃশ্য হস্তের (ইনভিজিবল হ্যান্ড) অনুপস্থিতি থাকলে বাজারের সাধারণ কার্যক্রম অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে আমরা বিদ্যমান বর্তমানে আমাদের পণ্য ও সেবা পাওয়ার স্বাধীনতাটুকুও হারিয়ে ফেলব। ইন্টান্যশনাল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত ছাত্র অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর সাম্প্রতিক লেখা থেকে জানতে পারি যে ২০০১ সালের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ ও তাঁর দুই বন্ধু জর্জ আকেরলফ ও মাইকেল স্পেন্স তাঁদের যুগান্তকারী গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, বাজারে চলমান যে অসম তথ্যপ্রবাহ রয়েছে, তার ভিত্তিতে অদৃশ্য হস্ত বা ইনভিজিবল হ্যন্ড সঠিক বিন্দু দিতে পারে না। আর এর ফল গিয়ে পড়ে পণ্য ও সেবার গুণগত মানের ওপর। কিন্তু স্টিগলিৎজ ও তাঁর বন্ধুরা এর সঙ্গে এটি যোগ করেননি, অসম তথ্যপ্রবাহের ভিত্তিতে আমরা যেসব সমস্থিতি (ইকুইলিব্রিয়াম) বিন্দু সয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যাচ্ছি, সেগুলোর বহিঃস্থ প্রভাবগুলো বা এক্সটার্নালিটিজ বিবেচনা কীভাবে করা যাবে। কারণ, অর্থনীতির কর্মকাণ্ড তো আর কেবল ব্যক্তিগত ভোগ ও অধিকারের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি সার্বিক জীবনমান, সমাজে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, ন্যায্যতার চর্চা ও একটি সার্বিক সহমর্মীভিত্তিক সংহত সমাজের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিবেচনার অভাবেই কি আজ আমাদের সমাজ ও শহরটি অনারামদায়ক, কিছুটা দিগ্‌ভ্রান্ত এবং কোথায় যেন মানুষের প্রতি আপসহীন একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সামাজিক চুক্তি ও ন্যায্যতা

স্কুলে থাকতে ছেলেবেলা থেকেই পড়ে এসেছি, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু জানতাম না কেন মানুষ সমাজে থাকে? একত্রে থাকতে গেলে কি কোনো লিখিত বা অলিখিত বোঝাপড়া কিংবা চুক্তি করতে হয়? সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের জন্য ন্যায্যতা ছাড়া একত্রে বসবাস সম্ভব নয়। তাহলে ন্যায্যতার প্রসার কীভাবে ঘটানো যাবে? ন্যায্যতার পরিধি বাড়াতে গেলে সামাজিক চুক্তির সীমিত কাঠামোটির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী রয়ে গেছে?

তত্ত্বের কাজ হলো বাস্তবে প্রচ্ছন্নভাবে থাকা বিষয়টিকে যুক্তি ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নভাবে মানুষের চেতনায় ফুটিয়ে তোলা। ফলে এ প্রক্রিয়া আমাদের বাস্তবতাকে নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সহায়তা করে। আর এর ফলেই একদিকে আমাদের যেমন বাস্তবতার নতুন মাত্রা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তেমনই বাস্তবতার কাম্য রূপান্তর সহজতর হয়। আমরা যদি একটু বড় প্রেক্ষাপটে গৃহস্থালি কাজের চুক্তি নিয়ে ভাবি, তবে আমাদের চোখে কেমন ঠেকবে তা দেখা যাক। এই ঘটনায় দুটি পক্ষ—আমার পরিবার একটি পক্ষ এবং আসমা আপার পরিবার অন্য একটি পক্ষ। গৃহস্থালি কাজের যে চুক্তি হচ্ছে, তার ভেতরে উভয়পক্ষেরই জীবনমানের প্রশ্নটি রয়ে গেছে। তবে এই মুহূর্তের জীবনমানকে অন্তিম অবস্থা না ধরে আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলতে পারি।

আসমা আপা ও তার পরিবার যেভাবে জীবন কাটাতে চায়, সেভাবে জীবনটি কাটাতে পারছে কি না। এই চুক্তি তার কেবল বর্তমান স্বাধীনতা, সক্ষমতা কিংবা সক্ষমতাই নয় ভবিষ্যতের একটি বিকশিত জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, যা তার ও তার পরিবারের অধিক ন্যায্যতা ও অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারবে। সমস্যায় পড়লে অর্থাৎ চুক্তির শর্ত অপর পক্ষ ভঙ্গ করলে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তাকে

সুরক্ষা দিতে পারে, সেটি তিনি জানেন কিনা। কেবল প্রতিষ্ঠানই নয়, প্রতিষ্ঠানের বাইরেও তার অধিকারগুলো সংরক্ষণের কোনো পথ-পদ্ধতি তার জানা আছে কি না। অধিকন্তু চুক্তিতে নেই কিংবা আলোচনাও হয়নি এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা গৃহস্থালি কাজের সহায়তাকারীর ক্ষেত্রে ভাবার 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র' এখনো প্রস্তুত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ আসমা আপার মত প্রকাশের স্বাধীনতায় আমার পরিবার (গৃহকর্তা হিসেবে) কতখানি ছাড় দিতে প্রস্তুত সেটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গৃহকর্তার পরিবারের কতটুকু গুণগত শিক্ষা রয়েছে, যার ফলে মানসিকভাবে অন্যের প্রতি তার উদারতা ও সম্মানের স্থিতিস্থাপকতা কতটুকু হবে সেটি নির্ভর করবে। গৃহস্থালি কাজ করতে গিয়ে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে তার গৃহকর্তার পরিবারের সঙ্গে অলোচনার সুযোগ কতখানি রয়েছে, তাও বিবেচ্য বিষয়। আসমা আপার ক্ষমতায়নের জন্য তিনি নিজের তথ্যভিত্তি তথা জ্ঞানভিত্তি বাড়ানোর পথ খুঁজে নেবেন কীভাবে?

যুক্তিনির্ভর প্রকাশ্য আলোচনা ও ন্যায্যতা

বাঙালি সংস্কৃতি তো বটেই, পুরো উপমহাদেশেই অন্ধবিশ্বাস ও অযৌক্তিকতার চেয়ে যুক্তিনির্ভর প্রকাশ্য আলোচনার অত্যন্ত শক্তিশালী ধারা বহমান। কেবল ভারতবর্ষেই নয় আফ্রিকা, চীন, মিসরীয় অঞ্চলসহ নানা অ-পশ্চিমা সমাজেও যুক্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। পশ্চিমা লেখাপত্র যেহেতু আমরা বেশি পড়ি, সেকারণে ন্যায্যতার আলোচনাকে পশ্চিমা ও অতি সাম্প্রতিক বিষয় মনে হতে পারে। আমার কাছে এ চিন্তাধারাকে একটি ফাঁদ বলে মনে হয়। কারণ, আমি মনে করি—আজ আমরা যেসব ভাবনা-চিন্তাকে পশ্চিমা বলে চিহ্নিত করছি, সেসব জ্ঞানের কোনো না কোনো পর্যায়ের উন্নয়নে পৃথিবীর অ-পশ্চিমা সমাজের অবদানকে গ্রহণ করেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ফলে বিশুদ্ধ পশ্চিমা সভ্যতা বলে কিছু নেই। আবার উল্টোদিকে, বিশুদ্ধ অ-পশ্চিমা জ্ঞান বলেও কিছু হয় না। কারণ, অ-পশ্চিমা সমাজও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই নিজেদের পরিপুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে কার্যত পশ্চিমা ও অ-পশ্চিমা জ্ঞানের মধ্যে আমরা কোনো স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে আলাদা করতে পারছি না।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানের ভূমিকা

এই জায়গায় এসে আমার থমাস জেফারসনের কথা মনে পড়ে গেল। জেফারসনের কথা পাড়ামাত্রই অনেকে শোরগোল শুরু করে দিতে পারেন। তাঁর দাস ব্যবসা ও ইত্যাদি বিষয় টেনে আনতে পারেন। আসলে এখন ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার আগে দুবার ভাবতে হয়, অথচ আমাকে সেটাই করতে হচ্ছে। জেফারসনের প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বেশ প্রগাঢ়। আমি মনে করি, জ্ঞানের বিষয়ে তাঁর দার্শনিক দূরদৃষ্টি এখনো আকর্ষণীয়, যদিও তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। তিনি জ্ঞান নিয়ে যে গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা আমাকে ভীষণ উদ্দীপ্ত করেছে। আমি তার কথাটি পেয়েছিলাম বিখ্যাত 'দ্য ইকোনমিস্ট' ম্যাগাজিনে। জেফারসনের কথাটি ছিল, জ্ঞান আহরণে কোনো বাধা নেই। যে-কেউই জ্ঞানার্জন করতে পারে। জ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট পরিধিও নেই। কোনো একজন বা কোনো সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী এর মালিক নন কিংবা জ্ঞানের কোনো একক মালিকানা দাবি করা সম্ভব নয়। কারণ, জ্ঞানের এই বিপুল ভান্ডার গড়তে পৃথিবীর নানা প্রান্তের সমগ্র মানবসভ্যতাই অবদান রেখেছেন। আমাদের প্রত্যেকের শ্রম-জ্ঞানের উৎকর্ষতায় অবদান রেখেছে। এর ফলে কার্যত সমগ্র পৃথিবীই এই প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে। জেফারসনের ভাষায়: 'যদি প্রকৃতি কোনো একটিমাত্র বস্তুকে এমন সমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করে থাকে, যা অন্য সব সম্পদের তুলনায় সবচেয়ে সংবেদনশীল, তবে সেটি হলো চিন্তার সক্ষমতা ও তার প্রয়োগ; যাকে আমরা আইডিয়া বা ধারণা বলে চিহ্নিত করি।... কোনো

একজন কতখানি জ্ঞানার্জন করতে পারবেন তার পরিধি কেউই নির্ধারণ করে দিতে পারেন না। আর যদি কেউ এমন চেষ্টা করেন, তবে তিনি কখনোই সফল হবেন না। কারণ, বাদবাকি সবাই মিলিতভাবে সমগ্র জ্ঞানভান্ডারের মালিকানার অধিকারী। যদি কোনো একজন আমার থেকে কোনো একটি আইডিয়া পেয়ে যান, তবে তিনি আমার জ্ঞানের ভান্ডারকে না কমিয়েই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। ব্যাপারটি হলো অনেকটা এমন—কোনো একজন আমার দিকে যদি টর্চলাইটের আলো ফেলেন, তবে শেষপর্যন্ত তিনি আমাকে তো আলোকিত করলেনই,অধিকন্তু আমাকে আলোকিত করার জন্য আলোর প্রতিফলনের মাধ্যমে তিনি নিজেকেও আলোকিত করতে সক্ষম হবেন। যদিও এতে আমি নিজে অন্ধকারে ডুবে যাব না। বাস্তবে জ্ঞান ও আলোকরশ্মি একইরকমভাবে কাজ করে।"

খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি বনাম অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

অমর্ত্য সেনের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ "হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড" ("স্মৃতিকথা: ঘরে-বাইরে")-এর মুখবন্ধে তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। অমর্ত্য সেনের ভাষায়: 'পৃথিবীর সভ্যতা ব্যাখ্যায় দুটি ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি ধারার দৃষ্টিভঙ্গি হলো "খণ্ডিত"। এই দৃষ্টিকোণটির আওতায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তার প্রকাশভঙ্গিগুলো আলাদা আলাদা সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই পদ্ধতির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার অংশগুলোর মধ্যে প্রতিকূল সম্পর্ক দেখানো হয়। বর্তমান সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশ প্রচলিত যেটি "সভ্যতার সংঘাত" নামে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর অন্য ধারাটি হলো "অন্তর্ভুক্তিমূলক" দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণ মনোযোগী হয় বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গিগুলো চূড়ান্তভাবে একটি সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করায়—এটিকে বিশ্বসভ্যতা নাম দেওয়া যায়। এই বিশ্বসভ্যতার গাছটি সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র মানবজাতির পরস্পরসম্পর্কিত আন্তজীবন যাপনের মাধ্যমে, বিভিন্ন জায়গায় তার শেকড় ও শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে, নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় ফুল ফুটিয়ে। নিশ্চিতভাবেই আমার এ গ্রন্থটি যদিও সভ্যতার প্রকৃতির যুক্তিসিদ্ধ অনুসন্ধানে নিবেদিত নয়, কিন্তু পাঠক হিসেবে আপনি দেখবেন—পৃথিবীর যা-কিছু অবদান, তার ব্যাখ্যায় খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বরং সভ্যতার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমার সহমর্মিতা রয়েছে। মধ্যযুগের ক্রুসেড থেকে শুরু করে বিগত শতকের নাৎসিদের আক্রমণ, ধর্মীয় রাজনীতির যুদ্ধ-বৈরী অবস্থা থেকে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা ও দাঙ্গার সৃষ্টি, বিভিন্ন ধরনের গোঁড়া মতের গোষ্ঠীগুলোর ভেতর রেষারেষিও ঝগড়া। কিন্তু এসব হিংসা ও সংঘাত থাকা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিশালী ধারাও বহমান ছিল। আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ করি তবে বুঝতে পারব যে, একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে কীভাবে জ্ঞান সঞ্চারিত হয় এবং এক দেশ থেকে অন্য আরেকটি দেশে বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। সভ্যতার এই পারস্পরিক বিনিময়ের পথ ধরে হাঁটতে থাকলে আমরা দেখব, বৃহত্তর ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির কাহিনীগুলো আমরা কিছুতেই এড়াতে পারছি না। পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে আমাদের সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার গুরুত্বকে কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না। চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষ হলো গঠনমূলক অভিজ্ঞতার বিশাল এক ভান্ডার। এক হাজার বছর আগে, প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে ও ১১ শতকের প্রথম দিকে ইরানি গণিতজ্ঞ আল-বেরুনি বেশ কিছু বছর ভারতে ছিলেন। তাঁর সুলিখিত "তারিখ আল-হিন্দ" গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেন যে, পরস্পরের কাছ থেকে শেখার বিষয়টি সমৃদ্ধ জ্ঞান ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে কতটা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তিনি ভারতে থেকেই গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে চমৎকার সব অবদান রেখে গেছেন। সেটি কম দিনের কথা নয়,

আজ থেকে প্রায় এক সহস্রাব্দ বছর আগেই তিনি দেখিয়েছেন যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে কীভাবে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলা যায়। ভারতীয়দের প্রতি আল-বেরুনির ভালোবাসা ভারতীয় গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে তার আগ্রহকে একদিকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছে, ঠিক তেমনই এটিই ভারতীয় এসব শাস্ত্রে তার নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশ্ববীক্ষার বিসর্জন

ন্যায্যতা, সমদর্শিতা (ফেয়ারনেস), দায়িত্ব (রেসপনসিবিলিটি), কর্তব্য (ডিউটি), শুভময়তা (গুডনেস) ও সমীচীনতা (রাইটনেস) এসব গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর চর্চার নানা ধরন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে চিন্তার চর্চা বরং বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের জন্য যা দরকারি সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক চিন্তা-চর্চা তার সহায়তা করতে পারছে না কিংবা করছে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় কতখানি অসহযোগিতা করা যায়, তার উদাহরণ রয়েছে অনেক।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পশ্চিমা চিন্তকদের সমালোচনা নিত্যকার ব্যাপার, যুগের চাহিদা। এটি একধরনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আমার কাছে ফ্যাশন অর্থ পুরোনো চিন্তা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে বিপুল পরিমাণ সময় ও শ্রম ঢালা হয় উত্তর-উপনিবেশিক ও উত্তরাধুনিক তত্ত্ব চর্চা এবং নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় জিনিসে, সেগুলো কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের মনকে সংকীর্ণ করে ফেলছে। ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে পারছে না। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে না। বিজ্ঞান ও কলা চর্চার পরিসর বিশ্ববিদ্যালয়েই সংকুচিত হচ্ছে। গরিব আত্মীয়কে জায়গা দিতে যে রকমভাবে তেমন কোনো পয়সা খরচ হয় না, সেরকমভাবে বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদকে কোনো রকমে জায়গা দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিসরে। জ্ঞানের সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরকে এখন দেশের চাহিদা মেটাতে চিন্তাশীল ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারছে না। ফলে বিশ্ববীক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্মের গড়ে তোলার ব্যর্থতা সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এই ব্যর্থতা আমাদের সামষ্টিক স্বাধীনতা ও সক্ষমতাকে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রসারিত করার কাজটিকে চরমভাবে বাধাগ্রস্থ করতে পারে। এই সবকিছুর উৎস কী, তা উপরের আলোচনাতে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি।

সভ্যতার নির্মাণ কীভাবে?

উদাহরণস্বরূপ মহামতি গৌতম বুদ্ধের কথা বলা যায়। তাঁর সময়টি ছিল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষ। আমরা যদি ইউরোপীয় আলোকায়নের প্রধান চিন্তকদের লেখার সঙ্গে বুদ্ধের চিন্তাধারাগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করি, তবে দেখব যে তারা বিপরীত চিন্তার তো ননই, বরং তাদের চিন্তাভাবনার অনেক সাদৃশ্য ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যে মিল রয়েছে। এমনকি গৌতম বুদ্ধের নামের শেষাংশ বুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হলো যিনি আলোকপ্রাপ্ত। ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখছি, একই ধরনের জ্ঞানচর্চার ধরন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। একই ধরনের প্রশ্ন মোকাবিলায় যুক্তি প্রয়োগের ধাঁচ আলাদা হলেও মূলত তাদের ভেতরে প্রবাহমান সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত না করি তবে সমগ্র সভ্যতার জ্ঞানভান্ডারের অগ্রসরতা আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। আবার নানা ধাঁচের যুক্তি প্রয়োগকে যদি কেবল আঞ্চলিক পরিধিতে আটকে রাখি; তবে ন্যায্যতা, সমদর্শিতা, দায়িত্ব, কর্তব্য, শুভময়তা ও সমীচীনতাসংক্রান্ত যুক্তিচর্চা ও প্রয়োগের অনেক সাধারণ সূত্র বুঝতে আমরা ব্যর্থ হব।

উপমহাদেশে নীতি ও ন্যায্যতার চর্চা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থায় দুটি বিষয়ের সঙ্গে ন্যায্যতাসম্পর্কিত বলে মনে করা হতো। একটি হলো নীতিসম্পর্কিত ধারণা ও অপরটি হলো ন্যায়সম্পর্কিত ধারণা। কোনো প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও চর্চা সমীচীনতার বিবেচনায় উত্তীর্ণ হতে পারল কিনা এবং আচার-আচরণ ঔচিত্যের বিচারে সঠিক ছিল কিনা—এ দুটি বিষয় ছিল নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও চর্চার পরিণামগুলোর মূল্যায়ন– অর্থাৎ এর ফলে মানুষের জীবনযাপনে এর ফলাফল কেমন, তার বিবেচনাগুলো ছিল ন্যায় ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এদুটি বিষয় বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অন্যদিকে আলোকায়নের চিন্তকেরা কিন্তু সবাই এক সুরে কথা বলেননি। তাদের মধ্যে ন্যূনতম দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। পুরোপুরি ন্যায্য সমাজের বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, সেটি চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়েছেন একটি ধারার চিন্তকেরা। এই ধারায় তারা সমাজে ন্যায্য প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণাগুণ নির্ধারণেই জোর দিয়েছেন। এই ধারাতেই টমাস হবস সামাজিক চুক্তির ধারণাকে সামনে আনেন। এ চিন্তাধারার সমূহ উন্নতি ঘটান পরবর্তী সময়ে জন লক, জ্যাঁ-জাক রুশো, ইমানুয়েল কান্টসহ অন্যরা।

চুক্তিমূলক ন্যায্যতা বনাম অচুক্তিমূলক ন্যায্যতা

সমকালীন রাজনৈতিক দর্শনে চুক্তিমূলক (কন্ট্রাকটারিয়ান) দৃষ্টিভঙ্গিটির জোরালো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় জন রলসের ন্যায্যতা তত্ত্বে। ন্যায্যতাসংক্রান্ত অন্য ধারাটির চিন্তকদের কথা ছিল জীবনযাপনের বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব থাকলেও মানুষের আচরণ, সামাজিক আদানপ্রদান ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক চলকগুলোর প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের বাস্তব জীবন যেসব নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়, তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা। এই ধারার চিন্তকদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাডাম স্মিথ, মারকি দ্য কনদরচে, মেরি উলস্টোনক্রাফট, জেরেমি বেন্থাম, কার্ল মার্কস, জন স্টুয়ার্ট মিলসহ আরও বেশ কিছু দার্শনিক—যাঁরা নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার মধ্যেও সাধারণ সুরটি ছিল সামাজিক চুক্তির ধারণাটি তো কাল্পনিক, নইলে বাস্তব সমাজে শ্রেণি, বৈষম্যের ধারা, অধস্তন শ্রেণির ওপর সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা ও অসমতা নিরন্তর ঘটে চলেছে কীভাবে? সামাজিক চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি ও ন্যায্যতা বাস্তবে কাজ করলে, এসব ঘটছে কেন? ফলে এই ধারার চিন্তকেরা অচুক্তিমূলক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারায়তাঁদেরচিন্তাভাবনাগুলোকে পরিচালিত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে "সামাজিক চয়ন তত্ত্ব"র কথা না বললেই নয়। অষ্টাদশ শতকে মারকি দ্য কনদরচে সামাজিক চয়ন তত্ত্বের নির্মাণ করেন, যেটি ছিল মূলত গাণিতিক ধারা। বিংশ শতকের মধ্য ভাগে কেনেথ অ্যারো এই তত্ত্বের সমূহ উন্নতি ঘটান। তবে এই তত্ত্বের শিরোনাম দেখে আলোকায়নের প্রথম ধারার মনে হলেও এটি মূলত দ্বিতীয় ধারার মধ্যে পড়ে।

রলসের আদি অবস্থার (অরিজিনাল পজিশন) ধারণা

জন রলসের ন্যায্যতাকে সমদর্শিতার ভিত্তিতে বোঝার তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে 'আদি অবস্থা'র ধারণার কথা বলেছেন। অর্থাৎ রলসের সমদর্শিতার তত্ত্ব 'আদি অবস্থা'র ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'আদি অবস্থা'র কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার উত্তরণেও স্মিথের নিষ্পক্ষতার চিন্তাটি জরুরিভাবে দরকার হয়ে পড়বে। রলসের 'অরিজিনাল পজিশন' বা 'আদি অবস্থা' একটি কল্পিত পরিস্থিতি, যেখানে সমাজের সবাই অজ্ঞানতার চাদরে ঢাকা থাকে। ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থ সম্পর্কে সবাই সেখানে উদাসীন এবং কেউই জানে না যে

ভালো জীবন কাকে বলে। এমন কথা আপনাদের মনে কৌতুকের সৃষ্টি করলেও রলসকে এভাবে প্রারম্ভিক প্রস্থানের (পয়েন্ট অব ডিপার্চার) চিন্তনকণা সৃষ্টি করেই এগোতে হয়েছিল। যদিও এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পটভূমিটি কৃত্রিম, রলসের নিজেরই কল্পিত, তবে রলস এর ভিত্তিতে ন্যায্যতার এক মৌলিক ভিত্তিভূমি সৃষ্টি করেছেন। শুধু তা-ই নয় সূত্রগুলোকে বেশ শক্ত গাঁথুনিতে আঁটতে পেরেছেন। এর ভিত্তিতেই কেবল ন্যায্যতা সামনে এগোতে পারে। আর এই ন্যায্যতার ভিত্তিতেই সমাজে প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি হবে ও চলবে। এবং এরই ভিত্তিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ন্যায্য সমাজের সন্ধান পাওয়া যাবে।

চুক্তিমূলক (কন্ট্রাকটারিয়ান) ন্যায্যতা

রলসের চিন্তাপদ্ধতি মূলত চুক্তিমূলক (কন্ট্রাকটারিয়ান)। আদি অবস্থায় সবাই সর্বসম্মতভাবে কোন ধরনের 'সামাজিক চুক্তি' গ্রহণ করবেন সেটি রলসের চিন্তায় স্পষ্ট নয়। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর বহুল আলোচিত "ক্রিটিক অব প্রাকটিক্যাল রিজন" গ্রন্থে প্রথম এই চুক্তিনির্ভর চিন্তাপদ্ধতির ধারাণাটি আমাদের দেন। তবে বর্তমান সময়ে চুক্তিমূলক চিন্তাপদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধনে নেতৃত্ব দেন জন রলস। ফলে সমকলীন নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনে চুক্তিমূলক ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রলসের "সমদর্শিতাই ন্যায্যতা" তত্ত্বের ধারণাটি মূলত চুক্তিমূলক ভাবনার ঐতিহ্যের কাঠামোই অনুসরণ করেছে। রলস 'আ থিওরি অব জাস্টিস' গ্রন্থে এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন: "লক, রুশো, এবং কান্ট প্রস্তাবিত সামাজিক চুক্তির ধ্রুপদী তত্ত্বটিকে বৃহত্তর রূপ দেওয়া এবং তাকে বিমূর্ততার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা"—এটাই তাঁর লক্ষ্য।

চুক্তিমূলক ন্যায্যতাসমালোচনা

অমর্ত্য সেন রলসের এই ধারাটিকে তৃপ্তিযোগবাদী তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করার প্রয়াশটিকে সমালোচনা করেছেন। অমর্ত্য সেনের মতে, 'এই গুরুত্বপূর্ণ তুলনাটি আমাদের গভীরভাবে ভাবায়। কিন্তু শুধু এই বৈপরীত্যের ওপর জোর দেওয়ার ফলে রলস অন্য নানা চিন্তাধারাকে অবহেলা করেছেন, যে ধারাগুলো তৃপ্তিযোগবাদী নয়, অবার চুক্তিমূলকও নয়। আবার আমরা অ্যাডাম স্মিথের দৃষ্টান্তটি নিতে পারি। ন্যায্যতার দাবিকে সমদর্শিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাঁর (স্মিথের) "নিষ্পক্ষ দর্শক"-এর ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন।... স্মিথের নিষ্পক্ষ দর্শকের ধারণা ব্যবহার করে সমদর্শিতার প্রশ্নটি আলোচনা করলে এমন কিছু সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়, রলসের চুক্তিমূলক বিশ্লেষণের ধারায় যার অবকাশ নেই। আমরা এমন সম্ভাবনাগুলো বিচার করতে পারি: (১) কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার অন্বেষণ না করে তুলনামূলক মূল্যায়ন; (২) কেবল প্রতিষ্ঠান এবং সূত্রাবলির হিসাব না নিয়ে সামাজিক পরিণামের প্রতি নজর দেওয়া; (৩) সামাজিক মূল্যায়নে অসম্পূর্ণতার সম্ভাবনা রেখে দিয়েও সামাজিক ন্যায্যতাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পথনির্দেশ দেওয়া, বিশেষত যেখানে অন্যায়ের স্বরূপ স্পষ্ট ও সহজবোধ্য; (৪) যারা চুক্তির শরিক, সেই ব্যক্তিবর্গের বাইরে অন্যদের মতামত জানা, সেটা তাদের স্বার্থকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই হোক কিংবা স্থানীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকতে না চাওয়ার তাগিদেই হোক।... এই সমস্যগুলোর প্রত্যেকটিই চুক্তিমূলক ধারা এবং রল্সের "সমদর্শিতাই ন্যায্যতা"র তত্ত্বকে সীমিত করে।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ৯৩-৯৪)।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, জন রলসের ন্যায্যতার তত্ত্ব সমদর্শিতার ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর এই সমদর্শিতার তত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন 'আদি অবস্থা'র ধারণার ভিত্তিতে। এখন প্রশ্ন

হচ্ছে, রলসের কাছে কোন মানুষগুলো এসব প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন? সামাজিক চুক্তির যেসব নানা ধরনের রূপ সমাজে দেখা যায়, তাতে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এত অংশ নিতে পারবেন না। অমর্ত্য সেন রলসের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অমর্ত্য সেন বলেন: "রলস সামাজিক চুক্তির যে রূপটি ব্যবহার করেছেন, তার ফলে কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মানুষ ন্যায্যতার সন্ধানে যোগ দিতে পেরেছে, তিনি যাদের জনসমুদয় (পিপল) নামে অভিহিত করেছেন। সমকালীন রাজনীতির তত্ত্বে একটি জাতি-রাষ্ট্রের মানুষকে যেভাবে অভিহিত করা হয় তার সঙ্গে এর একটা সামগ্রিক সাদৃশ্য রয়েছে। (রলস) আদি অবস্থার ধারণাটি এর বাইরে যাওয়ার প্রায় কোনো উপায়ই রাখেনি। ...টমাস পোগে এবং আরও কেউ কেউ যেমন রলসের আদি অবস্থাকে 'বিশ্বজনীন' একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রলসের পথ ধরে একটা বিশ্বায়িত সমাজের জন্য ন্যায্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করার (যেমন, একটা বিশ্বায়িত সরকার গড়ে তোলার) প্রকল্পটি নিয়ে গভীর সমস্যা আছে। ... টমাস নেগেলের মতো তাত্ত্বিকেরা বিশ্বায়িত ন্যায্যতার ধারণাটিকেই অসম্ভব বলে রায় দিয়েছেন। অথচ একটি দেশে সামাজিক অবস্থার ন্যায্যতার মূল্যায়ন করতে হলে কোনো দেশের সীমানার বহির্ভূত বৃহত্তর বিশ্ব প্রাসঙ্গিক হতে বাধ্য। তার অন্তত দুটি কারণ আছে।... প্রথমত, একটা দেশে কী হচ্ছে, সেই দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করছে, বাকি পৃথিবীর ওপর তার প্রভাব পড়বেই।...আমরা এই পরস্পরিক প্রভাবের বলয়েই বেঁচে আছি। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশ বা সমাজেই কিছু স্থানীয় এবং সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা থাকতে পারে, যেগুলো বৃহত্তর দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা দরকার হয়। কারণ, সেই পর্যালোচনার সূত্রে অনেক নতুন ধরনের প্রশ্ন উঠতে পারে, এবং একটা দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব কথা ধরে নিয়ে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, অন্য দেশ বা সমাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়, সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা যায়।" (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ৯৪-৯৫)।

আইসায়া বার্লিন অমর্ত্য সেনের সঙ্গে এক আলোচনায় রলসের তত্ত্ব নিয়ে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছিলেন। বার্লিনের প্রশ্নটি ছিল: '"সমদর্শিতাই ন্যায্যতা" ধারণাটি যথেষ্ট মৌলিক ধারণা হতে পারে না, কারণ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি প্রধান ভাষায় এই দুটি শব্দের সাবতন্ত্র প্রতিশব্দই নেই। যেমন ফরাসি ভাষায় "ন্যায্যতা" দিয়েই দুটি ধারণা বোঝাতে হয়।' অমর্ত্য সেন বার্লিনের প্রশ্নটি একটি চিঠিতে লিখে রলসকে জানান। রলস চিঠিটি পেয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্তির সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন। রলসের জবাবটি ছিল: 'বিশেষ বিশেষ এবং অর্থের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট শব্দ একটি ভাষায় আছে কি না, সেটা এখানে খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়; আসল প্রশ্ন হলো—নির্দিষ্ট শব্দ না থাকলেও সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝে নিতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয় কিনা, এবং তারা প্রয়োজন ও প্রসঙ্গ অনুসারে যত শব্দ দরকার তত শব্দই ব্যবহার করে ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারেন কি না।'

ন্যায্যতা প্রশ্নে রলস ও স্মিথের সমন্বয়

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রলস কেন 'আদি অবস্থা'র ধারণা নির্মাণে অজ্ঞানতার চাদরে ঢাকা জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন? কারণ, সেই গোষ্ঠীর সদস্যরা যেন কায়েমি স্বার্থ ও ব্যক্তিগত নানা ধরনের প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের নিস্পক্ষ দর্শক ধারণাটির অর্থ হলো 'মানবসমাজের বাকি অংশের চোখ' দিয়ে পরিস্থিতির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। আমার মতে, একটি ন্যায্য সমাজের নির্মাণে নির্মোহ থাকার আন্তরিকতার কোনো অভাব আমরা রলস ও স্মিথের মধ্যে পাই না বরং উদ্দেশ্যের দিক থেকে যথেষ্ঠ মিল আছে এমনটিও বলা যায়। তা সত্ত্বেও রলস তাঁর অজ্ঞানতার চাদরে ঢাকা জনগোষ্ঠীকে

পৃথিবীর বাদবাকি জনগোষ্ঠীর মূল্যায়নের বাইরে রেখেছেন। অর্থাৎ রলসীয় তত্ত্বে অন্যদের অংশগ্রহণের যে স্বাধীনতাটি নেই, স্মিথের নিস্পক্ষ দর্শক বা ইম্পারশিয়াল স্পেকটেটরের ধারণাটি অনেকখানি স্থিতিস্থাপক (ফ্লেক্সিবল)। স্মিথের চিন্তার এই শক্তিশালী দিকটি আমাদের রলসের তত্ত্বীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে উৎসাহ দেয়। তাসত্ত্বেও 'বাকি লোকদের' চোখ দিয়ে কী দেখা সম্ভব হবে, সে জন্য মুক্তমনের প্রয়োজন—এই প্রসঙ্গটিতে স্মিথের বক্তব্যগুলো রলসের তত্ত্ব বাতিল না করে বরং সমর্থনই করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চুক্তিমূলক ন্যায্যতার ভেতর যে যুক্তিপ্রয়োগের বিষয়টি কীভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অ্যাডাম স্মিথের ইম্পারশিয়াল স্পেকটেটর বা নিস্পক্ষ দর্শক ধারণাটি ব্যবহারের সঙ্গে চুক্তিমূলক যুক্তিপ্রয়োগের সম্পর্ক রয়েছে। ন্যায্যতার ভেতর সমদর্শিতা কাজ করছে কিনা, তা নিশ্চিত হতে আমরা যেকোনো লোকের মত আহ্বান করার মতো স্থিতিস্থাপক (ফ্লেক্সিবল) থাকতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো চুক্তির ভেতর আপস-মীমাংসার ক্ষেত্রে সমদর্শিতা অনেক সময় রক্ষা করা যায় না। কারণ, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ভেতরই সেটি সীমিত থাকে, অথবা যেসব ব্যক্তির ভেতর চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে সেখানকার 'বদ্ধ নিস্পক্ষতা'র কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কেউ এখানে চুক্তি সম্পাদনে স্বাক্ষীর কথাটি তুলতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হলো একই জনগোষ্ঠী বা সংস্কৃতির সদস্য থেকে স্বাক্ষী হওয়ায় 'বদ্ধ নিস্পক্ষতা'কে 'মুক্ত নিস্পক্ষতা'য় রূপান্তরিত করার অনেক বাধা থেকেই যায়। মোদ্দা কথাটি হলো, সমসাময়িক সময়ের হবসীয় চিন্তাবিদ রলস ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বিশুদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলায় মনোযোগী। কিন্তু এধরনের প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম রাষ্ট্রে কাজ করতে পারবে, তখনই যখন সমাজটির অস্তিত্ব থাকবে ন্যূনতম দুটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রথমটি হলো—সমাজের সদস্যদের ভেতর সামাজিক চুক্তি থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়টি হলো—সমাজের সদস্যদের ভেতর সম্পূর্ণ মতৈক্যের ভিত্তি থাকতে হবে। রলসের 'আ থিওরি অব জাস্টিস' গ্রন্থেই একথার সমর্থন পাওয়া যায়: "এটি খুবই সম্ভব যে, একজন প্রকৃত বিচারশীল ও নিস্পক্ষ দর্শক কেবল সেই সমাজব্যবস্থাকেই সমর্থন জানাবেন যেটি ন্যায্যতার সূত্রগুলোকে গ্রহণ করে, এবং সেগুলো আবার একটি চুক্তির মাধ্যমে গৃহীত হয়।" (অনুচ্ছেদ ৩০, পৃ. ১৮৪-৮৫)।

ন্যায্যতার পথে যুক্তিচর্চার গুরুত্ব

তবে একথা সত্য যে চুক্তিমূলক যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে উভয় পক্ষের কিংবা বহুপক্ষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। রলসের আশা করেছিলেন, 'মানুষ যখন সামাজিক চুক্তির ঐকমত্যে উপনীত হবে, সবাই তখন সংকীর্ণ স্বার্থের পেছনে দৌড়ানো ত্যাগ করে সামাজিক চুক্তি যাতে কার্যকর থাকে এমন আচরণই করবে।' কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত রলস তাঁর "পলিটিকাল লিবারালিজম" গ্রন্থে এবিষয়ে বলেন: 'যুক্তিগ্রাহী ব্যক্তিগণ একটা সামাজিক ভূবন চান, যেখানে তারা স্বক্ষম ও সমান হিসেবে অন্যদের সঙ্গে এমন শর্তে যৌথ আচরণে যুক্ত হবেন, যা অন্যদের কাছেও গ্রহণযোগ্য। তারা চাইবেন এমন পারস্পরিক বিনিময়ের পরিমণ্ডল, প্রত্যেকেই যা থেকে সুবিধা পাবেন। বিপরীতে, যখন দেখা যাবে যে মানুষ অন্যদের সঙ্গে বিনিময়-সম্পর্কে জড়িত হচ্ছেন, অথচ যথার্থ ন্যায্য আচরণবিধির ধার ধারছেন না, আচরণবিধি ভাঙা সম্ভব হলেই স্বার্থের প্রয়োজনে তা ভাঙতে প্রস্তুত; তখন একটি মৌলিক অর্থে তারা আচরণ অ-যুক্তিগ্রাহী বলে গণ্য হবেন।' (পৃ. ৫০)।

চুক্তিপূর্ব ও চুক্তি-উত্তর আচরণে পার্থক্য

রলস অবশ্য চুক্তিপূর্ব ও চুক্তি-উত্তর মানুষের আচরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। তবে আশা করেছেন যে মানুষ সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহী আচরণ করবে। রলস অবশ্য কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, চুক্তির মধ্যেই সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহী আচরণের কথা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অমর্ত্য সেন রলসের এই অবস্থান নিয়ে মন্তব্যে বলেছেন, 'রলসের তত্ত্বায়নকে তাই অপূর্ণ বা অসংহত বলে অভিযুক্ত করা যায় না। তবু প্রশ্ন থেকে যায়: আমরা যে বাস্তব জগতে বাস করি, যা রলস কল্পিত বিশ্ব নয়, সেখানে কীভাবে এই রাজনৈতিক মডেল আমাদের ন্যায্য বিচারের দিশা দেবে? সম্পূর্ণ ন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থা নির্মাণ এবং তার সঙ্গে যথাযথ আচরণ যুক্ত হলে, সম্পূর্ণ ন্যায্য সমাজ গঠন যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে রলসের বক্তব্যের অর্থ আছে। কিন্তু তাহলে সামাজিক ন্যায্যতা সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী চিন্তা এবং আমাদের তুলনামূলক বিচারভঙ্গির মধ্যে একটা মস্ত বড় ও সমস্যাসংকুল দূরত্ব তৈরি হবে।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ১০৩)।

অমর্ত্য সেন রলসের তত্ত্বের পর্যাপ্ততা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। কারণ, সেনের মতে, 'তিনি (রলস) যখন সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী ন্যায্যতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করছেন, তখন প্রোৎসাহের (ইনসেন্টিভ) দাবিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বৈষম্যকে জায়গা ছাড়তে হচ্ছে। আমরা যদি "রেসকিউয়িং জাস্টিস অ্যান্ড ইনইকুয়ালিটি" গ্রন্থে প্রদত্ত জি এ কোহেনের যুক্তিটি গ্রহণ করি... মানুষকে যথাযথ আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে (যা তাদের ন্যায্য পৃথিবীতে এমনিতেই করা উচিত, কোনো ব্যক্তিগত প্রোৎসাহ ছাড়াই) বৈষম্যকে ছাড় দেওয়া অনুচিত।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ১০৩)।

চুক্তিমূলক ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র

চুক্তিমূলক ন্যায্যতায় যুক্তিপ্রয়োগের গুরুত্ব যেমন কেন্দ্রীয় ও মৌলিক বিষয়, ঠিক তেমনই গণতন্ত্রের চর্চাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমি যতদূর জানি গণতন্ত্রের অন্তত দুটি ধরন আছে। অবশ্য আমাদের দেশে একটি ধরনকেই গণতন্ত্রের একমাত্র ধরন হিসেবে সর্বাধিক মনে করা হয়। গণতন্ত্রের অন্তত দুটি ধরনের মধ্যে প্রথমটি হলো ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি বা প্রকাশ্য গণতন্ত্র। প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন, ভোট, অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষভাবে নাগরিকদের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং সব রাজনৈতিক দলের জন্য সুযোগের সমতাসহ এধরনের আরও অনেক কিছুই রয়েছে।

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ধরনটি হলো ডেলিবারেটিভ ডেমোক্রেসি বা আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক গণতন্ত্র। অর্থাৎ দেশের সরকারি সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করার আগে জনগণের মধ্যে প্রকাশ্য যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তোলা। আলোচনাভিত্তিক গণতন্ত্রকে সম-অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা যায়। কারণ—সেখানে প্রতিবাদ, মতবিনিময় ও অলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ রাজনীতির অন্যান্য বৈধ চর্চা বোঝায়, যা বিভিন্ন দেশে সাধারণভাবে অনুশীলন হয়ে আসছে। গণতন্ত্রের মূল বিষয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। অর্থাৎ সরাসরি অংশগ্রহণ কিংবা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ নিজেই নিজেকে পরিচালিত করবে। কারণ, মানুষ সম্পর্কে মৌলিক গণতন্ত্রে মৌলিক বিশ্বাস হলো মানুষ পরাধীন নয়।

গণতন্ত্রের শক্তি সংরোধক ক্ষমতা (কাইন্টাভেইলিং পাওয়ার)

স্বাধীনতা মানুষের সব কর্মকাণ্ডের একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয়। এখানে কানাডীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথের একটি ধারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি দীর্ঘদিন বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকতা করেছেন এবং একই বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে

কাজ করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বছর, ১৯৫২ সালে তাঁর সাড়াজাগানো "আমেরিকান ক্যাপিটালিজম: দ্য কনসেপ্ট অব কাইন্টাভেইলিং পাওয়ার" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি "কাইন্টাভেইলিং পাওয়ার" বা "সংরোধক ক্ষমতা" নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়ার আলোচনা করেন।

গলব্রেথ দেখান যে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে, তখনই যখন ক্ষমতাপ্রত্যাশী একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর ওপর অন্য দলগুলোর সংরোধক ক্ষমতা কাজ করবে। ফলাফল হবে কোনো একটি গোষ্ঠী বা দল অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারবে না অথবা এত বেশি ক্ষমতাবান হতে পারবে না, যাতে অন্যান্য দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। বাস্তবিকভাবে গণতন্ত্র এভাবে আরও বেশি কার্যকর ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে বলে গলব্রেথ মত দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ববাদী শাসনধারা যদি কোথাও গড়ে ওঠে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রক্ষমতার বণ্টন নিয়ে কমিউনিস্ট ভাবধারার লোকদের এবিষয়ে অনাগ্রহ বেশ চোখে পড়ার মতো। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় গলব্রেথের সংরোধক ক্ষমতার ধারণা সেসব একপেশে অবস্থা থেকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় জনগণকে আনতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

শেকসপিয়ারের "কিং জন" নাটকে একটি চমৎকার মন্তব্য রয়েছে: "প্রায়ই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মূল্যায়ন আমাদের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।" আমরা নিজেরা ধনী কিংবা গরিব বা বিশেষ কোনো পরিচিতির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলে বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যায়ন নিষ্পক্ষ দর্শক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার মানসিকতা অমাদের মধ্যে কাজ না-ও করতে পারে। নিজেরা নিজেদের প্রশ্রয় দিলে আত্মসমীক্ষার বিস্তৃতি সংকুচিত হয়ে পড়বে। এটি এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে বাস্তবে সমদর্শিতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন 'সমদর্শী আচরণ'। আর নিজেদের মধ্যে এই সমদর্শী আচরণ নির্মাণে মৌলিকভাবে সাহায্য করবে অন্যদের দৃষ্টিকোণ ও তাদের ভাবনাচিন্তাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন। আর তা করতে গেলে সাধারণ বিচারশীলতার গণ্ডির বাইরে সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু রলস যে কন্ট্রাকটারিয়ান বা চুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করেছিলেন ,তার প্রধান বিষয় হলো, অমর্ত্য সেনের ভাষায়—'শেষ বিচারে তার (চুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি) মুখ্য বিষয় হলো বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সুবিধা অর্জন।" (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ২৩৪)।

৩. ন্যায্যতার অনুসন্ধান ও বাস্তব পৃথিবী

প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতা বনাম অপ্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতা

অমর্ত্য সেনের ন্যায্যতা বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক একটি উদ্ধৃতি এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তার ওপর দৃষ্টিপাত করা দরকার, শুধু প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাদির মূল্যায়নে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করলে চলে না। দ্বিতীয়ত, ন্যায্যতার প্রশ্নে বিভিন্ন বিকল্পের তুলনামূলক বিচার করতে হবে, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতভাবে ন্যায্য একটি ব্যবস্থার সন্ধান করলে চলবে না।... সমগ্র বইটিতে প্রকাশ্য যুক্তিপ্রয়োগ নিষ্পক্ষতার দাবিগুলোকে ব্যবহার করে সেটি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।' (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃ. ৪৫৬)।

এ পর্যন্ত চুক্তি ও ন্যায্যতা নিয়ে দুটি ভিন্ন চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে আলোচনা করা হলো। একটি হলো সামাজিক চুক্তির কাঠামোয় ন্যায্যতাসম্পর্কিত যুক্তিপ্রয়োগের ধারা। এই ধারাটি আরম্ভ হয় টমাস হবস থেকে। পরে এই ধারায় অবদান রাখেন জন লক, জ্যা-জাঁক রুশো ও ইমানুয়েল কান্ট। সমসাময়িক কালে চুক্তিমূলক ঐতিহ্যটিতে অবদান রেখেছেন জন রলস, রবার্ট নজিক, গতিয়ে, ডোয়ারকিনসহ

অন্যরা। আর চুক্তিমূলক এই ধারাটি গ্রহণ না করে সামাজিক চয়নের বিচারধারা যাঁরা অনুসরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমর্ত্য সেন, জঁ দ্রেজসহ অন্যরা। এই দ্বিতীয় ধারাটি দেখাতে চেয়েছে যে, সামাজিক চুক্তির ঐতিহ্যটি অত্যন্ত জ্ঞানদীপ্ত হলেও এটি ন্যায্যতার একটি প্রশস্ত ভিত্তি হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই বিচারধারার সীমাবদ্ধতাগুলো খুবই বেশি এবং শেষপর্যন্ত এটি ন্যায্যতা বিষয়ে বাস্তব যুক্তিপ্রয়োগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতার সীমাবদ্ধতা

তবে আমার পর্যবেক্ষণে আলোকায়নের দুটি ভিন্ন ধারার এই পরস্পরকে বাতিল করে দেওয়ার প্রবণতাটির সীমাবদ্ধতা হলো উভয়পক্ষই কতগুলো বাস্তবতার তত্ত্বায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, আমরা যে বাস্তব পৃথিবীতে বাস করি, তাতে মানুষকে দেখি তার জানা সমস্তকিছু প্রয়োগ করে অনুন্নত জীবন থেকে অধিকতর উন্নত জীবনের দিকে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলতে। অর্থাৎ মানুষ হলো চিন্তা ও চর্চার গঠনমূলক অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট সামগ্রিক সত্তার বিশাল এক ভান্ডার। ফলে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দুটো ধারাই সমন্বিতভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে চায়। আবার এ কথাও সত্য, চুক্তিমূলক বা সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী ও তুলনামূলক বা ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতার এই দুই বিপরীত ধারার মধ্যেও তাদের ভেতর কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে। নইলে তাদের আলোকায়ন চিন্তাধারা নামকরণ করা হলো কেন? আর তা ছাড়া দুটি ধারাই যৌক্তিকতার ওপর বিশ্বাস রাখে এবং উভয় পক্ষই সামাজিক ও প্রকাশ্য যুক্তি-তর্ককে মৌলিকভাবে গুরুত্ব দেয়।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতার সমন্বয়ে নতুন ন্যায্যতার নির্মাণ

হবস ও হিউম

উক্ত আলোচনায় আমার কতগুলো নতুন পর্যবেক্ষণ রয়েছে। পাঠকের কাছে আমার ভাবনা স্পষ্ট করার জন্য উক্ত দুটি ধারার একজন দার্শনিককে আমি বেছে নেব এবং তাঁর বিপরীত চিন্তাধারার অলোকায়ন যুগেরই অন্য একজন দার্শনিকের ভাবনাগুলো উপস্থাপন করব এবং বর্তমান সময়ের অন্যতম দার্শনিকের ব্যাখ্যার সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত করে আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। সামাজিক চুক্তির প্রবক্তা দার্শনিক টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) ন্যায্যতা নিয়ে যা ভেবেছেন, তার কেন্দ্রে রয়েছে রাষ্ট্র।

অর্থাৎ হবসের ন্যায্যতার ধারণা গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। হবসের চোখে মানুষ হলো অসভ্য, বর্বর, আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক এবং অযৌক্তিক আচরণে পূর্ণ এক সত্তা। সুতরাং সে সভ্য ও নিয়ম মেনে চলবে, যখন সে একটি সামাজিক চুক্তির ভেতর দিয়ে যাবে; যেখানে সে অপরের অধিকারের সীমাকে ভঙ্গ না করার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। আর এর অন্যথা কেউ করলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র আইন ভঙ্গকারীকে তার ক্ষমতা বলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিচারের আওতায় আনবে।

হবস পড়ে আমার মনে হয়েছে, সম্ভবত হবসের চিন্তায় ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বলপ্রয়োগের ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ জনসাধারণ খুবই বিশৃঙ্খল ও অন্যায্যতাপ্রিয় এবং এর উৎস তার ব্যক্তিস্বার্থ। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের শৃঙ্খলায় আনতে হবে। আর এই বলপ্রয়োগের বৈধতার জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তিনি আশা করেছিলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো নিষ্পক্ষ ও বিশুদ্ধভাবে ন্যায্য হলে তার পক্ষে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভেতর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। কারণ, সার্বভৌম রাষ্ট্রের নানা ধরনের বিস্তৃত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার কাজটি করে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বর্তমান সময়ের দার্শনিক অমর্ত্য সেন হবসের ন্যায্যতা চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অমর্ত্য সেন বলেন,'তিনি (হবস) মনে করতেন যে ন্যায্যতার প্রাতিষ্ঠানিক দাবিগুলো কেবল সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমার মধ্যেই মিটতে পারে, অর্থাৎ ন্যায্যতার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন এবং সেগুলোকে গড়ে তোলা ও সচল রাখার জন্য আবশ্যক সার্বভৌম রাষ্ট্র।' কিন্তু দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) টমাস হবসের মতো করে ভাবতেন না। প্রকৃতপক্ষে হিউমের চিন্তা হবসের ঠিক বিপরীত। হিউম ন্যায্যতাকে কোনো সুনির্দিষ্ট সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভেতর খোঁজেননি। অমর্ত্য সেন ডেভিড হিউম স্মারক বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন:'প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাটা হিউমের চিন্তাতেও খুবই গুরুত্ব পেয়েছে, এবং এ বিষয়ে তাঁর গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যায্যতার বিষয়ে তিনি তাঁর চিন্তাকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংকীর্ণ ধারণার মধ্যে আটকে রাখেননি। রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে বৈশ্বিক ন্যায্যতা বলে কিছু হতে পারে না, এমন কোনো ধারণা তাঁর চিন্তায় স্থান পায়নি।... বিদ্যমান ব্যবস্থাপনাগুলোর মধ্যে কী কী অন্যায্যতা আছে, সেগুলো চিহ্নিত করার কাজটিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা করতে গিয়ে আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রচলিত সীমানাটাকে বদলে ফেলতে হবে।... এটা হয়তো হিউমের বিশ্ব-ন্যায্যতার চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত—বিদেশের সঙ্গে যেভাবে আমাদের বাণিজ্য বিস্তার ঘটে চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংবেদন ও যুক্তি প্রয়োগকেও এই কথাটা হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে যে "ন্যায্যতার পরিধিটা ক্রমে বিস্তৃত হয়ে চলেছে"। ন্যায্যতা কেবল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের লোকদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এমন কোনো চিন্তায় আটকে থাকা চলে না।'

হিউম-স্মারক বক্তৃতায় অমর্ত্য সেন হিউমের চিন্তাগুলোর বর্তমান পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিকতার অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন: 'হিউমের অনেক নতুন এবং পথপ্রবর্তক চিন্তা সমসাময়িক আলাপ-আলোচনায় যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। তাঁকে আলোকায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) যুগের অগ্রণী "মহা-দার্শনিক" শিরোপায় ভূষিত করা হলেও, তাঁর চিন্তা বিষয়ে অবহেলাগুলো চলেই এসেছে।' অমর্ত্য সেন হিউমের অন্তর্দৃষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অধ্যাপক সেনের ভাষায়,'হিউমের অন্তর্দৃষ্টিগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, নৈতিক বিষয়গুলোকে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তথ্য ও জ্ঞানের গুরুত্বকে স্বীকার করা। অন্য একটি ব্যাপার হচ্ছে, মানব সংবেদনের (সেন্টিমেন্টস) জোরালো ভূমিকাটাকে অগ্রাহ্য না করেও যুক্তির গুরুত্বকে মেনে নেওয়া। তা ছাড়া তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের শেখায় যে যারা এই পৃথিবীর অন্যত্র, আমাদের থেকে বহু দূরে বাস করেন, এমনকি যারা এখনো জন্মাননি, ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর বাসিন্দা হবেন, তাদের কথা ভাবাও আমাদের দায়িত্ব।'স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম সবসময় যে ভারী ভারী কথা বলেছেন তা নয়। তার একটি কথা আমাদের মুডকে একটু হালকা করতে সাহায্য করতে পারে। হিউমের কথাটি হলো 'সেই ব্যক্তিই সুখী, যার মেজাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এর চেয়েও বেশি সুখী সেই ব্যক্তি, যিনি যেকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের মেজাজ সহজেই খাপ খাওয়াতে পারেন।'

৫. অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতা

হবস, হিউম ও অমর্ত্য সেন

হবস, হিউম ও অমর্ত্য সেন পড়ে আমার কতগুলো পর্যবেক্ষণ মনে এসেছে। আমার মনে হয়, অমর্ত্য সেন-উত্তর ন্যায্যতা তত্ত্বের গভীরতার সম্প্রসারণ ও ন্যায্যতার পরিধি বাড়াতে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ কাজে লাগতে পারে। বর্তমানে আমরা বিশ্বায়নের যে বিশেষ সময়টায় বাস করি, সেখানে হিউমের

ন্যায্যতা-চিন্তার বিশেষ কতগুলো দিকের প্রতি খুব সঠিকভাবেই অমর্ত্য সেন আমাদের মনোযোগ দিতে বলেছেন—ন্যায্যতাসংক্রান্ত আমাদের চিন্তার ঘাটতিগুলো যেন আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

অমর্ত্য সেনের এ অন্তর্দৃষ্টি আমরা কাজে লাগিয়ে পৃথিবীব্যাপী শ্রমের যে বৈশ্বিক বিভাজন রয়েছে বিশেষ করে, বর্তমান পৃথিবীতে উৎপাদনের যে বিশ্বময়তা রয়েছে, সেখানে কতগুলো সংকটের দিকে আমরা আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি। বর্তমান সংকটগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবেশের ভয়ংকর বিপর্যয় ও জলবায়ু সংকট, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, ব্যক্তিপরিচয়ের একমাত্রিকতার সংকট ও বিশ্বসম্প্রীতির ভেঙেপড়া সেতুবন্ধন, করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষাপটে কাজ হারিয়ে আয় কমে যাওয়া ও টিকা বৈষম্য, স্বাস্থ্য পরিষেবার সমূহসংকট, শিক্ষার মৌলিক গুরুত্বের অভাব ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের ন্যায্যতার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক ও পরিস্থিতির উত্তরণে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো যায়।

এক্ষেত্রে ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সুখ্যাত অধ্যাপক ড. জয়তী ঘোষ সম্প্রতি একটি লেখায় বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার ওপর চমৎকার আলো ফেলেছেন। তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতের মহামারি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংকট কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সরকারি খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক এবং বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনসক্ষমতা তৈরি করা জরুরি। আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বৈশ্বিক কর সহযোগিতা। বৈশ্বিক কর সমন্বয়ের কাজটি সহজ হবে যদি বহুজাতিক কোম্পানিদের পুরোদমে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সমান কর প্রদান করতে বলা হয়। পাশাপাশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর তাদের মূল রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি মুনাফা পাঠানোর বদলে সাবসিডিয়ারি রাষ্ট্রগুলোতে মুনাফার পরিমাণ ভাগ করে নেওয়াকে নিশ্চিত করা যায়। আর তা করতে পারলে বৈষম্য কমে আসবে এবং পিছিয়ে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রয়োজনীয় সম্পদ পাবে।' (বণিক বার্তা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১)।

অমর্ত্য সেনের ন্যায্যতা চিন্তার পর্যালোচনা

তাসত্ত্বেও হিউমের ন্যায্যতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের চিন্তাভাবনাকে আমার কিছুটা একপেশে মনে হয়েছে। কারণ, অমর্ত্য সেন আমাদের ন্যায্যতার ভাবনা-চিন্তাগুলোকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিধির বাইরে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে বলে ডেভিড হিউম ও টমাস হবসকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ন্যায্যতার প্রশ্নে হিউম ও হবসের চিন্তাগুলো পরস্পরকে বাইনারি বা বিপরীত মেরুর চিন্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সমস্যা আরও আছে।

অমর্ত্য সেন হিউমের চিন্তার বিশেষ কতগুলো দিক যেমন মানব সংবেদনগুলোকে যুক্তিপ্রয়োগের সঙ্গে সমন্বয় করার গুরুত্বের কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'ডেভিড হিউমের জন্ম ৩০০ বছর আগে, ১৭১১ সালে। তাঁর সময়ের তুলনায় আজকের পৃথিবী অনেক বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও অনুজ্ঞাগুলো (আইডিয়াস অ্যান্ড অ্যাডমোনিশনস) এখনো খুবই প্রাসঙ্গিক। অথচবর্তমান পৃথিবীতে তাঁর ভাবনাগুলো গুরুত্ব দেওয়ার বদলেযেন খানিকটা অবহেলাই করা হয়েছে। হিউমের অন্তর্দৃষ্টিগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, নৈতিক বিষয়গুলো ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তথ্য ও জ্ঞানের গুরুত্বকে স্বীকার করা। অন্য একটি ব্যাপার হচ্ছে, মানব সংবেদনের (সেন্টিমেন্টস) জোরালো ভূমিকাটাকে অগ্রাহ্য না করেও যুক্তির গুরুত্বকে মেনে নেওয়া।'

ন্যায্যতার জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্প্রসারণ বনাম ন্যায্যতার পারিসরিক সম্প্রসারণ

আমাদের চিন্তাভবনার এমন গুরুতর ঘাটতির দিকটি হিউমের বরাতে অমর্ত্য সেন আমাদের ধরিয়ে দিলেও হিউমের চিন্তার জগৎটিতে যুক্তি ও সংবেদনশীলতার মেলবন্ধনের অর্গানিক উৎসটি কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে ও এগিয়েছে, তা সেন আমাদের বিশদভাবে দেখাননি। এসবের বাইরেও আমার মনে হয়েছে, অমর্ত্য সেনের হিউমীয় ন্যায্যতার ব্যখ্যা অনেকটা ন্যায্যতার জ্ঞানতাত্ত্বিক (এপিস্টেমলোজিক্যাল) সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরিচালিত। অমর্ত্য সেন ন্যায্যতার জ্ঞানতত্ত্বে অবদান রাখতে গিয়ে ন্যায্যতার পারিসরিক (স্পেশাল) সম্প্রসারণের দিকে জোর কিছুটা কম দিয়েছেন। মোদ্দা কথা, সেন ন্যায্যতার জ্ঞানগত সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে এর পৃথিবীব্যাপী ন্যায্যতার পারিসরগত সম্প্রসারণের বিষয়টিকে কিছুটা উপেক্ষা করেছেন। আমার মতে, ন্যায্যতা কেবল তত্ত্বীয় উৎকর্ষতার বিষয় নয়, তত্ত্বীয় উন্নয়ন তো আছেই এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ন্যায্যতার নানা ধরনের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে চলেছে,যার আইনি ও সামাজিক নানা স্তরের অভিজ্ঞতাগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ ফেরানো জরুরি। কারণ, ন্যায্যতার যত সম্প্রসারণ ঘটবে এবং এর উৎকর্ষতা যতই বৃদ্ধি করা যাবে মানুষের স্বাধীনতা, সক্ষমতা, ভালো জীবন ও পরিবেশের সমূহক্ষতি থেকে নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মেকে রক্ষা করার সম্ভাবনা ততই বাড়িয়ে তোলা যাবে।

ক্রমবর্ধমান ন্যায্যতার পথে অগ্রসর হওয়া

স্বাধীনতা সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক ও লেখক আলবেয়ার কামুর একটি কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন,'স্বাধীনতা আসলে আরো ভালো কিছু হওয়ার সুযোগ।' অমর্ত্য সেনের কাছে বৈশ্বিক ন্যায্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।বিশ্বব্যপী ব্যাপকতর অন্যায্যতা কমানোর জন্য এটির (বৈশ্বিক ন্যায্যতার) ওপর খুবই জোর দিচ্ছেন তিনি। কারণ, বিশ্বব্যাপী ন্যায্যতা প্রসারের মাধ্যমেই বিপুল অন্যায্যতার লাগাম টেনে ধরা যেতে পারে বলে সেন বিশ্বাস করেন। এই জায়গাটিতেই হিউমের ন্যায্যতার বৈশ্বিক সম্প্রসারণের ধারণার সঙ্গে অমর্ত্য সেনের চিন্তার সেতুবন্ধন রচিত হচ্ছে। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে অমর্ত্য সেন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানার ভেতর ন্যায্যতা চর্চার সমস্যা ও সংকটগুলোর বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছন। বৈশ্বিক ন্যায্যতার সম্প্রসারণের জন্য সারা বিশ্বে যেসব সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে, সেগুলোর ভেতরকার বাধাগুলোর আলোচনা তো অপ্রাসঙ্গিক নয়। দার্শনিক টমাস হবস বৈশ্বিক ন্যায্যতার বিষয়টি বিশ্বাস করতেন না। কারণ, তাঁর মতে সেখানে ন্যায্যতার প্রয়োগ অসম্ভব। হবসীয় চিন্তার অনুসারী বর্তমান সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক টমাস নেগেল তাঁর ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'দ্য প্রবলেম অব গ্লোবাল জাস্টিস' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বিষয়টিকে এভাবে বলছেন, 'হবসের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে একটিমাত্র সরকার ব্যতিরেকে বৈশ্বিক ন্যায্যতার ধারণাটা অলীক কল্পনামাত্র।'

হবস যদি আজকের দিনে বেঁচে থাকতেন, তবে পৃথিবীর বর্তমান রূপ দেখে তাঁর কথাটি ঘোরাতেন বলে আমার মনে হয়। কারণ, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের "সার্বজনীন মানবাধিকার সুরক্ষার ঘোষণাপত্র", ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ঘোষিত সব দেশের সব মানুষের জন্য "নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক চুক্তি" ও "আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক চুক্তি" এসব সম্ভব হতো না। আর বৈশ্বিক ন্যায্যতা যদি সত্যি সত্যিই অলীক কল্পনার বিষয় হয়, তবে বিশ্বের নানা প্রান্তে মানুষের নানা ধরনের নাগরিক অধিকার অরক্ষিত হলে আমরা কেউই তা নিয়ে কোনো কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা তা তো নয়। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে নাগরিক অধিকার হরণ কিংবা পরিবেশের ক্ষতির বিষয়ে আমরা বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ ও আলোচনার আওয়াজ তুলতে দেখছি,

যা প্রমাণ করে—আমরা পৃথিবীর মানুষ একটিমাত্র সভ্যতার অংশীদার—প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো পরস্পরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন সভ্যতার ধারণাকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বৈশ্বিক সক্ষমতারও কতগুলো ঘাটতির দিক রয়ে গেছে, নইলে বিশ্বব্যাপী এতটা আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থচিন্তা, করোনা ভাইরাসের টিকার সরবরাহে ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যাপকতর বৈষম্য দেখতে হতো না। ফলে অমর্ত্য সেন হিউমকে হবসের বিপরীতে স্থাপন করতে গিয়ে নিজেকে কিছুটা বিপদে ফেলেছেন।

ন্যায্যতার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি

আমার মতে, ন্যায্যতার দর্শনে টমাস হবস ও ডেভিড হিউম দুজনই মহান দার্শনিক। প্রত্যেকেই চিন্তা গড়ে তুলে তাঁর সময়ে বিদ্যমান নানা সংকটের দার্শনিক মোকাবিলা করেছেন ও মানবজাতির সংকট উত্তরণে পথ দেখিয়েছেন। আর তা ছাড়া সময়ের হিসেবে হবস এ পৃথিবীতে আগে এসেছেন এবং ন্যায্যতার প্রশ্নগুলো তাকে আগে ভাবতে হয়েছে। ন্যায্যতার চিন্তা হবসের অবদানে সমৃদ্ধ হওয়ার পর যে অগ্রসর অবস্থা হিউম পরে এসে পেয়েছেন, সেখান থেকে তিনি শুরু করেছেন। ন্যায্যতার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে হবসের ভাবনাগুলোর সীমাবদ্ধতা নিয়ে হিউম গভীরভাবে ভেবেছেন এবং সেগুলোর সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ন্যায্যতার নতুন তাত্ত্বিক নির্মাণের দিকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে আমার মতে, আমরা যদি এ দুই মহান দার্শনিকের চিন্তাধারার ভিন্ন প্রবাহকে সমন্বিত করে দেখার চেষ্টা করি, তবে অমর্ত্য সেনের খানিকটা একপেশে ভাবনার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে। ন্যায্যতার পরিধির আলোচনা কোনো স্থির তাত্ত্বিক আলোচনায় আটকে থাকতে পারে না। বরং এটি হবে একটি গতিশীল ও বহুমুখী আলোচনা এবং চিন্তাচর্চার ক্ষেত্র। আমরা যে পৃথিবীটায় বাস করি, সেখানে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানগুলোর বিপুল ব্যর্থতা লক্ষ করছি। হবসের সার্বভৌম রাষ্ট্রের গণ্ডির ভেতর ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও কোনো রাষ্ট্রই বাস্তব ক্ষেত্রে বলতে পারবে না যে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো শতভাগ ন্যায্যতার বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সব ব্যবস্থা ও সুবিধা থাকার পরও অনেক ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে। অমর্ত্য সেন হিউমের চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে হবস ও হবসীয় চিন্তাধারার সমালোচনা করে এ ঘাটতির দিকটি তাঁর চোখ এড়িয়েই গেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

কিন্তু আমি নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করব, অমর্ত্য সেনের লেখা বিশেষ করে ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বিপুল সাড়াজাগানো গ্রন্থ "দ্য আইডিয়া অব জাস্টিস" গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় না ঘটলে ন্যায্যতা ও নীতিসংক্রান্ত দার্শনিক ও ব্যবহারিক আলোচনার এই সক্ষমতা আমার মধ্যে কিছুতেই গড়ে উঠত না। আমার জীবনে অমর্ত্য সেনের এই গ্রন্থের অবদানকে এককথায় আমি আমার পুনর্জন্ম হিসেবেই দেখি। তাঁর এই গ্রন্থপাঠে কেবল আমার চিন্তার পরিধির সম্প্রসারণই ঘটেনি বরং ব্যক্তি হিসেবে যাপিত জীবনের চর্চায়ও আমার আগের সব কিছুই বদলে দিয়েছে। সুতরাং ন্যায্যতা চিন্তায় আমাদের এমন কাঠামো নির্মাণ করতে হবে যেটি "বাস্তব পৃথিবীর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রয়োজন"কে "সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি"র আওতায় মানবজাতির সবধরনের অভিজ্ঞতাকে ধারন করতে পারবে। আমার প্রস্তাবে এই নতুন কাঠামোটি ন্যায্যতার জ্ঞানগত ও পারিসরিক উভয় দিকেই সম্প্রসারিত হতে পারবে। আর সেই কাজ করতে গেলে আমাদের ন্যায্যতা প্রশ্নে হবস, হিউম ও অমর্ত্য সেন—এই তিনজন মহান দার্শনিকের চিন্তার সুষম ও সু-স্থায়ী সমন্বয় করতে হবে। কোনো কিছুকে বাতিল করে দেওয়ার অহম কোনো কাজের কথা নয়—তা আমরা তখন বুঝতে পারব।

তথ্যসূত্র

1. Osmani, S. R. (2010). Theory of Justice for an Imperfect World: Exploring Amartya Sen's Idea of Justice. *Journal of Human Development and Capabilities*, *11*(4),599–607. https://doi.org/10.1080/19452829. 2010. 520965

2. Sen, A. (2009). *The Idea of Justice* (1st ed.). Belknap Press of Harvard University Press.

3. Sen, A. (2011b, December 29). The Boundaries of Justice: David Hume and our world. *The New Republic*, *242*(Number-20(4915)). https:// newrepublic. com/ article/98552/hume-rawls-boundaries-justice

5. অমর্ত্য সেন. (2021, June 10).ন্যায্যতার পরিধি: ডেভিড হিউম ও আমাদের পৃথিবী. (প্রথম কিস্তি) (The Boundaries of Justice: David Hume and our world). Chowdhury, A. J.(আহমেদ জাভেদ) (Trans.). *The Daily Bonik Barta*. https://bonikbarta.net/ home/news _description/265758/ন্যায্যতার-পরিধি:-ডেভিড-হিউম-ও-আমাদের-পৃথিবী

৫. অমর্ত্য সেন. (2021, June 11). ন্যায্যতার পরিধি: ডেভিড হিউম ও আমাদের পৃথিবী. (দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি) (The Boundaries of Justice: David Hume and our world). Chowdhurz, A. J.(আহমেদ জাভেদ) (Trans.).*The Daily Bonik Barta*. https:// bonikbarta.net/home/ news_description/265834/ ন্যায্যতার-পরিধি:-ডেভিড-হিউম-ও-আমাদের-পৃথিবী

৬. জয়তী ঘোষ. (2021, September 10).কভিড-১৯: অনিবার্য পতন নাকি সহযোগিতার পথে হাঁটব. *The Daily Bonik Barta*. https://bonikbarta.net/ home/news_ description/ 274030/ অনিবার্য-পতন-নাকি-সহযোগিতার-পথে-হাঁটব-

৭. রজওয়ানুল ইসলাম. (জুলাই ২০১৯). অধ্যায় ১: কর্মসংস্থান, বেকারত্ব এবং প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব: ধারণা ও পরিমাপ. In*উন্নয়ন ভাবনায় কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার* (পৃ. ৫-৮). ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৪৯-১৬৫
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

উন্নয়ন ভাবনায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বনাম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যবেক্ষণমূলক পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন*

সারসংক্ষেপ *আলোচ্য প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে একটি মৌলিক বিষয় মানবিকতাকে উপেক্ষা করে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের কুপ্রভাব এবং একই সাথে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস এবং এর প্রসার, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের নেতিবাচক দিক—এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।*

মূল শব্দ *উন্নয়ন, আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, লোভ, লালসা, মুনাফা, বৈষম্য, বিশৃঙ্খলা, মনুষ্যত্ববোধ, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।*

১. ভূমিকা

এ কথা না বলার কোনো উপায় নেই যে, বিশ্ব এগিয়ে চলছে তো চলছেই। দিন যত গড়াচ্ছে, এগিয়ে যাওয়ার গতি ততই বাড়ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধুনিকতা, চাকচিক্য, দৃষ্টিনন্দন আধুনিক স্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি অসংখ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। প্রশ্ন হলো এ উন্নয়নের মূলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? বাণিজ্যিক? নাকি মানবিক? এর সহজ উত্তর আমাদের এই অগ্রগতির কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে বাণিজ্যিক মনোভাব বা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্য কথায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি এই বিশ্বকে দেখি তাহলে বলতে হবে বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে চলছে। কিন্তু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় আমাদের কোনোই অগ্রগতি নেই। আরও সহজ করে বললে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় যেমন দ্রুত এগিয়ে চলছি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে আমরা তেমনি পিছিয়ে যাচ্ছি।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট; ফোন: ০১৭১২-৬১৩০৯৭, ই-মেইল: jasim_uddin90@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-২০১৭-এ পঠিত, ২১-২৩ ডিসেম্বর ২০১৭।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে খানিক আলোচনা করা যাক। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিবেচ্য বিষয় হলো অর্থ, অর্থের প্রতি লোভ, লালসা, মুনাফা, স্বার্থ, স্বচ্ছলতা, বিলাসিতা ইত্যাদি। আর এ সবকিছু অর্জনে আমরা মেধা ও মননে লালন করি দুর্বৃত্তপনা, হিনমন্যতা, পেশীশক্তি, পাষবিকতা ইত্যাদি। অপর পক্ষে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে অর্থের স্থান নগণ্য। অর্থের চেয়ে মানবতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রধান্য পায়।

একজন মানুষের মধ্যে বাণিজ্যিক ও মানবিক উভয় দৃষ্টি ভঙ্গির সংমিশ্রণ থাকা স্বাভাবিক। এদুয়ের মধ্যে যাদের কাছে অর্থই সবকিছুর উর্ধ্বে বিবেচিত তারা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। অন্যদিকে যাদের কাছে অর্থের চেয়ে মানবতা, সহমর্মিতার গুরুত্ব বেশি তারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। একজন বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ বাস্তববাদী হয়। সবকিছুই সে বাস্তব জ্ঞান দ্বারা মূল্যায়ন করে। অপরপক্ষে একজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ আবেগতাড়িত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ বাস্তব জ্ঞান, বাস্তবতা দ্বারা সমাজকে উপলব্ধি করে এবং তা দ্বারা প্ররোচিত হয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়। বাস্তবতা তাকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ চরম স্বার্থপর, অর্থলিপ্সু হয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে মানবতাবাদী ও আবেগপ্রবণ করে গড়ে তোলে। পৃথিবীতে বাস্তববাদী মানুষের সংখ্যা নগণ্য। সে তুলনায় আবেগতাড়িত মানুষের সংখ্যা অসংখ্য, অগণিত। উন্নয়ন, অগ্রগতি যা-ই বলি না কেন—কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় হওয়া কাঙ্ক্ষিত নয়। মানবিকতাকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন হলে সমাজে অস্থিরতা, মারামারি, হানাহানি, বৈষম্য, বিভেদ, বিশৃঙ্খলা, বিভাজন বাড়তেই থাকবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা এগিয়ে গেছি বলে যতই দাবি করি না কেন? সমাজ থেকে অশান্তি, অসাম্য দূর করা সম্ভব হবে না। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে আমরা এই সত্যটিই দেখছি। বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্য—এই যুগে যে উন্নয়ন সংগঠিত হচ্ছে, তার মূলেই রয়েছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানবতার স্থান এতে নেই বললেই চলে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে চরম স্বার্থপর করে গড়ে তোলে। এ স্বার্থের কাছে অর্থকড়িই সব। বিবেক, বিবেচনা, মনুষ্যত্ববোধ—এই স্বার্থের কাছে বিসর্জিত, উপেক্ষিত। সহযোগিতা, সহমর্মিতাসহ এ জাতীয় মানবিক গুণের এই স্বার্থের কাছে কোনো স্থান নেই। মানবিক গুণগুলো বিসর্জন দিয়ে অর্থ উপার্জনের সংস্কৃতি এ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা এ এক ভয়ংকর সংস্কৃতি। একজন মানুষের মানবিক গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। সত্য হলো বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মানবতা আজ নির্বাসিত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন কোনো কুকর্ম নেই, যা মানুষকে দিয়ে করাতে প্ররোচিত করে না। এখানে অর্থই সব। অর্থের কাছে সবকিছু জিম্মি। সবার উপরে স্থান পায় অর্থ। সবকিছুই অর্থের মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত রূপ এতই কদাকার যে, এটি বিশ্বব্যাপী নারীর সৌন্দর্য্যকেও পণ্যে রূপান্তর করেছে। বাণিজ্যিক স্বার্থে নগ্নতা, যৌনতাকে সহজলভ্য ও সুলভ করে তুলছে। যুবসমাজকে বিপথগামী করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে স্থূল মানসিকতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে আজ মুনাফা অর্জনের পণ্য হিসেবে, আর এতে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে দেদারছে।

যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতিকে কেন সমূলে উৎপাটন করা যাচ্ছে না? কেন দারিদ্র্য দূরীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না? কেনই বা আজকের যুগের সবচেয়ে সহজতম কাজ—সব মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না? পোশাককর্মীদের জীবনমান উন্নত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? পাথরশ্রমিক, চা-শ্রমিকেরা কেন অযৌক্তিক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন? বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই চরম সভ্যতার যুগে বিশ্বব্যাপী এত যুদ্ধ কেন? কেন দিনের পর দিন নতুন নতুন সংকট তৈরি হচ্ছে? বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা

সমস্যা কেন ক্রমশই প্রকট আকার ধারণ করছে? এককথায় এর উত্তর হচ্ছে—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। বাণিজ্যিক মনোভাব শিক্ষিত, স্বচ্ছল, সচেতন নামধারী মানুষদের গ্রাস করে ফেলছে। আর এর পরিণতিতেই পৃথিবীজুড়ে এত অস্থিরতা, অরাজকতা, বৈষম্য, বিভেদ, হানাহানি। ড. আবুল বারকাত ২০১৪ সালের এক লোকবক্তৃতায় Rent Seekers-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের সমাজে দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, দখলবাজ, লুটেরা, কালোবাজারী, প্রতারক, দালাল যারা অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করে রাতারাতি বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক বনে যায়, তাদেরই তিনি তাঁর লোকবক্তৃতায় Rent Seekers হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই Rent Seeker-রা সম্পদ তৈরি করে না, অন্যের সম্পদ হরণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। এই Rent Seekers তৈরি হওয়ার প্রধান কারণ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার্যমাণ। আর এটিই বিশ্ববাসীর জন্য এক ভয়াবহ বিপৎসংকেত। এ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে ক্রমশ। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যাকে আমরা উন্নয়ন বলে চলছি। কিন্তু এ উন্নয়ন একপেশে। মানুষের মানবিক গুণগুলোকে বিসর্জন দিয়ে, উপেক্ষা করেই এ উন্নয়ন হচ্ছে। প্রকৃত বিবেচনায় এটি কোনো উন্নয়নই নয়।

আজকের বিশ্বায়ন ধারনাটি বাণিজ্যতন্ত্রের চরম বিকাশমান রূপ। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় উন্নত অনুন্নত কোনো দেশই বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ার বাইরে নয়। বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে দরিদ্র দেশগুলো এগিয়ে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলছে। কিন্তু বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যে প্রস্তুতি বা যে কাঠামোগত অবস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়, তা না থাকায় দরিদ্র দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে বলে মনে হচ্ছে না। আর দরিদ্র দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত না হলে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার চিন্তা অযৌক্তিক। আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের কথাই বলি। বিবেচনা করি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির বিষয়টি। গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে রিজার্ভের অর্থ চুরি হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ফিলিপাইনের ইনকোয়ার নামক পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এত বড় একটি ঘটনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। ফিলিপাইনের পত্রিকার বদৌলতে বিষয়টি জানাজানি হয়। তথ্য গোপন করার পরিণতিতে গভর্নর আতিউর রহমান ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তদন্তের জন্য বাংলাদেশের সিআইডি, এফবিআইসহ বেশ কয়টি সংস্থা কাজ করে। সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার জন্য সুইফটকে দায়ী করে। সুইফট তা অস্বীকার করে উল্টো বলেছে, এতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তারাই জড়িত। বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, বরখাস্ত করা হয় কয়েকজনকে। তার মানে বিভ্রান্তি কাকে বলে? আরও আশ্চর্যজনক তথ্য হলো ঘটনা ঘটার ১০ মাসের অধিক সময় পরে তৎকালীন গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো সুরক্ষিত জায়গা থেকে অর্থ চুরির ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক, অপমানকর, অবমাননাকর। এতে এ দেশের জনস্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এখানে সন্দেহ পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। যে যার মতো করে কথা বলে চলছে। এসব রসিকতা নয় কি? এ ঘটনায় প্রমাণ হয়, প্রযুক্তিজ্ঞানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। নৈতিকতায় নয়। নৈতিকতা ব্যাতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বা তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন মানুষের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না। রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা বলে দেয় যে আমরা বিশ্বায়নের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে কোনো সুস্থধারার রাজনীতি থাকবে বলে মনে হয় না। সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, আইন, শিক্ষা—সবই বিশ্বায়নের পদতলে অবদমিত হতে থাকবে। সত্য উদ্‌ঘাটন কঠিন হয়ে উঠবে। আজকের যুগে বিশ্বায়ন বাণিজ্যতন্ত্রের শিকলে বন্দী হয়ে টেকসই উন্নয়নের কথা বলে উন্নয়ন ধারনাকে মূলত বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। বিশ্বায়নের গতিপ্রকৃতি তা-ই জানান দিচ্ছে।

বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ার সুফল পেতে হলে বিশ্বনেতাদের বিশ্ববাসীর প্রতি প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতা থাকা চাই। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ককে দরিদ্র দেশগুলোর অভুক্ত মানুষদের প্রতি যে দরদ, মমত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, তা কি আছে? সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের রাষ্ট্রনায়কের দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দায়বদ্ধতা থাকা বাঞ্ছনীয় তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? বাস্তবে দায়বদ্ধতার বিপরীতে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দেখছি। হতাশাজনক সত্য—দিন যতই যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলছে। সারা বিশ্বে নিরাপত্তা সমস্যাটি দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধিই রয়েছে এর মূলে। উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থ উদ্ধারের নেশার কারণেই দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষের চরম আতঙ্ক, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে হচ্ছে। ৯/১১-এর পর সন্ত্রাসবাদ উন্নত দেশগুলোর জন্য চরম হুমকি বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বস্তুত এই সন্ত্রাসবাদ অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনছে। এ কি সত্য নয়?

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, একজন মানুষ অর্থ উপার্জন করে কী করছে মানুষ তা-ই দেখে। কাড়ি কাড়ি অর্থের বদৌলতে সমাজে রাতারাতি অবস্থান তৈরি করা যায়, প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় সহজেই। কী উপায়ে ব্যক্তি উপার্জন করে, সমাজ তা পরখ করে না। এ সংস্কৃতি প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বেড়েই চলছে। জ্যামিতিক হারের চেয়ে বেশি হারে বেড়ে চলছে বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা। এ বঞ্চনার শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে বলে মনে হয় না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির বেড়াজালে কূটনীতি দিনে দিনে দুর্বোধ্য ও জটিল হয়ে পড়ছে। কূটনীতির জটিলতার কঠোর সমীকরণে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন থমকে আছে। তৈরি হচ্ছে জটিল জটিল সমস্যা। সমস্যা থেকে সংকট। আজকের বিশ্বকে আলাদা আলাদাভাবে দেখলে অজস্র সংকট চোখে পড়ে। আর এককভাবে বিবেচনা করলে পৃথিবীতে সংকট একটাই, আর তা হলো—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। আরও সহজ করে বলা যায়, সব সংকটের কেন্দ্রবিন্দু হলো বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। পৃথিবীতে সব সময়েই সংকট ছিল। সংকট থেকে মুক্তিও মিলেছে। কিন্তু আগে কোনো সময়েই সংকটের মূলে বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল বলা যাবে না। আজকের যুগে বাণিজ্যিক স্বার্থে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। এর মানে দাঁড়ায়, এ যুগে যুদ্ধও একধরনের পরিকল্পিত বিনিয়োগ। বাণিজ্যিক স্বার্থের মোড়কে আবদ্ধ এই সংকট থেকে বিশ্ববাসীর মুক্তির উপায় কী? কিংবা এই সংকট থেকে আদৌ মুক্তি মিলবে কি? বলা মুশকিল।

কেবল লাগামহীন মুনাফা অর্জন একজন ব্যবসায়ীর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। মুনাফা লাভের পাশাপাশি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকাও জরুরি। তেমনি একজন শিল্পমালিকের শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা থাকা বাঞ্ছনীয়। পেটের দায়ে শ্রমিকেরা তার কারখানায় কাজ করেন। সেই শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন তথা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করার দিকে খেয়াল দেওয়া উচিত। জ্ঞাননির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদের মনোভাব তা-ই হতে হবে। প্রশ্ন হলো—একদিকে মুনাফা, আরেক দিকে দায়বদ্ধতা—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কোন দিকে প্ররোচিত করে? নিশ্চয়ই মুনাফার দিকে।

সুতরাং কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে মানুষের কল্যাণ হওয়ার কথা না। কল্যাণ একটি গুণগত ধারনা। এ যুগে প্রতিটি রাষ্ট্রই কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তা করতে পারছে কি? মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে চাইলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, তা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে হবে। আগে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর বাণিজ্যিকতার কথা ভাবতে হবে। তবেই গণমানুষের মঙ্গল। তবেই দেশ ও জাতির কল্যাণ। তবেই হবে প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়ন।

আলোচ্য প্রবন্ধে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কুফল নিয়ে আলোচনা করার প্রচেষ্টা থাকবে। একই সাথে বিশ্বমানবতার মুক্তি তথা দরিদ্র, শ্রমজীবী গণমানুষের উন্নতির লক্ষ্যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের মধ্য দিয়ে আজকে যে উন্নয়নের কথা আমরা বলছি তার স্বরূপ উন্মোচন করা। একই সাথে টেকসই ও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের উৎস খুঁজে বের করা।
২. বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ফলে বিশ্ববাস্তবতায় নেতিবাচক দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করা।
৩. প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়নে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের গুরুত্ব তুলে ধরা।

৩. তথ্য ও পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মাধ্যমিক উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ অর্থনীতির সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল, বিভিন্ন গ্রন্থ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর লেখকের অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ কতিপয় পর্যবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি এবং প্রসার

আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির যে রূপ বিশ্বব্যাপী দেখে চলছি, তা কখন কোথায় কীভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। সমাজ সবসময়ই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের কোন পর্যায়ে তার ভিত রচিত হয় তা সুনির্দিষ্ট করে বলার সুযোগ নেই। বাণিজ্যিকতা, বাণিজ্যিক স্বার্থ সবসময়ে সব সমাজেই ছিল। ১৪৯২ সালের কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার বিশ্ব পরিবর্তনে গতি সঞ্চার করে। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে ধীর গতিতে। কিন্তু ১৪৯২ সাল থেকে এই বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ৫০০ বছরের পরিবর্তন হয়েছে বৈপ্লবিক হারে যা অকল্পনীয়, নজিরবিহীন।

এই সময়ের মধ্যে ধ্যান-ধারনা, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উন্নয়নসহ সব ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এই পরিবর্তনের গতি আরও দ্রুততর হচ্ছে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পেছনে কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল বলা যাবে না। কিন্তু তার এই আবিষ্কার ইউরোপীয় বেনিয়াদের নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। ইউরোপীয় বণিকসমাজ সমুদ্র জয়ের নেশায় মেতে ওঠে। অল্প সময়ের ব্যবধানেই সমুদ্রপথে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য শুরু করে দেয়। আধুনিক নামধারী বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা সম্ভবত এখান থেকেই। এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভর করে পৃথিবীতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়েছে বলা হচ্ছে। কিন্তু এ উন্নয়নের বুকে রয়েছে এক বিরাট ভয়ানক ক্ষত। আর এ ক্ষত পৃথিবীব্যাপী প্রকৃত উন্নয়নের পথে হিমালয়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবীতে অগণিত আইন প্রণীত হয়েছে, হচ্ছে। আইন প্রণীত হবে গণমানুষের স্বার্থে, গণমানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে। তাত্ত্বিকভাবে জনস্বার্থে আইন প্রণীত হচ্ছে বলা হলেও সব ক্ষেত্রে তা কি হচ্ছে? বাংলাদেশের কথাই বিবেচনা করি। এ দেশের সব আইনে জনস্বার্থ প্রতিফলিত হচ্ছে না, এমনকি জনস্বার্থে বাস্তবায়নের হারও কম। হাইকোর্টে কত শত শত রিট হচ্ছে। প্রশ্ন হলো এত শত শত রিটের মধ্যে দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থে কতটি রিট হয়?

মানবিক মূল্যবোধকে প্রধান্য দিয়ে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হলে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হতো। কিন্তু বর্তমান বিশ্ববাস্তবতার দিকে তাকালে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, মানবিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটছে, ঘটে চলছে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হলেও সামাজিক সূচকের দিক থেকে বিশ্ব ক্রমাগত পিছিয়ে চলছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ফাঁক ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীতে যত সংকট তৈরি হচ্ছে, তার মূলে এই অসামঞ্জস্যতাই দায়ী। তাহলে কি বাণিজ্যিকতাকে শতভাগ উপেক্ষা করেই মানবিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অবশ্যয়ই না। বাণিজ্যকতাকে উপেক্ষা করে নয়। বাণিজ্যিকতা ও মানবিকতাকে পাশাপাশি চলতে দিতে হবে। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নকে প্ররোচিত করতে হবে। নতুন করে উন্নয়নের পথ খুঁজতে হবে যেখানে বাণিজ্যিকতার চেয়ে মানবিকতার গুরুত্বই থাকবে বেশি।

মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ অবধি হাজারও তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে, বাস্তবায়িত হয়েছে; যা সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাণিজ্যিকতার দাপটে পৃথিবীতে অনেক কার্যকর প্রভাবশালী তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়েছে যার ফলে এই কয়েক শতকে পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইউরোপের রেঁনেসা সারা ইউরোপজুড়ে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছে তার ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা জানি। রেনেসাঁর অগ্রদূতগণের কী উদ্দেশ্য ছিল তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যাবে না হয়তো। তবে এটুকু বলা যায় রেনেসাঁর অগ্রদূতগণ সম্ভবত একটি সুন্দর, শান্তিময়, বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এর সূত্রপাত করেছিলেন। রেনেসাঁর মূল কথা ছিল মানবকল্যাণ, গণমানুষের মুক্তি। ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদের জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া গণমানুষের মুক্তির মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত। কিন্তু অচিরেই বাণিজ্যিকতা সে চেতনা গ্রাস করে নেয়। রেনেসাঁর প্রভাব বাণিজ্যিকতার জালে আটকা পড়ে। ভূমিভিত্তিক সমাজকাঠামো ভেঙে শিল্পভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক চেতনা বণিক সমাজের ভোগ-বিলাসিতার মাধ্যমে পরিণত হয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে এভাবেই। ইউরোপজুড়ে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। মানুষ মানবতাবাদী না হয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থে অন্ধ হয়ে ওঠে। বাণিজ্যই হয়ে ওঠে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। বাণিজ্যতন্ত্রের কুপ্রভাব কেবল ইউরোপজুড়ে নয় বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়। মানুষের মুক্তির জন্য যে চেতনার সূত্রপাত, মানবতার জয়গানের যে জাগরণের প্রসার হতে লাগল, বাণিজ্যতন্ত্র মুহূর্তেই তা গ্রাস করে ফেলল। কেবল রেনেসাঁর অগ্রযাত্রা নয়, বাণিজ্যতন্ত্রের কাছে পুরো বিশ্ব, বিশ্বরাজনীতি, দর্শন, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আজ শেকলবন্দী।

১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো উপনিবেশবাদী শক্তির ওপর পদাঘাত করে এবং তার আঘাতে উপনিবেশবাদ ক্ষয়িত হতে থাকে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পরপরই বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। দেশে-দেশে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দল। এসব দলের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয় এবং দেশে-দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরিণতিতে উপনিবেশবাদের পতন ঘটতে থাকে। একের পর এক দেশ স্বাধীন হতে থাকে।

১৯২০-এর দশকের শেষ ভাগে মহামন্দা মোকাবিলায় সামষ্টিক অর্থনীতির সূত্রপাত হয়, যা মন্দার কবল থেকে বিশ্ব অর্থনীতিকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এভাবে হাজারও তত্ত্ব, পদ্ধতি, নিয়ম-বিধি, আইন, যুদ্ধ-বিগ্রহ পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে চলছে। অর্থনীতিতে উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ তত্ত্ব বাদ দিয়ে যখনই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়, তখন থেকেই বিশ্বমানবতা, মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধের পতন ঘটতে থাকে। আজকের সময়ে যা শূন্যের কোঠায়। সুতরাং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্ব আজ চরম বিতর্কের মুখোমুখী। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণতা দিতেই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বের উদ্ভব। এই মুনাফা সর্বোচ্চকরণের জন্য বিক্রেতা/উৎপাদনকারীরা কি-ই-না করে চলছে। অসম প্রতিযোগিতা, অনৈতিক কার্যকলাপ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, দাম বাড়ানো, ভেজাল পণ্য উৎপাদন, সিন্ডিকেট, শ্রমিকদের ন্যায্যমজুরি থেকে বঞ্চিত করা, শোষণ, নিপীড়নসহ এমন কোনো অপকর্ম নেই, যা মুনাফা সর্বোচ্চ করতে বিশ্বব্যাপী ঘটছে না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সর্বগ্রাসী রূপ আজ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

৫. বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক দিক

সমাজের সাধারণ মানুষেরা সহজ সরল, নিরীহ। এরা অন্যের ক্ষতি করতে আগ্রহী নয়, কঠোর পরিশ্রম করে, দিনরাত শরীরের ঘাম ঝরিয়ে যাচ্ছে। দুঃখজনক সত্য এই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরা স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারছে না। সারা পৃথিবীব্যাপী এই একই চিত্র। কতিপয় মানুষ বুদ্ধির জোরে অন্যের অধিকার হরণ করে বিলাসী জীবনযাপন নিশ্চিত করছে। রাষ্ট্র, আইন, সরকার, সমাজ—সবই এই অল্পসংখ্যক দুর্বৃত্তদের পক্ষে। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ নীরিহ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দিকে কেউ তাকায় না। বাণিজ্যতন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা এটাই।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ধ্যান-ধারনাকে অর্থকেন্দ্রিক করে তোলে, যা অনৈতিক ও অযৌক্তিক। আজ বিশ্বব্যাপী যে অজস্র সংকট তৈরি হচ্ছে, তার প্রধান কারণ এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সুষ্ঠু চিন্তা বিকাশের এক বিরাট বাধা। মানুষের মেধা ও মননে এক ভয়ানক প্রতিবন্ধক। এককথায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবকল্যাণ ব্যাহত করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিক্ষিত মানুষ মানে আলোকিত একজন মানুষ। একজন শিক্ষিত মানুষকে হওয়া চাই সৎ, আদর্শ ও সুবিবেচক নাগরিক। অসংখ্য শিক্ষিত মানুষ এ দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, গণমাধ্যমসহ সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। প্রশ্ন হলো কতজন শিক্ষিত মানুষ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে, তিনি শতভাগ সৎ। এ কথা ধ্রুবসত্য যে, উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের নৈতিকতাবিরোধী, আইনবহির্ভূত, বিবেকবর্জিত কার্যকলাপ দেখে হতাশ হতে হয়। শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের অর্থের মোহ, জালিয়াতি, অনিয়ম, অনাচার, দুর্নীতি দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের একজন কর্মকর্তার কথা বিবেচনা করা যাক। জনপ্রশাসনের একজন কর্মকর্তা প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন জনস্বার্থে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নিরলস কাজ করার জন্য। প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হিসেবে এ দেশের কতজন কর্মকর্তা তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করছেন যে, তিনি মানুষের জন্য মানবকল্যাণে নিবেদিত। জনপ্রশাসনের একজন কর্মকর্তার সাথে এ দেশের সাধারণ মানুষের ন্যূনতম কোনো যোগাযোগ থাকে কি? দুর্নীতি এ দেশে এক ভয়াবহ ব্যাধি। বলা হয়—এ দেশের রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী—এই তিন শ্রেণি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। দুর্নীতি করে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে যায়। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো দেশ ও জাতি। প্রচলন আছে, একজন দুর্নীতিবাজের কাছে মা-বাবা, ভাইবোন

বলে কিছু নেই। সুযোগ পেলে বাবার সাথেও সে দুর্নীতি করে। দুর্নীতি দেশের উন্নয়নকে অবরুদ্ধ করে রাখছে। এ দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবছর বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়। গত ১০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ উন্নয়নে ভারসাম্য ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলে ব্যয়িত হলেও বাস্তবে এ অর্থের সিংহভাগ রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী, ছাত্রনেতা, ঠিকাদার, জনপ্রতিনিধিদের পকেটে চলে যাচ্ছে। এ যেন দেখার কেউ নেই। দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা ভাগ্য উন্নয়নের কথা বলে প্রতিবছর সামাজিক নিরাত্তাবেষ্টনির অসংখ্য কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৭ হাজার ৫৪৬ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১২.৭২ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৯ শতাংশ। এসব কর্মসূচির সামান্য অংশই প্রকৃত সুবিধাভোগীরা পায়। এসব বরাদ্দ যত-না হয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে, তার চেয়ে বেশি হয় দুর্নীতি করার জন্য। কেবল বাংলাদেশ নয় দুর্নীতি আজ বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ফলেই পৃথিবীব্যাপী দুর্নীতির মহোৎসব। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ফলেই এ দেশে একাধিকবার শেয়ারবাজারে কেলেঙ্কারির মতো ঘটনা দেখতে হয়। একটি চক্র শেয়ারবাজারে কৃত্রিমভাবে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিঃস্ব করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়। ডেসটিনির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে কত নিখুঁতভাবে মানুষের মগজ ধোলাই করে বোকা বানিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নেয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ফলেই নির্মাণকাজে রডের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহার করার মতো অদ্ভুত অনৈতিক ঘটনা ঘটছে। নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার মতো লোমহর্ষক বর্বর ঘটনা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি অবহিত। ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামসহ সাত জনকে একসঙ্গে অপহরণ এবং পরে হত্যা করে লাশ গুম করার সাথে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক, র‍্যাব -১১ এর উপ-অধিনায়ক, র‍্যাব-১১ এর সিপিসিসহ পুরো একটি ইউনিট সম্পৃক্ত হয়ে পরে। ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ ইং তারিখে এই মামলার রায়ে আলোচিত সাত খুনের ঘটনায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সংশ্লিষ্টতাকে 'জাতির জন্য অত্যন্ত কলঙ্কজনক', 'সকল সরকারি কর্মচারীর জন্য লজ্জাজনক' বলে উল্লেখ করেছেন আদালত। 'এ ঘটনা আমাদের সকলের মাথা লজ্জায় নুইয়ে দিয়েছে' উল্লেখ করে রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, নূর হোসেন মূল পরিকল্পনাকারী (মাস্টারমাইন্ড)। র‍্যাব সদস্যরা তাঁর সঙ্গে মিলে যৌথভাবে (জয়েন্টভেঞ্চার) এই অপরাধ ঘটিয়েছেন (প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭)। এই কলঙ্কজনক ঘটনার মূল কারণ কী? এককথায় এর উত্তর—অর্থের প্রতি মোহ। কেবল অর্থের মোহে পড়ে নূর হোসেনের মতো একজন আপাদমস্তক দুর্বৃত্তের কাছে র‍্যাবের একটি পুরো ইউনিট বিক্রি হয়ে যায়। সত্যিই, অর্থের মোহে মানুষ কি-ই-না করতে পারে!

ইউরোপীয় বেনিয়ারা দেশের পর দেশ দখল করে ঐসব দেশের সম্পদ লুণ্ঠণ করে নিতে থাকে। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সংগঠিত কোম্পানি দখলকৃত দেশগুলোর ওপর প্রবল প্রতাপশালী রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। ফলে ঐসব দেশে তারা বাণিজ্যিক স্বার্থে লুণ্ঠনের সাংস্কৃতি চালু করে। লুণ্ঠনের এই সাংস্কৃতি সহজতর করতে অর্থের প্রচলন করে অর্থকে জনপ্রিয় করে তোলে। অর্থের প্রচলন করে সম্পদ লুণ্ঠনের সাথে সাথে অর্থ লুণ্ঠন শুরু করতে থাকে। সম্পদ, অর্থ লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত হয়নি। বাণিজ্যিক স্বার্থ সর্বোচ্চকরণ করতে এর পাশাপাশি তথ্যলুণ্ঠন শুরু করে। কোন দেশের কত আয়তন, জনসংখ্যা, সমাজকাঠামো, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মানুষের ধ্যানধারনাসহ কোথায় কী সম্পদ আছে—সবধরনের তথ্যই লুণ্ঠন করে নিতে থাকে। আর এসব তথ্যের ওপর তাদের পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ঢেলে সাজায়। কূটবুদ্ধির

জালে বন্দী হয়ে কূটনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে হাতছাড়া হয়ে গেলেও দখলকৃত দেশগুলোর ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমনি রয়ে গেছে, যার দ্বারা তাদের সম্পদ, অর্থ, তথ্য লুণ্ঠন করে চলছে এখনো। চরম সত্য হলো উন্নত বিশ্বজুড়ে আজকে যে সমৃদ্ধির অর্থনীতি দেখে আমরা অভিভূত হই, প্রকৃত অর্থে সেটি লুণ্ঠনের অর্থনীতি। সারা বিশ্বের সম্পদ, অর্থ, তথ্য লুণ্ঠন করে তাদের সমৃদ্ধির সোপান তৈরি করছে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ফলেই উচ্চশিক্ষায় আজ ইতিহাস, ললিতকলা, সাহিত্য, দর্শনের মতো ধ্রুপদী বিষয়গুলোর কদর কমে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় এখন বাণিজ্যনির্ভর বিষয়গুলোর জয়জয়কার। তরুণেরা বাণিজ্য কীভাবে করতে হয় শিখবে। কীভাবে মুনাফা সর্বোচ্চ করা যায়? গেইম থিউরির মতো ধারনাগুলো শিক্ষাই তাদের প্রধান কাজ। ললিতকলা, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য চর্চা তাদের কাছে গুরুত্বহীন, অসার। যেভাবেই বিবেচনা করি না কেন যেকোনো বাণিজ্য শুরু হয় মিথ্যা দিয়ে। আর এ মিথ্যা শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার নামে প্রকৃত অর্থে তরুণদের বিপথগামী করা হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের মেধা-মনন আজ সৃজনশীল না হয়ে বরং ছলনার আশ্রয় নিয়ে কীভাবে আয়েশী দিন যাপন করা যায় সে দিকেই বেশি ধাবিত হচ্ছে। এই উপমহাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনের দিকে তাকালেই এর সত্যতা মিলবে। বর্তমানে কত সংগীতশিল্পীই না জন্ম হচ্ছে। কিন্তু এদের কোনো একজনকে ষাটের দশকের শিল্পীর সাথে তুলনা করা যাবে কি? এ যুগের একজন শিশুর মধ্যে সংগীতপ্রতিভা দেখলেই গান গেয়ে কীভাবে অর্থবিত্তের মালিক হওয়া যায় সে চিন্তায় মা-বাবা বিভোর হয়ে যান। এতে তার শিল্পসত্তা লোপ পেতে থাকে। একজন সংগীতশিল্পীর গানের প্রতি অনুরাগ, দরদ, মমত্ববোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থ উপার্জনের নেশা তা ধ্বংস করে দেয়। ফলে ষাটের দশকের শিল্পীর মতো শিল্পী এ যুগে সৃষ্টি হচ্ছে না। এর জন্য দায়ী বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই।

সমাজের জন্য কিছু করতে চাইলে একজন মানুষকে ভালো মানুষ হতে হবে। একজন প্রশাসক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদসহ যেকোনো পেশার একজন মানুষ যত দক্ষই হোক-না কেন ভালো মানুষ না হলে তার দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করতে পারে না। পরিতাপের বিষয় মানুষের কল্যাণের সাধনে অযোগ্য এই মানুষগুলোই আমাদের সমাজে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের দেশে যা দেখছি একজন ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচ্চ বিত্তের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে চায়। কেননা উচ্চ বিত্তের কাছ থেকে সহজে অধিক ফি আদায় করা যায়। পরম মমতার সাথে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে এমন তো দেখা যায়না। উল্টো সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার নামে অবহেলিত হয়, উপেক্ষিত হয়। একই কথা অন্য পেশাজীবীর বেলায়ও প্রযোজ্য। এটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের ফল। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্ররোচিত করে। সৎ, প্রতিশ্রুতিশীল, দায়িত্বশীল ও ভালো মানুষ হিসেবে নয়। মানুষকে নিজের জন্য পরিবারের জন্য পরিশ্রমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। দেশ ও সমাজের জন্য নয়।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এমনভাবে প্ররোচিত করে যে, সে সবকিছুই অর্থের মানদণ্ডে বিবেচনা করে। অর্থই সব। মান-মর্যাদা, আভিজাত্য সবই অর্থের মাধ্যমে নিরূপিত। মানুষের সততা, নীতিনৈতিকতা, বিবেক-বিবেচনাবোধ সব তুচ্ছ। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সমকাল পত্রিকার প্রথম পাতায় "ওয়াসার প্রকল্পে ব্যাপক নয়-ছয়: ২০০ কোটি টাকার সুফল পায়নি রাজধানীবাসী" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে গৃহিত ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়মের কথা তুলে ধরা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, এ প্রকল্পে সময় ও ব্যয় দুটোই বাড়ানো হয় নিয়মবহির্ভূতভাবে। ১১টি প্যাকেজ দরপত্র আহ্বানের কথা থাকলেও ২০০টি কার্যাদেশ দিয়ে ঠিকাদারদের সঙ্গে মিলে সরকারি প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় করা হয়। কমপক্ষে ৮০টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের

নামে অর্থ ছাড় করা হয় কার্যাদেশের চেয়ে বেশি। দরপত্র ছাড়াই সরাসরি কয়েকটিকে কাজ দেওয়া হয়। কাজ শেষ হওয়ার আগেই বিল দেওয়া হয়। প্রকল্প এলাকায় ৫ কিলোমিটার পাইপ ক্রয় ও স্থাপন করার কথা থাকলেও তা শেষ না করেই কাজ শেষ করা হয়। ১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের কথা থাকলেও অধিগ্রহণ করা হয় মাত্র দশমিক ৩৪ হেক্টর। সম্প্রতি প্রথম আলো পত্রিকায় "টাকা গুনে গুনে পকেটে নিলেন পুলিশ কর্মকর্তা" শিরোনামে এক প্রতিবেদনে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের ওবায়দুর রহমান নামের একজন উপ পরিদর্শক অপহরণ মামলায় জড়ানো মো. মাসুম নামের একজনের কাছ থেকে কীভাবে দফায় দফায় টাকা আদায় করছেন, তা উল্লেখ করা হয়। ২০১৫ সালের ২০ ডিসেম্বরে সাভারের আশুলিয়ায় শেখ শাওন নামের সাড়ে চার বছরের এক শিশু নিখোঁজ হয়। মো. মাসুম নামের ঐ ব্যক্তিকে আসামি করে ২০১৬ সালের ১২ মার্চ আশুলিয়া থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়। ওবায়দুর রহমান তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে নিখোঁজ ঐ শিশুর উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করে মামলাকে পুঁজি করে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেন। নিখোঁজের বাবা শেখ সুমন প্রথমে মাসুমকে অভিযুক্ত করলেও পরে অবস্থান পাল্টায়। কিন্তু ওই কর্মকর্তার হাত থেকে মাসুমের মুক্তি মেলেনি। কলমের খোঁচায় মাসুমকে শেষ করে দেওয়ার হুমকি দিলে মাসুম ওই কর্মকর্তাকে কয়েক দফায় ২ লাখ ২২ হাজার টাকা প্রদান করে। পেশায় ইলেকট্রেশিয়ান মাসুম এত টাকা পরিশোধ করে নিঃস্ব হয়ে যায়। অর্থ উপার্জনের নেশায় মানুষ কত সহজে নিজেকে ছোট করে, কত সহজে নিজের মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদা, মানসম্মান বিসর্জন দিতে পারে। অর্থ উপার্জনের নেশায় সত্যিই নীতিনৈতিকতা, আইন, বিবেক বিবেচনা, দেশ ও গণমানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করা হয় না। চিন্তা করার কোনো সুযোগও নেই। যেকোনো উপায়ে, যেকোনো পথে অর্থ উপার্জন চাই-ই চাই। বৈধ অবৈধ বিবেচ্য নয়। নীতিনৈতিকতার প্রয়োজন নেই। অর্থই চাই। চাই-ই চাই। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ প্রথম আলোর 'পাকা বাড়িতে ভিজিডির কার্ড' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় 'অন্যের জমিতে খুপড়িঘরে সংসার তানজিলা বেগমের। স্বামী জালাল উদ্দিন দিনমজুর। তাও ভিজিডি কার্ড জোটেনি তানজিলার কপালে। তাদের প্রতিবেশী শামসুল ইসলাম অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। পাকা বাড়ি। তার ছোট স্ত্রীর নামে ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ হয়েছে। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ভানুগাছি ইউনিয়নে তানজিলার মতো কেউ কেউ ভিজিডি কার্ড পাননি। আবার শামসুল ইসলামের মতো বেশ কয়েকটি পরিবারের সদস্যরা ওই কার্ড পেয়েছেন।' ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ কালের কণ্ঠ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'সামাজিক সুরক্ষা খাতের উপকারভোগী নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম।' এতে উল্লেখ করা হয় সরকারের গৃহিত সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা খাতের ৮৪ শতাংশ উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা কী প্রমাণ করে? অর্থলিপ্সা মানুষকে পরিপূর্ণ অমানুষ করে তোলে।এসব প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয়েছে, অর্থ উপার্জনের নেশায় মানুষ নিজেকে কত ছোট করতে পারে। সামান্য চোখ বুঝেই আঁচ করা যায়। অর্থলিপ্সার কাছে মানবতার ন্যূনতম কোনো মূল্য নেই। মনুষ্যত্ববোধ, মায়ামমতা সবকিছুই তুচ্ছ, অবহেলিত।

মানুষকে ঠকিয়ে বা বঞ্চিত করে, প্রতারণা করে, শঠতা, কপটতার বিনিময়ে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার শিক্ষা মূলত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পাওয়া। এ শিক্ষা থেকে কোনো উন্নয়ন হতে পারে এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। সমাজের যত অস্থিরতা, অশান্তি, অনিয়ম সবই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সাংস্কৃতিক বিভেদ, ভেদাভেদ, ব্যবধান, বৈষম্য গড়ে তোলে। আমাদের দেশে বিদেশিদের নিরাপত্তার জন্য কত কিছুই না করা হচ্ছে। বিশেষ করে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ঢাকার গুলশানে ইতালির নাগরিক সিজার তাভেলা এবং একই সপ্তাহে ৩ অক্টোবর রংপুরের কাউনিয়ায় জাপানের নাগরিক হোশি কোনিও হত্যার পর বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার বেশকিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য এসকল পদক্ষেপ

নিসঃন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রশ্ন হলো একজন ইউরোপীয় নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য আমাদের দেশে যা করা হচ্ছে, সে দেশে অবস্থানরত আমাদের দেশের কোনো নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য তা করা হচ্ছে কি না? নিশ্চয়ই না। খালি চোখে যা দেখি বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় নাগরিকগণ এ দেশে এসে থাকেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা, ইংরেজি শিক্ষা, খেলোয়ার, বিভিন্ন খেলার কোচ, বিশেষজ্ঞ, এনজিও, বহুজাতিক কোম্পানির কর্মী, দূতাবাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে এসে দেশের বিভাগীয় শহর, জেলাশহর এমনকি গ্রামগঞ্জেও গিয়ে থাকেন। মানুষের আথিতিয়তা দেখে তারা মুগ্ধ হন, বিমোহিত হন। উল্টোভাবে দেখলে আমাদের দেশেরও অনেক মানুষ বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় দেশগুলোতে যান। সেখানে কি তারা এমন আথিতিয়তা পান? নিশ্চয়ই না। আথিতিয়তার বদলে বরং বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হন। বিশেষ করে এসব দেশে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষেরা ব্যাপকভাবে অবহেলিত হয়ে থাকেন। এ সাংস্কৃতিক বৈষম্য বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভব। আমাদের দেশসহ অনেক দরিদ্র দেশের শ্রমিকেরা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। এসব শ্রমিকের অধিকাংশই তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অবহেলিত হচ্ছেন। আবার পান থেকে চুন খসলেই তাদের কঠোর শাস্তির মুখোমুখী হতে হচ্ছে। এই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ত্রুটি রাষ্ট্রীয়ভাবে কূটনীতিতে প্রভাব পড়ছে। ভাবমূর্তির সংকটে পড়ছে পুরো দেশ। অথচ ধনী দেশগুলোর নাগরিকগণ অনেক অনাচার-অপকর্ম করে চলছে, তাতে সরকারের ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ নেই। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতার চেয়ে কোম্পানি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, গণমাধ্যম, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফার প্রতি ঝুঁকে থাকে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির এটাই মূল শিক্ষা। প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দেশ ও মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মায়াজালে পড়ে এ বিষয়টি অস্বীকার করে কেবল অর্থ ও মুনাফার পেছনে ছুটে থাকে। বিশ্বব্যাপী আজ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সক্রিয়। মানবাধিকার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে এসব সংস্থা গড়ে উঠছে। এসব সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে কার্যক্রমের কোনো মিল নেই। তারা দরিদ্র দেশগুলোর দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের চাইতে ধনী দেশের অর্থলিপ্সু কোম্পানিগুলোর মুনাফা লাভের পথ সুগম করার জন্য ব্যতিব্যস্ত। কাগজে-কলমে সুন্দর সুন্দর কথা বলে থাকলেও বাস্তবে তাদের জন্ম ধনী দেশগুলোর লুণ্ঠনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করা—বাণিজ্যতন্ত্রকে প্রসারিত করা। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আজ কত অসহায়। গণমাধ্যমের বদৌলতে তাদের দুর্দশার চিত্র যা দেখি তা থেকে বলতে পারি এ যুগে মানবতা বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পদক্ষেপ দেখে হতবাক হতে হয়। রোহিঙ্গাদের পক্ষ নিয়ে অনেক সংস্থা কথা বলছে, পাশে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্যা স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। বিষয়টি উদ্ভট নয় কি?

বাণিজ্যতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লিখে মানুষকে প্রভাবিত করা, প্ররোচিত করার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। আগে একটি বই মানুষকে আলোড়িত করত। বাণিজ্যতন্ত্র বিকাশের ফলে মানুষের কথা বলে, মানবিকতার কথা বলে এমন লেখা বই মানুষকে প্রভাবিত করে না। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, মাতা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা এই তিনটি মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। চরিত্র গঠন, ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার উপদেশ এখন আর মানুষকে তেমন উদ্বুদ্ধ করে না। মননশীল মানসিকতা, সৃজনশীলতা ক্ষয়ে আসছে ক্রমশ। ডা. লুৎফর রহমানের মহৎ জীবন, উন্নত জীবন বইগুলোর মতো বইয়ের কদর ও গুরুত্ব দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। স্বাধীন মত প্রকাশের

সংস্কৃতিতেও বাণিজ্যিকপ্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত বলা হলেও এখন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রায় সবাই সতর্ক থাকে। ইংরেজি সাহিত্যের মহাকবি জন মিল্টন আজীবন অনাচারের বিরুদ্ধে লিখে গেছেন। ১৬৪৪ সালের ২৩ নভেম্বর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Areopagitica প্রকাশিত হয়। বাক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করার আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার ওপর অত্যাচার, নির্যাতন এমন কি মৃত্যুর হুমকিও আসতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনা করতে পিছপা হননি। ১৬৪৩ সালে রাজার নির্দেশে 1643 Ordinance for the Regulation of Printing এর মাধ্যমে বাক স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিষয়ে লেখার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলে মুদ্রণ ও বাক স্বাধীনতার পক্ষে জন মিল্টনের লিখা এই বিখ্যাত গ্রন্থ শুধু ইংল্যান্ডে নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের বাক স্বাধীনতা, মুদ্রণ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যারা কলম ধরেছেন, তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আবার ব্রিটিশদের তোষণ করে যারা লিখেছেন তারা পুরস্কৃত হয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। দীনবন্ধু ছিলেন মাটির কাছাকাছি মানুষ। তিনি ছিলেন কৃত্রিমতার বিরোধী এবং সত্যের অনুসারী। ব্রিটিশদে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁর মতো মানবহিতৈষী মননশীল ব্যক্তি সাধারণ মানুষের পক্ষে লিখেছেন। মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর সম্পাদিত দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের নীলদর্পণ পাঠের ভূমিকায় লিখেছেন, নীলদর্পণের রাজনৈতিক ভাগ্য দীনবন্ধু আঁচ করেছিলেন, কিন্তু সেন্টিমেন্ট উত্তেজনাকে শ্রদ্ধা করতেন বলে নীলদর্পণ প্রকাশে সংকুচিত হননি। বিবেকের নির্দেশে 'নীলকর-বিষধরদংশন-কাতর' নানা স্থলের পথিক সরকারি কর্মচারী দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রকাশ করে মহৎ সাহসের কাজ করেছিলেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ন্যায়ের প্রশ্নে কোনো দিন আপস করেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বিদ্রোহী কবি এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে বুলবুল নামে পরিচিত। জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন করেও তাকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি আজীবন অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে ও সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন। এ যুগের বুদ্ধিজীবীরাও সত্য কথা বলেন। কিন্তু এ সত্য বলেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, আপসের মনোভা থেকে। গুছিয়েগাছিয়ে এমন কৌশলে সত্য বলেন, যাতে সব পক্ষই খুশি হয়। যাতে সব পক্ষ থেকে সুযোগ বোঝে সুবিধা নেওয়া যায়। একজন উপন্যাসিক উপন্যাস লেখার আগে চিন্তা করেন, কোনো কোনো শব্দ কীভাবে স্থাপন করা হলে তার গ্রন্থটি বেশি বিক্রি হবে। সুতরাং সত্যিকার অর্থে এটি স্বাধীন মত প্রকাশ নয়। সত্য হলো—দিন যতই যাচ্ছে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের মানুষের সংখ্যা কমে আসছে।

ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়ন পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। ব্যাংকিংব্যবস্থায় প্রযুক্তির সংযোগ করে আধুনিক কালে আরও যুগোপযোগী করে মানুষের জীবনকে গতিশীল, স্বাচ্ছন্দ্যময় করে গড়ে তোলছে। কিন্তু এ ব্যাংকিংব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী গণমানুষের কোনো উন্নয়ন করতে পেরেছে কি? প্রশ্ন আছে এ নিয়ে। আধুনিক ব্যাংকিং বাণিজ্যবাদকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গণমানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা প্রকৃত টেকসই উন্নয়নে কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের দেশে যা দেখে চলছি, ব্যাংকগুলো কেবল স্বচ্ছল ব্যবসায়ী শ্রেণি, যাদের অঢেল সম্পদ আছে কেবল তাদেরই মোটা অংকের ঋণ প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, কৃষক, শ্রমজীবী দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাংকিং করতে তেমন আগ্রহী নয়।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্যকে আড়াল করে রাখে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে আমরা পৃথিবীতে ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ করি। শিক্ষা, অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এর নেপথ্য কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়ন। সত্যি কি তাই? জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা কি সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছি? মানব পাচারের কথাই বিবেচনা করি। বিশ্বব্যাপী মানব পাচার

আজ এক ভয়াবহ সমস্যা। অমানবিক হলেও দিন দিন বেড়েই চলছে মানব পাচারের পরিমাণ। গত ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে United states Department of Stateকর্তৃক প্রকাশিত 2015 Trafficking in Persons Report —Bangladesh নামে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় "Bangladesh is primarily a source and tolesserextent a transit and destination country for men, women and children subjected to forced labor and sex trafficking."। ২৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে সমকাল এ প্রকাশিত "সীমান্তের অনেক কর্মকর্তা মানব পাচারে জড়িত" শিরোনামে এক প্রতিবেদনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র থেকে উল্লেখ করা হয়, কক্সবাজারের টেকনাফ, উখিয়াসহ সীমান্ত এলাকায় ঘুরে-ফিরে পোস্টিং নেওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানব পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এসব কর্মকর্তার বদলি করা হলেও তদবির করে ওই এলাকায় থেকে যায়। মানব পাচারকারীদের সাথে এসব কর্মকর্তার সাথে বিশেষ সখ্য রয়েছে এবং রাতারাতি বিপুল অর্থের মালিক বনে গেছে তারা। বিশ্বজুড়ে নারী, শিশু, মানবপাচার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এমন অবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছি দাবি করা যৌক্তিক হবে কি? তবে কি মানব পাচার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব। হয় তো সম্ভব নয়। কিন্তু মানবপাচার দিনে দিনে না বেড়ে ক্রমান্বয়ে তা কমার কথা। তাহলেই কেবল আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার দাবি যৌক্তিক বলা যাবে।

একজন রাষ্ট্রনায়ক হবে মানবতাবাদী, মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। একই সাথে পরমতসহিষ্ণু, উদার, অসাম্প্রদায়িক, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় নিরলস কর্মী। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে চলছে। পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে, উগ্র, সাম্প্রদায়িক, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি তৈরি করে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোতে জনগণের রায় নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক বনে যাচ্ছে। এ থেকে কি বলতে পারি বিশ্ব সত্য সত্যিই জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছে? গত ৩১ জুলাই, ২০১৫ রাত ১২টা ১ মিনিটে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ৬৮ বছরের পুঞ্জিভূত ছিটমহল সমস্যার অবসান হয়। আমরা দেখছি আন্তরিকতা থাকলে কত দ্রুত কত সহজে ছিটমহল সমস্যার মতো সমস্যা সমাধান করা যায়। প্রশ্ন হলো বিগত ৬৮ বছর ধরে এ সমস্যা কেন টিকে থাকে? কীভাবে টিকে থাকে? এর আগে গেলে ছিটমহল সমস্যার উদ্ভব হলো কেন? আমরা যে দাবি করছি আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছি। ৬৮ বছরের ছিটমহল সমস্যা কি প্রমাণ করে দেয় আমরা সত্যি-সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছি? মধ্যপ্রাচ্য সংকটের দিকে তাকালে কী দেখি? ১৯৯০ সালে দ্বি-মেরভিত্তিক বিশ্ব থেকে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পরপরই মার্কিনপন্থী ইরাক সরকার মার্কিন সরকারের চক্ষুশূলে পরিণত হয়। কালবিলম্ব না করে মার্কিন সরকার ইরাক আক্রমণ করে। পরে মার্কিন সরকারে পরিবর্তন এলে ইরাকের ওপর আক্রমণ বন্ধ হয়। ২০০১ সালে ৯/১১-এর পর মার্কিন জোট আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে চরম অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মূলত মার্কিন জোট পাকিস্তান থেকে শুরু করে আফ্রিকার প্রায় পুরো অংশের কোটি কোটি মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। সাদ্দাম-গাদ্দাফিদের অনেক দোষ ছিল সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো সাধারণ মানুষের মুক্তি, গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে মার্কিন জোট এসব দেশে আক্রমণ চালালে সাধারণ মানুষের আদৌ কোনো উন্নতি হয়েছে কি? সাদ্দামের আমলে ইরাকের সাধারণ মানুষ শান্তিতে ছিল, নিরাপদে ছিল, ইরাক ছিল সমৃদ্ধশীল দেশ। একই কথা গাদ্দাফির আমলের লিবিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজকের বাস্তবতায় কেবল ইরাক, লিবিয়ার জনগণ নয় বিশ্বের এক বিশাল এলাকার সাধারণ মানুষ এখন চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত। এ অঞ্চলের কোটি কোটি নারী ও শিশুর ভবিষ্যৎ এখন চরম অন্ধকারে। এটা কি প্রমাণ করে আমরা প্রকৃত অর্থে এগিয়ে

যাচ্ছি। বিশ্বব্যাপী এ রকম হাজারও সংকট তৈরি হচ্ছে, জিইয়ে রাখা হচ্ছে; যেগুলো মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না। সত্য হলো বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী সাধারণ কৃষক, মজুর, কুলিদের সৃষ্টি করা সম্পদ কতিপয় মানুষ কুক্ষিগত করে বিলাসবহুল জীবনযাপন নিশ্চিত করছে। বাণিজ্যতন্ত্র এটাকেই উন্নয়ন বলছে। বাণিজ্যতন্ত্র এটাকেই বলছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার। সত্যকে আড়াল করার এ যেন এক ভয়াবহ অপকৌশল।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার উন্নত দেশগুলোর মুষ্টিমেয় মানুষের সীমাহীন বিলাসী জীবন যাপন উৎসাহিত করছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ, দুর্গতি বাড়ুক—সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের দুর্দশার কথা বলা হয় সত্য। তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনো উন্নয়ন হয় না। দিন রাত পরিশ্রম করেও এসব দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দুবেলা ভাত খেতে পারে না—সেদিকে খেয়াল দেওয়ার সময় কোথায়? বাণিজ্যি দৃষ্টিভঙ্গি তাই চতুর একচোখা। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে চলছে। পৃথিবীর সত্যিকার উন্নয়নে বাণিজ্যিকতার ভেরাজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রতিটি মানুষই স্বচ্ছলতা চায়। পরিবার পরিজন নিয়ে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করার প্রবণতা মানুষের একটি স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি। একজন যৌক্তিক মানুষ স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপনের প্রত্যাশা করতেই পারে। কিন্তু সে স্বচ্ছলতা প্রাপ্তির জন্য মানুষের মেধা, সৃজনশীলতা, পরিশ্রমের সমন্বয় চাই। মানুষ তার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, সততার বিনিময়ে সুন্দরভাবে স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারে। রাষ্ট্র-সমাজ তথা মানুষের উচিত সে রকম একটি অবস্থান তৈরি করা। সৎভাবে অর্থ উপার্জন করে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপনের প্রতি সবারই সমর্থন থাকা উচিত। পরিতাপের বিষয় হলো—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এ সত্যকে অস্বীকার করে। বাণিজ্যতন্ত্রে সততা, মেধা, যোগ্যতার কোনো স্থান আছে বলে মনে হয় না। বাণিজ্যতন্ত্রে যেকোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন চাই। নীতিনৈতিকতা, সততা, বিবেক বিবেচনা বোধ, মনুষ্যত্ববোধের ধার ধারে না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র নামধারী রাষ্ট্রগুলো নীতিনৈতিকতাবহির্ভূত বেআইনি-গর্হিত অন্ধকার পথে অর্থ উপার্জন ঠেকাতে পারছে না। বিশ্বব্যাপী আজ কালো টাকার দাপট। ৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে সমকাল পত্রিকার পানামা পেপারস' নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে উল্লেখ করা হয়, পানামার একটি ল ফার্ম মোসাক ফনসেকার ১ কোটি ১৫ লাখ গোপন নথি ফাঁস হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। পানামা পেপারস' খ্যাত ওই নথিগুলোতে জানা গেছে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা থেকে শুরু করে ধনী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি, নামীদামি চলচিত্র অভিনেতা, খেলোয়াড়রা কৌশলে কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে গোপনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। এ তালিকায় বর্তমান ও সাবেক মিলিয়ে অন্তত ৭২ জন রাষ্ট্রপ্রধানের নাম প্রকাশ পায়। পানামা পেপারস থেকে কালো টাকার বিস্তৃতি সম্পর্কে একটি সামান্য ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। মোদ্দা কথা, সৎ পথে থেকেও মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে দেশ ও সমাজের বিঘ্ন না ঘটিয়েও কাড়ি কাড়ি অর্থ উপার্জন করা যায়। প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া যায়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি তা পরিহার করে বরং অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জনকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এককথায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি একজন মানুষকে পরিপূর্ণ অমানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

বিজ্ঞানের হাজারও আবিষ্কার মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই তাঁদের মেধা ও মননের সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিরলস পরিশ্রম করে বিভিন্ন আবিষ্কার করে

চলেছেন। কিন্তু এসব আবিষ্কার হয়ে উঠছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মুনাফা লাভের হাতিয়ার। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মানবকল্যাণ আজ ভূলুণ্ঠিত। মানুষের শৈল্পিক সত্তা উপেক্ষিত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ এক প্রবল প্রতাপশালী দর্শন, সর্বগ্রাসী সংস্কৃতি যার কাছে গোটা বিশ্ব নতজানু, অসহায় অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। বাণিজ্যিকতার অন্ধকার রূপ দেখে বিশ্ব বিবেক বাক্‌রুদ্ধ, হতবাক। সভ্যতা সবকিছুই দেখছে, শুনছে, বুঝে চলছে- কিন্তু কিছুই করতে পারছেনা- যেন কিছুই করার নেই।

৬. প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার

প্রশ্ন হলো—এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো মানবিক শিক্ষার প্রসার। বাণিজ্যিকতার কবল থেকে গোটা বিশ্বকে তথা বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার প্রত্যয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে সবার আগে বিশ্বনেতৃত্বকে একত্রে বসতে হবে। কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাণিজ্যিক স্বার্থ থাকবে। এতে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে মানবিকতাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, রাজনীতি, আইনপ্রণয়ন থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে সব স্তরে মানবিকতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বিশ্বব্যাপী শিক্ষা হবে মানবিকতাকে পাকাপোক্ত করার হাতিয়ার। বাণিজ্যিক শিক্ষাকে পরিত্যাগ করে মানবিক শিক্ষা বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করা গেলেই কেবল প্রকৃত উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। শিক্ষার মানবিকীকরণ করতে হবে। শিক্ষাকে মানবিক করে অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতিকে মানবিকীকরণ করা সহজ হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী মানবিক শিক্ষার প্রসারের ফলে কী কী পরিবর্তন আনা সম্ভব—অনুমান করি:

১. সারা বিশ্ব থেকে দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব।

২. দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজটি খুব সহজে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

৩. অসুস্থতা, অসহায়ত্ব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কাজটি সহজতর হবে।

৪. প্রতিটি দরিদ্র, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বা স্বচ্ছল ও নিরাপদ জীবনযাপন সম্ভব হবে।

৫. শিক্ষাকে মানবিক করা সম্ভব হলে বর্তমানে যে উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমান, তার চেয়ে সহস্রগুণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে।

৬. গণমুখী ব্যাংকিংব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। এতে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিংব্যবস্থা জণকল্যাণে মুনাফার কথা বাদ দিয়ে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। অনুরূপ গণমাধ্যম কর্পোরেট পুঁজির কবল থেকে মুক্ত হবে। গণমাধ্যমও সত্যিকার অর্থে বিশ্বব্যাপী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। গণমাধ্যম কাঠামো এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কী ঘটছে, সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো কী, তাদের সম্ভাবনা তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে—এমন খবর প্রচারে প্রাধান্য পায়। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিনোদন বিষয়গুলো শতভাগ ব্যয়মুক্ত করা যাবে।

৭. মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ভিত্তি করে সারা পৃথিবী থেকে দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অনাচার প্রায় শতভাগ দূর করা সম্ভব।

৮. সব উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে জনস্বার্থে। জনস্বার্থ নিশ্চিত করেই তবে মুনাফার প্রশ্ন আসবে। লাগামহীন মুনাফা অর্জনের অপসংস্কৃতি থেকে উৎপাদক শ্রেণি বেরিয়ে আসবে। পৃথিবীতে

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি সংঘাত বলে কিছু থাকবে না। বৈষম্য, বিভেদ, হানাহানি, অনাচার, অরাজকতা দূর হবে।

৯. অর্থনীতিকে মানবিক করা সম্ভব হবে। গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে বাণিজ্যিকতা বলতে কিছু থাকবে না। সব দেশের সব অর্থনীতিতে থাকবে মানবিকতার জয়জয়কার। এ জন্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। মানবকল্যাণে তথা দেশ ও মানুষের স্বার্থে উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। একই সাথে বিশ্বব্যাপী রাজনীতি ও কূটনীতিতে পরিবর্তন আসবে। দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক যা-ই বলি না কেন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মূল কথা হবে মানবতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। বিশ্বরাজনীতি ও কূটনীতিকে মানবিক করে পৃথিবীকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

১০. পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিকই স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে এ রকম একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন মানে বিলাসিতা নয়। চাহিবামাত্রই যেন প্রত্যেকেই তার মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন নিশ্চিত করতে পারে এ রকম একটি অবস্থান তৈরি করা।

১১. পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন, মানবতাবাদী, উদার, অসাম্প্রদায়িক, সংস্কৃতিমান এক পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি মানুষকে সংস্কৃতিমান হিসেবে গড়ে তোলতে সক্ষম হলেই পৃথিবী থেকে সব অনাচার দূর করা সম্ভব।

এমন একটি ব্যবস্থা চালু করার পথে প্রধান বাধা বাণিজ্যিকতা। এই বাণিজ্যিকতাই বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা না ভেবে মুষ্টিমেয় মানুষের বিলাসী জীবন নিশ্চিত করতে চায়। টেকসই প্রকৃত উন্নয়নে এমন সংস্কৃতির অবসান হওয়া সময়ের দাবি। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই এক-একজন সুবিবেচক নাগরিক। এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার নিরন্তর, দুর্বার, অপ্রতিরুদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে সবার আগে আগে চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন, মানবাধিকার, সুশাসন, আইনের শাসন, শোষণমুক্ত, দারিদ্র্য মুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা আজ বড় প্রয়োজন।

৭. শেষ কথা

সুতরাং উন্নয়ন কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিবেচনা কাম্য নয়। আজ সময় এসেছে এ বিষয়ে চুলচেঁড়া বিশ্লেষণ করার। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ বিশ্বমানবতার শত্রু। বাণিজ্যিকতা আজ আমাদের এক ঘন অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। পৃথিবীতে সত্যিকার উন্নয়ন সাধন করতে হলে, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে আমাদের পরিশোধিত হতে হবে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে মানবিকতার কথা ভাবতে হবে। বিশ্বশান্তি, মানবতা, গণমানুষের কল্যাণ তথা একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে আজ আমাদের বাণিজ্যিকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সংকুচিত হোক। পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের ব্রত হোক মানবতার।

তথ্যসূত্র

1. Jalil, M. A.: Bangladesh Economy in a Globalization World, BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, vol 28, Number 1, June 2012.
2. Lee, Eddy and Marco Vivarelli, The Social Impact of Globalization in the Developing Countries, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of labor, January, 2006.
3. Marching towards Growth, Development and Equitable Society, Budget Speech, 2016-17, Ministry of Finance, Peoples Republic of Bangladesh, 02 June, 2016.
4. Internet.
5. United States Department of state: Trafficking in Persons Report, Bangladesh, 27 July, 2015.

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬।

৭. দীনবন্ধু মিত্র, নীলদর্পণ, সম্পাদনায় মমতাজউদদীন আহমদ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০০৫।

৮. বারকাত, আবুল: "বাংলাদেশে দারিদ্র্য- বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির সন্ধানে", লোকবক্তৃতা ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেট অডিটোরিয়াম, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১৪।

৯. বাংলা পিডিয়া (খণ্ড ২): বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

১০. বাংলা পিডিয়া (খণ্ড ৪): বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

১১. সমকাল, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথম আলোসহ বিভিন্ন দৈনিকের বিভিন্ন প্রতিবেদন, কলাম, ফিচার।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৬৭-১৭৭
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কৃষিপণ্যের (ধানের) মূল্য, প্রান্তিক কৃষকদের ভালোবাসার অর্থনীতি

মো: জাহাঙ্গীর আলম*

সারসংক্ষেপ *সমাজ, সভ্যতা, পরিবেশ, আর্থসামাজিক পরিকাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের আবাসস্থল স্বাধীন ভূখণ্ড এ বাংলাদেশেরও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ছাপ দৃশ্যমান। স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। এ ভূখণ্ডের সুদূর অতীত অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষিকে ধরে রেখেছে কৃষক, বংশপরম্পরায়। ইতিহাস-ঐতিহ্যের খাতিরে মাটির টানে অনুপস্থিত মুনাফায় বঞ্চনাকে ম্লান করে পথ চলছে কৃষি এবং কৃষক পরিবার। নেই উল্লেখযোগ্য কারিগরি জ্ঞান, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। প্রকৃতি আর লোকজ জ্ঞানই মূলত সম্পদ। ক্ষতি আর ক্ষতি লাভের প্রত্যাশা করলেও দেখা মেলেনি সহসা। মাটির মায়ার জালে বেঁধেছে নিজেকে নিজ পরিবার-পরিজনকে। হ্যাঁ বাংলাদেশের কৃষকদের কথাই বলছি। প্রকৃত সত্য হলো কৃষকেরা কৃষিপণ্য বিশেষ করে ইরি ধানের উৎপাদন ব্যয় তার উৎপাদিত পণ্য (ধান) বিক্রি করে তুলতে পারছে না। এ ঘটনা বেশির ভাগ সময়েই ঘটেছে। কেন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কেন পণ্যের দাম বিশেষ সময়ে কম হয়, এতে লাভ কার, শোষণ কেমন, স্বল্প মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থসামাজিক প্রভাব কী? ইত্যাদি বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের মূল বিষয়। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পায় না কেন? যায় কোথায়? পেলে কৃষির কী লাভ হতো? কৃষকের অবস্থার কী পরিবর্তন হতো? কৃষিনির্ভর এ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কী অবস্থা হতো? স্থিতিশীল উন্নয়নের অবস্থা কী হতো? আর্থিক লোকসান দিয়েও কৃষক কেন উৎপাদন করে চলেছে? কীসের মোহ? কী স্বার্থ ইত্যাদির আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এখানে সন্নিবেশিত এ সংকট উত্তরণের পথ কী? করবেই বা কে, দায় কার, এসব প্রশ্ন আর উত্তরের অনুসন্ধান এ প্রবন্ধের উপজ্যব্য।*

মূল শব্দ: *ফসলের ঘ্রাণ, অনুপস্থিত মুনাফা, পারিবারিক ভোগান্তি, আর্থসামাজিক নিঃশ্বায়ন, অনিচ্ছাকৃত ভালোবাসা, লাভজনক কৃষি কৌশল, কৃষিনির্ভর শিল্প উন্নয়ন।*

---

* সহকারী অধ্যাপক, সরকারী ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা; ফোন: ০১৭১০৮২৭৭৬, ই-মেইল: jahangir252540@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯।

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি ছোট দেশ। দেশটির অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। কৃষিটা নির্ভর করছে একদল অশিক্ষিত আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বলতম, প্রকৃত অর্থেই অদক্ষ পরপুজির ওপর নির্ভরশীল, প্রশিক্ষণবিহীন ভেজাল কৃষি উপকরণ ব্যবহারকারী কৃষকের ওপর। আর দেশটার খাদ্যনিরাপত্তা এবং স্বয়ম্পূর্ণতা নির্ভর করছে এদের ওপর। এ কৃষককুল এবং তার পরিবারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর-এ পরিচালিত রাজস্ব খাতের কৃষিকর্মীরা মূলত ফিল্ড করেন সার ডিলার বা খুচরা কৃষিপণ্য বিক্রেতার দোকান পর্যন্ত; সেখান থেকে তথ্যের আদান-প্রদান হয় চলে কৃষি উৎপাদন, মূলত বহুমুখী সংকটের আবর্তে কৃষককুল। নিতান্তই তার নিজের প্রয়োজনে সামর্থ্যমতো কার্যসিদ্ধি করছেন। উৎপাদন এবং বিপণনপ্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য। বংশপরম্পরায় ক্ষতি মেনে মাটির টানে ফসলের ঘ্রাণে উৎপাদন করে চলেছে কৃষক। কৃষক এবং দেশের স্বার্থে কৃষিকে লাভজনক করার কৌশল এখন সময়ের দাবি।

ইরি / বোরো মৌসুমে উৎপাদিত কয়েকটি ধানের নাম, বয়স ও ফলন

নাম	জীবনকাল	ফলন (একরপ্রতি)	মন্তব্য
ব্যাবিলন-২	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	উৎপাদনের হিসাবটি বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানির, বাস্তবে উৎপাদন অনেক কম হয়।
মেঘনা	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
তিনপাতা সুপার	১৩৫-১৪০ দিন	১১৫-১২৫ মণ	
তিনপাতা-১০	১৩০-১৩৫ দিন	১১৫-১২৫ মণ	
ইস্পাহানি-১,২,৬,৭,৮	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
দুর্বার	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
আগমণী	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
ব্রি-ধান-২৮	১৩০-১৩৫ দিন	৮০-১০০ মণ	
হীরা-১,২	১৪০-১৪৫ দিন	১২০-১৩০ মণ	
সিনজেনটা এস-১২০৫	১৪০-১৪৫ দিন	১১৫-১২০ মণ	

ইরি বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদনের ব্যয়ের হিসাব

ইরি ধানের উৎপাদন ব্যয়: (১ বিঘা ৫০ শতাংশ):

ইরি ধানের উৎপাদন ব্যয়কে মূলত তিনটি ধাপে বিশ্লেষণ করা দরকার।

(ক) বীজতলা প্রস্তুত থেকে চারা উৎপাদন পর্যন্ত।

(খ) চারা তোলা, রোপণ এবং ফসল কাটা পর্যন্ত।

(গ) ফসল কাটা থেকে মাড়াই এবং বাজারজাতকরণ পর্যন্ত।

(ক) বীজতলা প্রস্তুত থেকে চারা উৎপাদন পর্যন্ত

কার্যক্রম	ব্যয় (টাকা)
১। বীজ ক্রয় ৩ কেজির/ ৩ প্যাকেট	৩০০ × ৩ = ৯০০/-
২। বীজতলা ভাড়া ৬ শতাংশ	১০০ × ৬ = ৬০০/-
৩। বীজতলা তৈরি কর্ষণ/চাষ ২ বার	২৫০ × ২ = ৫০০/-
৪। বীজতলা তৈরি শ্রমের মজুরি (বপনসহ)	৪০০ × ১ = ৪০০/-
৫। বীজতলায় সার, কীটনাশক, পানি প্রয়োগ, সার উপরিপ্রয়োগ, ভিটামিন, আগাছা দমন, কুয়াশা ভাঙা (নূন্যতম ৩০ দিন)	= ৯৫০/-
এ পর্বের ব্যয়	= ৩৩৫০/-

(খ) চারা তোলা, রোপণ এবং ফসল কাটা পর্যন্ত

কার্যক্রম	ব্যয় (টাকা)
১। জমি ভাড়া/লিজ	৬০০০ ÷ ২ = ৩০০০/-
২। জমি প্রস্তুত চাষ/কর্ষণ (৩ চাষ)	৬০০ × ৩ = ১৮০০/-
৩। জমি রোপণ উপযোগী করা আইল ছাটা মই দেওয়া , নালা এবং কাচা তৈরি	৪০০ × ১ = ৪০০/-
৪। সার প্রয়োগ রোপণকালীন টিএসপি, এমপি, ইউরিয়া, সালফার, দস্তা, কীটনাশক ইত্যাদি।	= ১৫০০/-
৫। চারা রোপণ শ্রম ব্যয় ৮ জন	৪০০ × ৮ = ৩২০০/-
৬। আগাছা দমন কীটনাশক (ঔষধের সাথে মিশ্রিত সার সহ)	= ৩০০/-
৭। সার উপরিপ্রয়োগ এবং কীটনাশক (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার)	= ১৪৮০/-
৮। নিড়ানী এবং মাটি উলটপালট (২ বার)	(৪০০×৩)×২ = ২৪০০/-
৯। সার, ভিটামিন, কীটনাশক, স্প্রেজনিত শ্রম ব্যয় এবং মেশিন ভাড়া (ন্যূনতম ২ বার তবে ব্লাস্টসহ অন্য রোগ হলে অধিকার)	(৪০০×২)+১০০ = ৯০০/-
১০। পানি সেচ বিদ্যুৎচালিত	= ২৫০০/-
	সর্বমোট = ১৭, ৪৮০/-

* দো-ফসলী জমি ফলে ১ ফসলের জমি ভাড়া ৬০০০ গুণ ২ ।

* ১ টা শ্রমের মূল্য ৮ ঘণ্টা = ৪০০ টাকা ধরে।

* কীটনাশক স্প্রে ২ বার ধরা হয়েছে। ব্লাস্টসহ অন্য রোগ হলে অধিকবার তার হিসাব ধরা হয়নি।

* ডিজেল চালিত সেচ হলে এর অধিক ব্যয়, তার হিসাব ধরা হয়নি।

(গ) ফসল কাটা থেকে মাড়াই এবং বাজারজাতকরণ পর্যন্ত

কার্যক্রম	ব্যয় (টাকা)
১। ফসল কর্তন (বিঘা প্রতি ৪ জন) শ্রমিক	৬০০×৪=২৪০০/-
২। বিছালি তৈরি এবং পরিবহন (৫ জন)	৬০০×৫=৩০০০/-
৩। মাড়াই, ঝাড়াই (২জন)	৬০০×২=১২০০/-
৪। মেশিনের তেল/বিদ্যুৎ এবং মেশিন ভাড়া	১০০+১০০=২০০/-
৫। ফসল ধান বস্তাবন্দীকরণ মজুতকরণ ০.৫ জন।	(৬০০÷২)+(১০০÷২)=৩৫০/-
৬। বাজারজাতকরণ পরিবহন	৪০০/-
এ পর্বের ব্যয়	৭৫৫০/-

* ফসল কর্তনের সময় শ্রমব্যয় অধিক ফলে প্রতিজন ৬০০ ধরে।

* মাড়াই, ঝাড়াই, বস্তাবন্দী, মজুতকরণে, পরিবারের নারী, শিশুসহ, অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়নি।

* দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অস্বাভাবিক দূরত্বের পরিবহন ব্যয় ধরা হয়নি।

একবিঘা = ৫০ শতাংশ এর দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান ব্যয় (ক, খ এবং গ এর যোগফল)

কার্যক্রম	দৃশ্যমান খরচ (টাকা)	অদৃশ্যমান খরচ (টাকা)	মোট ব্যয় (দৃশ্যমান+অদৃশ্যমান)
ক	৩,৩৫০/-	২০০/-	৩৫৫০/-
খ	১৭,৪৮০/-	২,৮০০/-	২০২৮০/-
গ	৭,৫৫০/-	২,১০০/-	৯৬৫০/-
ক+খ+গ এর যোগফল	২৮,৩৮০/-	৫,১০০/-	৩৩,৪৮০/-

* অদৃশ্যমান ব্যয়: আবাসন, আহার, ওষুধ, পান-তামাক, গাঁজাসহ পারিবারিক শ্রম ব্যয় ভোগান্তি ব্যয় ইত্যাদি। (শ্রমপ্রতি ২০০ টাকা ধরে) যদিও পারিবারিক ভোগান্তি আর্থিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন।

ইরি বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন থেকে আয়ের হিসাব

উৎপাদিত পণ্য	উৎপাদনের পরিমাণ	দর	মোট আয়
মোটা ধান	৩০ মণ	৬০০	১৮,০০০
বিছালি (খড়)	৩ কাউন্ট	১,২০০	৩,৬০০
চিটা	৩ বস্তা	৫০	১৫০
			২১,৭৫০

ইরি বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদনের নীট ক্ষতি (১ বিঘা = ৫০ শতাংশ জমিতে)
নিট ক্ষতি

ব্যয়: ৩৩,৪৮০
আয়: – ২১,৭৫০
১১,৭৩০ (এগারো হাজার সাতশত ত্রিশ টাকা)

ধান (মোটা) এর বয়স ১৪০ দিন ধরে-
(ক) প্রতি মৌসুমে ক্ষতি = ১১,৭৩০ টাকা ।
(খ) প্রতি দিন ক্ষতি = ৮৩.৭৮/৮৪ টাকা।
(গ) এক দশকে ক্ষতি = ১,১৭,৩০০ টাকা
(১০ মৌসুম ধরে)

- এই ক্ষতি কৃষক বাণিজ্যিকভাবে হিসাব করে না।
- ধীরে ধীরে ব্যয় করে শোষিত হয় বুঝে না।
- নিজের এবং পরিবারের শ্রম ও ভোগান্তি ব্যয় ধরে না।
- নিজের জমির ব্যবহার মূল্য হিসাব করে না।
- নিজেস্ব উৎপাদিত জৈব সার বিবেচনায় আনে না।

ক্ষতি চক্র/নিঃশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু

২য় বছর পর: নিম্ন বিত্ত কৃষকের ক্ষেত্রে—

- গবাদিপশু বিক্রি শুরু অথবা
- গাছ বা অন্য সম্পদ অথবা
- পরিবারের অন্য কেউ থাকলে তার অর্থ নিতে হবে অথবা
- আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট সহায়তা নিতে হবে।

৪র্থ বছর পর

- NGO ঋণের জালে আটকা পড়বে
- প্রতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস্য খুজবে।

৬ষ্ঠ বছর পর

- প্রতিষ্ঠানিক ঋণের জালে আটকা পড়বে।
- পেশা পরিবর্তনের চিন্তা করবে।

৮ম বছর পর

- একাধিক পেশায় যুক্ত হবে
- পরিবারের কেউ স্বচ্ছল থাকলে তার / তাদের সহায়তায় কৃষি টা চলবে অথবা
- ঐ জমি বন্ধক রেখে কৃষি কাজ চলবে।

১ দশক পর

- জমির আংশিক বিক্রি শুরু করবে
- নিজের জমির সাথে বর্গাচাষি রূপে আবির্ভূত হবে
- ভূমি বিচ্যুতির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে

ইরি (মোটা) ধানের মূল্য এবং অন্যান্য পণ্যের মূল্যের তুলনা
(জুলাই-১৯) (এক মণ ৪০ কেজি ধানের বিনিময় হার)

পণ্য	পরিমাণ	দাম	ধান ১ মণ অন্যান্য
চাল মাঝারি	১ কেজি	৪০ টাকা	১ : ১৫
কাঁচামরিচ	১ কেজি	৮০ টাকা	১ : ৭.৫
পেঁয়াজ	১ কেজি	৬০ টাকা	১ : ১০
চিংড়ি মাছ (গলদা ১০ গ্রেড)	১ কেজি	৮০০ টাকা	১ : ০.৭৫
ইলিশ মাছ	১ কেজি	১০০০ টাকা	১ : ০.৬
ডাক্তারের ফি	১ম বার	৮০০ টাকা	১ : ০.৭৫
মেডিকেল টেস্ট	সিটি স্ক্যান ১ বার সাধারণ	৪০০০ টাকা	১ : ০.১৫
শিক্ষকের কোচিং (ব্যাচ)	১ মাস = ১২ দিন	৮০০ টাকা	১ : ০.৭৫
শিক্ষকের বেতন (বাসায়)	১ মাস= ১২ দিন	৪০০০ টাকা	১ : ০.১৫
বাড়ি ভাড়া (গ্রামকেন্দ্রীক)	সেমি পাকা (মাসিক)	৩০০০ টাকা	১ : ০.২
বাড়ি ভাড়া (উপশহর)	পাকা	৬০০০ টাকা	১ : ০১
কাপড় গামছা-লুঙ্গি+গেঞ্জি = ৬০০ শাড়ি+ব্লাউজ+পেটিকোট=৯০০ শাড়ি+ব্লাউজ+পেটিকোট=৭০০ শার্ট+প্যান্ট=৮০০ থ্রি পিস =১০০০	১ বার ০৫ জনের কৃষক, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, মা	৪০০০ টাকা	১ : ০.১৫
বিদ্যুৎ মোবাইলসহ ন্যূনতম ইলেকট্রনিকস সামগ্রীর ব্যবহারসহ	ইউনিট ২/৩	১৫০০ টাকা	১ : ০.৪

- একজন কৃষক ১ বিঘা (৫০ শতাংশ) জমি চাষ করে ১ মৌসুমে দোফসলি জমিতে ৩০ মণ ধান উৎপাদন করলে তার মূল্য ১৮,০০০ টাকা হলে ধান বিক্রির আয় থেকে সে,
- ২টা বাচ্চার শিক্ষকের ব্যাচে কোচিং ফি ৬ মাসে ৯৬০০ এবং ঐ পরিবার প্রতিদিন ২ কেজি চাল ভোগ করলে ৩.০৫ মাসের খাদ্যের সংস্থান হবে অন্য কিছু করতে পারবে না।

  অথবা,
- পরিবারের সদস্যরা যদি ১ বার করে ডাক্তারের নিকট যায় এবং ২ জন একবার করে সিটি স্ক্যান করে, তাহলে ২ মাস ১৫ দিনের খাদ্যের সংস্থান করতে পারবে; আর কিছু করতে পারবে না।

  অথবা,
- ৬ মাসে যদি ২ বার কাপড় ক্রয় করে, তাহলে বাকি টাকায় খাদ্যের সংস্থান হবে মাত্র ৪ মাসের; অন্যকিছু হবে না।

  অথবা
- উৎপাদিত ফসল (ধান) দিয়ে যদি তার সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহ করতে হয়, তাহলে সর্বোচ্চ ২ মাসের বেশি সংসারিক ব্যয় নির্বাহ হবে না।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক দিক ভাবনা-পুনর্ভাবনা

- ধান বিক্রি না করে কমিউনিটি বেজ চাল উৎপাদন করলে লাভ হতো কিনা এবং চাল তৈরি ও দাম নিয়ন্ত্রণকারী সিন্ডিকেট ভাঙ্গতো কি না?
- ধান ক্রয় বিক্রয় থেকে বর্তমান প্রকৃয়ার মধ্যস্বত্ব ভোগী, ফড়িয়া এবং চালকল মালিকদের অস্বাভাবিক লভ্যাংশ বিশেষ প্রকৃয়ায় কৃষকদের অনুকুলে প্রবাহিত হলে কী হতো?
- বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম পণ্য ধানের উৎপাদন যদি অলাভজনক হয় তাহলে তাত্ত্বিকভাবে S.D.G/ M.D.G অর্জিত হবে না কি? স্থিতিশীল বঞ্চায়ন/ নিঃশ্বায়ন হবে।
- ধান চাষ অলাভজনক হলে ভবিষ্যতে কৃষকরা এ চাষ বন্ধ করে অন্য পেশার যাবেন কি না? আর গেলে খাদ্যনিরাপত্তার কি হবে?
- এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? বাজারব্যবস্থা, সিন্ডিকেট না সরকার?
- দায়ী যে-ই হোক কৃষিকে লাভজনক করতে উদ্যোগী হবেন কে? জনগন, রাজনৈতিক দল, বা সরকার?
- ভুক্তভোগী কৃষক যদি উদ্যেগী হয় তাহলে তাদের নেতৃত্বই বা কে দেবেন?
- মুক্তিযুদ্ধো আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পর কৃষি, কৃষকের বাস্তব অবস্থা চাষ মৌসুমে সরকারি/বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অথবা বঞ্চনায়নের মাত্রা, খাত/ক্ষেত্র।
- রাষ্ট্রের কৃষিসংশ্লিষ্ট ৭০/৮০ ভাগ ভুক্তভোগী মানুষ যদি তার শোষণের সঠিক খাত-ক্ষেত্র বুঝে সঠিক নেতৃত্বে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে জন্য উদ্যোগী হয়, তার রূপ কেমন হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি ...।

কৃষি যদি লাভজনক হতো, তাহলে অর্থনীতির ওপর কী প্রভাব হতো?

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষি চাষের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ কৃষি লাভজনক হলে ৭০% মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। এখন ক্রয়ক্ষমতাহীন বা কম ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হতো। গ্রামীণ অর্থনীতির খাতসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পেত। শহুরে কৃষিনির্ভর শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হতো। বাংলাদেশে বর্তমানে ধনবৈষম্যের গতিপ্রকৃতি বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। উপর তলায় ১০% মানুষের কাছে ৯০% সম্পদ পুঞ্জীভূত। আর বাকি ৯০% মানুষ ১০% সম্পদ ভোগ করে। এখানেও নিম্নশ্রেণির উচ্চবর্গের মানুষের হাতে উক্ত ১০% সম্পদের বেশির ভাগ দখলে। ফলে প্রকৃতভাবে কৃষক বা শ্রমিক অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষের অর্থসামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক। অর্থনৈতিক বঞ্চনাহেতু সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বঞ্চনারও শিকার। এ মানুষগুলোর নিজের শক্তি সামর্থ্য কম হওয়ায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হয়। কিন্তু এরা শুধু উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পেলে স্থিতিশীল আর্থসামাজিক ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারত, স্থিতিশীল বঞ্চনায়নপ্রক্রিয়ার বিপরীতে MDG আর SDG জাতীয় যত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করি না কেন, তা অর্জন সম্ভব হতো।

কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষক পরিবারের কোনো কোনো সদস্য যুক্ত কিন্তু শ্রমের মূল্যায়ন হয় না

কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষক পরিবারের মূল কর্তাব্যক্তি যিনি ঐ পরিবারের কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তার শ্রমমূল্য কখনো কখনো আংশিক মূল্যায়নে আনলেও অন্য অনেকে আছে, যাদের শ্রমমূল্য কৃষি

উৎপাদনের সাথে হিসাব করা হয় না। যদি তাদের শ্রমমূল্য হিসাব করা হতো, তাহলে কৃষি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেত। অন্যভাবে ভাবলে ঐ অমূল্যায়িত শ্রমশক্তি যদি মূল্যায়ন করা এবং তাদের পরিশ্রমিক দেওয়া হতো, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পেত। ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত, আর্থসামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেত, দেশের টেকসই উন্নয়ন তরান্বিত হতো, সর্বপরি কৃষিপণ্য উৎপাদনে দৃশ্যমান ব্যয় বৃদ্ধি পেত।

ব্যক্তি	কৃষি উৎপাদনে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্র
প্রবীণ নারী / পুরুষ	কৃষিশ্রমিকদের দিকনির্দেশনা দেওয়া, বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা, কৃষিশ্রমিকদের খাদ্যপ্রস্তুতে সহয়তা, ফসল মাড়াইঝাড়াই বিপণনের সহায়তা কার্যক্রম।
কিশোর / কিশোরী যুবক / যুবতী	থাকার ব্যবস্থা করা, শ্রমিক আনা নেওয়া, বীজ সার পরিবহন, কীটনাশক সার প্রয়োগ বীজ বপন, বীজ এবং পণ্যের শ্রেণীকরণ করা ইত্যাদি।

অলাভজনক কৃষিব্যবস্থাই দীর্ঘমেয়াদি বৈষম্য বঞ্চনা এবং দারিদ্র্য সৃষ্টির কারণ-খাত/ক্ষেত্র

কারণ	অভিঘাত
* অনুপস্থিত ভূস্বামীদের নিকট ক্রমশ ভূমির পুঞ্জীভবন।	মাঝারি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ভূমিচ্যুতি প্রান্তিক ও ভূমিহীনে পরিণত।
* বর্গাদার এবং ইজারাদার কৃষকের আধিক্যতা।	জীবনধারণ কষ্টসাধ্য অন্যান্য পণ্যের কার্যকর চাহিদা হ্রাস।
* কৃষিপণ্যের বিপণনে কয়েক ধাপে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।	অলাভজনক কৃষির কারণে কৃষক পরিবার নিঃশ্বায়ন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত।
* উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় কার্যকর সরকারি আর্থিক প্রণোদনাহীনতা এবং ঋণপ্রক্রিয়ার জটিলতা।	এনজিও, মহানজন, দালাল, ফড়িয়া, ব্যবসায়ীদের চড়া সুদে ঋণের জালে পুনঃপুনঃ আটকে পড়ে শেষবিচারে ভূমিচ্যুতি।
* প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষ করে বন্যা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙন, সাইক্লোন হেতু ফসল/জমিহানি।	বাস্তুচ্যুতি গ্রামীণ জীবনে কর্মহীনতা, শহরমুখী অভিগমন অনৈতিক কার্যক্রম এবং সামাজিক সংকটের জন্ম।
* কৃষি পরিবারের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং অনৈতিক ও বাণিজ্যিক পন্থার কারণে চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে না পারা।	বংশপরম্পরায় আর্থসামাজিক নিঃশ্বায়ন ও বঞ্চনায়নের সাথে যুক্ত।

ক্ষতি হলেও কেন চাষ করেন?

- বিকল্প কাজ বা চাষের সুযোগ নেই/কম।
- বাণিজ্যিক হিসাব করেন না, ধীরে ধীরে বিনিয়োগ করেন।
- নিজ এবং পরিবারের শ্রমের হিসাব করেন না।
- নিজেস্ব জমি/পৈত্রিক জমির মূল্য হিসাব করেন না।
- পারিবারিক খাদ্য জোগানের নিশ্চয়তা।
- গবাদিপশুর খাদ্য জোগানের নিশ্চয়তা।

- ক্ষতি হলেও ফসল বিক্রি করে আপৎকালীন ব্যয় নির্বাহ।
- আশা করে পরবর্তী বছর/মৌসুমে লাভ হবে।
- নিজেস্ব জমি পতিত/আগাছা না রেখে কিছু একটা করা।
- অনেক নিম্নবিত্ত কৃষি পরিবার অন্য কোথাও অন্য কাজ করতে পারে না। ফলে নিজের জমিতে কাজ করতে উদ্যোগী হয়।
- ফসলের গন্ধে ভালোবাসার টানে।
- এ ফসল ছাড়া অন্য লাভজনক বিকল্প চাষের বিষয়টি তার সামনে কৃষি/সরকারি দপ্তর কেউ আনেনি।

সুপারিশসমূহ

- কৃষক এবং কৃষিকে জাতীয়করণ করতে হবে। সরকারের কৃষি দপ্তরের অধীন নির্ধারিত উৎপাদন খামারে উৎপাদন পরিচালিত হবে।
- যৌথ খামার পদ্ধতিতে চাষ: বীজতলা তৈরি, চারা উৎপাদন, রোপণ, কর্তন, মাড়াই, বাজারজাতকরণ, সার এবং ওষুধ প্রয়োগ এবং সেচব্যবস্থাপনার যান্ত্রিকীকারণ সহজ হবে।
- কৃষি দপ্তরকে দায়বদ্ধতার জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।
- মাটি পরীক্ষা করে, সাঠিক ফসল, পরিমিত সার-সেচ-কীটনাশক, ফসলের জাত নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এবং প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকের সাথে কৃষি দপ্তর/কর্মকর্তাকেও দায় নিতে হবে।
- প্রকৃত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সঠিক চাহিদা এবং জোগান কত তা নির্ধারণ করা। বাজার অর্থনীতির কারণে কখনও কোনো পণ্যের অধিক উৎপাদন কম দাম, কম উৎপাদন অধিক দাম, উৎপাদন ব্যয় না ওঠা, আবার কোনো সময় ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতাহীনতা—এ অবস্থার পরিসমপ্তি দরকার।
- কৃষি উৎপাদন জোন করা। প্রকৃতপক্ষে মাটি, পানি, পরিবেশ ভৌগোলিক কাঠামোভেদে যে এলাকায় যে ফসল উৎপাদন লাভজনক, সে এলাকায় সেই ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা দরকার এবং পরিকল্পিতভাবে চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার।
- কৃষকদেরকে ধানের পরিবর্তে চাল তৈরি এবং বিক্রির কৌশলের দিকে নিতে হবে। এতে কৃষকের লাভ এবং চাল উৎপাদন সিন্ডিকেট ভেঙে যেতে পারে। কৃষক ও তার পরিবারের সারাবছরে কাজের ব্যবস্থা হবে। মৌসুমী বেকারত্ব হ্রাস পাবে।
- কৃষিপণ্যে নয়, কৃষি উৎপাদনে সরাসরি কৃষকদের অনুকূলে সরকারি ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। কৃষিপণ্যের ভর্তুকি বর্তমানে বেশির ভাগই মধ্যস্বত্বভোগীর অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়হ্রাস কৌশলসম্পর্কিত কৃষি উৎপাদনকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- কৃষি উৎপাদন মৌসুমে কৃষকদের কম সুদে সিসি ঋণ প্রদান এবং মৌসুম শেষে সরকারি ক্রয়নীতির আলোকে শস্যের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা দরকার।
- সেচের ব্যয়হ্রাসের জন্য কৃষিতে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার না করে, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করতে হবে। এ লক্ষ্যে নদীনালা, জলাধার খনন, পুনঃখনন করতে হবে, জলাবদ্ধতা হ্রাস করতে হবে।

- ভেজাল, নকল, সার/বীজ/তেল, কীটনাশকের কারণে ফসলের ক্ষতির দায় কোম্পানি/সরকারকে বহন করতে হবে। এ লক্ষে শস্যবীমা চালু করা জরুরি।
- বর্গাদারি/লিজ উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের তার জমি চাষের জন্য বর্গাদার/লিজকারীকে উৎপাদনকালীন নগদ ব্যয়ের একটা অংশ প্রদানের নীতির আয়তায় আনা সমীচীন।
- সামগ্রিক উৎপাদনব্যবস্থার আলোকে কৃষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির সাথে কৃষকের কার্যকর সম্পর্ক জরুরি।

উপসংহার

গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের ভাষায়, "আর্থসামাজিক বিকাশপ্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের বঞ্চনা বৃদ্ধি উন্নয়ন নয়, বরং এ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তিই সত্যিকার উন্নয়ন"—আমি এ বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস এবং সমর্থন করি। হ্যাঁ, বাংলাদেশ এখন ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে জাতীয় নীতির ভিত্তিতে MDG/SDG অর্জিত হচ্ছে, হবে। অপরদিকে দেশের আয় এবং ধনবৈষম্য সমান তালে নয়, অধিক হারে বেড়ে চলেছে। যেখানে উপরের ১০ শতাংশ মানুষ মোট সম্পদের ৯০ শতাংশ দখল-পুনর্দখল করছে, অপরদিকে নিচের ৯০ শতাংশ মানুষ মোট সম্পদের ১০ শতাংশেরও মালিকানা পাচ্ছে না। এখানে ভূমি-জলা-জঙ্গলে সাধারণ জনমানবের শ্রমঘাম বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হয়, সৃষ্টি হয় সম্পদ; আর এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত-বহিঃস্থ থাকেন ঐ প্রান্তিক জনমানব। শোষণপ্রক্রিয়ায় অধিকাংশ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক বনে যায় অনুপস্থিত ভূস্বামী-রেন্টসিকারসহ শোষকেরা। দেশে যত উন্নয়ন, কৃষকের তত বঞ্চনা—এটাকে আমি বলি উন্নয়নের বঞ্চনা। কৃষির সাথে যুক্ত থেকে বহুমাত্রিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে কৃষক, কৃষি পরিবার, কৃষি পরিকাঠামো শত শত বছর ধরে। কৃষক খাদ্যের জোগানদার, সম্পদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু মাটির টানে-ফসলের ঘ্রাণে নিঃশ্বায়ন ও বঞ্চনায়নের দিকে যাচ্ছে কৃষি ও কৃষক। সম্পদের মালিক হচ্ছে শোষক শ্রেণি। এটা কৃষকের অনিচ্ছাকৃত ভালোবাসা। আমি বলি কৃষকের ব্যতিক্রমধর্মী ভালোবাসার অর্থনীতি। কৃষকের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চাই চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। আর এ জন্য প্রয়োজন সমস্ত শ্রেণিরপেশার মানুষের ভাবনা-পুনর্ভাবনা।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশে কৃষি ভূমি জলা-সংস্কার: দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে সবচেয়ে অমীমাংসিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়—আবুল বারকাত।

২. বাংলাদেশের কৃষি ভূমি জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি—অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (মুক্তিবুদ্ধি প্রকাশনা)

৩. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য: সমাধান কোন্ পথে—অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম।

৪. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা (ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা)—মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

৫. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৬. প্রথম আলো, ২৬ মে ২০১৯

৭. নতুন কথা, ১৮ আগষ্ট ২০১৯ (ড. আবুল হোসেন)

৮. কৃষিকথা, জুলাই-আগষ্ট-২০১৯

৯. দৈনিক জন্মভূমি, ২৯ মে ২০১৮

১০ কৃষকদের সরাসরি সাক্ষাৎকার।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৭৯-১৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রাজশাহীতে বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

Abstract *This paper examines the problems and prospects of investments in Rajshahi. In the paper, the author has shown that due to the absence of a sound and modern infrastructure, specially rail, river and air transport system, private sector entrepreneurs are not coming here to invest. In these circumstances, the author has opined that the government must come forward to invest here, particularly in the infrastructure sectors and subsectors and also in basic industries like steel and engineering industries. Throughout the paper, the author has tried to point out that there is a huge potential of industrialisation, specially agro-oriented and basic. In the end, he has come to the conclusion that no private sector investments would come here unless and untill infrastructural problems are solved.*

মূল শব্দ *স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধুর সরকার, পুঁজিবাদী বিশ্বের মহাসংকট, লোকসানের ক্ষেত্র, বিনিয়োগ, শিল্পের বিকাশ, পণ্যের ন্যায্যমূল্য, ইপিজেড, পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো, মূলধনের বাজার*

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ৩২ দফার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে যাকে "দিন বদলের সনদ" নামে অভিহিত করা হয়। আর এ সনদ বাস্তবায়নের জন্যে রূপকল্প ২০১০-২০২১ রচনা করা হয় যা দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে (৬ষ্ঠ ও ৭ম) বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নের কাজ অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলছে। ২০০৭

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী; সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি;ফোন: ০১৯১৪২৫৪৫২৪, ই-মেইল: moazzem_hossainkhan@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রুয়েট মানবিক বিভাগ আয়োজিত 'রাজশাহীর উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯।

সালের শেষ দিকে শুরু হওয়া পুঁজিবাদী বিশ্বের মহাসংকট যা অদ্যাবধি চলছে এবং যার পরিণতিতে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও গ্রিস। এর শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন শিল্পে। হু হু করে তা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মার্কিন অর্থনীতিতে, পরবর্তী সময়ে উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে। ধাক্কা লেগেছিল জাপানসহ দূরপ্রাচ্যের আরও অনেক দেশের অর্থনীতিতে। এসব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শূন্যের কোঠায় এমনকি ঋণাত্মক হয়ে গিয়েছিল। এখনও এদের মধ্যে অনেক দেশেই প্রবৃদ্ধি সংকট পূর্ববর্তী অবস্থানে যেতে পারেনি। অথচ এ রকম একটা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধি ৬-এর কোটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬.৩% এ পৌঁছেছিল যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য কম (৭.৩%)। আর ৭ম পরিকল্পনায় এ যাবত প্রবৃদ্ধি পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে গেছে এবং

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তা ৮.১৩% এ পৌঁছে গেছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি (০৮.%)। ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি ১৯৯০-২০১৫) ৭টিই (মোট লক্ষ্য ৮টি) আমরা পুরোপুরি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। আর ৮মটি আংশিক। যাঁর নেতৃত্বে আমাদের দেশের এই অর্জন সেই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর জন্যে একাধিকবার আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, এমডিজি-উত্তর জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যও (এসডিজি ২০১৬-২০৩০) আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব, যদি উন্নত বিশ্বের দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত ধারাগুলো বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কিছুটা উদার হন।

এত ভালো খবরের পাশাপাশি খারাপ খবরও আছে বৈ কি। আসলে পুঁজিবাদী উন্নয়নের নিয়মটাই এই— আলোর পেছনে আঁধার। বলছিলাম অসম ও বৈষম্যপূর্ণ উন্নয়নের কথা। পুঁজিপতি শুধু সেখানেই বিনিয়োগ করবে, যেখানে তার লাভ আছে বা লাভের পরিমাণ বেশি। লোকসানের ক্ষেত্র বা স্থানগুলোতে পুঁজিপতি বিনিয়োগ করবে না। আর সে জন্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে কোনো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগই হয়নি বিগত বছরগুলোতে। বিগত শতাব্দীর সেই নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমল ১৯৯৬-২০০১) মংলা, ঈশ্বরদী ও উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) গড়ে তোলা হলেও এতদিনেও সেখানে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আসেনি। রাজশাহী আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি পশ্চাদ্‌পদ ও অনেকটাই উন্নয়ন-বঞ্চিত এলাকা। বিগত বছরগুলোতে এখানে উল্লেখ করার মতো কোনো বিনিয়োগ বিশেষ করে শিল্পায়নই হয়নি—হোক তা সরকারি বা বেসরকারি। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই আমরা এ অঞ্চলে বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

রাজশাহী অঞ্চলে বিনিয়োগ সম্ভাবনা: বিনিয়োগে সরকারি বনাম বেসরকারি খাত

রাজশাহীতে এযাবৎ কালে বিনিয়োগ যা হয়েছে তা মূলত সরকারি খাতেই হয়েছে বা সরকার করেছে। অবকাঠামো, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, পর্যটনসহ বিভিন্ন খাত, উপখাতের দিকে তাকালে দেখা যাবে—প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ যা হয়েছে সরকারি উদ্যোগেই হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধুর সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, পশ্চাদ্‌পদ এলাকাসমূহের উন্নয়ন সরকারি উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়। আর তাই তো বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী বাকশাল কর্মসূচির আওতায় দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের

মানেই হচ্ছে অর্থনৈতিক বিপ্লব। প্রথম বিপ্লব ছিল রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন, যা আমরা তাঁর নেতৃত্বে অর্জন করেছিলাম ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে ৯ মাসের এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতি ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানী এবং কোটি কোটি মানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগের ফসল ছিল এই স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অর্থনৈতিক বিপ্লব ছাড়া এ স্বাধীনতা কখনোই টেকসই হতে পারবে না। সে জন্যেই তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, যা দেশি ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য (দ্বিতীয় বিপ্লব) থেকে নিবৃত করতে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রকারী স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সংঘটিত হয় মানব ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড—পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনা—যাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে প্রাণ দিতে হয়। ব্যতিক্রম ছিলেন তাঁর অতি আদরের দুই কন্যা। তাঁরা ঐ সময়ে জার্মানিতে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। দায়িত্ব পড়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নের।

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জেল-জুলুমের বিনিময়ে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে জাতির পিতার সুযোগ্য সন্তান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের কাজে হাত দেন। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে তিনি প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সুসম্পন্ন করেন। সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করার এক সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কৃষিতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে প্রাণ ফিরিয়ে দেন। কৃষিতে ভর্তুকির ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেন। সার-বীজের ন্যায্যমূল্য ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার (দেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা ডুবে গিয়েছিল) পরও ২০০০ সালে বাংলাদেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়, খাদ্য আমদানি বিশেষ করে সরকারি উদ্যোগে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০ লক্ষ টন খাদ্য মুজদ ছিল সে সময়ে। শিল্পে সমস্ত বন্ধ কলকারখানা পুনরায় চালু করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রাজশাহীসহ গোটা দেশের বন্ধকৃত টেক্সটাইল, সিল্ক ও পাটকলসমূহ পুনরায় চালু করা হয়। শেখ হাসিনার সরকার ঐ সময়ে একটি অত্যন্ত দূরদর্শী ও দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান জয়দেবপুর মেশিন-টুলস কারখানাকে (খালেদা জিয়ার সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল লোকসানের অজুহাতে) দেশপ্রেমী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয় খুলনা শিপইয়ার্ডকে তিনি দেশপ্রেমী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত লোকসানী ও ঋণগ্রস্ত ছিল এসব প্রতিষ্ঠান। দুটি প্রতিষ্ঠানই দেশের অর্থনীতির জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আমাদের অর্থনীতিতে। একদিকে এরা সামরিক যান ও সরঞ্জাম উৎপাদন করছে; অন্যদিকে বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি এমনকি বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও দেশের জন্যে সরঞ্জাম ও যান উৎপাদন করছে ও সরবরাহ দিচ্ছে। এগুলো ক্রমান্বয়ে আধুনিকায়ন করে বর্তমানে আরও নতুন নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করছে, অনেক লাভ করছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করছে, আমদানি হ্রাসে ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

২০০১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার আমলের অর্জনসমূহ ভেস্তে দেন। মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালে দেশ আবার ১৯৯৬-এর পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। খাদ্যঘাটতিসহ নানা সমস্যায় পড়ে দেশ। প্রায় ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয় বাংলাদেশ। খাদ্য ঘাটতি, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শিল্পে উৎপাদন ঘাটতি, পরিবহনে মহানৈরাজ্য, শিক্ষায় লেজেগোবরে অবস্থা, দুর্নীতি প্রভৃতি সব মিলিয়ে দেশে এক মহানৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। সামরিক বাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার (১/১১) এসে নির্বাচনের আয়োজন করে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের সেই নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিপুল

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসেন। ৩২ দফার নির্বাচনী ইস্তাহারকে "দিন বদলের সনদ" নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর অন্যতম একটি ধারা ছিল "ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা"। আসলে " ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানটি আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে যুবসমাজের মস্তিষ্কে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, বিপ্লব ঘটায়। শুধু তা-ই নয়, এ সময়ে (২০০৯-১৩) বাংলাদেশ ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে ফিরে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়, নতুন কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, শিক্ষানীতি, জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমুদ্রসীমা জয়, অসংখ্য মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরুসহ ইত্যাদি অত্যন্ত সফল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালের নির্বাচনেও তারা জয়লাভ করে পুরোদমে পূর্ব মেয়াদে সূচিত মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়। অনেকগুলো ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাকিগুলো শেষ হওয়ার পথে। সবকিছু ছাপিয়ে এ সময়ের সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে 'নিজস্ব টাকায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ'। এর মাধ্যমে আমাদের দেশ বিশ্বের কাছে তার সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সফল নেতৃত্বের প্রমাণ দিতে পেরেছে, মাথা উঁচু করে চলতে শিখেছে। ২০০৯-২০১৮ সময়ের বৃহৎ সাফল্যের মধ্যে আরও যে প্রকল্পগুলোর নাম উল্লেখ না করলেই নয়, সেগুলো হচ্ছে—যথাক্রমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ, পায়রা সমুদ্রবন্দর ও মেট্রোরেল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী নাগাদ (২০২১) এগুলো বাস্তবে রূপলাভ করবে নিঃসন্দেহে। আর তখন আমাদের দেশের চেহারাই পাল্টে যাবে। আর সে জন্যে মহাজোটকে আবার ক্ষমতায় আসতে হবে বৈকি!

যেমনটা বলছিলাম পশ্চাদ্‌পদ এলাকায় বেসরকারি খাত বিনিয়োগে কখনই এগিয়ে আসেনি। একমাত্র সরকারি খাতই এদের ভরসা। অথচ পঁচাত্তরপরবর্তী সরকারগুলো বিশেষ করে সামরিক আমলে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কুপরামর্শে সরকারি খাতকে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি খাতের লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পানির দামে সরকারি ব্যাংকের ঋণে বেসরকারি খাতের তথাকথিত উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কোনো লোকসানী প্রতিষ্ঠান তারা ক্রয় করেনি। আর লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে তারা ঠিকভাবে চালাতে না পেরে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সরকারি প্রাতিষ্ঠানের জমি, যন্ত্রপাতি বিক্রি করে এবং কম সুদে সরকারি ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দিয়ে তথাকথিত খেলাপিতে পরিণত হয়ে নিজেরাই লাভবান হয়েছে। ভাবা যায় প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ অবলোপন করা হয়েছে! এ টাকাগুলো সত্যি সত্যি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হলে আমাদের দেশ কত দূর যেতে পারতো! পশ্চাদ্‌পদ এলাকাগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সেই আশির দশক থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে ১০ বছরের কর রেয়াত দেওয়া হচ্ছে। অথচ বেসরকারি খাত তেমন সাড়া দেয়নি, এগিয়ে আসেনি বিনিয়োগ করতে। উত্তরা, ঈশ্বরদী ও মংলা ইপিজেডে এখনো অনেক প্লট খালি পড়ে আছে। ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদে শেখ হাসিনার সরকার এগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার সেই সরকারি বিনিয়োগে। কই কোনোও বেসরকারি খাত তো আজ পর্যন্ত একটি ইপিজেড গড়ে তুলল না। তারা যাচ্ছে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়, যেখানে লাভ অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের বেসরকারি খাত ঝুঁকিপূর্ণ ও কম লাভজনক স্থান ও ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগে আগ্রহী নয়। রাজশাহীর সপুরায় বিগত শতাব্দীর আশির দশকে কিছু শিল্পকারখানা গড়ে উঠলেও সেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। দু-একটা যাও আছে, তা-ও ধুঁকে ধুঁকে চলছে। ঐতিহ্যবাহী সিল্ক কারখানা প্রায় নেই বললেই চলে। যে কয়েকয়টা আছে তা মূলত চীনা ও ভারতীয় কৃত্রিম সিল্ক সুতানির্ভর। অথচ একসময় রাজশাহী সিল্কের সুনাম ও কদর দুটোই ছিল।

পঁচাত্তরপরবর্তী সরকারগুলো সুপরিকল্পিতভাবে বেসরকারি খাতের বিকাশের স্বার্থে সরকারি খাতকে দুর্বল করেছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম শেখ হাসিনার সরকার। তিন মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১,২০০৯-২০১৩ ও ২০১৪-১৮) ব্যক্তিগতভাবে তিনি কিছুটা হলেও সরকারি খাতকে শক্তিশালী করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ও সরকারি খাতের বন্ধকৃত অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। একমাত্র তাঁর আমলে রেলওয়ের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, নতুন নতুন লাইন নির্মিত হচ্ছে এবং সরকারি খাতে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করা হয়েছে। রাজশাহী টেক্সটাইল মিল ও সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল চালুকরণ এ ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

সরকারি খাতের ওপর ভর করে বিকশিত হওয়া আমাদের দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। আর সেটা হচ্ছে এই যে, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা মাঝেমাঝেই সরকার ও জনগণকে জিম্মি করে লাভবান হতে চায়। সাম্প্রতিককালের ফার্মার্স ব্যাংকের দেউলেপনা ও ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে বাধ্যতামূলক ডিপোজিটের হার হ্রাসকরণ এবং সরকারি টাকার ৫০ শতাংশ বেসরকারি ব্যাংকে রাখার বিধান করতে সরকারকে দস্তুরমতো বাধ্য করার ব্যাপারটি গোটা দেশের মানুষকে হতবাক করেছে বটে! এটা বেসরকারি খাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মনে হচ্ছে, তারাই আসলে সরকারি খাত বা এরই অংশ। তারা সুবিধা আদায় করে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের অঙ্গীকার ভুলে গেছে (সুদ হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার বিষয়টি)। বাস কোম্পানির অধিকাংশের মালিক বিএনপিসহ অন্য বিরোধী দলগুলো। নিকট অতীতে ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোটের ডাকা অবরোধের কথা নিশ্চয়ই আমাদের সবার স্মরণ রয়েছে। যদি সরকারি খাতের রেল পরিবহনব্যবস্থা ও স্টিমার সার্ভিস না থাকতো, তাহলে ঢাকাকে তারা সত্যিই সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতো এবং তৎকালীন সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দিতে সক্ষম হতো; হয়তো সরকারের পতনও ত্বরান্বিত হতো। ভাগ্যিস শেখ হাসিনার সরকার রেলওয়ে ও স্টিমার সার্ভিসকে কিছুটা হলেও শক্তিশালী করেছিল। অতএব, সাধু সাবধান—বেসরকারি খাতের আচার-আচারণ বেসরকারি খাতের বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ রাখার স্বার্থে অবশ্যই সরকারি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, রাখতে হবে এবং তাকে নিয়ামক ভূমিকা নিতে হবে। বেসরকারি খাতের ঔদ্ধত্যপূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও সামন্তবাদী আচরণ কিছুতেই মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। বেসরকারি খাতের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই এটা জরুরি।

রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা

উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে শিল্প। শিল্পের দ্রুত বিকাশ ছাড়া আজকে উন্নত দেশগুলো তাদের বর্তমানের অবস্থানে আসতে পারতো না। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ অন্য উন্নত দেশসমূহ তাদের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল একমাত্র শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন করার মাধ্যমে। আসলে শিল্পের বিকাশ বিশেষ করে মৌলিক ভারী শিল্পের বিকাশ অর্থনীতির অন্য সকল খাতের বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশ এখনো এক্ষেত্রে দুর্বল বলে আমাদেরকে মৌলিক ভারী শিল্পজাত অধিকাংশ পণ্যই আমদানি করতে হয়। ফলে আমদানি বিল রপ্তানি বিলের চেয়ে সবসময়ই বেশি থাকে। ঘাটতি হয় ব্যালেন্স অব পেমেন্টে। অতএব, শিল্পে বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। প্রশ্ন জাগে রাজশাহী অঞ্চলে তাহলে কোন ধরনের শিল্পায়ন করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি—এখানে সবরনের শিল্পের বিকাশই সম্ভব। তবে সে জন্যে অবশ্যই কিছু প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে। প্রবন্ধের আলোচ্য অংশে আমরা শুধু সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা

করব। হ্যাঁ, ভারী মৌলিক শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা এখানে বিদ্যমান। পদ্মার তীরঘেষে, রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের পাশঘেষে এ ধরনের শিল্প গড়ে ওঠার বা তোলার যথেষ্ট সুযোগ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অন্যান্য খাতের বিকাশ এবং হালকা শিল্পের বিকাশ জরুরি। অথচ এ ধরনের শিল্প এখানে আদৌ গড়ে ওঠেনি। এদিকটায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উদ্যোক্তাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। হালকা শিল্পের বিকাশ বিশেষ করে আইসিটি পণ্য উৎপাদনের শিল্প যেমন মোবাইলফোন, টেলিফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ এখানে রয়েছে। সুযোগ রয়েছে কৃষিপণ্য বিশেষ করে ফলমূল ও সাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্পের বিকাশের। অদ্যাবধি রাজশাহী অঞ্চলে এ জাতীয় কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। আর সে কারণে কৃষিজাত এসব পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না কৃষক, আর আমরা বঞ্চিত হচ্ছি জীবাণুমুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য থেকে। এখানে মাছ, দুগ্ধ ও মাংস, এমনকি পশুর হার প্রক্রিয়াকরণের শিল্প গড়ে তোলার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহী মহানগরের মিলিয়ন জনসংখ্যাকে জীবাণুমুক্ত মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাংস ও মাংসজাত পণ্যের সরবরাহ করতে হলে এর কোনো বিকল্পই নেই। ইদানীং এ অঞ্চলে বেশকিছু ডেইরি ফার্ম, ছাগলের খামার ও হাঁস-মুরগির খামার গড়ে উঠেছে। এসব খামারি ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না তাদের উৎপাদিত পণ্যের এ মর্মে অভিযোগ রয়েছে। কম যান না মৎস্যখামারীরাও; তাদেরও একই অভিযোগ। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বিনিয়োগই হতে পারে এর সমাধান। আর এটা সম্ভব হলে এই অঞ্চল বা এলাকার চাহিদা পূরণ করে বিদেশে কৌটাজাত এসব পণ্য রপ্তানি করা সহজতর হবে। এই অঞ্চলের যত্রতত্র অত্যন্ত মূল্যবান উর্বর জমি ব্যবহার করে গড়ে উঠছে অসংখ্য ইটের ভাটা। সম্ভবত সরকার এটিকে শিল্প ঘোষণা করেছে। ইট উৎপাদন শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। তবে একে পরিবেশবান্ধব করতে হবে এবং উর্বর জমি নষ্ট না করে পদ্মার পাড়ঘেষে নদীখননের মাধ্যমে প্রাপ্ত মাটি দিয়ে করার কথা এখনই ভাবতে হবে। এতে করে এক ঢিলে তিন পাখি শিকার করা সম্ভব— ১. উর্বর জমি রক্ষা পাবে, ২. পদ্মার খননকাজ অব্যাহত থাকবে, ৩. সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে (পদ্মার নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ বিভিন্ন ভাটার মালিকদের কাছে নিদিষ্ট হারে লিজ দেওয়ার মাধ্যমে)।

পর্যটন ও বিনোদনে বিনিয়োগ সম্ভাবনা

রাজশাহী অঞ্চল অত্যন্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ এলাকা। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, শাহ্ মখদুমের মাজার, পুঠিয়া রাজবাড়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া পদ্মা নদীর পাড়কে কেন্দ্র করে পর্যটন ও বিনোদন শিল্প বিকাশের এক বিশাল সম্ভাবনাও রয়েছে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সুযোগ বিদ্যমান।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও আইটি পার্ক নির্মাণ

বিনিয়োগের আর একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও আইটি পার্ক। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাজশাহী এলাকায় বিভাগীয় কেন্দ্র অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সরকারের প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০০) উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) প্রতিষ্ঠা করা হলেও রাজশাহী অঞ্চলে কোনো ইপিজেড হয়নি। এখানে পদ্মার তীর ও রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের পাড়ঘেষে উপযুক্ত স্থানে একাধিক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা অবশ্যই সম্ভব। আর এসব

অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ হালকা ও ভারী শিল্প স্থাপনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু আইটি পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ধারনা করছি, এখানে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে, এ অঞ্চলে বিনিয়োগের এক বিশাল সম্বাবনা রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন এ সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়িত হলো না এতদিনেও? এলাকাবাসী ও সরকারের উদাসীনতা একটি কারণ হতে পারে। আর বাকি কারণগুলো মূলত অবকাঠামোগত ও সাংগঠনিক দুর্বলতাসংশ্লিষ্ট। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা এসব দুর্বলতা ও অন্যান্য ঘাটতিসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

অবকাঠামোগত দুর্বলতা

অবকাঠামো হচ্ছে এমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধার সমষ্টি, যার অবর্তমানে হয় উৎপাদন কর্মকাণ্ড একেবারেই সম্ভব নয় অথবা সম্ভব হলেও তা আংশিকভাবে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বড় ধরনের সাফল্য। বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ২১ হাজার মেগাওয়াট, আর উৎপাদন হচ্ছে ১১ থেকে ১২ হাজার মেগাওয়াট। এটা নিঃসন্দেহে বিশাল সাফল্য। কারণ, ২০০৯ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে উৎপাদন ছিল মাত্র ৩ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। জ্বালানি, বিশেষ করে গ্যাসের অভাবে পুরো সক্ষমতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে, গ্যাস আমদানি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিগগিরই সম্পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সঞ্চালন লাইনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে ইতিমধ্যেই বেশকিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে কারিগরি ক্রটির সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে। তবে টেকসই সমাধান হচ্ছে মাটির নিচ দিয়ে লাইন টানা। উন্নত দেশগুলোতে তা-ই করা হচ্ছে। এতে খরচ বর্তমানে একটু বেশি হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা অবশ্যই সাশ্রয়ী। কারণ, মাটির নিচের লাইন সাধারণত নষ্ট হয় না, ছিঁড়ে যায় না। অন্য কথায় রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রায় নেই বললেই চলে।

রাজশাহী শিক্ষার নগরী। রাজশাহীতে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। আছে পলিটেকনিক কলেজ। তবে দক্ষ জনবল তৈরিতে আরও পলিটেকনিক ও কারিগরি বিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। কারণ, দ্রুত শিল্পায়ন ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে হলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনবল আবশ্যক, যা বর্তমানে স্বল্পসংখ্যক এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তা ছাড়া এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বিশেষ করে আইসিটিবিষয়ক বিভাগ ও বিষয় চালু করা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায় এ অঞ্চল তথা দেশ পিছিয়ে পড়বে।

সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের বিষয় হচ্ছে—পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি। কারণ, এটি প্রথমত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; দ্বিতীয়ত, অনেক খরচের ব্যাপার; তৃতীয়ত, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন অত্যন্ত দক্ষ জনবলের দরকার। রাজশাহীতে মূলত অত্যন্ত দুর্বল পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর জন্যে বেসরকারি বিনিয়োগ আসেনি, এখনো আসছে না। ভবিষ্যতেও বিনিয়োগ আসবে না, যদি-না আধুনিক শক্তিশালী পরিবহন অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। পরিবহন অবকাঠামো চার ধরনের : ক) স্থল ; খ) নৌ ; গ) বিমান ও ঘ) পাইপলাইনে পরিবহন। স্থল পরিবহন আবার দুই ধরনের : ১। রেল ও ২। সড়ক পরিবহন। স্থলপরিবহনের মধ্যে রেলপরিবহন হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ,

আরামদায়ক, দ্রুত ও সাশ্রয়ী। আর সে জন্যেই উন্নত দেশগুলোতে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে রেলপরিবহন ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধুর সরকার রেলপথের বিকাশের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে (১৯৭২-১৯৭৫) রেল মন্ত্রণালয় ছিল, রেলের জন্যে আলাদা বাজেট হতো যেমনটা ভারতে এখনো হচ্ছে। সামরিক শাসক জিয়া এসে রেল মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করে একে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করেন। রেলের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর আমলে রেলে যেখানে স্থলপরিবহনে বরাদ্দের প্রায় ৮০ শতাংশ দেওয়া হতো, সামরিক আমলে এসে তা উল্টে গেল অর্থাৎ সড়কে বরাদ্দ দেওয়া হলো প্রায় ৮০ শতাংশ আর বাকি ২০ শতাংশের মতো রেলে। আশির দশকে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার সড়কপথ নির্মাণ করা হয় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে। রেলকে করা হলো হতশ্রী। অনেক লাইন লোকসানী অজুহাতে বন্ধও করে দেওয়া হলো। ৩ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে ১ হাজার কিলোমিটার রাস্তাও মানসম্পন্ন পাওয়া যাবে না। বেপরোয়া দুর্নীতি হয়েছে সড়ক নির্মাণে। বলা হয়ে থাকে যে, ৮০ শতাংশ টাকাই আত্মসাৎ হয়েছে। সড়কের মান দেখলে এটা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়। যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা। প্রতিদিন ডজন ডজন দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষের জানমালের ক্ষতি হচ্ছে। বর্তমানে সড়ক পরিবহনে বিরাজ করছে মহানৈরাজ্যজনক এক অবস্থা, যা কারও কাম্য হতে পারে না। অথচ যদি মাত্র ১০ হাজার কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ করা হতো (বর্তমানে রেলের লাইনের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার কিলোমিটারের মতো), তাহলে আমাদের দেশের অর্থনীতি আরও দক্ষ ও গতিশীল হতো, এত জানমালের ক্ষতি হতো না, এত উর্বর জমি সড়কের তলায় যেতো না, নষ্ট হতো না (আমাদের হিসেবে প্রায় মিলিয়ন হেক্টর জমি সড়ক নির্মাণে চিরতরে হারিয়ে গেছে)। আশার কথা জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা সম্ভবত এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কারণ, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই রেল মন্ত্রণালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, রেলের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। পায়রাবন্দর পর্যন্ত রেল যাবে। শুনতে খুব ভালো লাগছে। প্রশ্ন হলো—কবে হবে, আদৌ হবে তো? রাজশাহীতে বেসরকারি বিনিয়োগ আনতে হলে অবশ্যই এবং অনতিবিলম্বে ঢাকা-রাজশাহী-সোনামসজিদ স্থলবন্দর এবং রাজশাহী-খুলনা রেলপথের আধুনিকায়ন করতে হবে, ডাবল ও ট্রিপল লাইনে উন্নীত করতে হবে, স্টেশনগুলোকে সুপ্রসস্ত করতে হবে, ক্রসিংগুলোতে ওভারপাস নির্মাণ করতে হবে। রেলের সম্পদ রক্ষাসহ যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে লাইনের দুই ধারে ও স্টেশনের দুদিকে উচ্চনিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করতে হবে। সর্বোপরি তেল চুরি বন্ধে রেলকে বিদ্যুতায়িত করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ বিশেষ করে ভারতীয় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হলে অবশ্যই ভারতের সাথে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপন করতে হবে। প্রথমত, এটা সোনা মসজিদ বন্দর হয়ে করতে হবে। পরে দর্শনাসহ অন্যান্য স্থলবন্দর দিয়েও করা যেতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন পথ হচ্ছে নৌপথ। ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী এলাকায় শক্তিধর পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে নৌবন্দর গড়ে উঠেছিল। কোলকাতা, খুলনা, ঢাকাসহ অন্যান্য নদীবন্দরের সাথে রাজশাহী স্টিমারপথে সংযুক্ত ছিল। নিয়মিত স্টিমার যাতায়াত করত এই পথে। পরিবাহিত হতো যাত্রী ও মালামাল। ব্রিটিশরা কোলকাতা ও মানচেস্টারের পাটকল ও বস্ত্র মিলগুলোর কাঁচামাল বিশেষ করে পাট ও নীল নিয়ে যেতো এখান থেকেই। আর বস্ত্র মিলের উৎপাদিত কাপড় এখানে এনে বাজারজাত করত। সেই রামও নেই, আর অযোধ্যাও নেই। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ হয়ে গেছে। রাজশাহীর গুরুত্বও শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা কিছুই করেনি রাজশাহীকে বাঁচানোর জন্যে। স্বাধীনতার ৪৮ বছরে অবস্থার পরিবর্তন তো হয়-ই নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে বলা যায়। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে এ নৌপথকে পুনরায় চালু করার কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজনে চর কেটে মাটি তুলতে হবে, নদী

খনন করে জাহাজ-লঞ্চ-ট্যাংকার চলাচলের উপযোগী করতে হবে, পন্টুন-জেটি ইত্যাদি নির্মাণসহ একটি আধুনিক নৌবন্দরে রূপান্তরিত করতে হবে রাজশাহীকে। শেখ হাসিনা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন—ছিটমহল বিনিময়, সমুদ্রসীমা জয় ও নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণসহ প্রভৃতি। আমরা আশা করি, তিনি তাঁর চতুর্থ মেয়াদে (২০১৯-২০২৩) আরেকটি অসম্ভবকে সম্ভব করবেন অবশ্যই—রাজশাহীকে পূর্ণাঙ্গ নৌবন্দরে রূপান্তরিত করবেন। পদ্মার তীর রক্ষা, সংরক্ষণ, মাটিকাটা, নদ-নদী খননের মতো কাজগুলো ভারতের ঋণে করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রয়োজন 'পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার' আদলে একটি প্রকল্প ছক প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। হতে পারে তা ১০ থেকে ২০ বছরমেয়াদি। এ কাজে প্রয়োজনে চীনা সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে। পদ্মায় যেহেতু ভারতের অংশীদারত্ব রয়েছে, সেহেতু ভারতের সহযোগিতা অবশ্যই নিতে হবে। পদ্মার তীরে বিশেষ করে রাজশাহী মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসরত মানুষ ও তাদের পরিবারগুলোকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত ফ্ল্যাট-বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে পুনর্বাসিত করতে হবে। অতঃপর পদ্মার তীরকে বিনোদনের উপযোগী সুদৃশ্য অঞ্চলে রূপ দিতে হবে—পার্ক নির্মাণ, পিকনিক স্পট ইত্যাদি করা যেতে পারে। আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, পদ্মার সুবিস্তৃত চরে অত্যাধুনিক বিমানবন্দর স্থাপন করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ, বর্তমানে যে বিমানবন্দরটি রয়েছে, তা বেশ ছোট এবং এটাকে বাড়াতে হলে জমি হুকুমদখল করার মতো জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর তার সাথে অনেক উর্বর জমি নষ্ট ও বসতি উচ্ছেদের বিষয়ও জড়িত রয়েছে। কাজেই চরের খাসজমি এই কাজে ব্যবহার করাই সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। জলের দাম দিতে হয় না। আর তাই নৌপথে পরিবহনই পৃথিবীতে সবচেয়ে সস্তা পরিবহন। পরিবহনও করা যায় অনেক অনেক বেশি। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ পণ্য জলপথেই পরিবাহিত হচ্ছে। ৫০ হাজার টনের একটি ট্যাংকার রাজশাহী অঞ্চলের সারা বছরের ডিজেল চাহিদার সমপরিমাণ তেল একবারে নিয়ে আসতে পারে সবচেয়ে কম খরচে। স্বল্প খরচে রাজশাহীর মানুষ তখন ঢাকাসহ অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করতে পারবেন– রেলের অন্তত অর্ধেক এবং বাসের এক-চতুর্থাংশ খরচে। ঢাকাসহ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকার জিনিসপত্রের দামের সাথে এ এলাকার দামেও কোনো পার্থক্য থাকবে না। রাজশাহীর অর্থনীতি হবে অনেক দক্ষ ও উন্নত। আধুনিক পরিবহনব্যবস্থায় বিমানপরিবহন একটি আবশ্যকীয় সংযোজন। কারণ, 'টাইম ইজ মানি'। সময় যত বাঁচানো যায়, ততই লাভ, ততই উৎপাদন। কাজেই রাজশাহীতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে অন্তত একটি সুপরিসর আধুনিক বিমানবন্দর অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে। সর্বশেষ পরিবহন উপায়টি হচ্ছে জলপথে পরিবহন। সাধারণত জল, তেল, গ্যাস ইত্যাদি তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ পরিবহনে এ পথটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাজশাহীতে একমাত্র শেখ হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) প্রথমবারের মতো গ্যাস আসে। তবে গ্যাসের সরবরাহে সার্বিক ঘাটতির কারণে বাণিজ্যিক সংযোগ তো একেবারেই দেওয়া সম্ভব হয়নি, এমনকি সব বাসাবাড়িতেও দেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্যাস আমদানি শুরু হয়েছে। ক্রমান্বয়ে আরও আমদানি হবে। দেশীয় উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে অল্প করে হলেও। চাহিদা-সরবরাহের ঘাটতিও হ্রাস পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো গ্যাসের বড় মজুদ আবিষ্কৃত হবে সাগরে। হয়তো তখন রপ্তানির কথাও ভাবতে হবে। তবে আপাতত আমদানি করে হলেও রাজশাহীতে বাণিজ্যিক বিশেষ করে শিল্পে ও বাসা-বাড়িতে গ্যাস দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে, গ্যাসের অভাবে এখানে গ্যাসনির্ভর শিল্পের বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অঞ্চলে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে এদিকে নজর দেওয়া অতি জরুরি বলে আমি মনে করি।

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

আসলে বিনিয়োগের বাধাসমূহ দূর করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবেই এবং এর সাথে সাথে অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, হতে বাধ্য। তবে যদি উৎপাদন ও বিপনন সমবায় গড়ে তোলা যায় তবে বিষয়টি আরও স্বচ্ছ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, এতে করে উভয় সমবায়ই আগে থেকে অর্থাৎ বছরের শুরুতেই চুক্তিবদ্ধ থাকবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে। উদাহরণ হচ্ছে মিল্কভিটা ও আড়ং।

বিনিয়োগে অর্থায়ন

যেকোনো বিনিয়োগের জন্যে অর্থায়ন দরকার। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎসহ সবধরনের শিল্পের জন্যেই অর্থের প্রয়োজন। রাজশাহীতে স্বাভাবিক কারণেই মূলধনের বাজার গড়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতে হয়তো বা হবে। বর্তমানে একমাত্র ভরসা ব্যাংকব্যবস্থাই। তবে ব্যাংকব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল—রয়েছে আমলাতান্ত্রিক নানা জটিলতা, সিন্ডিকেট চক্র, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত ও সাধারণ উদ্যোক্তারা ব্যাংকের কাছে অর্থায়নের জন্যে যেতে ভয় পান। তদুপরি রয়েছে তথাকথিত ডাউনপেমেন্ট ও ঘুষের সমস্যা। এগুলো থেকে মুক্ত করতে ব্যাংকিং আইনকানুনেরও আধুনিকায়ন করতে হবে, সংস্কার করতে হবে। সুদের হার শিল্পভেদে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করতে হবে । ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যে সবচেয়ে কম হবে, মাঝাররি জন্যে তার চেয়ে একটু বেশি এবং বৃহৎ শিল্পের জন্যে সবচেয়ে বেশি। আর একটি জিনিস অবশ্যই করতে হবে, আর সেটি হচ্ছে—কৃষিতে উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্যে কৃষিনির্ভর বা কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্যে স্বল্পতম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, পারলে শুধু সার্ভিস চার্জ নিতে হবে। শিল্পায়ন তার প্রাথমিক পর্যায় (রাজশাহী এখন প্রাথমিক পর্যায়েই অবস্থান করছে) অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌছালে, তখন সুদের বিষয়টি ভাবতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে স্বচ্ছতা খুবই প্রয়োজন—বিভিন্ন ধরনের ঋণ সম্পর্কে শাখাসমূহের সামনে এবং সড়ক ও লোকালয়ের মোড়ে মোড়ে বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। রেডিও, টিভি ও খবরের কাগজে তো থাকবেই। এসব প্রতিষ্ঠানে বিসিকের আদলে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ চালু করার বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে। কারণ, নতুন বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হলে এর কোনো বিকল্পই নেই।

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি

নারী সমাজ আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। নারী আমাদের সরকার প্রধান, বিরোধীদলীয় নেতা, বিরোধী দলের নেতা। তারপরও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ নানা কারণ এর পেছেনে কাজ করছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অন্তত দুটি শাখার এক জরিপে দেখা গেছে, নারী ঋণগ্রহীতা মোট ঋণগ্রহীতার মাত্র ২ শতাংশ। অথচ অসংখ্য শিক্ষিত ছাত্রী এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ছাত্রী বেকার বসে আছেন অথবা শুধু গৃহবধূ হয়েই সংসারের ঘানি টানছেন। ভাবা যায় এই একবিংশ শতাব্দীতে এত বিপুলসংখ্যক ছায়া উদ্যেক্তার কত উদ্ভাবনী শক্তি ও ক্ষমতা তিলে তিলে নীরবে-নিভৃতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে! কত অবদান রাখতে পারতেন তারা তার এলাকার শিল্পায়নে? বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভাবা উচিত আমাদের সবার।

বাংলাদেশ এগোচ্ছে, নারীরাও এগোচ্ছেন। নারী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে। ভবিষ্যতে হয়তো রাজশাহীতেও হবে। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি একত্রিত হলে এবং তাদের যথাযথ সহযোগিতা দিলে রাজশাহীতে বিনিয়োগের আর একটি নতুন দরজা উন্মুক্ত হবে—এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যা

বর্তমানে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সাংঘাতিকভাবে রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীভূত। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হওয়ায় ঋণ প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় কয়েক মাস এমনকি বছর লেগে যাচ্ছে। এতে করে ঋণের কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। আমি মনে করি, এ ধরনের সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করা। একই অফিস থেকে প্লটের বরাদ্দপত্র, বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ, ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, টেলিফোনের সংযোগ, ভিসা ও পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্নীতি হ্রাস পাবে। বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হবেন। অর্থনীতি দক্ষ হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ'—এ রকম একটি কথা অনেক দিন ধরেই চালু আছে উদ্যোক্তা সমাজে। এ উদ্দেশ্যে সরকার এসএমই ফাউন্ডেশন করেছে, যার প্রধান কাজ হচ্ছে উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, সহযোগিতা করা। কিন্তু অদ্যাবধি এটা অনেকটাই ঢাকাকেন্দ্রিক রয়ে আছে। এর কর্মকাণ্ড বিভাগীয় শহরসহ অন্যান্য এলাকায়ও বিস্তৃত করতে হবে। এটা সময়ের দাবি । আমি মনে করি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্যে বিভাগীয় ও জেলাশহরে, এমনকি উপজেলাপর্যায়েও এসএমই ফাউন্ডেশনের অফিস থাকা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার

এখানে আমরা রাজশাহী অঞ্চলে বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বিনিয়োগের যে বিশাল সম্ভাবনা এখানে রয়েছে, তা বাস্তবে রূপ দিতে হলে সমন্বিত উদ্যোগ আবশ্যক। আর অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সরকারকেই করতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতীয় ও চীনা সরকারের ঋণ কাজে লাগাতে হবে। আন্তঃদেশীয় সংযোগ স্থাপনেও তা আবশ্যক। প্রথমদিকে সরকার মৌলিক ভারী শিল্পেও বিনিয়োগ করতে পারে। এমনকি অন্যান্য কিছু শিল্প স্থাপনেও সরকার নেতৃত্ব দিতে পারে। পরবর্তী সময়ে সেগুলো বেসরকারি খাতে বিক্রি করে দেওয়া যাবে। এতে করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হবে। আর একটি কথা— সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বশেষ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সংস্কার বা আধুনিকায়ন করে লাভজনকভাবে চালাতে হবে। প্রয়োজনে আখচাষ বন্ধ করে তরল চিনি আমদানি করে চিনি উৎপাদনে যেতে হবে। ভারত, ব্রাজিল ও কিউবা থেকে তরল চিনি (আধা প্রক্রিয়াকৃত) আমদানি করে আমাদের দেশেরই বেসরকারি চিনিকল মালিকেরা লাভ করতে পারলে সরকারি কারখানাগুলো পারবে না কেন? অবশ্যই পারতে হবে। আর আখের জমি লাভজনক পাটসহ অন্যান্য ফসল আবাদে ব্যবহৃত হবে। বিষয়টি জরুরি। ভেবে দেখতে পারেন সংশ্লিষ্টরা। সবচেয়ে বড় কথা দেশাত্মবোধ। সরকারি বা বেসরকারি যে বা যিনিই হোন না কেন, দেশের প্রতি দরদ, ভালোবাসা থাকলে কর্মে সফলতা আসবেই। আমরা এগিয়ে গেলে বাংলাদেশও এগিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র

১. Bangladesh Planning Commission, Government of the Peoples Republic of Bangladesh (GOPRB) (2018): Bangladesh Delta plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century), Vol. 1 &2, Ministry of Planning, GOPRB, October 2018.

২. GOPRB (2015): Seventh Five Year Plan 2016-2020.

৩. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৫): Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015.

৪. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৩): বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ন।

৫. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৩): Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021. Making Vision 2021 a Reality.

৬. Khan M. M. H. et al (2018): Role of RAKUB for the Empowerment of Women in the North-Western Region of Bangladesh: Some Ethical Issues. Bangladesh Journal of Political Economy (BJPE), Vol. 34, No. 2, December 2018.

৭. Khan M. M. H. (2017): Problems and Prospects of Transport System of Rajshahi City Corporation: A Survey. BJPE, Vol. 3, No. 5, January 2017.

৮. Khan M. M. H. (2012): Roads and Railways Sub-sectors in the Sixth Five Year Plan of Bangladesh: A Comparative Review. BJPE, Vol. 28, Nos. 1 & 2, 2012.

৯. Khan M. M. H. (2011): Transport Sector in the Sixth Five Year Plan of Bangladesh: An overview. BJPE, Vol. 27, Nos. 1 & 2, 2011.

১০. খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১৭): বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ: কিছু নৈতিক প্রশ্ন। BJPE, Vol. 33, No. 2, December 2017.

১১. খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১৭): পরিবহন অবকাঠামো পরিকল্পনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। BJPE, Vol. 33, No. 5, January, 2017.

১২. খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (২০১৭): বাংলাদেশের পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে নৌ পরিবহনের ভূমিকা। BJPE, Vol.24, No.1 & 2, 2008.

১৩. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১৯): জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯- ২০২০, ২৫ মে, ২০১৯।

১৪. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১৮): মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৮-২০১৯, ২৬ মে, ২০১৮।

১৫. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১৬): মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৬-২০১৭, ৩১ মে, ২০১৬।

১৬. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (২০১২): নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব। জাতীয় সেমিনার, ১৯ জুলাই, ২০১২।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৯১-২০২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

চট্টগ্রামের ব্যাংকিং এবং কতিপয় বিশেষ ঝুঁকি

এস এম আবু জাকের*

মূল শব্দ *অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক ব্যাংক, মহাজনী সুদ, টু-টু প্রথা, আর্থিক ঝুঁকি, ডিও ইস্যু, চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান*

ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করতে গেলে ব্যাংকিং বিষয়টা সামনে চলে আসে। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাংকিং ব্যবসার প্রসারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বের ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস যেমন অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং দিয়ে শুরু, তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবেশদ্বার চট্টগ্রামও এ ধারার ব্যতিক্রম নয়।

আজকের ব্যাংক ব্যবসার উৎপত্তি খুঁজতে হলে যেতে হবে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। তখন ব্যাবিলনবাসীরা উপাসনালয়ের আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত পুরোহিতের কাছে তাদের আমানত গচ্ছিত রাখত। সে সময় পুরোহিতগণ উপাসনালয়েই আমানত সংরক্ষণ করত ও সমাজে যাদের প্রয়োজন তাদেরই ঋণ প্রদান করত। ব্যাংকের মৌলিক কাজ দুটির শুরু এভাবেই। কিন্তু অধর্ম ও নীতিহীনতার কারণে পুরোহিতগণ জনসাধারণের আস্থা হারান।

পরবর্তী পর্যায়ে রোমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যাংক-এর উৎপত্তি ও প্রসার ঘটে। এটা ছিল খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের ঘটনা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এসব ব্যাংক আমানত গ্রহণ করত, চেক ও ড্রাফট মারফত আমানত পরিশোধ করত ও ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দান করত। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক যাত্রা শুরু করে ১৪০২ সালে ব্যাংক অব বার্সেলোনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এটাই পৃথিবীর প্রথম আধুনিকতম ব্যাংক। এই উপমহাদেশে প্রথম সুসংগঠিত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০০ সালে যার নাম ছিল হিন্দুস্তান ব্যাংক, স্থাপিত হয় কোলকাতায়।

* ইভিপি ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, এক্সিম ব্যাংক, চট্টগ্রাম; ফোন: ০১৭১৩-১০২০১২ ই-মেইল: smabuzaker@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সেমিনার ও চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ৪র্থ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০১৯ আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২ মার্চ ২০১৯।

আমাদের এই অঞ্চলে ১৮৪৬ সালে প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপিত হয়। স্থানীয় জমিদার, উকিল, ব্যবসায়ী, ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও ইউরোপীয় নীল চাষি প্রভৃতি শ্রেণির লোকের উদ্যোগে একটি অংশীদারী কোম্পানি হিসেবে 'ঢাকা ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৯ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাংক অব বেঙ্গল' এঅঞ্চলে শাখা না খুলে 'ঢাকা ব্যাংকের' সুনাম ও ভালো ব্যবসা বিবেচনায় এনে ঢাকা ব্যাংককে ক্রয় করে নেয় এবং এটাকে নিজেদের একটি শাখায় রূপান্তর করে। ব্যাংক অব বেঙ্গল পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে শাখা খোলে। এর দ্বিতীয় শাখা খোলা হয় ১৯০৬ সালে চট্টগ্রামে।

১৮৬২ সালের পরবর্তী সময়ে স্থানীয়ভাবে বহু ব্যাংক স্থাপিত হয়। অবশ্য তখন এর অনেকগুলোকে ব্যাংক না বলে লোন অফিস বলা হতো। তবে এদের কার্যাবলী ছিল ব্যাংকের মতো। চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত সে ধরনের ব্যাংকের মধ্যে ছিল ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত মহালক্ষী ব্যাংক।

১৯৪৬ সালে এ দেশে মোট ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ২২টি। এ ২২টির মধ্যে তফসিলভুক্ত ব্যাংক ছিল ৮টি, অতফসিলভুক্ত ব্যাংক ছিল ১৩টি ও বিদেশি ব্যাংক ছিল ১টি। আর ব্যাংক শাখা/অফিসের সংখ্যা ছিল ৬৬৮টি। দেশ বিভক্তির পর ব্যাংকের অমুসলিম মালিকগণ দেশ ত্যাগ করেন। দেশ ত্যাগের সময় তারা ব্যাংকের সম্পদ এবং দক্ষ ব্যাংক কর্মচারীদের সাথে নিয়ে যায়। ফলে এঅঞ্চলের ব্যাংকিং সেক্টরে তীব্র শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৯ সালে এ অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা/অফিসের সংখ্যা কমে ১৪৮ টিতে দাঁড়ায়। এরপর বিভিন্ন ব্যাংক শাখা খুলে শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করে। এ অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) অধিবাসীদের দ্বারা ১৯৫৯ সালে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি. এবং ১৯৬৫ সালে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালে এ অঞ্চলে ব্যাংকের শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০২৫টিতে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর ব্যাংকের সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরের ভারসাম্য উন্নয়ন, সর্বোপরি ব্যাংকিং সেবা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিদেশি ব্যাংক ব্যতীত সকল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ছয়টি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়: সেগুলো হলো—সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংক। ব্যাংক সমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর ব্যাংকিং সেক্টরের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়। ব্যাংকিং সেক্টরের সম্প্রসারণ কেবলমাত্র শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থেই সম্প্রসারণ নয় বরং ব্যাংকিং কার্যক্রমেরও সম্প্রসারণ হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ সরকারের নির্দেশিত খাতে ঋণ প্রদান করত, লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশে যত্রতত্র শাখা খুলতে হতো, কনসেশন হারে ঋণদান করত, ব্যাপক হারে নিয়োগ প্রদান করতে হতো। ফলে ব্যাংকের লাভ আশানুরূপ ছিল না। এ কারণে ১৯৮৩ সালে উত্তরা ব্যাংক ও ১৯৮৪ সালে পূবালী ব্যাংককে বিরাষ্ট্রীকরণ করা হয় এবং বেসরকারি খাতে ব্যাংক খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯৮৩ সালে বেসরকারি খাতে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছর এবং এর পরবর্তী সময়ে বেসরকারি খাতে অনেক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকিংয়ের পথিকৃৎ

আধুনিক ব্যাংকিংয়ের পূর্বসূরী হিসেবে তিন শ্রেণির লোকের কথা বলা যায়—স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী এবং মহাজন। আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের পূর্বসূরী হিসেবে ইংল্যান্ডের স্বর্ণকারদের নাম উল্লেখ করা যায়। ইংল্যান্ডের স্বর্ণকারগণ আর্থিক দিক থেকে বিত্তবান ছিল, নৈতিক দিক থেকে সৎ ছিল এবং সামাজিকভাবে বিশ্বাসী ছিল। তাই তখন সমাজের লোকজন তাদের স্বর্ণালংকার, মূল্যবান জিনিস, নগদ অর্থ স্বর্ণকারদের

কাছে জমা রাখত। স্বর্ণকারগণ মূল্যবান জিনিসের প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ প্রদান করত এবং রসিদে বর্ণিত জিনিস চাহিবামাত্র পরিশোধ করার জন্য আমানতকারীকে বা রসিদের বহনকারীদের প্রদান করত। আবার আমানতকারীগণ চাহিবামাত্র পরিশোধ করার জন্য আমানতগ্রহীতা স্বর্ণকারের উপর লিখিত নির্দেশ দিত, যা স্বর্ণকারগণ মর্যাদা দান করত। আধুনিক কালের চেক-এর উৎপত্তি এখান থেকেই।

বাংলাদেশেও ব্যাংকিংব্যবস্থার উৎপত্তি সেই স্বর্ণকারদের হাত ধরে। চট্টগ্রাম শহর এবং গ্রামেগঞ্জের হাট-বাজারে স্বর্ণকারগণ শতাব্দীর পর শতাব্দি ধরে এ নীতি চালু করে ঋণ প্রদানের যে নীতি চালু করে রেখেছে আধুনিক ব্যাংকিং এর এ ডিজিটাল যুগেও তা বহাল তবিয়তে আছে। চট্টগ্রামের অপ্রাতিষ্ঠানিক এ ধারা অনেকটা বাধাগ্রস্ত হলেও চট্টগ্রামের অনকে অঞ্চলে স্বর্ণকারদের এ ব্যবসা পরিচালনায় খুব বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না। ব্যাংকগুলো এখনো স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে লোন দিতে চায় না। আর যার কাছে স্বর্ণালংকার ছাড়া বন্ধক দেবার মতো কিছু নেই সে তো প্রয়োজনের তাগিদে স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার জন্য ঐ স্বর্ণকারের কাছেই যেতে বাধ্য।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবসার পূর্বসূরী হিসেবে ব্যবসায়ীদের নামও উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এত সচ্ছলতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিল যে, তারা জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়েছিল, যার কারণে জনসাধারণ তাদের কাছে অর্থ জমা রাখত। ব্যবসায়ীগণ এ অর্থের একাংশ ঋণের ব্যবসায়ে খাটাত।

বন্দরনগরী হওয়ার সুবাদে চট্টগ্রাম প্রাচীণকাল থেকে ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্যবসায়ীদের কাছে অন্যরা পুঁজি খাটিয়ে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রাপ্তির যে ধারা পূর্বে ছিল, বর্তমানেও সে ধারা চালু রয়েছে। কোনো কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত আমানত গ্রহণ করে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করে। এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালায় আবার জনসাধারণের কাছ থেকেও আমানত (জনগণের ভাষায় বিনিয়োগ) সংগ্রহ করে ব্যাংকের আমানতের সুদের হারের চেয়ে বেশি হারে। এ ব্যবস্থায় আমানতকারী ব্যাংকের আমানতের হারের চেয়ে বেশি হারে সুদ উপার্জন করতে পারে এবং এক সপ্তাহের জন্যও অর্থলগ্নী করতে পারে যা ব্যাংক করে না। অপর পক্ষে উক্ত আমানত গ্রহীতা ব্যাংকের ঋণের সুদের হারের চেয়ে কম সুদে টাকা পায় এবং ব্যাংকে বন্ধকী সম্পত্তি প্রদান ও পণ্যের স্টক বন্ধক রাখার মতো কঠিন বিষয়গুলোকে এড়াতে পারে। চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে অনেক ব্যবসায়ী আবার ব্যাংক থেকে সি.সি. লোন নিয়ে সে লোনের টাকা দিয়ে অন্যদের ধার দেয় বেশি সুদের হারে। যে ব্যবসায়ী হঠাৎ করে পুঁজির সংকটে নিপতিত হয় সে ব্যবসায়ীর প্রয়োজন স্বল্প মেয়াদী ঋণ যেমন, এক সপ্তাহ কিংবা এক মাস। একটি ঋণ ব্যাংকে মঞ্জুর করাতেই কয়েক মাস সময় লেগে যায়। তাই ঐ ব্যবসায়ী দ্বারস্থ হন ঋণদাতা ব্যবসায়ীর কাছে। যে ব্যবসায়ীরা আধুনিক ব্যাংকিং এর পূর্বসূরী, আধুনিক ব্যাংকিং এর চরম উৎকর্ষতার যুগেও সে ব্যবসায়ীরা তাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ধারা চালু রেখেছেন।

আধুনিক ব্যাংকিং এর অপর পথিকৃৎ হলেন মহাজনেরা। মহাজন শ্রেণির লোকজন অতি প্রাচীন কাল থেকেই ঋণ ও সুদের ব্যবসা করে আসছেন। এরা স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করতেন এবং উচ্চ হারে সুদ আদায় করতেন। মধ্যযুগে মহাজন শ্রেণির লোকদের ঋণের কারবার ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

চট্টগ্রামে মহাজন শ্রেণির ঋণ ও সুদের ব্যবসা স্বর্ণকার ও ব্যবসায়ীদের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপকতা পেয়েছিল। গ্রামে গঞ্জে সবচেয়ে বেশি প্রাধাণ্য লাভ করে মহাজনী পুঁজি। ছোট পরিসরে যে কেউ মহাজনী ব্যবসা করতে পারতো। জমির দলিল কিংবা মূল্যবান সম্পদ জমা রেখে মহাজনরা টাকা খাটাতো।

চট্টগ্রামে গ্রামেগঞ্জে স্বর্ণকাররাও মহাজনী সুদের ব্যবসা পরিচালনা করত যা এখনো বিদ্যমান। চট্টগ্রামের কোনো কোনো ব্যবসায়ীক অঞ্চলে হাতে গোনা কিছু মহাজন আছে তারা কোটি কোটি টাকা ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার পণ্য বন্ধক রেখে। মাঝির গুদামে ব্যবসায়ীদের রক্ষিত পণ্য মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ পাওয়া যায় সহজে। মহাজনী সুদের যাঁতা কল থেকে জনসাধারণকে উদ্ধারের জন্য যে আধুনিক ব্যাংকিং এর উদ্ভব, ব্যাংকিং-এর উৎকর্ষতার এহেন সময়েও সে মহাজনরা টিকে আছে সমম্মানে।

ব্যাংকিংয়ে চট্টগ্রাম

৩০ জুন, ২০১২ ভিত্তিক তথ্য থেকে দেখা যায় চট্টগ্রামে ৪৫টি তফসিলী ব্যাংক ব্যবসায় রত যাদের মোট শাখার সংখ্যা ৭৫৭ এবং এডি শাখার সংখ্যা ১৫৮। আমানতের পরিমাণ ৬৩,৫৬২.৪৫ কোটি টাকা এবং ঋণ/অগ্রিমের পরিমাণ ৬৬,০০০.৪৯ কোটি টাকা, এর মধ্যে বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৭৬৪.৬৯ কোটি টাকা এবং বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণের হার ৫.৭০%। আমদানির পরিমাণ ৪২,৪০৯.৬৩ কোটি টাকা এবং রপ্তানির পরিমাণ ১৮,২৩৫.৯২ কোটি টাকা।

দেশের ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। চট্টগ্রামে ব্যাংকগুলোকে নানামুখী সেবা দেবার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চট্টগ্রামে একটা শাখা খোলে ১৯৪৮ সালের ১২ জুলাই, যা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হিসেবে পরিচিত। তবে এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৫ জুলাই, ১৯৫২ সালে। এ শাখার আওতাধীন জেলাসমূহ হলো চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুষ্ঠু ব্যাংকিং ধারা প্রতিষ্ঠা, বিশেষ বিশেষ খাতে ঋণ প্রদানে উৎসাহ যোগানো এবং ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশেষ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের আওতায় ব্যাংকগুলোর কতিপয় তথ্য নিম্নরূপ

(কোটি টাকায়)

	সেপ্টেম্বর ২০১৫	সেপ্টেম্বর ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৭
মোট আমানত	১৩৫৫৪৮	১৯১৮১৭	২০৯১৮৯
মোট ঋণ	১০৩০২০	১৩১১৭৭	১৪৬০৩১
শ্রেণিকৃত ঋণ	৯৯০২	১৮৯৩৬	১৩৪৯৮
শ্রেণিকৃত ঋণের হার	৯.৬১%	১৪.৪৪%	৯.২৪%

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম।

উক্ত টেবিলে লক্ষণীয় যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট আমানত সংগ্রহের পরিমাণ হলো ২০৯১৮৯ কোটি টাকা এবং মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ হলো ১৪৬০৩১ কোটি টাকা যার মধ্যে ৯.২৪% খেলাপি অর্থাৎ ১৩৪৯৮ কোটি টাকা। এতদ্অঞ্চলে সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৯.৬১ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ তে খেলাপির পরিমাণ ছিল ১৪.৪৪ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে ৫.২০ শতাংশ কমলেও তা আন্তর্জাতিক মানের প্রায় দ্বিগুণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর শেষে দেশে খেলাপি ঋণের হার দাঁড়ায় ১০.৬৭ শতাংশ। জাতীয়ভাবে খেলাপি ঋণের চেয়ে চট্টগ্রামে ১.৪৩ শতাংশ কম হলেও এ হার একটি সুস্থ অর্থনীতির পরিচায়ক হতে পারে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, খেলাপি ঋণের হার ২ শতাংশের নিচে রয়েছে এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, চীন ও ফিলিপাইনের। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর শেষে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের খেলাপি ঋণের হার নিম্নরূপ—

সিঙ্গাপুর: ১.২, মালয়েশিয়া: ১.৬, চীন: ১.৭, ফিলিপাইন: ১.৯, থাইল্যান্ড: ২.৯, ভিয়েতনাম: ২.৫, ইন্দোনেশিয়া: ২.৯, কম্বোডিয়া: ২.৫, শ্রীলংকা: ২.৬ এবং ভারত: ৯.৩ শতাংশ।

এশিয়ার অপরাপর দেশের খেলাপি ঋণের চিত্র দেখে সহজে অনুমান করা যায় যে ভারতের কথা বাদ দিলে অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের অবস্থান কত তলানিতে আছে।

বর্তমানে সারা দেশে ৮ লাখ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ১ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা খেলাপি। আর চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদর কাছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। ভোগ্যপণ্য, ইস্পাত, কৃষি, আবাসন সহ বিভিন্ন খাতের প্রতিষ্ঠান এ খেলাপি তালিকায় থাকলেও সবার উপর রয়েছে ইস্পাত খাত। এ অঞ্চলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের প্রায় ৪০ শতাংশই রয়েছে ইস্পাত খাতে।

চট্টগ্রাম যেহেতু দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বিতীয় প্রাণশক্তি সেহেতু যেকোনো ব্যাংকের প্রথম শাখাটি ঢাকায় স্থাপিত হলে দ্বিতীয় শাখাটি চট্টগ্রামে স্থাপিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে এখানে কিছু কিছু ব্যবসা বা শিল্প গড়ে উঠেছিল যা সারা দেশের চাহিদার জোগানদাতা। ভোজ্য তেল ব্যবসা এবং এর পরিশোধনের জন্য স্থাপিত পরিশোধন কারখানা চট্টগ্রামের একটা মৌলিক ব্যবসা যা এখনো সারা দেশের ভোজ্য তেল ব্যবসায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। সঙ্গত কারণে প্রচুর পুঁজি লাগে এ ব্যবসায় এবং ব্যাংক-ঋণও দেওয়া হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের। এস. আলম গ্রুপ, ইলিয়াছ ব্রাদার্স, এমইবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, মোস্তফা গ্রুপ, এইচ আর গ্রুপ, নুর জাহান গ্রুপ, এস এ গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, টিকে গ্রুপ ইত্যাদি ভোজ্য তেল ব্যবসা করে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এ গ্রুপগুলোর মধ্যেই রয়েছে চট্টগ্রামের সরবরাহকৃত ঋণের সিংহভাগ। আবার এ ভোজ্য তেল খাতেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

চট্টগ্রামে অপর যে মৌলিক খাতটি ব্যাংক ঋণের প্রবাহে বড় ভূমিকা রাখে সেটি হলো জাহাজ ভাঙা শিল্প। শুধু এ সেক্টরে বিনিয়োগ করার জন্য সীতাকুন্ড, বারবকুন্ড এলাকায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অনেকগুলো ব্যাংক শাখা। বিশ্বে জাহাজ ভাঙা শিল্পের অন্যতম দেশ বাংলাদেশ। ৬০-এর দশকের দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে সাগর উপকূলে জাহাজ ভাঙা ব্যবসার শুরু। আর আশির দশকের দিকে এ ব্যবসা বিকশিত হতে থাকে। সীতাকুন্ডে প্রায় ১৬০টি ইয়ার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ৪০ থেকে ৫০টি ইয়ার্ডে নিয়মিত জাহাজ ভাঙা হয়। এ শিল্পে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান রয়েছে। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যাংকগুলো এগিয়ে এসেছে। ফলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। পরিত্যক্ত জাহাজ ভেঙে এর থেকে লৌহজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে দেশের লৌহজাত শিল্পে। দেশে লোহা জাতীয় কাঁচামালের চাহিদা ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ টন। এর মধ্যে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টন জোগান দেওয়া হচ্ছে জাহাজ ভাঙা শিল্প থেকে। আর এ কাঁচামাল প্রাপ্তির সহজলভ্যতার ওপর ভিত্তি করে দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য রি-রোলিং ও ষ্টিলস মিলস। পুরাতন জাহাজ আমদানিতে ব্যাংকগুলো বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দিয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। জাহাজ ভাঙা শিল্পে ঋণের প্রয়োজন হয় প্রচুর। এক একটি জাহাজের জন্য এক'শ থেকে দু'শ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ লাগে। তাই ব্যবসায়ীরা ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত দিতে পারেন না। প্রায় ব্যাংক তাই সহায়ক জামানতের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে ব্যবসা করেছিল।

ব্যবসায় যখন মন্দা নেমে আসে তখন অনেক ব্যবসায়ীর ঋণ খেলাপি হয়ে পড়ে এবং অনেক ব্যাংক বিপদে পড়ে যায়। হালে কিছু ব্যবসায়ী দায় দেনার চাপে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ফলে এ অনন্য খাতটি ব্যাংকারদের দৃষ্টিতে হয়ে পড়েছে বিপদসংকুল। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সরকার এগিয়ে না আসলে এ মৌলিক খাতটি বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ব্যাংকিংয়ে বিশেষ ঝুঁকি

ব্যাংকিং সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা। ঝুঁকি পরিহার করা কিংবা কমিয়ে এনে ব্যবসা করার জন্য ব্যাংকারদের চেষ্টার অন্ত নেই। ব্যাংকাররা সাধারণত যেসব ঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন তা হলো:

(ক) শিল্পের ক্ষেত্রে যোগানের ঝুঁকি এবং বিক্রয় ঝুঁকি।

(খ) কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালন ঝুঁকি, রেজিলিয়েন্স ঝুঁকি, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ঝুঁকি এবং ব্যবস্থাপনার সততার ঝুঁকি।

(গ) সিকিউরিটির ক্ষেত্রে. সিকিউরিটির নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি এবং সিকিউরিটির পর্যাপ্ততা ঝুঁকি।

এসব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকগুলো হরেক রকমের নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করছে। কিন্তু এর বাইরেও নানা অপ্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি থাকে যেগুলো পরোক্ষভাবে ব্যাংকগুলোকে গভীর সংকটে ফেলছে। চট্টগ্রামে এ ধরনের কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি বাজারে বিদ্যমান যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকগুলোকে সমস্যায় ফেলছে যেমন:

১. খাতুনগঞ্জের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বাজার—টু-টু ।

২. অতিরিক্ত ডিও ইস্যুর চাতুরী।

৩. দেশান্তরী হওয়া।

১. খাতুনগঞ্জের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বাজার—টু-টু

মহাজনি প্রথার আধুনিক একটি রূপ টু-টু প্রথা। চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জেই এর উৎপত্তি এবং বিকাশ। এ প্রথা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং এর জন্য একটা বড় হুমকি। আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির সীমাবদ্ধার কারণে খাতুনগঞ্জে গড়ে উঠেছে টু-টু পদ্ধতি। মহাজনি প্রথাটা খাতুনগঞ্জের আদি প্রথা হলেও এর আধুনিক সংস্করণ হলো টু-টু পদ্ধতি। নগদ অর্থের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়।

টু-টু পদ্ধতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে আশির দশকে। নগদ অর্থের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যবসায়ী বা মহাজন কর্তৃক চড়া সুদে কোনো জামানত ছাড়া শুধু ভবিষ্যতে পরিশোধ্য চেকের বিনিময়ে যে ঋণ দেওয়া হয় তাকে টু-টু পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতির কয়েকটি ধরন রয়েছে। যেমন সিঙ্গেল বার-টু-বার , ডাবল বার-টু-বার ও মাস-টু-মাস।

সপ্তাহের যেদিন ঋণটি নেওয়া হয় পরবর্তী সপ্তাহের সে দিনেই পরিশোধ্য পদ্ধতির নাম হলো বার-টু-বার। দুই সপ্তাহের জন্য ঋণটি নেওয়া হলে তাকে বলে ডাবল বার-টু-বার। সে রকম যদি কোনো মাসের যে তারিখে নগদ অর্থ ধার হিসাবে নেওয়া হয় এবং তা যদি সুদসহ আসল পরবর্তী মাসের সে তারিখেই পরিশোধ্য হয়, সে পদ্ধতিটিকে মাস-টু-মাস পদ্ধতি বলা হয়।

টু-টু প্রথায় যারা ধার দেয় তারা মূলত মহাজন শ্রেণি। তবে এ প্রথার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং লাভজনক হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ীও এ প্রথায় তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে মহাজনি কায়দায়। অর্থ ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসই মূল ভিত্তি। এরপরও ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেক জামানত রাখা হয় অর্থাৎ বার টু বার হলে নির্ধারিত পরিশোধ্য তারিখের চেক জমা নেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেকের ওপরও আস্থা রাখতে না পারলে তখন গুদামে রক্ষিত মালামাল বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া হয়। কেউ কেউ তেল কিংবা চিনির ডিও (ডেলিভারী অর্ডার) জমা রেখেও টাকা ধার দেন।

সুদের হার নির্ধারণে টু-টু প্রথার রয়েছে একটি অভিনব পদ্ধতি। এক মন ভোজ্য তেলের দাম ১১০০ টাকা ধরে আসল ঋণ হিসাব করা হয়। এক ট্রাকে ১৫০ মন ভোজ্য তেল সরবরাহ করা হয়। সে হিসাবে এক ট্রাক ভোজ্য তেলের ডিও এর মূল্য ১৬৫,০০০/- টাকা ধরা হয়। বাজারে ভোজ্য তেলের দাম ২২০০ টাকা হলেও টু-টু তে লেনদেনের সময় ঐ ১১০০ টাকাই ধরা হয়। কেউ টু-টু মানি মার্কেট থেকে ঋণ নিতে চাইলে এক ট্রাক তেলের মূল্য অর্থাৎ ১৬৫,০০০ টাকা নগদ গ্রহণ করার বিনিময়ে এক মাস পর এর সুদ প্রদান করতে হয় ২৭০০ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রায় ২০ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে হয়। যে সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যবসায়িক ঋণের সুদের হার ছিল সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ।

১.১ টু-টু ব্যবসার প্রসারের কারণ

ক) সহজ শর্তে এবং তাৎক্ষনিক নগদ অর্থ পাওয়ার জন্য টু-টু প্রথার জুড়ি নেই। চাহিবা মাত্র এ ঋণ পাওয়া যায়, যদি বাজারে ঋণ গ্রহীতার সুনাম বিদ্যমান থাকে।

খ) ব্যাংকগুলো সাধারণত কোলেটারেল সিকিউরিটি ছাড়া ঋণ দেয় না। যে ব্যবসায়ীর কোনো কোলেটারেল সিকিউরিটি নেই তিনি স্বল্প কালের জন্য নগদ অর্থের সংকটে পড়লে তার জন্য টু-টু প্রথাই একমাত্র ভরসা।

গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ মঞ্জুর করতে দু'তিন মাস সময় লেগে যায়। এ সময়ের আগেই যদি ঋণের প্রয়োজন হয় তখন ব্যবসায়ীরা টু-টু বাজারে যেতে বাধ্য হন।

ঘ) ব্যবসায়ীর ব্যাংকে ঋণের লিমিট মঞ্জুর করা থাকলেও এক সাথে তার অনেকগুলো আমদানি ডকুমেন্ট ব্যাংকে উপস্থাপিত হলে তখন অতিরিক্তি ঋণের প্রয়োজন হয়। ব্যাংক এ অতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর না করলে তাকে বাধ্য হয়ে টু-টু বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করে ডকুমেন্ট ছাড় করতে হয়।

ঙ) ব্যাংকে ঋণ নবায়নের সময় ঋণের সুদ প্রদান করা, ব্যাংকের বার্ষিক ও অর্ধবার্ষিক ক্লোজিং এর সময় ঋণ পরিশোধ করা কিংবা ঋণ পুনঃতফসিল করার সময় ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন টু-টু বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করাই সবচেয়ে সহজ।

খাতুনগঞ্জে মহাজনী অর্থ বাজার তথা টু-টু প্রথায় কী পরিমাণ অর্থের পরিচালন ঘটে তা হিসাব করা দুঃসাধ্য হলেও ব্যবসায়ীদের মতে এ পদ্ধতিতে দৈনিক প্রায় ১০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়। এ বাজারের প্রসারতা নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য একটা বড় হুমকি।

১.২ টু-টু পদ্ধতিতে ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি

যেসব মহাজন কিংবা ব্যবসায়ী টু-টু প্রদ্ধতিতে টাকা খাটায় তারা প্রথমে নিজের পুঁজির ওপর ভর করে এ ব্যবসা পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে অর্থের চাহিদা বেড়ে গেলে তখন এ চাহিদা মেটানোর জন্য

ব্যাংকের দ্বারস্থ হন। ব্যাংক থেকে নানা উপায়ে লোন নিয়ে তা অধিক সুদে টু-টু ব্যবসায় খাটায়। যেহেতু টু-টু ব্যবসা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই এতে ঝুঁকি রয়েছে প্রচুর। অনেক সময় টু-টু বাজার থেকে ঋণ নিয়ে ঋণ গ্রহীতা দেউলিয়া হয়ে যায় কিংবা বাজার থেকে উৎখাত হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ঋণদাতার কোনো উপায় থাকে না। ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এক সময় সে নিজেও দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ব্যাংক তাকে দেওয়া ঋণ আদায় করতে পারে না অর্থাৎ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়ে যায়। ১৯৮৬ সালে বিভূতিভূষণ নামে এক ব্যবসায়ী ৬ কোটি টাকা বকেয়া রেখে ভারতে পালিয়ে যায়। এর পরই এ ব্যবসার ঝুঁকি প্রতিভাত হয় । বিভূতিভূষণ পালিয়ে যাওয়ার কারণে তার সাথে দেনাপাওনা আছে এমন অনেক ব্যবসায়ীও সংকটে পড়ে যায়। ধারণা করা হয় যে এখন পর্যন্ত এভাবে ঘটে যাওয়া শতাধিক ঘটনায় কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে খাতুনগঞ্জে। যে কারণে ব্যাংকগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২. অতিরিক্ত ডিও ইস্যুর চাতুরি

চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে যে সব লেনদেন হয় তার বেশির ভাগই ডিও এর মাধ্যমে হয়। ভোগ্যপণ্য, ভোজ্যতেল ও চিনি'র ব্যবসা পরিচালনায় ডিও পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। যে সব ব্যবসায়ী আমদানি ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের পণ্যের বিপরীতে বিক্রয়ের দলিল হিসাবে ডিও ইস্যু করে থাকেন। ক্রেতারা ঐ ডিও হাতে ধরে রাখেন ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির সুযোগ নেওয়ার জন্য। ঐ ডিও এর মালামাল ডেলিভারি নেওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অনেক জনের হাতে হস্তান্তরিত হয়। আমদানিকারক ছাড়াও ভোজ্য তেলের স্থানীয় উৎপাদনকারীরাও এ ডিও ইস্যু করে থাকেন। যখন ডিও ইস্যুকারীর অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় তখন তিনি প্রকৃত স্টকের অতিরিক্ত স্টকের বিপরীতে ডিও বিক্রি করে বাজার থেকে নগদ অর্থ তুলে নেন। যারা ডিও ক্রয় করেন তারা সবাই সাথে সাথে মাল ডেলিভারী গ্রহণ করেন না। এ সুযোগটাকে কাজে লাগায় ডিও ইস্যুকারীরা। সব ডিও এর মাল যদি এক সাথে ডেলিভারী নেওয়ার জন্য ক্রেতারা হাজির হয় তখন ডিও ইস্যুকারীর প্রকৃত স্টকের অবস্থা বুঝা যাবে। ডিও ব্যবসার প্রসার হবার কারণে এ ধরনের প্রতারণামূলক অতিরিক্ত ডিও বাজারে ছাড়ার মাধ্যেমে অতিরিক্ত পণ্য মূল্য বাজার থেকে সংগ্রহ করা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থ বাজারে একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। খাতুনগঞ্জে ভোজ্য তেল ব্যবসায় নিয়োজিত যে সব প্রতিষ্ঠানের ডিও ক্রয় বিক্রয় হতো সে সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো :

ক) টি কে অয়েল মিল, খ) মোস্তফা ভেজিটেবল অয়েল মিল, গ) মোহাম্মদ ইলিয়াছ ব্রাদার্স ঘ) শাহআমানত ভেজিটেবল, ঙ) ইয়াকুব অয়েল মিল, চ) এম রহমান বনস্পতি, ছ) আলহাজ্ব অয়েল মিল, জ) রাসেল ভেজিটেবল, ঝ) এস আলম ভেজিটেবল অয়েল মিল ইত্যাদি।

উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই সংকটে নিপতিত এবং ইতিমধ্যে ডিও ক্রেতাদের আস্থা হারিয়েছে। চিনির বাজারে ডিও ব্যবসায় বর্তমানে সিটি গ্রুপ এবং এস আলম সুগার মিল অত্যন্ত শক্ত অবস্থায় আছে।

অতিরিক্ত ডিও ইস্যু করার পর ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়ে গেলে অতিরিক্ত ডিও এর বিপরীতে মালামাল সরবরাহ করা যায় না। যে সব ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঐ অতিরিক্ত ডিও ক্রয়ের জালে জড়িয়ে যান ঐ প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়ার সাথে সাথে তারাও সংকটে নিপতিত হন। ফলে ব্যাংকের ঋণও তারা আর শোধ করতে পারেন না।

৩. দেশান্তরী হওয়া

চট্টগ্রামের ব্যাংকিংয়ে অন্য একটা বড় ঝুঁকি হলো ঋণগ্রহীতার দেশান্তরী হওয়া। দেনার ভারে জর্জরিত হয়ে ঋণগ্রহীতা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রেখে বা বিক্রি করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়মিতভাবে ঘটছে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে রাজগরিয়া পরিবার দেশে প্রচুর দেনা রেখে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কয়েকটি ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের অনেক ব্যবসায়ী কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পালিয়ে যান। এদের ব্যাংকঋণের পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা, যা দীর্ঘদিন ধরে খেলাপি হয়ে আছে।

ব্যাংকের ঋণ অনাদায়ী রেখে বিদেশে সপরিবারে পালিয়ে গেলে ঐ ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতে মামলা করা যায়। কিন্তু বন্ধকী সম্পক্তি নিলাম বিক্রয় করে দেনা যদি সম্পণ পরিশোধ না হয়, বাদ বাকি পাওনা আদায়ের জন্য ব্যাংকের হাতে কোনো হাতিয়ার থাকে না। অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩-এ এই ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ঋণ গ্রহীতার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে অর্থঋণ আদালত আইনে কোনো ধারা না থাকাটা অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর বড় সীমাবদ্ধতা। দেশ থেকে যে কেউ দেশান্তরী হতে পারে, কিন্তু দেশান্তরী হওয়ার ঘটনা চট্টগ্রামেই যেহেতু বেশি, তাই দেশান্তরী হওয়ার বিষয়টি চট্টগ্রামের ব্যাংকিংয়ের জন্য একটা বিশেষ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত।

সমস্যা ও সুপারিশ

চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। এটি ঢাকার চেয়ে প্রাচীনতম শহর। আইনগতভাবে বৈধতা না পেলেও এটি দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। আর তাই দেশের ব্যাংকব্যবস্থায় ঢাকার পর চট্টগ্রামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু এটা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র তাই একটি শক্তিশালী ব্যবসায়ী শ্রেণি গড়ে উঠেছে চট্টগ্রামে। আর ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি ঋণ ব্যবহারকারী হলো এ ব্যবসায়ীরা। একটি শক্তিশালী ব্যাংকিংব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে উন্নয়ন। চট্টগ্রামে ব্যাংকিং-এর সমস্যাগুলোর প্রতি একটু আলোকপাত করা যাক:

১. ব্যবসায় পণ্যমূল্যের ওপর সরকারি যুতসই নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সৃষ্টি হয় অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এ অসুস্থ প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর সত্যিকার অর্থে অসুস্থ হয়ে বাজার থেকে বিদায় নেয় ডজন ডজন ব্যবসায়ী। ফলে তাদের নেওয়া ঋণ খেলাপি হয়ে পড়ে। আবার কিছু কিছু মেগা ব্যবসায়ী জামানতহীনভাবে শত কোটি টাকার ঋণ পেয়ে যান সহজে। তাদের এ পুঁজি লাগানো হয় পণ্য মূল্য হ্রাস করা কিংবা নিয়ন্ত্রণে। পণ্যমূল্য পড়ে গেলে মুহূর্তেই অতল গহ্বরে পড়ে যান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। ফলে তাদের ঋণ হয়ে পড়ে অনাদায়ী। ব্যাংকের দেওয়া অযাচিত ও সস্তা পুঁজি বাজারে নেতিবাচক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

২. বাজারে চাহিদার চেয়ে আমদানিকৃত পণ্যের জোগান বেড়ে গেলে বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পণ্যের মূল্য কমতে থাকে। আর তখন কে আগে পণ্য বিক্রি করে আপদ থেকে বেরিয়ে পড়বে সে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এ প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজির ব্যবসায়ীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্বলতা তাদের দুর্বলতর হয়। ঋণ হয় খেলাপি। অথচ পণ্যের জোগান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। আর ব্যবসায়ীরা লোকসানের সম্মুখীন হলেও অন্তত পথে বসে না। চালের দাম বেড়ে গেলে তা কমানোর জন্য সরকারি কর্মকর্তারা যেভাবে মাঠে ময়দানে নেমে পড়েন, অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা

থাকে না কেন? এ প্রচেষ্টাটা যদি সকল পণ্যের জন্য অব্যাহত থাকে সিন্ডিকেট ব্যবসার যাঁতা কলে পিষ্ট ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস হয় না, ঋণও সহজে খেলাপি হয় না।

৩. চট্টগ্রামের ব্যাংকিং এর আরেকটি দুর্বল দিক হলো এখানে বড় ব্যবসায়ীরা বড় অংকের ঋণ পেয়ে যায় কোনো কোলেটারাল ছাড়াই। আর ছোট ব্যবসায়ীরা ছোট অংকের ঋণ পায় ঋণের অংকের দ্বিগুণ কোলেটারাল দিয়ে। আবার বড় ব্যবসায়ীরা কম সুদের হারে ঋণ পায়, কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীদের দিতে হয় সর্বোচ্চ হারের সুদ। এক্ষেত্রেও পণ্য মূল্যের ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ীরা বড় ব্যবসায়ীদের কাছে মার খাচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। নিঃস্ব হচ্ছে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। ঋণ খারাপ হওয়ার পেছনে এটাও একটা বড় কারণ।

৪. চট্টগ্রামের বড় ব্যবসায়ীরা একই সাথে কয়েকটা ব্যাংক থেকে ঋণ মঞ্জুর করে রাখেন। একটি ব্যাংকে একটা ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হবার আগেই অন্য একটি ব্যাংক থেকে ঋণের টাকা এনে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। শরীরের রোগের লক্ষণের ওপর এভাবে দেওয়া হয় মরীচিকাময় প্রলেপ। তাতে রোগ গভীর থেকে গভীরতর হয়, লক্ষণকে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না। অপর দিকে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের একটি ব্যাংকে একটি ঋণই থাকে। কোনো যৌক্তিক কারণে সে ঋণটি অনাদায়ী হলেই তার সি আই বি খারাপ, পারফরম্যান্স খারাপ, সুনাম খারাপ - শেষ পর্যন্ত হয় তার অগ্রন্থ্যযাত্রা।

৫. দেশে একটি পণ্যের কতটুকু চাহিদা আছে তার হিসাব সরকারের কাছে থাকে। সে অনুযায়ী শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত। যেমন সারা দেশে কাগজের চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ কাগজের মিল থাকা দরকার সরকার যদি এর দ্বিগুণ পরিমাণ কাগজের মিল স্থাপনের জন্য অনুমতি দেয় তাহলে পুরো কাগজ শিল্পটাই লোকসানে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, উদ্যোক্তরাও পথে বসবে। তেমনি ব্যাংক যখন শিল্প স্থাপনে ঋণ মঞ্জুর করে তখন বর্তমান চাহিদা এবং জোগান কতটুকু আছে তা নির্ণয় করে নতুন শিল্পে ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত - কোলেটারাল সিকিউরিটি যত বেশিই হোক না কেন। বাস্তবে এ নিয়মাচার মানা হয় না। বেশকিছু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাংকারদের এ বেহিসাবী মঞ্জুরীর কারণে এবং সরকারের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে।

৬. এভাবে সারা দেশের ন্যায় চট্টগ্রামেও অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা থেকে উৎখাত হয়ে গেছেন এবং খেলাপি হয়ে পড়েছে তাদের কোটি কোটি টাকার ঋণ। কেউ কেউ বলে থাকেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের কারণে দেশের খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে এবং অর্থনীতিতে একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আসলে এক্ষেত্রে চট্টগ্রামকে আলাদাভাবে বেশি দোষারোপ করার জো নেই। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছেন। বড় উদ্যোক্তা বলে বড় ঋণ গ্রাহকও তারা। খেলাপি হওয়ার কারণে বড় ঋণটা সহজে চোখে পড়ে। তার মানে এই নয় যে চট্টগ্রামেই খেলাপি ঋণ বেশি। আসলে এটা চট্টগ্রামের সমস্যা নয়, জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য গ্রাহক-ব্যাংকার-সরকার এ ত্রিপক্ষিয় সমঝোতার বিকল্প নেই। মরা গাছেও ফুল ফোটে–তাই চেষ্টাটা তো করে যেতে হবে!

উপসংহার

অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম যে অবদান রেখে যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি অবদান রাখার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উত্তোরণের পর যে সব আর্থিক ঝুঁকির চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা মোকাবিলা করার জন্য চট্টগ্রামকে প্রকৃত অর্থেই বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা দরকার এবং চট্টগ্রামের ব্যাংকিং-এর সমস্যাবলীকে দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। জাতীয় অর্থনীতিতে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। এর ভৌগোলিক অবস্থান শুধু দেশের জন্য নয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগের যুগসূত্র হতে পারে এ চট্টগ্রাম। এছাড়াও ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান এবং দক্ষিণ-পূর্ব চীনের আঞ্চলিক ট্রান্সশিপম্যান্ট হাব হতে পারে এ চট্টগ্রাম। অর্থনীতির স্বর্ণদ্বারের পরিকল্পিত পন্থায় উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে। বর্তমানে দেশের শিল্পোৎপাদনের ৪০%, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮০% এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের ৫০% এ চট্টগ্রামের অবদান।

অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম সে সম্ভাবনার পথে ইঞ্জিন অব গ্রোথ। চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকার যে মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ব্যাংকিং খাতটিকে বিশুদ্ধ করার পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্চণীয়। ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা শ্রেণিকে যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী যারা লোকসানে পড়ে ইতিমধ্যে ব্যবসা বিমুখ হয়ে পড়েছেন তাদের প্রণোদনার ব্যবস্থা করে ব্যাংকিং সুযোগসুবিধায় কীভাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে চিন্তা করার এখনই সময়। পুরনোদের অভিজ্ঞতা, নতুনদের উদ্যম–দুইয়ে মিলে আনতে পারে স্বনির্ভরতা। তাই ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের পথে প্রতিবন্ধকতার অপসারণ জরুরি। স্বেচ্ছা খেলাপিকে আই সি ইউতে রেখে অন্যান্যদের চাকাকে সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রীজ-মবিল-অয়েল ইত্যাদির প্রয়োগের মাধ্যমে যদি শেষ চেষ্টাটা করা যায় ক্ষতি কি! একটি শিল্প কারখানা খেলাপির কারণে যদি পরিত্যক্ত লোহা লক্করে পরিণত হয় তা শুধু উদ্যোক্তার ক্ষতি নয়, বরং দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। বিশুদ্ধ ব্যাংকিং চর্চাই অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ফুল ফোটাতে পারে, সে ফুল অবশ্যই ফুটবে। আর সে ফুলে সুভাসিত হবে বাংলাদেশ–এ প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি।

তথ্যসূত্র

১। বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম।

২। দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক বণিক বার্তার বিভিন্ন সংখ্যা।

৩। ফজলুল কাদের কাদেরী, ২০০৫, ব্যাংকিং পদ্ধতি ও সম্পর্কিত আইনাবলী, ফয়েজুল কাদের, ঢাকা।

৪। Debnath,2013, Dr. R.M, Business of Banking, Lotus Publishers, Dhaka.

৫। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২০৩-২১৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রংপুর বিভাগে উন্নয়ন সম্ভাবনা ও সমস্যা

মোহাম্মদ জাকারিয়া*
সজীব কুমার রায়**

মূল শব্দ *রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব, মানবসম্পদ, সেচের চাহিদা, পিপিপি, ক্ষুদ্র উৎপাদক, লোহার খনি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, দারিদ্র্য হার হ্রাস, বাজেট বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য*

অবতরণিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতীক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৯-২১ (Medium-Term Macroeconomic Framework —MTMF, 2019-21) প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপির ৩১.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপির ৩৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপির ৩৫.৩ শতাংশে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মোট বিনিয়োগের ২৬.৩ শতাংশ আসবে বেসরকারিভাবে। অবশিষ্ট ৯ শতাংশ বিনিয়োগ আসবে সরকারিভাবে। সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সরকার এক্ষেত্রে বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে

---

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, বাংলাদেশ; ই-মেইল: jakaria88rueco@gmail.com

** প্রভাষক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, বাংলাদেশ; ফোন: ০১৭২৩ ২৯৬৫০৯ ই-মেইল: sajibkumarroy@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক দিনাজপুর আঞ্চলিক সেমিনার-২০১৯-এ পঠিত, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯।

কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের চেষ্টা বাস্তবায়ন, জ্বালানির বহুমুখীকরণ, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপির আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান অবস্থা থেকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অত্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যত বেশি সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে স্বার্থান্বেষীদের আগমন তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৃষ্ট সম্পদের নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্বগুলির অন্যতম। আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও দুর্বল প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমা বিস্তৃত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের হুমকি অপেক্ষা রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা, নিরাপত্তাহীনতা, আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন পরাশক্তির হস্তক্ষেপ বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৃষ্ট সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

সম্ভাবনাসমূহ

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো আলাদা। ক্রমবিকাশমান কৃষি, রপ্তানিতে শিল্প পণ্যেও আধিপত্য, বিশাল সক্ষম মানবসম্পদ ও দীর্ঘমেয়াদে মানবসম্পদের স্থিতিশীল প্রবাহের নিশ্চয়তা, নারী শিক্ষার উচ্চহার ও এর অতিদ্রুত বিকাশ, সামাজিক সূচকে অগ্রগতি, অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের গতিশীল ও সরব উপস্থিতি ইত্যাদি সবই বাংলাদেশের অর্থনীতির বিগত দিনের অর্জন ও অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ শক্তির নিয়ামক। পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল। আইটি খাতে, ঔষধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, উড়োজাহাজ ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ও যোগাযোগ, পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতি মন্দা অবস্থা থেকে পুনরায় প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরছে, এ অবস্থায় বাংলাদেশের অথনীতির ওপর একটি ধনাত্মক প্রভাব সৃষ্টি হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সামনের বছরগুলিতে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বাংলাদেশ কেবল একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ নয়, একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশও বটে। জিডিপি ও আমদানি রপ্তানির আকার বিবেচনা করলে এ চিত্র ফুটে উঠে। একটি সরকারের সাফল্যের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হচ্ছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফলতা। বাংলাদেশে প্রতিবছর ২০ লক্ষাধিক শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এই বিশাল শ্রম শক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা আরও ত্বরান্বিত করবার জন্য অর্থনীতিতে এখন বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণের সময় এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ, নদী অববাহিকায় কৃষি জমি সম্প্রসারনের জন্য পরিকল্পিতভাবে ভূমি আহরণ, ব্যাপক ও বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিকে মোকবেলা করবার জন্য ভূমির

উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বাজারে মানব সম্পদের চাহিদার গতি প্রকৃতি সঠিকভাবে নিরূপনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের বাজার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার ইত্যাদি। নদী অববাহিকায় যে বিপুল পরিমাণ পলি পরিবাহিত হচ্ছে তা জলপথের নাব্যতা হ্রাস করলেও সঠিক কর্মকৌশল প্রনয়ণের মাধ্যমে তা আমাদের জন্য আর্শীবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিগন্ত প্রসারিত করবার জন্য এখন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অর্থনীতিতে নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে ফলে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই জায়গায় বাংলাদেশের দিগন্ত অনেক বেশি বিস্তৃত, এবং এই সম্ভাবনাকেও যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির মধ্যেও বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর বিভাগের অন্তর্গত নিম্নোক্ত খাতগুলোতে গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে।

পানি (সেচ) ব্যবস্থাপনা

কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলের সকল জেলাই খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা খরা প্রবণতা এবং সেচ ও পানীয় পানির অপ্রতুলতা। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির বিকাশ সেচের চাহিদাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে যার প্রধান জোগান ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। এটি কোনো টেকসই প্রক্রিয়া নয়, যা বিশেষজ্ঞ মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং বিকল্প পন্থা অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এজন্য নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ রোধ করে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচের জন্য পানি সংরক্ষণ ও তা শুকনো মৌসুমে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা বিভিন্ন সময় শোনা যাচ্ছে। এ ধরনের প্রচারণা অবিবেচনা প্রসূত ও সেচ ব্যবস্থাপনার খণ্ডিত চিত্র উপস্থাপন করে। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো বড় সেচ প্রকল্প সফলতার মুখ দেখেনি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ব্যাপক ভূমি ক্ষয় ও পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে ব্যাপক তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ গবেষণা রয়েছে। এক্ষেত্রে নদীর গতিরোধ না করে নদীর স্বাভাবিক গতিধারাকে কাজে লাগিয়েই আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লাভ সর্বাধিক করা সম্ভব। সেই জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করে এই খাতকে সম্ভাবনাময় করে গড়ে তোলা যায়।

ক) নদীর নাব্য বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী তীরবর্তী এলাকায় ভূমি উদ্ধার ও তার যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

খ) প্রাকৃতিক জলাধারগুলো পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমের পানি সংরক্ষণ ও পানির যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। বৃহত্তর বরেন্দ্র এলাকার মাটির বৈশিষ্ট্য ও ভূমির ঢাল পর্যালোচনা করলে সহজেই ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার যে একমাত্র বিকল্প তা সহজেই বোঝা যায় এবং এ ব্যাপারে বহু বিশেষজ্ঞ মতামত সুপ্রতিষ্ঠিত।

গ) সেচের ক্ষেত্রে পানির অপচয় হ্রাস করবার জন্য সেচ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ। পানি অমূল্য সম্পদ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির সর্বোত্তম ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য পৃথিবীব্যাপী প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পানির অপচয় রোধে প্রযুক্তি নির্ভর সাশ্রয়ী পানি ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল

বিনিয়োগ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল একটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারি, বেসরকারি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী (পিপিপি) ও বিদেশি—এই চার ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন নিয়ে কাজ করছে সরকার। এরই অংশ হিসেব ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার যার মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত ৪ হাজার কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের সুযোগ তৈরি হবে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতি গতি পাবে, তেমনি বেকার সমস্যা থেকেও মুক্ত হবে বাংলাদেশ (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। এরই অংশ হিসেবে দিনাজপুর সদর উপজেলার সুন্দরবন গ্রামে মোট ৩০৮ একর জমির উপর একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে সরকার, যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে, তেমনি এই অঞ্চলেরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে। কৃষিভিত্তিক এলাকার কথা বিবেচনা করেই নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেড এর ন্যায় দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প কলকারখানা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া যেহেতু দিনাজপুরে সম্প্রতি একটি মূল্যবান লোহার খনি পাওয়া গেছে, সেহেতু এই লোহার খনির ওপর ভিত্তি করে এখানে লোহা ও স্টিল কারখানা স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি এই অঞ্চলে বেকারত্বের হার বেশি হওয়ায় বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও এ দেশের মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তা ছাড়া দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হলে উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন ঘটবে এবং সহজ শ্রম পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (বাংলা ট্রিবিউন, জুলাই ৯, ২০১৯)।

কৃষিতে ক্ষুদ্র উৎপাদকের হাত সুসংহতকরণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলের কৃষির গুণগত মানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। চাষের নিবিড়তা এবং রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণের প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকের মজুরি, উপকরণের দাম ও সেচের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়নি, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যেরও মূল্য হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সময়ে ধানের মূল্য উৎপাদন খরচের চেয়ে নিচে নেমে গেছে ও কৃষক দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এটি একটি সাধারণ ধারা। ফলে কৃষকের হাত ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধ্য ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। এমতাবস্থায়, কৃষককে সরাসরি ভর্তুকির আওতায় এনে উৎপাদনের ঝুঁকি হ্রাস করা গেলে দেশের কৃষি খাত তথা কৃষক সমৃদ্ধ হবেন। আর দেশের কৃষি খাত সমৃদ্ধ হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

ধানের পাশাপাশি এই অঞ্চলে উৎপাদিত ফল (যেমন: আম, লিচু) ও শাকসবজি সংরক্ষণ ও পরিবহনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কারণ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের খাদ্যাভাস পরিবর্তিত হয়। আয় বৃদ্ধি ফল ও শাকসবজির চাহিদা বৃদ্ধি ঘটায়। কৃষির বৈচিত্র্যকরণ ও কৃষিকে আরও লাভজনক করবার ক্ষেত্রে এই খাতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে এর সুবিধা থেকে কৃষক বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই, এই অঞ্চলে উৎপাদিত ফল ও শাকসবজির স্বাস্থ্যসম্মত

সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এই খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।

কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকাণ্ড এবং জীবনীশক্তি। উৎপাদনশীলতা, আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্যসহ প্রায় সব কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত একটি দেশ। প্রাথমিক পণ্য হিসেবে এখন অনেক কৃষিজাত পণ্যই বাংলাদেশ বিদেশে রপ্তানি করছে। যেকোনো পণ্য প্রাথমিক পণ্য বা কাঁচামাল হিসেবে রপ্তানি করার চেয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্য হিসেবে রপ্তানি করা সম্ভব হলে আয় অনেক বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন ঘটে অনেক বেশি। এর ফলে শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং কর্মসংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ একটি উৎকৃষ্ট অঞ্চল; কারণ এই অঞ্চলটি কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এখানে কৃষি শিল্পের প্রসার ঘটানো খুবই সহজ ও লাভজনক। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পাশাপাশি এ অঞ্চলের চা শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি, ২০১৬' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। উল্লেখ্য, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। রংপুর বিভাগের বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে সহজেই এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পরিসর আরও বিস্তৃত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) আরও অধিক জনগোষ্ঠীকে এর নৈপুণ্য বিকাশকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেমন রেডিও-টিভি মেরামত, হাউজওয়্যারিং অ্যান্ড মোটর ওয়েন্ডিং, চামড়াজাত পণ্য তৈরি, উন্নতমানের বাঁশজাত পণ্য তৈরি, টেইলরিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, পাটজাত দ্রব্য তৈরি, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ (মারকার পেনসিল তৈরি), শ্যালো মেশিন মেরামত, রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনার রিপেয়ারিং ইত্যাদি এবং নৈপুণ্য বিকাশকেন্দ্রবহির্ভূত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স যেমন- মৌমাছি পালন, শতরঞ্জি তৈরি, বেনারসী শাড়ী তৈরি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে এই অঞ্চলের জনগণকে কারিগরীভাবে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

মানবসম্পদ

মানবসম্পদই বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কারণ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল

কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হবার ক্ষেত্রে মানব সম্পদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং এই অবদানের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮)। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালালেও এক্ষেত্রেও রংপুর বিভাগের বিশাল জনগোষ্ঠী উপেক্ষিত রয়েছে যা এই বিভাগের ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বেকারত্বের হার (৮.০%) দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ, এই বিভাগে বেকারত্বের হার বাংলাদেশের সামষ্টিক বেকারত্বের হারের (৪.২%) প্রায় দ্বিগুণ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

তাই রংপুর বিভাগের অন্তর্ভূক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের এত বিশাল জনগোষ্ঠীকে যদি বিভিন্ন ধরনের কর্মমুখী শিক্ষা তথা কারিগরি প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দেশে-বিদেশে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়, তাহলে এই মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়েই রংপুর বিভাগের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা সম্ভব।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি রংপুর বিভাগের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে অবস্থিত। এই কয়লা খনিতে মজুদের পরিমাণ ৩৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং এখানে বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায়। এই খনি থেকে প্রাপ্ত কয়লা দিয়ে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)। এই খনিতে অনেক মানুষ কর্মরত থাকলেও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে তা কার্যকর ফলাফল আনয়ন করতে পারছে না। সে জন্য এ কয়লা খনিতে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লোকবল নিয়োগ দিয়ে একদিকে যেমন এ অঞ্চলের মানুষের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব, অন্যদিকে শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুললে সেখানে এই খনির কয়লা দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করা সম্ভব। এর ফলে এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হওয়ার পাশাপাশি অঞ্চলটিও সামগ্রিকভাবে উন্নত হবে, যাকে সম্ভাবনা হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

দিনাজপুর লোহার খনি

রংপুর বিভাগের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরে দেশের প্রথম লোহার খনির সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)। জিএসবি জানিয়েছে, খনিটিতে উন্নত মানের লোহার আকরিকের (ম্যাগনেটাইট) পাশাপাশি মূল্যবান কপার, নিকেল ও ক্রোমিয়ামের উপস্থিতিও রয়েছে যার পরিমাণ প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ মিলিয়ন টন। এছাড়াও এই খনির পাশে নতুন করে দীঘিপাড়া কয়লা খনির কাজ চলছে। এসব খনি থেকে পুরোদমে উত্তোলন শুরু হলে উত্তরাঞ্চলসহ সারা দেশের মানুষদের জীবনমান পাল্টে যাবে। কর্মসংস্থান হবে এখানকার মানুষদের। দেশেরও লাভও হবে (দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৮, ২০১৯)।

স্থলবন্দর

স্থলবন্দর হলো সীমান্তে অবস্থিত আন্তদেশীয় পণ্য ও যাত্রী যাতায়াত এবং বিনিময় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র। বর্তমানে রংপুর বিভাগে প্রস্তাবিত একটি স্থলবন্দরসহ মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ৫টি। যথা: বাংলাবান্ধা

স্থলবন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
হিলি স্থলবন্দর, হাকিমপুর, দিনাজপুর।
বিরল স্থলবন্দর, বিরল, দিনাজপুর।
বুড়িমারী স্থলবন্দর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
সোনাহাট স্থলবন্দর, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

উপরোক্ত স্থলবন্দরগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো সহজ যাবে। উদাহরণে হিসেবে বলা যায়, দিনাজপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হলে এখানকার উৎপাদিত পণ্য সহজে হিলি, বিরল ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত, নেপাল ও ভুটানে রপ্তানি করা সহজ হবে। যার ফলে এই অঞ্চলের মানুষ একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন সাধিত হবে। তা ছাড়া, এসব স্থলবন্দর দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে গমনাগমন সহজ হবে।

বিমানবন্দর

ব্রিটিশ আমলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শিবগঞ্জ এলাকায় ২৫০ একর জমির উপর নির্মিত বিমানবন্দরটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের সব ধরনের অবকাঠামো রয়েছে। এটি চালু করতে তেমন কোনো খরচ হবে না। এই বিমানবন্দর চালু হলে একদিকে যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে এই অঞ্চলের মানুষেরা চলাচলের নিমিত্তে আরও বিকল্প উপায় পাবে। পাশাপাশি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দরে রুপান্তর করার নিমিত্তে সরকার কাজ করছে (প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৬)। এই বিমানবন্দরগুলোকে ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আমাদের দেশের জনগণ বিশেষ করে এই অঞ্চলের জনগণ যেকোনো প্রয়োজনে সহজে যাতায়াত করতে পারবে।

সমস্যাসমূহ

রংপুর বিভাগের উন্নয়নের সম্ভাবনাসমূহকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলো সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হয় তা নিম্নরূপ:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালনকারী উপাদান। রংপুর বিভাগের জেলাগুলি নানাবিধ কারণে এক্ষেত্রে পশ্চাদ্পদ। সরকার এ সমস্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করলে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রের মাত্রা হ্রাস ও অঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভাগভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান তুলনা করলেই সহজেই আঞ্চলিক বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রংপুর বিভাগে বৈদেশিক কর্মসংস্থান (১,৪১,৪৭৫ জন) বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ ময়মনসিংহের

সারণি ১: বিভাগ ভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান (২০০৫-২০১৮)

বিভাগ	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান		বিভাগ	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	
		সংখ্যা	%			সংখ্যা	%
	কুমিল্লা	৮,৭৩,৪৩৮	১০.৭৬		মাগুরা	৩৭,৫৭২	০.৪৬
	চট্টগ্রাম	৬,৮০,৬৬১	৮.৩৮	খুলনা (৫,৩৯.৩৪১ জন বা, ৬.৬৪)	সাতক্ষীরা	৩৭,২৮১	০.৪৬
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪,৩৮,১২৬	৫.৪০		বাগেরহাট	৩৭,২৮৯	০.৪৬
	চাঁদপুর	৩,৩২,৯৩৬	৪.১০		খুলনা	৩৬,০১৪	০.৪৪
চট্টগ্রাম (৩১,৭০,৬১১ জন বা, ৩৯.০৪%)	নোয়াখালী	৩,১৮,৩২১	৩.৯২		নড়াইল	৩২,৪২০	০.৪০
	ফেনী	২,১২,৫২৪	২.৬২		মোট	৫,৩৯,৩৪১	৬.৬৪
	লক্ষীপুর	১,৯৯,৭৩২	২.৪৬		বগুড়া	১,০৮,২৬৩	১.৩৩
	কক্সবাজার	৯৮,৮২৬	১.২২		পাবনা	৯৪,০২৭	১.১৬
	খাগড়াছড়ি	৭,৮০৮	০.১০		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৬,৭৬৪	০.৯৫
	রাঙ্গামাটি	৪,৪৮১	০.০৬	রাজশাহী	নওগাঁ	৬৩,৩৫৪	০.৭৮
	বান্দরবন	৩,৭৫৮	০.০৫	(৪,৯৯,৮৫৫	সিরাজগঞ্জ	৫৮,০৯৮	০.৭২
	মোট	৩১,৭০,৬১১	৩৯.০৪	জন বা, ৬.১৬)	রাজশাহী	৩৯,৩২৪	০.৪৮
	টাঙ্গাইল	৪,০১,২৯২	৪.৯৪		নাটোর	৩৮,৬১৭	০.৪৮
	ঢাকা	৩,৬৯,২০৭	৪.৫৫		জয়পুরহাট	২১,৪০৮	০.২৬
	মুন্সীগঞ্জ	২,৩৭,৪০৬	২.৯২		মোট	৪,৯৯,৮৫৫	৬.১৬
	নরসিংদি	২,৩১,৯৩৭	২.৮৬		বরিশাল	১,১৪,৪১৫	১.৪১
	নারায়ণগঞ্জ	২,০৩,১০৪	২.৫০		ভোলা	৭৪,৬২১	০.৯২
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	২,০২,৬৯৩	২.৫০	বরিশাল	পিরোজপুর	৪৮,২৬৬	০.৫৯
(২৫,১৬,৭৯৫	গাজীপুর	১,৮৬,৯৭৫	২.৩০	(৩,৩৬,২২৭	বরগুনা	৩৫,৩০৫	০.৪৩
জন বা,	ফরিদপুর	১,৭৬,৭৩০	২.১৮	জন বা, ৪.১৪)	পটুয়াখালী	৩৩,৬৩৩	০.৪১
৩০.৯৯%)	মানিকগঞ্জ	১,৭৩,০২৩	২.১৩		ঝালকাঠি	২৯,৯৮৭	০.৩৭
	মাদারীপুর	১,১২,৯৫৪	১.৩৯		মোট	৩,৩৬,২২৭	৪.১৪
	শরীয়তপুর	১,০৮,৩৪০	১.৩৩		ময়মনসিংহ	১,৭৮,৪৭৩	২.২০
	রাজবাড়ী	৬৩,৬৭১	০.৭৮	ময়মনসিংহ	জামালপুর	৭১,৬১৮	০.৮৮
	গোপালগঞ্জ	৪৯,৪৬৩	০.৬১	(৩,০৫,২৮৮	নেত্রকোণা	৩৭,৯৩৭	০.৪৭
	মোট	২৫,১৬,৭৯৫	৩০.৯৯	জন বা, ৩.৭৬)	শেরপুর	১৭,২৬০	০.২১
	সিলেট	১,৯৬,২৯৬	২.৪২		মোট	৩,০৫,২৮৮	৩.৭৬
সিলেট (৬,১১,৩১৪	মৌলভীবাজার	১,৬০,৫১৪	১.৯৮		গাইবান্ধা	৩৫,৫৭১	০.৪৪
জন বা,	হবিগঞ্জ	১,৪৫,৩৮৪	১.৭৯		রংপুর	২৮,২৩৯	০.৩৫
৭.৫৩)	সুনামগঞ্জ	১,০৯,১২০	১.৩৪		দিনাজপুর	২২,০৫১	০.২৭
	মোট	৬,১১,৩১৪	৭.৫৩	রংপুর	কুড়িগ্রাম	১৮,৬৭৭	০.২৩
	যশোর	৯৬,৭২৭	১.১৯	(১,৪১,৪৭৫	নীলফামারী	১৩,৯৫৫	০.১৭
খুলনা	কুষ্টিয়া	৮৬,৩৫৭	১.০৬	জন বা, ১.৭৪)	ঠাকুরগাঁও	১১,৪৩৮	০.১৪
(৫,৩৯,৩৪১	ঝিনাইদহ	৭৬,৭৯৭	০.৯৫		লালমনিরহাট	৬,৬১৩	০.০৮
জন বা,	মেহেরপুর	৫৮,৬৪২	০.৭২		পঞ্চগড়	৪,৯৩১	০.০৬
৬.৬৪)	চুয়াডাঙ্গা	৪০,২৪২	০.৫০		মোট	১,৪১,৪৭৫	১.৭৪
সর্বমোট = ৮১,২০,৯০৬ জন							

উৎস: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০১৯।

(৩,০৪৫,২৮৮ জন) মাত্র ৪৬.৩৪ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, শুধু কুমিল্লা জেলায় (৮,৭৩,৪৩৮ জন) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার (১০.৭৬%) রংপুর বিভাগের (১,৪১,৪৭৫ জন বা, ১.৭৪%) চেয়ে প্রায় ৬.১৭ গুণ বেশি।

বেকারত্ব

বাংলাদেশের অন্য যেকোনো বিভাগের চেয়ে রংপুর বিভাগে বেকারত্বের হার সর্বাধিক যা এই বিভাগের উন্নয়নের পথে এক বিশাল অন্তরায়। তাই রংপুর বিভাগকে উন্নত করতে হলে এই বিভাগের বেকাত্বের হার প্রশমনে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায়, এই ভগ্নদশা থেকে এই বিভাগের উত্তরণ অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার।

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বেকারত্বের হার (৮.০%) বাংলাদেশের সামষ্টিক বেকারত্বের হারের (৪.২%) প্রায় দ্বিগুণ।

সারণি ২: ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বিভাগভিত্তিক বেকারত্বের হার

বিভাগ	গ্রাম			শহর			সর্বমোট		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
রংপুর	৪.৪	১৪.৮	৭.৭	৫.১	২০.৫	৯.৩	৪.৫	১৫.৬	৮.০
চট্টগ্রাম	৩.১	৭.৫	৪.৭	২.৮	৭.৭	৪.২	৩.০	৭.৫	৪.৫
বরিশাল	৩.৪	৫.১	৩.৯	৫.২	১১.৮	৬.৮	৩.৮	৬.১	৪.৪
খুলনা	২.৭	৫.৪	৩.৭	২.৫	৮.৮	৪.৩	২.৭	৬.০	৩.৮
ঢাকা	২.৪	৪.৭	৩.০	৩.১	৫.৬	৩.৮	২.৭	৫.১	৩.৩
সিলেট	২.৭	৪.২	৩.০	২.৫	৬.২	৩.১	২.৬	৪.৪	৩.১
রাজশাহী	২.৪	৩.১	২.৭	২.৮	৮.৪	৪.৫	২.৫	৩.৯	৩.০
সর্বমোট	২.৯	৬.৫	৪.১	৩.২	৭.৭	৪.৪	৩.০	৬.৮	৪.২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ত্রৈমাসিক শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৫-২০১৬, বিবিএস, ঢাকা, ২০১৭।

অবকাঠামোগত দুর্বলতা

অবকাঠামোগত দিক থেকেও রংপুর বিভাগ অনেক পিছিয়ে রয়েছে যার অন্যতম প্রধান কারণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য যা ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এডিপি'র বরাদ্দের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি)-এর 'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটিতে প্রতীয়মান হয়েছে। বিআইপির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এডিপি'র বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্রটি নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, উল্লিখিত সময়ে রংপুর বিভাগে এডিপি'র বরাদ্দ মাত্র ৩.১৩ শতাংশ যা বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ ময়মনসিংহের (৩.৫৩%) প্রাপ্ত বরাদ্দের চেয়েও কম। প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বৈষম্য শুধু বিভাগগুলোর মধ্যেই নয়, একই সঙ্গে তা একটি বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। বাংলাদেশের জেলাগুলোয় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বৈষম্য রয়েছে। দেশের মধ্যাঞ্চল তুলনামূলকভাবে বরাদ্দের বেশির ভাগ অংশ পেয়ে থাকে। এডিপিতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পাওয়া জেলাগুলো হচ্ছে নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর ও বগুড়া।

সারণি ৩: ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিভাগভিত্তিক বরাদ্দ

বিভাগ	এডিপিতে বরাদ্দের হার
ঢাকা	৩৮.৫৪
চট্টগ্রাম	২৭.৭৫
রাজশাহী	১০.১২
খুলনা	৮.২০
সিলেট	৪.৫৬
বরিশাল	৪.১৮
ময়মনসিংহ	৩.৫৩
রংপুর	৩.১৩

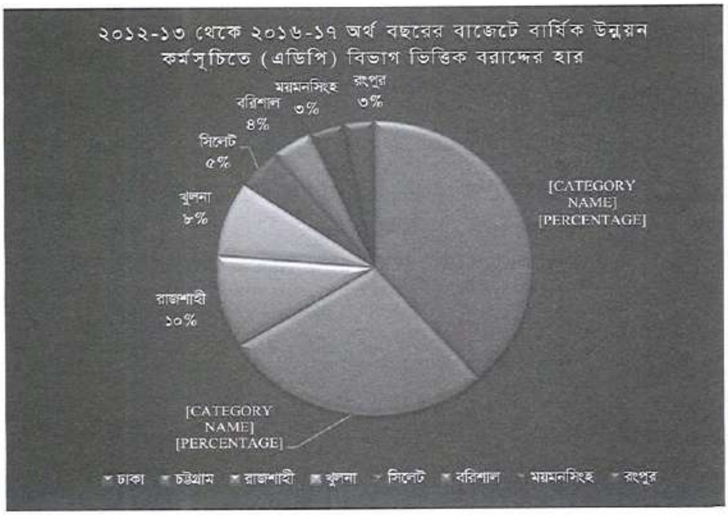

উৎস: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৯ মে ২০১৯

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে বৈষম্য

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বের যেসব দেশ সবচেয়ে অরক্ষিত অবস্থায় আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশের লাখ লাখ নাগরিক নানা সময়ে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দাবদাহ ও খরার মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গাংগেয় ব-দ্বীপ অনেকাংশে ডুবে যাবে।

রংপুর বিভাগ কৃষিনির্ভর হওয়ায় খরা এই অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। তবে দুঃখের বিষয় হলো খরা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপেও বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈষম্য উন্নয়নের অনুসঙ্গী তবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা সবসময় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব। বৈষম্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব না হলে বা এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যা সরকারের বিভিন্ন প্রকাশনায় স্বীকৃত, এমনকি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্যার সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি ও তা সমাধানের কর্মকৌশল প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এই বৈষম্য বহুমাত্রিক ও বিবিধ কারণে তা সৃষ্ট।

আঞ্চলিক বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ সরকারের জ্বালানি নীতি ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ। বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি তথা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সমস্যা খরা মোকাবিলায় সরকারের অবহেলার চিত্র সারণি- ৪ এ ফুটে ওঠে।

সারণি ৪: বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কর্মসূচি

Policy & Strategic Documents/Action plan	Projects/Strategies/ Objectives/ Priority Activities (total)	Related with droughts	Remarks
NAPA 2005	15(Priority Areas)	1	To promote research on drought resilient crops
National Food Policy 2008	26 (Area of Intervention)	0	Nothing on drought
BCCSAP 2009	44 (Programs)	1	R & D on the climate resilient cropping system and drought management option for farmers
Environment & Forest Ministry (MOEF)	25 (Projects for the period of 2009-14)	1	Related with forestation in 'Barind Tract'.
Sixth Five Year Plan (SFYP) 2011-15	35 (Proposed Program)	2	Related to research on climate resilient cultivars and adaptation to climate change, even no specific target was set and no concern on irrigation
National Agriculture Policy (NAP) 2013	9 (objectives)	0	Nothing to fight against drought
Ministry of Agriculture	62 (Projects of ADB on 2013-14)	3	Related with irrigation under BMDA routine projects. Nothing is there emphasizing the drought.
Prospective Plan 2010-2021	44	1	Only acknowledged the need of drought resilience seeds and efficient irrigation but no specific action.
Bangladesh Climate Change Trust Fund	207 (Projects for 2014)	4	Research on drought resilient crops, excavation and re-excavation of water-bodies & Forestation. Only 0.9 percent of total expenditure.

দারিদ্র্য

দারিদ্র্য হার হ্রাস রাষ্ট্র ও সমাজের আর্থসামাজিক অগ্রগতির অন্যতম নির্দেশক। সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ছিল ৪০ শতাংশ, মাত্র এক দশকের ব্যবধানে ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও এখনো মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। জনসংখ্যার বিরাট এই অংশকে দারিদ্র্যভুক্ত রেখে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। তাই, এখনো দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলপত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেবে দেশের ৩৬টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থান করছে। পক্ষান্তরে,

নিম্ন দারিদ্র্যরেখার হিসাব অনুসারে ৩১টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থান করছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)।

দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক মানক উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করলেও বাংলাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ভিন্ন। এক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ অন্যান্য বিভাগ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার নিম্নোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	উচ্চ দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী			নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
রংপুর	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩
ময়মনসিংহ	৩২.৮	৩২.৯	৩২.০	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮
রাজশাহী	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫	১৪.২	১৫.২	১০.৭
খুলনা	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩	১২.৪	১৩.১	১০.০
বরিশাল	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪	১৪.৫	১৪.৯	১২.২
চট্টগ্রাম	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯	৮.৭	৯.৬	৬.৫
সিলেট	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫	১১.৫	১১.৮	৯.৫
ঢাকা	১৬.০	১৯.২	১২.৫	৭.২	১০.৭	৩.৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী রংপুর বিভাগে (৪১.৫%) দারিদ্রের হার নিকটবর্তী ময়মনসিংহ বিভাগ (৩২.৮%) থেকেও প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি যার ফলে এই অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, অন্যথায় এই বিশাল জনসংখ্যাকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের না করে এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বাজেট বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেখানে কোনো একটি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয় আয় তথা কল্যাণের সাম্যভিত্তিক অংশীদার হতে পারে। উন্নয়ন অংশীদারীত্বের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এবং উন্নয়নের ফল প্রপ্তির ক্ষেত্রে দুই ধরনের নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, তা যথাক্রমে:

ক) প্রাকৃতিক ও ভৌত বৈশিষ্টাবলী, যেমন জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য, অনুন্নত অবকাঠামো, সম্পদের অপ্রতুলতা ইত্যাদি এবং

খ) সরকারের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন অংশীদারীত্বের প্রশ্নে উত্তরাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী এই উভয় কারনেই উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার। উত্তরাঞ্চল বলতে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মোট ১৬টি জেলাকে[১] বোঝানো হয়েছে। এই বৈষম্যের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণিত। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক

১. বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ও ঠাকুরগাঁ।

সারণি ৬: ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কয়েকটি জেলায় প্রদত্ত বরাদ্দের পরিমাণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

জেলা	সর্বমোট ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয়
চট্টগ্রাম	৫৬৮২,৭৪,৭৯	২৫৭৯,৭৯,৪২
খুলনা	৩২৯২,৯৪,৬০	১৯৭১,৬২,২৮
টাঙ্গাইল	২২৩৪,৯৪,২৬	৯০৫,৭৩,৪৬
সিলেট	২১৭৪,৭৫,৮১	৮৭২,৯১,৭৬
রাজশাহী	২১৪৯,৭৮,৫৮	৫৯৪,৯৭,০৫
বরিশাল	২১০৬,৫১,০৫	৭৭৮,৭৮,০০
রংপুর	২০০৮,৪৩,৭৪	৭২৫,১১,৫৬

উৎস: বাংলাদেশের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

বৈষম্য যত বৃদ্ধি পাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা তত বৃদ্ধি পাবে। বাজেটে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বরাদ্দ প্রদান প্রয়োজন। বাজেটে বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক বৈষম্য বিদ্যমান তা বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার বাজেটের তুলনামূলক চিত্র থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত সারণিতে উল্লেখিত জেলাগুলোর মধ্যে রংপুর জেলায় বাজেট বরাদ্দ সর্বনিম্ন যা আঞ্চলিক বৈষম্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। তাই, এই অঞ্চলের উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে রংপুর বিভাগের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি।

জ্বালানি ও শিল্পকলকারখানার অভাব

দেশের সব অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে সকল অঞ্চলে জ্বালানির সুষম বণ্টনের বিকল্প নেই। কিন্তু এই দিক দিয়েও রংপুর বিভাগ অবহেলিত কারণ এই অঞ্চলে সরাসরি জ্বালানি তথা গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নেই (দৈনিক সমকাল, মার্চ ১০, ২০১৮) যার ফলে এই অঞ্চলে শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠে নি। এজন্য জ্বালানি সমস্যার কারণে এই অঞ্চল পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সরবরাহ আছে এরকম অঞ্চল থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যা এই অঞ্চলের অগ্রগতিতে বাধাস্বরূপ। সিলিন্ডারের মাধ্যমে যদিও এই অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু মূল্য, প্রায়োগিক দিক ও কার্যকারিতা বিবেচনায় এই সিলিন্ডারের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্যাস আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিবেচনায় খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এমনকি এই অঞ্চলের পরিবহন খাতও পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সরবরাহ আছে এ রকম অঞ্চল থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

করণীয়

১. মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে। এই অঞ্চলের জেলাগুলিতে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আয়বৈষম্য অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা সম্ভব। যেখানে সরকার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিহীনভাবে কোটা ব্যবস্থা চালু রেখেছে, সেখানে বাস্তবতার

নীরিখে এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আয়বৈষম্য হ্রাসে উল্লিখিত ব্যবস্থা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

২. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদী জমি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামনের দিনগুলিতে কৃষি গুরুত্বের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করবে। কৃষির ঝুঁকি হ্রাস ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এ অঞ্চলে আয় সৃষ্টির মাধ্যমে আয়বৈষম্য ও দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা পালন করবে। কৃষির অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিনিয়োগ এক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে সেচের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। তাছাড়া বিপণন অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।

৩. সরাসরি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। কারণ এর ফলে এই বিভাগের মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠলে একদিকে যেমন পুরুষের সাথে নারীরাও গৃহস্থালির কাজকর্ম সম্পাদন করার পাশাপাশি স্থানীয় কলকারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে সংসারে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে পারবে, অন্যদিকে কলকারখানাগুলো তুলনামূলকভাবে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে নারীদের একদিকে যেমন কাজের জন্য ঢাকা বা অন্য কোনো শহরে স্থানান্তরিত হতে হবে না, অন্যদিকে নারীরা সরাসরি অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হলে তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৪. সরকারি খরচের বৈষম্য দূর করতে হবে। গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত গ্যাস আঞ্চলিক আয়বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া এই অঞ্চলে গরুর গোবর নির্ভর গৃহস্থালী জ্বালানিব্যবস্থা কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। গৃহস্থালী কাজে ন্যায্য মূল্যে সিলিন্ডারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করে আয়বৈষম্য হ্রাস ও কৃষি জমির উর্বরতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে দীর্ঘ মেয়াদে আয়বৈষম্য হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫. শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধি ও বিদ্যমান অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করবার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অংশীদারীত্বের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে বৈকালিক বা সান্ধ্যকালীন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকশিত হয়। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশে বিশেষ প্রনোদনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে। শিল্পে ও পরিবহনে জ্বালানি সমস্যা নিরসনে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৭. কৃষিপণ্যের বিপণনব্যবস্থার দুর্বলতা বাংলাদেশে কৃষি খাতের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্থ করছে। বিপনন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় কৃষির বৈচিত্র্যকরণ জরুরি। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

ক) বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
খ) সেচের ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
গ) কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে পূর্ব বাংলার জনগণ আশা পোষণ করেছিল পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাঙালির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক মহল পূর্ব বাংলাকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে ভাবতে থাকে এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ শুরু করে। পূর্ব বাংলার জনগণ রাজস্ব আয়-ব্যয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, উন্নয়ন প্রকল্প, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের বন্টন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শোষণের শিকার হতে থাকে। এরূপ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। যার সফল পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও এই ধরনের বৈষম্য দৃশ্যমান রয়েছে। জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর বিভাগ আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হওয়ার পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বেকারত্ব হ্রাস, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ খাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি খাতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে যা আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রতীয়মান হয়েছে। উপরোক্ত বৈষম্যগুলো নিরসন করা না গেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচারের নিশ্চয়তা থাকবে - প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধটি এই ধরনের বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দাবি রাখে।

তা ছাড়া, দেশের সকল জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রংপুর বিভাগ কৃষিনির্ভর হওয়ায় এই অঞ্চলের কৃষি খাতে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি এখানকার বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতসহ সামাজিক খাতসমূহে বিনিয়োগের সাথে এই অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা গেলে তা যেমন এই অঞ্চল তথা দেশের জন্য লাভজনক তেমনি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের উচিত জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রতি বৈষম্য না করা এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারণ কোনো একটি অঞ্চলকে বাদ দিয়ে কোনো দেশেরই সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অর্থবছরের জাতীয় বাজেট।

৩. খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৬. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৮. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি) এর 'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন।

৯. ত্রৈমাসিক শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৫-২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

১০. দৈনিক কালের কণ্ঠ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা।

১১. দৈনিক সমকাল, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

১২. দৈনিক প্রথম আলো, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

১৩. বাংলা ট্রিবিউন (অনলাইন সংবাদমাধ্যম), পান্থপথ, শুক্রাবাদ, ঢাকা।

১৪. দৈনিক ইনকিলাব, আর কে মিশন রোড, ঢাকা।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২১৯-২৩২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর বিভাগের অনগ্রসরতা: উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক*

সারমর্ম *বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি স্থায়ী সমস্যা। এ দেশের বিপুল জনশক্তিকে বেকারত্ব এবং নিম্ন আয়ের সমস্যা থেকে মুক্ত করার প্রধান বিকল্প হতে পারে বৈদেশিক নিয়োগ। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রংপুর অঞ্চল, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কর্মপ্রচেষ্টার সুফল বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতার সমস্যাটি রয়ে গেছে। রংপুর অঞ্চলে প্রবাসীর সংখ্যা কম হওয়ায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়। রংপুর বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ০.৮৬% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রাম বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ১১.৩১% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। রংপুর বিভাগে গড়ে প্রতি বর্গ কি.মি. ০৮ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত, কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগের আলোচ্য জেলাসমূহে এই সংখ্যা ১৬৫ জন যা রংপুর বিভাগের তুলনায় ২০ গুণ বেশি। চট্টগ্রাম বিভাগের জনসাধারণ নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এ অঞ্চলের মানুষ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সংগ্রামী, বহির্মুখী এবং কষ্টসহিষ্ণু। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অগ্রজ অভিবাসীদের দ্বারা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বৈদেশিক নিয়োগলাভে অগ্রসর হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অগ্রগামী হওয়ার পেছনে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পুল এবং পুশ উভয় প্রভাবের ভূমিকা লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে, রংপুর অঞ্চলের বেশির ভাগ জনসাধারণ অধিক হারে কৃষিনির্ভর। তারা অর্থনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের সাথে তেমন পরিচিত নয়। তারা স্বল্প আয়-উপার্জনের মাধ্যমে সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ফলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বহির্মুখী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ বা বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াসে অগ্রগামী অথবা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তারা উচ্চাভিলাষী হতে পারেনি। এই অঞ্চলের অল্পসংখ্যক মানুষ বিদেশে অবস্থান করার ফলে নিজেদের মধ্যে কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট*

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি, উপসচিব (প্রেষণে) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর; ফোন: ০১৭৩২৩৯৪৯৯৫, ই-মেইল:abr_razzaque@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক দিনাজপুর আঞ্চলিক সেমিনার-২০১৯-এ পঠিত, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯।

তথ্যের আদান-প্রদান সীমিত, বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান সম্পর্কে স্থানীয়দের জানাশোনা কম এবং বেকারদের জন্য বৈদেশিক নিয়োগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস তেমন জোরালো নয়। আবার, রংপুর অঞ্চলে প্রবাসী সংখ্যা কম হওয়ায় প্রদর্শন প্রভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পুল প্রভাবের ভূমিকা সামান্য এবং পুশ প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত। আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য রংপুর অঞ্চলের জনসাধারণের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পড়ার একটি কারণ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বাজারের ব্যাপ্তি অনুসন্ধান ও নতুন কর্মক্ষেত্রের তথ্য উন্মোচন করা প্রয়োজন। আঞ্চলিক উন্নয়নে অগ্রগতি ও ভারসাম্য অর্জনের জন্য রংপুর বিভাগের কর্মক্ষম জনশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগের অবাধ প্রবাহ, কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্সির অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ, স্থানীয় পর্যায়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার মাধ্যমে জনসচেতনতা, প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক ব্যয়ের কথা বিবেচনায় নিয়ে জনশক্তি রপ্তানির লক্ষে উদ্ভাবনী কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলের মানবসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। অদক্ষ, অর্ধদক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। জনশক্তি রপ্তানি বাড়িয়ে বাংলাদেশের জনসম্পদকে উন্নয়নের মূল শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

মূল শব্দ প্রকট বেকারত্ব, বিদেশ, কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স, দক্ষ জনশক্তি, অনীহা, অনগ্রসরতা, নদীভাঙ্গন, লবণাক্ততা, রংপুর অঞ্চলের অনগ্রসরতা

১. ভূমিকা

প্রকট বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। দেশেশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বেকার। বাস্তবতা এমন যে, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ অনেকে তাদের যোগ্যতার মানদণ্ডে কাজ খুঁজে পেতে সক্ষম হন না। আবার, প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মক্ষম জনগণ বিদ্যমান বেকার জনশক্তির সাথে যুক্ত হচ্ছেন। অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজার সীমিত হওয়ায় বেকার সমস্যার সমাধান করা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশের বিপুল জনশক্তিকে বেকারত্ব এবং নিম্ন আয়ের সমস্যা থেকে মুক্ত করার প্রধান বিকল্প হতে পারে বৈদেশিক নিয়োগ। কিন্তু, এক্ষেত্রে প্রয়োজন যথাযথ উদ্যোগ এবং বহুমুখী প্রচেষ্টা। বাংলাদেশি নাগরিকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বহির্বিশ্বে শ্রমশক্তির চাহিদার গতিপ্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে যেমন গভীর অনুসন্ধান ও উপলব্ধি প্রয়োজন, তেমনি এর উপযোগিতা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান অবস্থায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেশকিছু অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এবং এই অগ্রসর অঞ্চলের প্রবাসীগণ জাতীয় অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রংপুর অঞ্চল, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। এরূপ অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে জানা এবং কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জিত সুফল এ দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ধারাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ১৯৭৬ হতে ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত দেশের ১,২১,৯৯,১২৪ জন পুরুষ এবং মহিলা কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে ১৬৮টি দেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৮ খ্রি. বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা ৭,৩৪,১৮১ জন এবং তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৫,৫৪৪.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় ১,৩০,২৯৩.৬১ কোটির সমান।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং রেমিটেন্স (১৯৭৬-২০১৮)

সারণি-১

বছর	মোট কর্মসংস্থান	কর্মসংস্থানের গড় (বার্ষিক) প্রবৃদ্ধি হার	রেমিটেন্স (কোটি টাকায়)	রেমিট্যান্সের গড় (বার্ষিক) প্রবৃদ্ধি
১৯৭৬	৬০৮৭	-	৩৫.৮৫	-
১৯৮০	৩০০৭৩	৯৯	৪৯২.৯৫	৩১৯
১৯৮৫	৭৭৬৯৪	৩২	১,৪১৯.৬১	৩৮
১৯৯০	১০৩৮১৪	৭	২,৬৯১.৬৩	১৮
১৯৯৫	১৮৭৫৪৩	১৬	৪,৮৩৮.৩১	১৬
২০০০	২২২৬৮৬	৪	১০,১৯৯.১২	২২
২০০৫	২৫২৭০২	৩	২৭,৩০৪.৩৪	৩৪
২০১০	৩৯০৭০২	১১	৭৬,৬৩৯.৯৭	৩৬
২০১৫	৫৫৫৮৮১	৮	১১৯,৩৬৩.৬২	১১
২০১৮	৭৩৪১৮১	১১	১৩০,২৯৩.৬১	৩

উৎস: bmet.gov.bd (old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=20)

উদ্বৃত্ত জনশক্তির প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে। নিচে সারণি-১ এ ১৯৭৬ থেকে ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিপরীতে অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

১৯৭৬ খ্রি. ৬০৮৭ জনের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩৫.৮৫ কোটি টাকা ছিল। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সময়কালে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকলেও রেমিটেন্স প্রবাহের গতি নিম্নমুখী ছিল। ১৯৯৫ খ্রি. কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১,৮৭,৫৪৩ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৪,৮৩৮.৩১ কোটি টাকা হয়। ২০১৫ খ্রি. কর্মসংস্থানের পরিমাণ ৫,৫৫,৮৮১ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯,৩৬৩.৬২ কোটি টাকা হয়েছে।

৩. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসীবান্ধব কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর মুক্ত স্বদেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭২ খ্রি. ২০ জানুয়ারি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার প্রদান করে সরকার

২০০১ খ্রি. ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করে। বাংলাদেশের বাইরে বহির্বিশ্বে কর্মী প্রেরণ এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি দপ্তর/সংস্থা যেমন—বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিদেশে কর্মী প্রেরণ ও তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সেবা প্রদান করছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গুণগত মান উন্নয়ন, উৎকর্ষসাধন ও যুগোপযোগী শিক্ষার সাথে পরিচিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ খ্রি. ৭০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে মোট ৬,৮১,৭৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাপানিজ, কোরিয়ান, আরবি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার কোর্স চালু রয়েছে। এ ছাড়া, বিদেশে নারী অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান এবং নারী অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নারী কর্মীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চলমান রয়েছে।

প্রবাসীদের জন্য নীতিমালা ও আইন প্রণীত হয়েছে এবং বিদেশে ৩০টি শ্রমকল্যাণ উইং স্থাপন করা হয়েছে। স্বল্প সময়ে সহজ শর্তে অভিবাসন ও পুনর্বাসন ঋণ প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে প্রবাসী কল্যাণ শাখা বা ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ এবং কর্মপ্রচেষ্টার সুফল বেকারত্ব হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতার সমস্যাটি রয়ে গেছে। এই সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুধাবন করা যেমন প্রয়োজন, এই অবস্থা থেকে মুক্তি বা উত্তোরণের উপায় অনুসন্ধান করা তেমন জরুরি।

৪. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতার প্রকৃতি

আলোচনার সুবিধার্থে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের সাথে অগ্রসর অঞ্চল হিসাবে চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার ২০০৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত বেদেশিক কর্মসংস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়নে অনগ্রসর হওয়ায় রংপুর অঞ্চল বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও অনগ্রসর রয়ে গেছে। রংপুর অঞ্চলে কৃষিকাজের সাথে নিয়োজিত জনসংখ্যা বেশি। যেখানে অভ্যন্তরীণ নিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ কম হলেও ছদ্ম বেকারত্বের হার বা খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশগামী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণের মতো মানুষের সংখ্যা কম এবং বৈদেশিক নিয়োগ লাভের জন্য বহির্মুখী হওয়ার প্রবণতা কম। ফলে প্রবাসীর সংখ্যা কম হওয়ায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়। নিচে সারণি ২ এর মাধ্যমে রংপুর বিভাগের জেলা ভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা ও প্রবাসীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

রংপুর বিভাগে পঞ্চগড় জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ৪ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বনিম্ন এবং গাইবান্ধা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ১৭ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বোচ্চ। দিনাজপুর জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ৬ জন এবং রংপুর জেলায় ১২ জন।

রংপুর বিভাগের জেলা ভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা এবং প্রবাসীর সংখ্যা
সারণি-২

জেলার নাম	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা	প্রবাসীর সংখ্যা (২০০৫-২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বগ কি.মি.)	জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রবাসীর হার (প্রতি হাজারে)	প্রবাসীর সংখ্যা (প্রতি বর্গ কি.মি.)
রংপুর	২৪০০.৫৬	২৯৯৬৩৩৩	২৮২৩৯	১২৪৮	৯	১২
গাইবান্ধা	২১১৪.৭৭	২৪৭১৬৭৯	৩৫৫৭১	১১৬৯	১৪	১৭
কুড়িগ্রাম	২২৪৫.০৪	২১৫০৯৭৩	১৮৬৭৭	৯৫৮	৯	৮
লালমনিরহাট	১২৪৭.৩৭	১৩০৫২৪৮	৬৬১৩	১০৪৬	৫	৫
নীলফামারী	১৫৪৬.৫৯	১৯০৭৪৯৬	১৩৯৫৫	১২৩৩	৭	৯
দিনাজপুর	৩৪৪৪.৩০	৩১০৯৬২৮	২২০৫১	৯০৩	৭	৬
ঠাকুরগাঁও	১৭৮১.৭৪	১৪৪৪৭৮২	১১৪৩৮	৮১১	৮	৬
পঞ্চগড়	১৪০৪.৬৩	১০২৬১৩৯	৪৯৩১	৭৩১	৫	৪

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

নিচে সারণি ৩ এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার জেলাভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা ও প্রবাসীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ৪০ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বনিম্ন এবং কুমিল্লা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ২৭৮ জন যা অন্যান্য জেলার তুলনায় সর্বোচ্চ। চট্টগ্রাম জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রবাসীর সংখ্যা ১২৯ জন।

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাভিত্তিক আয়তন, জনসংখ্যা এবং প্রবাসীর সংখ্যা
সারণি-৩

জেলার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা	প্রবাসীর সংখ্যা (২০০৫-২০১৮)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রবাসীর হার (প্রতি হাজারে)	প্রবাসীর সংখ্যা (প্রতি বর্গ কি.মি.)
কক্সবাজার	২৪৯১.৮৫	২৩৮১৮১৪	৯৮৮২৬	৯৫৬	৪১	৪০
কুমিল্লা	৩১৪৬.৩০	৫৬০২৬২৪	৮৭৩৪৩৮	১৭৮১	১৫৬	২৭৮
চট্টগ্রাম	৫২৮২.৯২	৭৯১৩৩৬৫	৬৮০৬৬১	১৪৯৮	৮৬	১২৯
চাঁদপুর	১৬৪৫.৩২	২৫১৩৮৩৭	৩৩২৯৩৬	১৫২৮	১৩২	২০২
নোয়াখালী	৩৬৮৫.৮৭	৩২৩১৮৩১	৩১৮৩২১	৮৭৭	৯৮	৮৬
ফেনী	৯৯০.৩৬	১৪৯৬১৩৮	২১২৫২৪	১৫১১	১৪২	২১৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৮৮১.২০	২৯৫৩২০৭	৪৩৮১২৬	১৫৭০	১৪৮	২৩৩
লক্ষীপুর	১৪৪০.৩৯	১৭৯৭৭৬০	১৯৯৭২২	১২৪৮	১১১	১৩৯

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78892733bc06eb/), (http://www.old.bmet.gov.bd/ BMET/stattisticalDataAction#)

নিচে চার্ট-১ এ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহের তুলনামূলক অবস্থান দেখানো হলো।

ডান পাশে চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা এবং বাম পাশে রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের সকল জেলায় (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা ২০ জনের নিম্নে। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জেলায় (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) প্রবাসীর সংখ্যা ১২০ জনের উর্ধ্বে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহের তুলনামূলক অবস্থান

চার্ট-০১

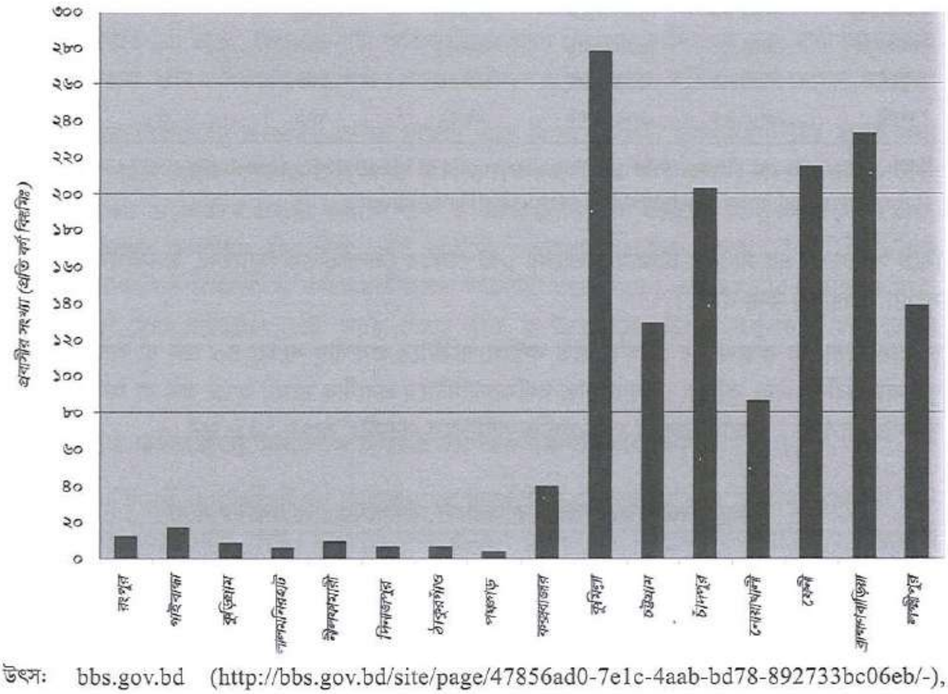

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

রংপুর বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ০.৮৬% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। পক্ষান্তরে, চট্টগ্রাম বিভাগের ০৮ জেলার মোট জনসংখ্যার ১১.৩১% বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত যা রংপুর বিভাগের তুলনায় ১৩ গুণ বেশি। রংপুর বিভাগে গড়ে প্রতি বর্গ কি.মি. ০৮ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত, কিন্তু, চট্টগ্রাম বিভাগের আলোচ্য জেলাসমূহে এই সংখ্যা ১৬৫ জন যা রংপুর বিভাগের তুলনায় ২০ গুণ বেশি। মোট পরিমাণের দিক থেকে রংপুর বিভাগের জনগণ বাংলাদেশের অন্য সকল বিভাগের চেয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অনগ্রসর (পরিশিষ্ট-১)।

রংপুর বিভাগের জেলাসমূহের তুলনায় চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার প্রবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু, রংপুর বিভাগের জেলাসমূহে মহিলা প্রবাসীর হার চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনায় বেশি। সারণি-৪ এ রংপুর বিভাগের জেলা ভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

রংপুর বিভাগ

জেলাভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর সংখ্যা

সারণি-৪

জেলার নাম	প্রবাসীর সংখ্যা	পুরুষ	পুরুষ (%)	মহিলা	মহিলা (%)	মন্তব্য
রংপুর	২৮২২৯	২৪৯১৮	৮৮	৩৩১১	১২	
গাইবান্ধা	৩৫৫৫০	৩১৮১৫	৮৯	৩৭৩৫	১১	
কুড়িগ্রাম	১৮৬৬৮	১৭০১০	৯১	১৬৫৮	৯	
লালমনিরহাট	৬৬১২	৫৩৭৩	৮১	১২৩৯	১৯	
নীলফামারী	১৩৯৫২	১১২৭৮	৮১	২৬৭৪	১৯	
দিনাজপুর	২২০৪২	১৭৮৭৫	৮১	৪১৬৭	১৯	
ঠাকুরগাঁও	১১৪৩১	৯৩৬৯	৮২	২০৬২	১৮	
পঞ্চগড়	৪৯৩০	৩৯১৫	৭৯	১০১৫	২১	

উৎস: bmet.gov.bd (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলাভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর সংখ্যা

সারণি-৫

জেলার নাম	প্রবাসীর সংখ্যা	পুরুষ	পুরুষ (%)	মহিলা	মহিলা (%)	মন্তব্য
কক্সবাজার	৯৮৮২২	৯৫২৫৭	৯৬	৩৫৬৫	৪	
কুমিল্লা	৮৭৩৩৩০	৮৪৮৬৫২	৯৭	২৪৬৭৮	৩	
চট্টগ্রাম	৬৮০৬৪৮	৬৭২৭৭৪	৯৯	৭৮৭৪	১	
চাঁদপুর	৩৩২৯০৬	৩২২৫১৪	৯৭	১০৩৯২	৩	
নোয়াখালী	৩১৮৩০২	৩১২১৫০	৯৮	৬১৫২	২	
ফেনী	২১২৫২৩	২১০৫৮৭	৯৯	১৯৩৬	১	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৩৮১২১	৪০৬৯১০	৯৩	৩১২১১	৭	
লক্ষ্মীপুর	১৯৯৭০৮	১৯৫৪৪৫	৯৮	৪২৬৩	২	

উৎস: bmet.gov.bd (http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction#)

রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট, নীলফামারী ও দিনাজপুরে পুরুষ ও মহিলা প্রবাসীর হার যথাক্রম ৮১% এবং ১৯%। কুড়িগ্রামে মহিলা প্রবাসীর সংখ্যা ৯% যা সর্বনিম্ন এবং পঞ্চগড় জেলায় মহিলা প্রবাসীর সংখ্যা ২১% যা তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ। নিচের সারণি-৫ এ চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার মহিলা ও পুরুষ প্রবাসীর হার উল্লেখ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও ফেনীতে মহিলা প্রবাসীর হার যথাক্রমে ১% যা সর্বনিম্ন এবং নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে ২%। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মহিলা প্রবাসীর হার ৭%, যা চট্টগ্রাম বিভাগে তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অগ্রসর অঞ্চলে মহিলা প্রবাসীর হার কম। কারণ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর পুরুষ প্রবাসীরা স্বচ্ছলতার সাথে পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম। তারা তাদের পরিবারের নারী সদস্য বা স্ত্রীদের বিদেশ যাওয়ার বিষয়ে অনাগ্রহী। পারিবারিক রক্ষণশীলতা, ধর্মীয় অনুভূতি, সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ববোধের কারণে এ অঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা কম। পক্ষান্তরে, রংপুর অঞ্চলে প্রবাসী মহিলা কর্মীর হার বেশি। কারণ, যে পরিবারে পুরুষ সদস্য পর্যাপ্ত আয় করেন না, সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি থাকে না, সেক্ষেত্রে মহিলা সদস্য বাধ্য হয়ে সংসারের হাল ধরতে এগিয়ে আসেন এবং কর্মসংস্থানে বিদেশমুখী পর্যন্ত হন। পুরুষ সদস্যের বেকারত্ব অথবা নিষ্ক্রিয়তার কারণে পারিবারিক হতাশা, আর্থিক দৈন্য ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। অনেক সময়, দেশের অভ্যন্তরে উপযুক্ত কাজ না পেয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মহিলারা বিদেশমুখী হন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করেন।

৫. বিভিন্ন বছরে রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বিভিন্ন বছরে রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পরিমাণ নিচের সারণি-৬ ও ৭ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন বছরে রংপুর বিভাগে জেলাওয়ারি বৈদেশিক কর্মসংস্থান

সারণি-৬

জেলার নাম	আয়তন	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৮
রংপুর	২৪০০.৫৬	৫৯৫	১০০৬	২৩৪৫	২৬৮৮
গাইবান্ধা	২১১৪.৭৭	৭৩৮	১০৮০	৩০১৫	৪৭৮৫
কুড়িগ্রাম	২২৪৫.০৪	২৮৬	৫৬৯	১৮০৬	২৫১১
লালমনিরহাট	১২৪৭.৩৭	৮৮	২৭৪	৫৯২	৬৮৯
নীলফামারী	১৫৪৬.৫৯	১৯৬	৬০৮	১৪০৯	১৫২৯
দিনাজপুর	৩৪৪৪.৩০	৩৭৭	৮৪৬	২১৫৪	২২১৫
ঠাকুরগাঁও	১৭৮১.৭৪	১৫৭	৪১২	১২৪৪	১৩৯৪
পঞ্চগড়	১৪০৪.৬৩	৬৫	২০৬	৫৪৫	৫৮১
মোট =	১৬১৮৫.০০	২৫০২	৫০০১	১৩১১০	১৬৩৯২

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ঢাকা, বাংলাদেশ।

রংপুর বিভাগে ২০০৫ খ্রি. মোট ২৫০২ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ২০১০ খ্রি. ৫০০১ জন, ২০১৫ খ্রি. ১৩১১০ জন এবং ২০১৮ খ্রি. ১৬৩৯২ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করে। ২০০৫ থেকে ২০১৫ খ্রি. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতি ক্রমবর্ধমান।

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০০৫ খ্রি. মোট ৯৪৭৪০ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। ২০১০ খ্রি. ১৭৭৩৭৮ জন, ২০১৫ খ্রি. ১৮১১২৩ জন এবং ২০১৮ খ্রি. ২২২২০৬ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করে। ২০০৫ থেকে ২০১০ এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ খ্রি. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়।

বিভিন্ন বছরে চট্টগ্রাম বিভাগে জেলাওয়ারি বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সারণি-৭

জেলার নাম	আয়তন	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৮
কক্সবাজার	২৪৯১.৮৯	১৪৪৭	৪৬০৩	৪৫৬৮	৮৯১৪
কুমিল্লা	৩১৪৬.৩০	২৭৩০৩	৪৬৩৪০	৫৪১০৯	৬২৫৬২
চট্টগ্রাম	৫২৮২.৯২	২১৫৩৮	৪৮৪৮৪	৩২৩৯৮	৩৫০৯৭
চাঁদপুর	১৬৪৫.৩২	১০২৭০	১৬৫৫২	২০২০৭	২৪২৫৯
নোয়াখালী	৩৬৮৫.৮৭	৮৩৫১	১৮২৩৩	১৭২২২	২১৭৭৪
ফনী	৯৯০.৩৬	৭০৫৮	১২২৫৭	১০৪৯৪	১৩৮৮৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৮৮১.২০	১৩৬৯২	১৯৮৬৬	৩০৬৫৮	৪০৩১৬
লক্ষীপুর	১৪৪০.৩৯	৫০৮১	১১০৪৩	১১৪৬৭	১৫৩৯৬
মোট =	**২০৫৬৪.২৫**	**৯৪৭৪০**	**১৭৭৩৭৮**	**১৮১১২৩**	**২২২২০৬**

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিভিন্ন বছরে তুলনামূলকভাবে চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সারণি-৮

বিভাগ	আয়তন	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৮
চট্টগ্রাম (৮ জেলা)	২০৫৬৪.২৫	৯৪৭৪০	১৭৭৩৭৮	১৮১১২৩	২২২২০৬
রংপুর (৮ জেলা)	১৬১৮৫	২৫০২	৫০০১	১৩১১০	১৬৩৯২
	২১.৩০	৯৭.৩৬	৯৭.১৮	৯২.৭৬	৯২.৬২
	৭৮.৭০	২.৬৪	২.৮২	৭.২৪	৭.৩৮

উৎস: bbs.gov.bd (http://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/-), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ঢাকা, বাংলাদেশ।

চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলার আয়তন রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার চেয়ে ২১.৩০ % বেশি। কিন্তু, ২১.৩০% বেশি আয়তন বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ২০০৫ খ্রি. উভয় বিভাগের মোট ১০০% প্রবাসীর ৯৭.৩৫% বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানে গেলেও রংপুর বিভাগ থেকে গিয়েছে মাত্র ২.৬৪%। ২০১৫ খ্রি. উভয় বিভাগের মোট ১০০% প্রবাসীর ৯২.৭৬% চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানে গেলেও রংপুর বিভাগ থেকে গিয়েছে মাত্র ৭.২৪%। ফলে বিভিন্ন বছরে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রবাসীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং প্রায় একই গতিতে বেড়েছে। কিন্তু রংপুর বিভাগে বিভিন্ন বছরে প্রবাসীর সংখ্যা কম এবং বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনামুলকভাবে কমই রয়ে গেছে।

৬. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে রংপুর অঞ্চলের অনগ্রসরতা কারণ

চট্টগ্রাম বিভাগে তুলনামূলকভাবে অভিবাসীর সংখ্যা বেশি। এই বিভাগের কয়েকটি জেলা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। যেমন চাঁদপুর, লক্ষীপুর মেঘনা তীরবর্তী অঞ্চলে আবার নোয়াখালীতে কিছু চরাঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমূদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় জনসাধারণ নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততাসহ

প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এসকল অঞ্চলের মানুষ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সংগ্রামী এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাদেরকে বহির্মুখী এবং কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার আশায় তারা দেশের বাহিরে বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে। এভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অগ্রজ অভিবাসীদের দ্বারা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বৈদেশিক নিয়োগ লাভে অগ্রসর হয়েছে। অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—চট্টগ্রাম বিভাগের মতো অগ্রসর অঞ্চলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রদর্শন প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী পূর্ব থেকেই বিদেশমুখী হওয়ায় তাদের অনুসরণে কাজের খোঁজে কর্মক্ষম জনগণের বিদেশমুখী হওয়ার প্রবণতা বেশি। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অগ্রগামী হওয়ার পেছনে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পুল এবং পুশ উভয় প্রভাবের ভূমিকা লক্ষণীয়।

পক্ষান্তরে, রংপুর অঞ্চলের বেশির ভাগ জনসাধারণ অধিক হারে কৃষিনির্ভর। তারা অর্থনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের সাথে তেমন পরিচিত নয়। তারা স্বল্প আয়-উপার্জনের মাধ্যমে সাধারণ জীবনযাপনে নিজেদের অভ্যস্ত রেখেছে। ফলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বহির্মুখী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ বা দেশের বাহিরে বিদেশে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা অথবা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তারা উচ্চাভিলাসী হতে পারেনি। এ অঞ্চলের অল্পসংখ্যক মানুষ বিদেশে অবস্থান করার ফলে নিজেদের মধ্যে কর্মসংস্থানসংশ্লিষ্ট তথ্যের আদান-প্রদান সীমিত, বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান সম্পর্কে স্থানীয়দের জানাশোনা কম এবং বেকারদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস তেমন জোরালো নয়। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশ যাওয়ার কথা চিন্তা করেন না। তথ্য ও সচেতনতার অভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মতি না থাকায়, দেশে থেকে কিছু করার মানসিকতা ইত্যাদি কারণে কিংবা প্রতারিত হওয়ার ভয়ে এবং বিদেশ সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে রংপুর অঞ্চলের মানুষ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অনগ্রসর রয়ে গেছে।।

৭. উত্তরণের উপায়

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তি রপ্তানির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সাথে সাথে বৈদেশিক বাজারের ব্যাপ্তি অনুসন্ধান ও নতুন কর্মক্ষেত্রের তথ্য উন্মোচন করা প্রয়োজন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক ব্যয়ের কথা বিবেচনায় নিয়ে অধিকহারে দক্ষ শ্রমিক রপ্তানির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য রংপুর অঞ্চলের জনসাধারণের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পড়ার একটি কারণ। আবার, রংপুর অঞ্চলে প্রবাসী সংখ্যা কম হওয়ায় প্রদর্শন প্রভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পুল প্রভাবের ভূমিকা সামান্য এবং পুশ প্রভাব প্রায় অনুপস্থিত। নিচে রংপুর অঞ্চলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপায় উল্লেখ করা হলো:

(১) অনেক জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় রয়েছে। তবে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির শাখা অফিস নাই। যাদের সুনাম রয়েছে এরূপ এজেন্সির জেলাপর্যায়ে শাখা অফিস থাকা প্রয়োজন এবং তাদের কার্যক্রমের সমন্বয় করার জন্য বিভাগীয়পর্যায়ে বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। ফলে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সময়, শ্রম এবং যাতায়াত ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে এবং জনমনে আস্থা ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পাবে।

(২) মানসম্মত শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের চাকরির জন্য উপজেলা এবং জেলাপর্যায়ে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক চাকরি মেলা (জব ফেয়ার) আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য কর্মী বাছাই করে বিদেশে কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(৩) তথ্য ও যোগাযোগের অবাধ প্রবাহকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অনেকের ধারণা বিদেশে যেতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, যা তাদের নেই। কোথায়, কীভাবে, কার মাধ্যমে, কত খরচে, কোন দেশে, কী কী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান লাভ করা যাবে— সেসব বিষয়ে এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের কোনো ধারণা নেই। যেসব দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের চাহিদা রয়েছে, সেসব দেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় কত—তার একটি হালনাগাদ তথ্য জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ে থাকতে হবে।

(৪) বোয়েসেল যেসব দেশে কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, সেসব দেশের কর্মসংস্থানসংক্রান্ত তথ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) কর্মী প্রেরণে রিক্রুটিং এজেন্সির অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। ভুঁইফোঁর, অসাধু, দালাল চক্রের দৌরাত্ম্যের কারণে বিদেশ গমনইচ্ছুক কর্মীদের মনে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়। এই আস্থাহীনতা দূর করার লক্ষ্যে অসাধু ও দালাল চক্রের হাত থেকে কর্মীদের মুক্ত করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৬) বিদেশের প্রতিকূল পরিবেশ ও আবহাওয়ায় টিকে থাকতে না পারা, প্রতারিত হওয়া এবং উপযুক্ত কাজ না পাওয়ার কারণেও কর্মীদের বিদেশ থেকে ফেরত আসতে হয়। বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি না থাকায় দালালদের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে প্রতারিত হয়ে স্বর্বশান্ত হয়ে কোনো কর্মী দেশে ফেরত এলে বিদেশগমন বিষয়ে অন্যদের মধ্যে অনীহার সৃষ্টি হয়। এরূপ প্রতারিত হওয়ার ভয় এবং আস্থাহীনতা নিরসন করা সম্ভব হলে অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

(৭) উত্তরাঞ্চলের মানুষ অল্পে তুষ্ট থাকতে অভ্যস্ত। অনেকে কোনোভাবে খেয়েপরে দিন যাপন করতে পারলেই তৃপ্ত থাকেন। এই প্রকৃতির মনমানসিকতা ধারণ করার ফলে তারা নিজ এলাকার বাইরে যাওয়ার মতো ঝুঁকি গ্রহণ করেন না। দিনাজপুরের মানুষ অধিক হরে কৃষিনির্ভর। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অধিক উপার্জন এবং নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের বিষয়ে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, সংস্থা ও কার্যালয়ের যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং জনগণের সাথে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি বৈদেশিক নিয়োগ লাভে জনগণকে উৎসাহিত করতে পারে।

(৮) জেলা অফিসগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োগযোগ্য জনশক্তির চাহিদাসম্পর্কিত তথ্য, সেসব দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা, ভিসা প্রাপ্তিসম্পর্কিত তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর করা, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বৈদেশিক নিয়োগের হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৯) দালাল এবং প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে দেশে ফেরত এলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে দালাল ও প্রতারক চক্র যাতে প্রতারণা করতে না পারে এবং প্রতারণা করার কারণে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা অথবা শাস্তি নিশ্চিত করা যায়—সে জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(১০) স্থানীয়পর্যায়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৌর চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যানগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জনসচেতনতা, প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) জাতীয় স্বার্থে সরকার কর্তৃক রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে স্বচ্ছতা ও সুশাসনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৮. উপসংহার

রংপুর বিভাগের মানুষের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অনগ্রসরতা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে একটি অন্তরায়। আঞ্চলিক উন্নয়নে অগ্রগতি ও ভারসাম্য অর্জনের জন্য রংপুর বিভাগের কর্মক্ষম জনশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। মানসম্মত শিক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলের মানবসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। অদক্ষ, অর্ধদক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সম্প্রসারণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য ও যোগাযোগ সেবার অবাধ গতিশীলতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধান, দারিদ্র্য নিরসন, বৈদেশিক লেনদেনের অনুকূল ভারসাম্য স্থায়িত্বশীলকরণ এবং বিভিন্ন উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন সহজতর হবে। জনশক্তি রপ্তানি বাড়িয়ে বাংলাদেশের জনসম্পদকে উন্নয়নের মূল শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, *জেলাভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০০৫-২০১৮*, ঢাকা: ৮৯/২ কাকরাইল, বাংলাদেশ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ(probashi.gov.bd)|

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), *পপুলেশন অ্যান্ড হাউজিং সেন্সাস ২০১১*, ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জুন, ২০১২।

Alam, Md. Sarwar. *Prospects of Human Resource Cooperation between Saudi Arabia and Bangladesh.* Bangladesh Embassy Magazine. Riyadh: Embassy of Bangladesh, Saudi Arabia, 2016.

Islam, Dr. Md. Nazrul. *Bangladesh-Saudi Arabia collaberation to up-skilling human resources for achieving "Vision 2030".* Bangladesh Embassy Magazine, Riyadh: Embassy of Bangladesh, Saudi Arabia, 2018.

Siddiqui, Moksud Belal. *Migration and Remittances: Recent Trends and Future Opportunities for Bangladesh.* Paper Presented at the 18^{th} Biennial Conference "Global Economy and Vision 2021" of the Bangladesh Economic Association (BEA) Dhaka, Bangladesh, 2012.

পরিশিষ্ট-১

এক নজরে সকল বিভাগের জেলাওয়ারি বৈদেশিক কর্মসংস্থান

সারণি - ১

বিভাগ	জেলার সংখ্যা	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান (২০০৫-২০১৮)	বিভাগের অংশ (%)	বিভাগ	জেলার সংখ্যা	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান (২০০৫-২০১৮)	বিভাগের অংশ (%)
চট্টগ্রাম	১১	কুমিল্লা	৮৭৩৪৩৮	৩৯.০৪%	সিলেট	৪	সিলেট	১৯৬২৯৬	৭.৫৩%
		চট্টগ্রাম	৬৮০৬৬১				মৌলভীবাজার	১৬০৫১৪	
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৩৮১২৬				হবিগঞ্জ	১৪৫৩৮৪	
		চাঁদপুর	৩৩২৯৩৬				সুনামগঞ্জ	১০৯১২০	
		নোয়াখালী	৩১৮৩২১				মোট =	৬১১৩১৪	
		ফেনী	২১২৫২৪		রাজশাহী	৮	বগুড়া	১০৮২৬৩	৬.১৬%
		লক্ষ্মীপুর	১৯৯৭৩২				পাবনা	৯৪০২৭	
		কক্সবাজার	৯৮৮২৬				চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৬৭৬৪	
		খাগড়াছড়ি	৭৮০৮				নওগাঁ	৬৩৩৫৪	
		রাঙ্গামাটি	৪৪৮১				সিরাজগঞ্জ	৫৮০৯৮	
		বান্দরবান	৩৭৫৮				রাজশাহী	৩৯৩২৪	
		মোট =	৩১৭০৬১১				নাটোর	৩৮৬১৭	
ঢাকা	১৩	টাঙ্গাইল	৪০১২৯২	৩০.৯৯%			জয়পুরহাট	২১৪০৮	
		ঢাকা	৩৬৯২০৭				মোট =	৪৯৯৮৫৫	
		মুন্সিগঞ্জ	২৩৭৪০৬		বরিশাল	৬	বরিশাল	১১৪৪১৫	৪.১৪%
		নরসিংদী	২৩১৯৩৭				ভোলা	৭৪৬২১	
		নারায়ণগঞ্জ	২০৩১০৪				পিরোজপুর	৪৮২৬৬	
		কিশোরগঞ্জ	২০২৬৯৩				বরগুনা	৩৫৩০৫	
		গাজীপুর	১৮৬৯৭৫				পটুয়াখালী	৩৩৬৩৩	
		ফরিদপুর	১৭৬৭৩০				ঝালকাঠি	২৯৯৮৭	
		মানিকগঞ্জ	১৭৩০২৩				মোট =	৩৩৬২২৭	
		মাদারীপুর	১১২৯৫৪		ময়মনসিংহ	৪	ময়মনসিংহ	১৭৮৪৭৩	৩.৭৬%
		শরীয়তপুর	১০৮৩৪০				জামালপুর	৭১৬১৮	
		রাজবাড়ী	৬৩৬৭১				নেত্রকোণা	৩৭৯৩৭	
		গোপালগঞ্জ	৪৯৪৬৩				শেরপুর	১৭২৬০	
		মোট =	২৫১৬৭৯৫				মোট =	৩০৫২৮৮	
খুলনা	১০	যশোর	৯৬৭২৭	৬.৬৪%	রংপুর	৮	গাইবান্ধা	৩৫৫৭১	১.৭৪%
		কুষ্টিয়া	৮৬৩৫৭				রংপুর	২৮২৩৯	
		ঝিনাইদহ	৭৬৭৯৭				দিনাজপুর	২২০৫১	
		মেহেরপুর	৫৮৬৪২				কুড়িগ্রাম	১৮৬৭৭	
		চুয়াডাঙ্গা	৪০২৪২				নীলফামারী	১৩৯৫৫	
		মাগুরা	৩৭৫৭২				ঠাকুরগাঁও	১১৪৩৮	
		সাতক্ষীরা	৩৭২৮১				লালমনিরহাট	৬৬১৩	
		বাগেরহাট	৩৭২৭৯				পঞ্চগড়	৪৯৩১	
		খুলনা	৩৬০১৪				মোট =	১৪১৪৭৫	
		নড়াইল	৩২৪২০				সর্বমোট-	৮১২০৮৯৬	১০০.০০%
		মোট =	৫৩৯৩৩১						

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=30,
http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=25, accessed on 10/11/2019)

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৩৩-২৩৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

দক্ষিণ-পশ্চিম জলাবদ্ধ উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা

বাবুর আলী গোলদার*

মূল শব্দ *জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমি, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, স্থায়ী জলাবদ্ধতা, কৃষক অভ্যুত্থান, স্থায়ী, দারিদ্র্য, ভূমিহীন, দুর্নীতি, নারী-শিশু পাচার, এলআর ফকাস, জোয়ারাধার/টিআরএম মডেল, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প*

ভূমিকা

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বলতে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলকে বোঝানো হচ্ছে। একসময় জাতীয় আয়ের সিংহভাগ জোগান দিত এই দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল। শুধু তা-ই নয়, এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যও ছিল। গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা মাছ ছিল। এটা ছিল জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমি অঞ্চল। মানুষ বিল কমিটি গঠন করে অষ্টমেসে বাঁধ দিয়ে আউশ-আমন ফসল ফলাত। রবিশস্যও চাষাবাদ হতো। মাছ-ভাতের কোনো অভাব ছিল না। এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশ বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা না করে ৬০-এর দশকে সবুজ বিপ্লবের নামে নেদারল্যান্ডস সরকারের প্রযুক্তি ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে শুরু করা হয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প। ১৫ বছর এর মধ্যে এ প্রকল্পের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। নদীর নাব্য হারিয়ে ৮০ দশকে শুরু হয় জলাবদ্ধতা। এবং ক্রমান্বয়ে জলাবদ্ধতা স্থায়ী রূপ ধারণ করতে থাকে। যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ৮টি থানার ৬৮টি ইউনিয়নে প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর জমি জলাবদ্ধ হয় এবং ১২ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে লবণাক্ততাও জনজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আবার সিডর, আইলার মতো দুর্যোগ তো প্রায়ই এ অঞ্চলে প্রতিবছর লেগেই আছে। এর মধ্যে আবার এ অঞ্চলে ২০টি অন্ত্যজ শ্রেণির জনগোষ্ঠী বসবাস করে। যা, মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ। এরা সর্বদিক দিয়ে অবহেলিত ও দরিদ্র্য, ভূমিহীন, সামাজিক মর্যাদাও এদের কম।

* পরিচালক, পাঁজিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থা; ফোন: ০১৭১১২৭৯৫১৮ ই-মেইল:baburpsks@yahoo.com
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯

জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ

এরশাদ সরকারের আমল থেকে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে নদ-নদীর উপর ক্রস বাঁধ দিয়ে ডজন ডজনবার নদীখনন করা হয়। এতে কোনো ফল হয়নি। বরং জলাবদ্ধতা আরও বিস্তার লাভ করে এবং প্রকল্পের অর্থ লুটপাট হয়। এখনো খনন করা হচ্ছে। খনন করে মাটি নদ-নদীর মধ্যেই রাখা হচ্ছে। ভরত ভায়না বিলের টিআরএম মডেল সরকার গ্রহণ করেছিল। বিল কেদারিয়ায় ও কেশবপুরের পূর্ব বিলখুশিয়ায় টিআরএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। আংশিক ফলাফলও অর্জিত হয়েছিল। এলাকার জনগণ জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম এর বিকল্প নেই—এ কথা বলছে।

জলাবদ্ধতা নিরসনে আন্দোলন সংগ্রাম ও গণ-উদ্যোগ

জলাবদ্ধতা সমস্যা এত প্রকট যে এ জনপদ যেন আন্দোলন-সংগ্রামের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। জলাবদ্ধতা নিরসন আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন ক্ষেত্রমোহন মাস্টার, গোবিন্দ মাস্টার, পঙ্গু হয়েছেন সরওয়ার মাস্টার ও গোবিন্দ সরকার। নিহত হন পুলিশ কনস্টেবল মোশারফ। বামপন্থী দলগুলোকে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে দেখা যায় বেশি। ১৯৮৮ সালের ২২ জুলাই কেশবপুরের ডহুরি নামক স্থানে ১০ হাজার জনগণের এক কৃষক অভ্যুত্থান হয়। যে অভ্যুত্থানে ক্ষেত্রমোহন বাদে উল্লিখিত ব্যক্তিরা শহীদ হন। ১৯৯০ সালের ১৮ সেপ্টম্বর বিল ডাকাতিয়া সংগ্রাম কমিটি ১৪৪ ধরা ভঙ্গ করে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বাঁধ কেটে দেয়। ১৯৯২ সালে পাঁজিয়া-পাথরা বিলের বাঁধ কেটে দেয় জনগণ। ১৯৯৭ সালের ২৯ অক্টোবর কেশবপুরের ভরত ভায়না বিলের বাঁধ কেটে দেয় জনগণ। বাঁধ কাটার দায়ে ১০০ জনের নামে মামলা হয়। পরবর্তী সময়ে সিইজিআইএস ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ কাটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করে। এবং উদ্ভব হয় জোয়ারাধার/টিআরএম। যা এখন পৃথিবীর মডেল। টিআরএম এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এখন সরকার জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম প্রকল্প থেকে সরে আসছে। কিন্তু এখনো জলাবদ্ধতা নিরসনে আন্দোলন-সংগ্রামে কমিটিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। যেমন ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি, কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন, ভবদহ পানি নিষ্কাশন আন্দোলন কমিটি, পানি কমিটিসহ আরও অনেক। যা হোক এই জলাবদ্ধতা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর কী প্রভাব ফেলছে নিচে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. **মৎস্য ঘের:** ৮০-এর দশক থেকে বিলগুলো জলাবদ্ধ। সমস্যা সমাধানে মানুষ সরকারের মুখাপেক্ষী থেকেছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অবশেষে মানুষ কম্যুনিটি মৎস্য ঘেরের সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য শুধু মৎস্য চাষ নয়। পানি পাম্প আউট করে ধান চাষ। কিন্তু পুঁজি, প্রযুক্তি, নেতৃত্ব ও দুর্নীতির কারণে কম্যুনিটি ঘেরের উদ্যোগ টেকেনি। পরবর্তী সময়ে শর্তসাপেক্ষ ঘেরগুলো লিজ দেওয়া হয়। বাইরের লোক এসে লিজ নেয়। বোরো মৌসুমে পানি পাম্প আউট করে চাষাবাদের উপযোগী করে দেওয়ার শর্তে। কোনোবার লিজগ্রহীতা চুক্তিপত্রের শর্ত মানেন, কোনো বছর মানেন না। ঘের দখল নিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ও হামলা-মামলার সৃষ্টি হয়। ভূমিহীন ব্যক্তিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ঘেরের মধ্যে হাঁস চরে বেড়াতে পারে না। গোখাদ্য সংগ্রহ করা যায় না। সঙ্গত কারণেই মানুষ অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়।

২. **কর্মসংস্থান:** জলাবদ্ধতার কারণে এলাকায় কর্মসংস্থান থাকে না। মানুষ শহর অঞ্চলে রিকশা-ভ্যান চালাতে যায়। এমনকি সন্তানাদি বাড়ি রেখে স্বামি-স্ত্রী রাতে কাজ করতে শিল্পাঞ্চলে যায়। কর্মসংস্থান না থাকলে আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হয় প্রতিনিয়ত।

৩. **দারিদ্র্য:** দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে জলাবদ্ধ এলাকার মানুষ বেশি দরিদ্র।

৪. **স্বাস্থ্য:** জলাবদ্ধতা যখন প্রকট আকার ধারণ করে, তখন কলেরা-ডায়েরিয়া-আমাশয় ও চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। উন্নত চিকিৎসা করার সামর্থ্য তাদের থাকে না। জলাবদ্ধ এলাকার অধিকাংশ মানুষ পুষ্টিহীনতার চরম শিকার।

৫. **শিক্ষা:** জলাবদ্ধতার সময় অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। ফলে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হয়। যোগাযোগব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে।

৬. **শিশু ও নারী পাচার:** জলাবদ্ধতার কারণে তীব্র দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয় এবং কর্মসংস্থান থাকে না। ফলে এলাকার টাউট-দালালেরা কাজের প্রোলোভন দেখিয়ে নারী ও শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী উপজেলাসমূহে নারী-শিশু পাচারের সংখ্যা বেশি।

৭. **মাইগ্রেশন:** সিজনাল মাইগ্রেশন হয় বেশি। কারণ, স্থানীয় লোকজন কাজের সন্ধানে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে যায় এবং অনেকে দেশ ছেড়েও চলে যান।

৮. **পরিবেশদূষণ:** জলাবদ্ধতার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়। আর যার ফলে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি দেখা দেয়। আবার অন্যদিকে যেহেতু জলাবদ্ধ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে একটি বোরো ফসল হয়, সেহেতু প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ফসলে ব্যবহার করার ফলে পরিবেশদূষণ হয়। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানীর সমস্যা বাড়ছে। জরিপ করলে হয়তো বা দেখা যাবে যশোর অঞ্চলে ক্যানসার ও হৃদ্‌রোগীর সংখ্যা বেশি। এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রতিবছর ২৯ হাজার টন বিষ ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশে। এমন হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিষ ব্যবহারের পরিমাণ আরও বেশি। আর ভূগর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে ধানের চালে আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। আর্সেনিকোসিস রোগীও আছে এই এলাকায়। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট। প্রকাশ থাকে যে, পরিবেশদূষণে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা। (প্রথম আলো ১৭.০৯.২০১৯)।

৯. **কৃষি ও আর্থসামাজিক অবস্থা:** আমাদের এ অঞ্চলের জনগণ আদিকাল থেকেই এলাকার ভূ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনপ্রণালী ও চাষাবাদ পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল। লবণাক্ততা ও বন্যা সহনশীল ধানের চাষাবাদ করতেন। এবং প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেতো। এ অঞ্চলে কোনো খাদ্যঘাটতি ছিল না। ১৯০৮ সালে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে একটা ধারণার জন্য ১৯২০-২৬ সাল পর্যন্ত একটা অনুসন্ধান জরিপ চালানো হয়। এলআর ফকাস (1920-26 L. R. Fowcus) তাঁর (Final Report on the survey and statement operation in the district of Khulna)-তে পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক সমন্বয়ে একটা প্রান্তিক চাষি পরিবারের বার্ষিক বাজেট ৫৫০.০০ ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। এ রিপোর্ট থেকে সেই সময়ে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এরপর আর তেমন কোনো জরিপ হয়েছে বলে জানা নেই। তবে ১৯৮১ সালে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ১০০ পরিবারের ওপর একটি জরিপ চালানো হয়। এতে দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৫৫%, নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রায় ৩৭%, বাকি ৮% মধ্যবিত্ত। কোনো গ্রামেই উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনী পাওয়া যায়নি। দরিদ্র পরিবারের বার্ষিক সর্বোচ্চ আয় ৩,৬০০.০০ টাকা। (মুহম্মদ নুরুল ইসলাম 'খুলনা জেলা' পৃ. ৪২১)।

১০. **যোগাযোগব্যবস্থা:** জলাবদ্ধতা-বন্যার কারণে যোগাযোগব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। কাঁচা রাস্তা-পাকা রাস্তা সবই যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায়। আবার জলাবদ্ধ এলাকায় যে সমস্ত ভারী জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলোর দামও কমে যায়। কোনো রোগীকে জরুরি মুহূর্তে হাসপাতালে নেওয়াও দুরূহ হয়ে পড়ে। আর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই। ২০০৪ সালের বন্যায় যশোর জেলার মোট আয়তনের ৭৭ দশমিক ৯০ শতাংশ এলাকাই প্লাবিত হয়েছিল।

১১. **বসতবাড়ি:** গ্রামাঞ্চলের জনগণের কাঁচা ঘরবাড়ি একবারে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করতে আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হয়।

১২. **জ্বালানির সংকট:** পূর্বে এ এলাকায় জ্বালানি কোনো সংকট ছিল না। যশোরের খেজুরের গুড় ছিল বিখ্যাত। কিন্তু সেই যশোরে এখন খেজুরের গুড় তেমন উৎপাদন হয় না। কারণ, স্থায়ী জলাবদ্ধতায় অনেক খেজুরগাছ মারা গেছে এবং এতে করে জ্বালানি সংকটও বেড়েছে। জলাবদ্ধতার আগে প্রচুর জ্বালানি ছিল। যেমন ধানের খড়, আগাছা, গাছগাছালি, গাছের ঝরাপাতা ইত্যাদি। এসব আগে তেমন ক্রয় করতে হতো না। জ্বালানিসংকটের কারণে এখন গ্রামের গরিব মানুষেরাও রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা করতে গিয়ে তাদের আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে।

১৩. **ফ্যামিলি ডাইভারশন:** বাঙালি সংস্কৃতি হলো যৌথপরিবারে বসবাসের সংস্কৃতি। জলাবদ্ধতার কারণে সে সংস্কৃতি এখন আর নেই। দেখা যাচ্ছে বাবা বাইরের জেলায় কাজ করতে গেছেন, মা কোনো এক রাইস মিলে, চিংড়ি কারখানা বা শহরের কোনো বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করছেন। মেয়ে হয়তো বা গ্রামের কারও বাড়িতে কাজ করছেন। এই হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা।

১৪. **পেশার পরিবর্তন:** এ লাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষক। কিন্তু জলাবদ্ধতার কারণে কেউ শ্রমিক শ্রেণিতে, ভ্যান-রিকশাচালক বা অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৫. **নারীশ্রমিক:** জলাবদ্ধ এলাকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের মজুরিও বেশ কম।

১৬. **খাসজমি:** দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক খাসজমি ও নদীর চর রয়েছে, যা ভূমিহীনদের প্রাপ্য। কিন্তু ধনিক শ্রেণি তা দখল করে বসে আছে। এমনকি সাতক্ষীরা জেলায় খাসজমির জন্য লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হন জায়েদা নামে এক নারী। আরও অনেক লোক আহত হন। অনেক ভূমিহীনকে মামলা-মোকদ্দমাও সহ্য করতে হচ্ছে।

১৭. **সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড:** জলাবদ্ধ এলাকায় শত শত নোনা ও মিষ্টি পানির মৎস্য ঘেরের সৃষ্টি হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করে প্রভাবশালী ও শহরের ক্ষমতাসীন লোকেরা। এতে অনেক আমলাও জড়িত থাকেন। সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা ঘের পরিচালিত হয়। জমির মালিকেরা তাদের ন্যায্য হিস্যা বুঝে পান না। ফলে ঘের দখল, জমি দখলকে কেন্দ্র করে অনেক মামলা মোকদ্দমা ও খুন, হত্যা ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে।

১৮. **ঋণগ্রস্ততা:** দারিদ্র্যের কষাঘাতের কারণে এলাকার অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো এনজিওর নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করছেন। এমনকি খোজখবর নিয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ শিক্ষকই ব্যাংকের কাছে ঋণী।

১৯. **লবণাক্ততা:** বাংলাদেশে মোট চাষযোগ্য জমির ৩০ শতাংশেরও বেশি হলো উপকূলীয় অঞ্চলে। বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় কমবেশি লবণাক্ততার সন্ধান পাওয়া গেছে। সাতক্ষীরা জেলায় লবণাক্ত মাটির পরিমাণ সর্বাধিক, প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার হেক্টর। এই লবণাক্ততা আরও বাড়ছে প্রতিবছর। ক্রমান্বয়ে লবণাক্ততা উত্তরাঞ্চলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক অবস্থা হুমকির মুখে পড়ছে। গবেষকেরা বলছেন, লবণাক্ততার কারণে উদ্বাস্তু হবে মানুষ। (প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০১৮)। উপকূল অঞ্চলে ২০% গর্ভপাতের কারণ লবণাক্ততা (বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন প্র. আ. ২৬ আগস্ট ২০১৯)।

২০. **গো-খাদ্য সংকট:** আশির দশকের আগে তেমন গোখাদ্যের প্রয়োজন হতো না। গবাদিপশু বিলে চরে বেড়াত দিনের বেলায়। সন্ধ্যার আগে মাঠে ঘাস-পাতা খেয়ে পেট পুরে গোয়াল ঘরে ফিরত। আর এখন এক কাহন খড়বিচালি ক্রয় করতে হচ্ছে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকায়। ছোট ১ আঁটি ঘাস ক্রয় করতে হয় ১৫ থেকে ২০ টাকায়। কেশবপুরের বাগডাঙ্গা গ্রামে কিছু গরুর বাচ্চা পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জানান, মূলত অপুষ্টির কারণেই গরুর বাচ্চা বিকলাঙ্গ হচ্ছে। বাগডাঙ্গা গ্রামটির দুই পাশে জলাবদ্ধ বিল। গরুকে কচুরিপনা খাওয়ানো হতো গো-খাদ্য সংকটের কারণে।

২১. **ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য:** ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অতি মাত্রায় বাড়ছে। উপকূলীয় অঞ্চল এর বাইরে নয়। এখন আর চীন বিশ্বের অতি ধনীর তালিকায় নেই। এখন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ধনী লোকের সংখ্যা ১৭.৩%। আর চীন ১৩.৪%, ভারত ১০.৭%, পাকিস্তান ৮.৪%, যুক্তরাষ্ট্র ৮.১% (প্র. আ., ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮)।

২২. **নৈরাজ্য:** এ ছাড়াও লিজসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণ সম্পত্তিসহ বিভিন্ন জমি-জলা সম্পত্তি দখল ও লুট, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, মাস্তানি ও নানা অপরাধের পেশাদারি তৎপরতা, উন্নয়ন বরাদ্দ, কাজের বিনিময় খাদ্য, উপবৃত্তি, দুস্থ মাতা কর্মসূচি, ত্রাণ তহবিল ইত্যাদি আত্মসাৎ, ভূমিসংক্রান্ত দুর্নীতি এবং ঘুষবাণিজ্য ইত্যাদি রয়েছে অহরহ।

২৩. **সংস্কৃতি চর্চায় ঘাটতি:** এ অঞ্চলে একসময় বিভিন্ন গ্রামে পালাগান, জারি-সারি, যাত্রা, মেলা, পুতুলনাচ প্রভৃতির আয়োজন হতো। এখন আর তেমন সেগুলো হতে দেখা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কিছু সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে—

- সকল নদ-নদী অববাহিকায় একটি করে জোয়ারাধার (টিআরএম) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- জোয়ারাধারকৃত বিলের জমি মালিকদেরকে সহজ শর্তে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
- পদ্মা/ভৈরব/মাথাভাঙ্গা নদ-নদীর সাথে এ অঞ্চলের নদ-নদীগুলোর সংযোগ স্থাপন করতে হবে।
- প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততাকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- সমস্যা সমাধানে লোকজ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে হবে।
- সব নদ-নদী দখল মুক্ত করতে হবে।

- সব খাসজমি চিহ্নিত করে ভূমিহীনদের দখলে দিতে হবে।
- সমস্যা সমাধানে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে।
- পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত প্রায় ১৪ হাজার ৯০০ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যা বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশের ওপর প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ২০০০ সালে ভারতের বন্যায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। ভারতেও এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে কথা উঠেছে।
- লোকজ জ্ঞানের সমন্বয়ে বিকল্প জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৩৯-২৫১
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ*

মূল শব্দ *'তলাবিহীন ঝুড়ি' এমডিজি, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য, এসডিজি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, উপবৃত্তি ডাইনামিক ওয়েবসাইট*

ভূমিকা

বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু মুক্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে সমার্থ। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। এই বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন এবং মুক্তিকামী জনগণকে দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মানেই একটি দর্শন , একটি চেতনা। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও আমরা এগিয়ে চলেছি একটি শোষিত-বঞ্চিত জাতির সার্বিক মুক্তির দিকে। বঙ্গবন্ধু হলেন বিশ্বাস, ধ্যান ও জ্ঞানে মুক্তিকামী জনতার মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে জাতিকে উপহার দিলেন 'ভিশন-২০২১'। ভিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি বা দেখা। আর ভিশন-২০২১ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে একটি উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দিনবদলের পালা। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণতসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। মধ্যম আয়ের দেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আর সেই লক্ষ্যে এই ভিশন বা রূপকল্পের ধারণা এসেছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে। বিতর্কিত ওয়ান-ইলেভেনের সময় জেলখানায় বন্দী অবস্থায় তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন বাংলাদেশকে নিয়ে। (১৩ জুলাই ২০১৫, দৈনিক ইত্তেফাক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী)। তিনি বলেন, "কারাগারে থেকেও আমি

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা; প্রেষণে বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর। ফোন: ০১৭১৫০৫২৬৭৭, ই-মেইল: sahmmad1970@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক দিনাজপুর আঞ্চলিক সেমিনার-২০১৯-এ পঠিত, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯

সময় নষ্ট করিনি। বাংলাদেশকে নিয়ে ভেবেছি। প্রতিদিন লেখালেখি করতাম। সঙ্গে করে একটি খাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যে তা লেখায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এরপর আরও একটি খাতা আনিয়ে নিয়েছিলাম। আমার লেখার বিষয়বস্তু ছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নিয়ে। তিনি বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শিক্ষার হার কত হবে? খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে আমাদের কী করণীয়? মৌলিক চাহিদা পূরণে আমাদের সরকার কী করতে পারে ইত্যাদি।"

মধ্যম আয়ের দেশের পথরেখা

বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। একসময়ের 'তলাবিহীন ঝুড়ি', বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের পথে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চায়। আর সে লক্ষ্যে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে US$ ২০০০ এবং প্রবৃদ্ধির হার হবে ১০ শতাংশ।

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে সরকার। আর এ লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক । বিশ্বব্যাংকের এ মূল্যায়ন সরকারের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের মতে মধ্যম আয়ের দেশের সংজ্ঞা

মধ্যম আয়ের দেশ—এই শ্রেণীকরণটি মূলত বিশ্বব্যাংকের। কোন দেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে, সেটি নির্ধারণ করতেই তারা দেশগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে। মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিএনআই) মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেশের বিভাজন:

নিম্ন আয়ের দেশ – কমপক্ষে US$ ১০৪৫
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ - US$ ১০৪৬ থেকে US$ ৪১২৫
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ - US$ ৪১২৬ থেকে US$ ১২৭৪৫
উচ্চ আয়ের দেশ - US$ ১২৭৪৬ ডলারের বেশি।

প্রতিবছরের ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক এই শ্রেণীকরণের তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংকের এই শ্রেণীকরণের আলোকে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। কারণ, বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় US$ ১৪৬৬।

অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ রূপকল্প-২০২১

প্রথাগত সংস্কার এবং সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প নিয়ে বর্তমান সরকার এগুতে চায়। ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আর ২০২০ সাল বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। তারও আগে ২০১৫ সালে অতিক্রান্ত হয়েছে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) অর্জনের সময়সীমা। আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-

দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারীমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবিলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে। (মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ, বাজেট ২০০৯-২০১০)

আমাদের রূপকল্প অর্জনের অভিযাত্রায় আমরা সামষ্টিক পর্যায়ে ২০২১ সাল নাগাদ যে মাইলফলকগুলো অর্জন করতে বদ্ধপরিকর তা হলো জাতীয় প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা ধরে রাখা, জাতীয় আয়ে শিল্পের বর্তমান ২৮ শতাংশ হিস্যাকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা, গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোটায় উন্নীত করা, মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৫-তে কমিয়ে আনা। আমাদের লক্ষ্য হলো বেকারত্বের হারকে ১৫ শতাংশে নামানো এবং দুর্ভাগা মানুষ যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে তাঁদের হারকে ১৫ শতাংশে অবনমিত করা।

রূপকল্প ২০৪১

রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য তৈরি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেন। রূপকল্প ২০৪১ এর স্লোগান-শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। রূপকল্প ২০৪১ এর মুখবন্ধে বলা আছে- 'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব'। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র। রূপকল্প ২০৪১ এ ২৬টি লক্ষ্যের কথা বলা আছে। ইশতেহারের লক্ষ্য ও ঘোষণা অংশে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ, উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথরচনা

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি নির্বাচিত সরকার পূর্ণমেয়াদে দায়িত্ব পালন শেষে আবারো পূর্ণ মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের এ রায় সরকারের ওপর তাঁদের বিপুল আস্থারই এক অনন্য নজির। ২য় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে সরকার জনগণের স্বপ্নের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ এবং মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক উত্তরণ ঘটিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশের কাতারে সামিল হওয়া সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন

আনন্দের বিষয় হলো, এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্র্য হার ও এর ব্যবধান হ্রাস, অপুষ্ট শিশুদের আধিক্য কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, এইচআইভি, যক্ষ্মাসহ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দমন ইত্যাদি পুরোপুরিই বর্তমান সরকারের অর্জন। অন্য দিকে, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি , শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুহার হ্রাস, টিকা দান কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি ও সংক্রামক ব্যাধি হ্রাসের ক্ষেত্রে হয়েছে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) পদার্পণ

এমডিজি'র ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর (২০১৬) মাসে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি সদস্য দেশ ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুমোদন করেছে, যাতে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য (goals) এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (targets) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব অভিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলই প্রথম ১১টি অভিষ্ট লক্ষ্যের ধারণা দেয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেখান থেকেই ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্যের উদ্ভব হয়। বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজির এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সামাজিক খাত তথা সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধ ও গর্বের প্রতীক। উজ্জীবিত বক্তা , স্বপ্নদ্রষ্টা ও এমন এক প্রাণের নেতা যাঁর ছিল অনন্য ক্যারিশমা। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পর বাংলাদেশ আজ অদম্য । তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে বাংলাদেশে। এই দেশটার সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্বকেই চমকে দিয়েছে। আর্থসামাজিক সূচকগুলোয় প্রমাণ দেয় বাংলাদেশ আজ এই উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাখো শহীদের স্বপ্নের প্রতিও দেশ আজ সুবিচার করে চলেছে। একসময় যারা হতাশ হয়ে দেশটির স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্র হওয়াকে হঠকারী সিদ্ধান্ত মনে করেছেন , যারা আশঙ্কা করেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া অকার্যকার রাষ্ট্রের তালিকায় শামিল হবে- সেই সব অপবাদ দূর করে আমাদের প্রিয় দেশটি এ সমস্ত মিথ ও ভ্রান্ত পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে অভাবনীয়ভাবে ধ্বংসাবশেষ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো উঠে এসেছে। যারা সেসময়ে হতাশা ছড়িয়েছিলেন, তারাই এখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী নীতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বে নানা প্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত হয়েছেন।

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশনব্যবস্থাসহ সামাজিক সূচকসমূহে হয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন।
- ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। এর সুফল হলো শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হারে ব্যাপক হ্রাস এবং শিশু জন্মে প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা নার্সের উপস্থিতি।
- বর্তমানে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার প্রতিহাজারে যথাক্রমে ১.৭ ও ৩৩ জনে নেমে এসেছে।
- গড় আয়ু ৭০.৭ বছর।
- দারিদ্র্য হার কমেছে ৪০.০ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশে।
- অতিদরিদ্র কমেছে ২৪.২ শতাংশ থেকে ১২.০৪ শতাংশে।
- বেড়েছে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক গতিশীলতা।
- এপ্রিল, ২০১৬ এর শেষে দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১৩ কোটি ২০ লক্ষ ও ৬ কোটি ২০ লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১-এ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান সরকার ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ কে সামনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য 'শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার' বিবেচনায় নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে এসকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ও জাতীয় সংসদে পাসকৃত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তাবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির মূল দর্শন

এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্ব দানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিক্যুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং উক্ত নতুন বইসমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সৃজনশীল ও শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখস্থ শিক্ষা তথা সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। আর সে লক্ষ্যে সকল শিক্ষকদের সৃজনশীল ও শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের অংশ হিসেবে প্রথমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদানকারী ২০১৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে। এই মাস্টার ট্রেইনারগণ দেশব্যাপী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদানকারী ৭০ হাজার শিক্ষককে সরাসরি শিক্ষাক্রম বিস্তরণবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে।২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি বর্তমান সরকার শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৬ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন। বিশ্বের কোনো দেশে এত বই বিনামূল্যে বিতরণের কোনো রেকর্ড নেই।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তিপ্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৫ম ও ৮ম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তির সংখ্যা উন্নীত করে প্রায় ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৪৯.৫ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১ হাজার কোটি টাকা সিড মানি প্রদান করেছে। এই ১ হাজার কোটি টাকার সিড মানির বিপরীতে অর্জিত ৭৫ কোটি টাকা মুনাফা হতে স্নাতক ও সমপর্যায়ের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তা ছাড়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইমেইলের মাধ্যমেও এ ফল অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে।

- ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

- সারা দেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ হাজার ৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট, মোডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডাইনামিক করা হয়েছে।প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ইবুক ভার্সন উন্নয়ন করতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে যে-কেউ দুই সময়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের অংশবিশেষ হিসেবে সরকার ১৪ জুন ২০১১ থেকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্রেণি পাঠদান সপ্তাহে তিন দিন সকাল ০৯:১০ মিনিট থেকে ১০:০০ পর্যন্ত বিটিভির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন

আমাদের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। জনমিতিক লভ্যাংশের এই সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এ লক্ষ্যে সরকার–

- ১০০টি উপজেলায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করবে।
- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪ বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সকল বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করবে সরকার।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা-২০১২' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ১২ জন করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় ৭ হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালের দেশের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জন মেধাবীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

জেন্ডার সমতা

শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে এখন রোল মডেল। শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অনুপাত ৫৩:৪৭। অর্থাৎ ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ৪৭ জন এবং ছেলে শিক্ষার্থী ৫৩ জন।

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

- প্রাথমিক পর্যায়ে– ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয় সরকারীকরণ।
- ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৭৬ শিক্ষককে আত্মীকরণ করা হয়েছে।
- ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা।
- শতভাগ ভর্তির সুফল ধরে রাখতে শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্কুল ফিডিং নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মানসম্পন্ন শিক্ষার সম্প্রসারণ

- সরকারের উদ্ভাবিত সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ব্যবহার।
- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ।
- উপবৃত্তি প্রদান- ৬ষ্ট শ্রেণি হতে স্নাতক পর্যন্ত ৩৮ লক্ষ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছাত্রী।

  ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ

১৫-৪৫ বছর বয়সে নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে একটি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সরকার অটিস্টিক অ্যাকাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কোচিংবাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন

তথাকথিত শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইভ টিজিং প্রতিরোধ

ইভ টিজিং বা ছাত্রীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা শহরে সর্বস্তরের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সারা দেশে র‍্যালি,

কর্মশালা এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ইভ টিজিং উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে এবং দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ২৯৮৮ জন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি মাধমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৯৭৩২টি সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপকের পদ ১৩৮টি পদ, সহযোগী অধ্যাপকের পদ ২৪৪টি, সহকারী অধ্যাপকের পদ ৪২৪টি এবং প্রভাষকের পদ ৬৫৮টি এবং অন্যান্য ১৮৬টি পদসহ মোট ১৬৫০টি পদ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়।

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিক্ষাক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের জাতীয় বাজেটে জিডিপিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় জিডিপির মাত্র ২ শতাংশেরও কম। এটাই আমাদের শিক্ষাখাতে বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহে শিক্ষাখাতে ডাবল-ডিজিট ব্যয় করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক এখনও অসৃজনশীল

আমরা সবেমাত্র ২০১০ সালে সনাতন মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছি। সবার শিক্ষককে সৃজনশীল হতে হবে, তারপর হতে হবে বাবা-মাকে। তাহলেই আমাদের তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাও সৃজনশীল, মননশীল ও ইতিবাচক হবে।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও কুসংস্কারমুক্ত হয়নি, এখনও রয়েছে না বুঝে মুখস্থ করা, শিক্ষার মূল লক্ষ্য মনকে বিকশিত করা তথা দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন করা । এ লক্ষ্যে এখনও আমরা পৌঁছতে পারিনি।

দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অভাব

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে শিক্ষককে হতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ শিক্ষক। তাঁকে হতে হবে রোলমডেল ও নিবেদিতপ্রাণ। এটাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা

শিক্ষক হবে সমাজের ও দেশের রোলমডেল অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে মর্যাদা দিতে হবে। আর্থিক প্রণোদনাসহ দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষককে এখন পর্যন্ত আমরা সামাজিকভাবে মর্যাদা দিতে পারিনি। এটাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রণোদনা ও গবেষণা

শিক্ষকের কাজ জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ। এজন্য তাঁর নেশা ও পেশা হবে শিক্ষাদান ও গবেষণা। তিনি সারাজীবন ধরে শিখবেন, শেখাবেন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন। যেসব শিক্ষকের উচ্চতর ডিগ্রি তথা এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে, গবেষণা থাকবে, প্রকাশনা থাকবে, তাদের আর্থিক প্রণোদনাসহ প্রদোন্নতির ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা এটা করতে পারিনি।

স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ

সরকার শিক্ষাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ করে থাকেন। একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার উদ্যোগ। তবে এক্ষেত্রে সরকার নতুন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করলে ভালো হয়। তা না হলে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের সাথে নতুন যারা আত্মীকৃত হন তাদের সাথে সমস্যা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করে সরকারীকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষায় মেধাবীকে আকৃষ্ট করতে হলে প্রত্যেকের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেক্ষেত্রে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ

- আনন্দের সাথে শিক্ষাদানের অভাব।
- সনাতন মূল্যায়ন পদ্ধতি।
- সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতি।
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ঝরেপড়া সমস্যা।
- আলাদা বেতন-কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার অভাব।
- মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষকের অভাব।
- শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোটবই, প্রাইভেট টিউশনি প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের অভাব
- শিক্ষককেন্দ্রিক সনাতন পাঠদান এখনো অব্যাহত।
- দলীয় অংশগ্রহণ, পারস্পরিক শেয়ারিং, ক্লাসে দলীয় কাজ, সেই কাজে একজন দলীয় নেতা নির্বাচন এবং তার নেতৃত্বে দলীয় কাজ সম্পাদন ইত্যাদির অনুপস্থিতি।
- ক্লাসে দলীয় কাজের অভাবে শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিকশিত হচ্ছে না।
- কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।
- সুপারভিশন, মনিটরিং, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব
- শিক্ষার তিনটি ধারা এখনও অব্যাহত।

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় জেন্ডার অসমতা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত আশানুরূপ নয়।
- শিক্ষার পরিমাণগত বৃদ্ধি।
- শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে গবেষণার অভাব।
- অবকাঠামোর অভাব।
- সাধারণ শিক্ষার আধিক্য বেশি।
- কারিগরি শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সুপারিশসমূহ

- আমাদের জাতীয় বাজেটে জিডিপিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ হতে হবে ডাবল ডিজিট তথা অন্ততপক্ষে ১০ থেকে ১২ শতাংশ।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবককে সৃজনশীল হতে হবে। রূপকল্প ২০২১ এ উল্লেখ আছে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভাবনশীল ও সৃজনশীল বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হবে।
- দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন তথা শিক্ষার্থীর জ্ঞান দক্ষতা, কর্মদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বাড়াতে হবে। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে।
- দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ মেধাবী শিক্ষকের নিয়োগ বাড়াতে হবে। সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের মডেল অনুসরণ করতে হবে। সিঙ্গাপুর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সিঙ্গাপুর প্রাথমিক শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সারা পৃথিবীতে রোলমডেল। পৃথিবী বিখ্যাত হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী গ্রাজুয়েট এনে সিঙ্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে।
- প্রণোদনা ও গবেষণা বাড়াতে হবে শিক্ষাখাতে। যেসব শিক্ষকের উচ্চতর ডিগ্রি তথা এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে, গবেষণা থাকবে, প্রকাশনা থাকবে, তাদেরকে আর্থিক প্রণোদনাসহ পদোন্নতির ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনে সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল, সাহসী, উদ্ভাবনশীল ও রোল মডেল ব্যক্তিত্বকে নিয়োগ দিতে হবে।
- নতুন স্কুল-কলেজ সরাসরিভাবে সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে প্রয়োজনে শিক্ষাকে সবার মাঝে কমমূল্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জাতীয়করণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আলাদা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নে ব্যাপক বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার জরুরি। বছরে একটি পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন–এটি কখনো বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। উন্নত দেশগুলোতে

ক্লাসে শ্রেণিশিক্ষক সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে গ্রেড প্রদান করে। একে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলে।

- শ্রেণিকক্ষে দলীয় অংশগ্রহণ, দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ, ক্লাসে ব্যক্তিগত উপস্থাপনা, দলীয় উপস্থাপনা, পারস্পরিক শেয়ারিং, ক্লাসে দলীয় কাজ, সেই কাজে একজন দলীয় নেতা নির্বাচন, তার নেতৃত্বে দলীয় কাজ সম্পাদন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা গেলে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিকশিত করা যাবে। এর ফলে আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন দেখছি—ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে সহজ হবে।

উপসংহার

শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার, তেমনি অন্যদিকে তা এক সামাজিক পুঁজি। মানুষের চয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। এ মানব পুঁজির যথাযথ বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্তি দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গতি সঞ্চারিত হয়ে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

তথ্যপঞ্জি

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০

২. রূপকল্প - ২০২১

৩. রূপকল্প- ২০৪১

৪. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - ২০১০-২০২১

৫. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১১-২০১৫

৬. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৬-২০২০

৭. মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সকল বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৬-১৭)

৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই, ২০১৫, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা।

১০. রহমান, আতিউর। "বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অর্থনৈতিক মুক্তি", সচিত্র বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০১৬।

১১. https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_2021

১২. http://print.thefinancialexpress-bd.com/2014/02/06/17446

১৩. http://archive.dhakatribune.com/politics/2013/dec/28/vision-2021-extended-2041

১৪. http://www.newstoday.com.bd/?option=details&news_id=2369338&date=2014-02-১৫.http://www.thedailystar.net/problems-with-our-education-sector-23954

১৬. http://rih.stanford.edu/rosenfield/resources/Primary%20Education% 20in%20 Bangladesh.pdf

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৫৩-২৫৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

নওয়াপাড়া নদীবন্দর: সমস্যা ও সম্ভাবনা

সুকুমার ঘোষ*

সারসংক্ষেপ *২০০৭ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে নওয়াপাড়া নদীবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন ৫৫-৬০টি কার্গো জাহাজ থেকে বন্দরে মালামাল ওঠানো-নামানো হয়। বন্দর থেকে বছরে সরকার গড়ে ২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। ঘাটগুলোতে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করেন; যার মধ্যে ১ হাজার ৫০ জন নারীশ্রমিক। শ্রমিকের গড় মজুরি দৈনিক ৪৫০-৫০০ টাকা। সস্তা শ্রমিক ও নদীপথের সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নওয়াপাড়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করছেন। নদীবন্দরকে কেন্দ্র করে পাটসার, সিমেন্ট, চাল, তেল, মৎস্য খাবার, চামড়ার মিল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন জেলার সাথে স্থল ও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। পরোক্ষভাবে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু অবৈধ দখল-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিসহ বিআইডাব্লিউটিএর বিদ্যমান অব্যবস্থাপনাসমূহ দূর করে বন্দরের উন্নয়ন অব্যাহত রাখলে অচিরেই নওয়াপাড়া প্রথম শ্রেণির নদীবন্দরে রূপান্তরিত হতে পারে।*

মূল শব্দ *ভৈরব নদ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গ, রাজস্ব আয়, সিআরডিপি, নৌপুলিশ, চাঁদাবাজি, হয়রানি ও প্রতারণা, রক্ষকই ভক্ষক, নৌপথ ড্রেজিং, শ্রমিক মজুরি ও নিরাপত্তা, প্রথম শ্রেণির নদীবন্দর*

পটভূমি

যশোর জেলার নওয়াপাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্য ও শিল্পনগরী হিসেবে খ্যাত। সড়ক, নৌ ও রেলপথে চমৎকার যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনুকূল ও সুন্দর পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় আশির দশক থেকে খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা নওয়াপাড়ায় আসতে শুরু করেন। একপর্যায়ে নওয়াপাড়া সার, সিমেন্ট, চাল, বালু, পাথর ও কয়লার বৃহত্তম মোকাম হিসেবে দেশের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯০ সালে সারের ব্যবসা

---

* সহকারী অধ্যাপক, মশিয়াহাটী ডিগ্রি কলেজ, মনিরামপুর, যশোর; ফোন: ০১৭১১৪৬০১৯৯, ই-মেইল: biva_org@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯

ব্যাপকতা লাভ করায় ব্যবসায়ীরা নিজস্ব উদ্যোগে ভৈরব নদের তীরে ঘাট তৈরি করে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানি-রপ্তাণি বাণিজ্য শুরু করেন।

রাজস্ব আয়ের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বিআইডাব্লিউটিএ (Bangladesh Inland Water Transport Authority) ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে নওয়াপাড়াকে নদীবন্দর ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে। ২০০৭ সালের মে মাসে ভৈরব নদের চেঙ্গুটিয়া থেকে ভাটপাড়া ফেরিঘাট পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমানা নির্ধারণ এবং ৯টি প্লাটুন স্থাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নদীবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে নওয়াপাড়া নদীবন্দরে কার্গো জাহাজে পণ্য আমদানি বেড়েছে। গড়ে প্রতিদিন ৫৫-৬০টি কার্গো জাহাজ থেকে বন্দরে মালামাল ওঠানো-নামানো হয়। এই বন্দর থেকে বছরে সরকার গড়ে ২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। বন্দরে বিআইডাব্লিউটিএর ঘাটের সংখ্যা ৭৯টি, যার মধ্যে ৮টি টেন্ডারের মাধ্যমে এবং বাকি ৭১টি সরাসরি ব্যক্তিমালিকানায় ইজারা দেওয়া হয়েছে। ঘাটগুলোতে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করেন; যার মধ্যে ১ হাজার ৫০ জন নারী শ্রমিক। নারী শ্রমিকেরা জাহাজের ভেতরে বস্তায় মাল ভরা ও সেলাইয়ের কাজ করেন। শ্রমিকের গড় মজুরি দৈনিক ৪৫০-৫০০ টাকা ।

চমৎকার যোগাযোগব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় এ বন্দরটি ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যে ভারত ও মিয়ানমার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সে লক্ষ্যে দুই দেশের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল নওয়াপাড়া নদীবন্দর পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের পর বিআইডাব্লিউটিএ নওয়াপাড়া নদীবন্দরকে অত্যাধুনিক বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ, নৌপথ ড্রেজিং, ওয়্যারহাউজের সুবিধাদি বৃদ্ধি, নদীভাঙন রোধে কি-ওয়াল নির্মাণ, মালামাল ওঠা-নামার জন্য আরসিসি র‍্যাম্প ও সিঁড়ি নির্মাণ, মালবাহী ট্রাকের জন্য পার্কিং ইয়ার্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বন্দরে জাহাজের সংখ্যা, পণ্যসামগ্রী আমদানি ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	জাহাজের সংখ্যা	আমদানির পরিমাণ (মে. টন)	রাজস্ব আয় (মিলিয়ন)
১	২০১৩-২০১৪	৪৫০	৭.২৫	৮.০৫
২	২০১৪-২০১৫	৪৫৮	৭.২৯	৯.১১
৩	২০১৫-২০১৬	১৪৬৪	৭.৩২	১০.৫৭
৪	২০১৬-২০১৭	১৪৭০	৭.৩৫	১১.৫৩
৫	২০১৭-২০১৮	১৪৬৮	৭.৮৪	১২.২৫

বন্দর সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নওয়াপাড়া নৌবন্দরে ১ হাজার ৪৫০টি জাহাজে পণ্য আমদানি করা হয়েছে ৭ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন, রাজস্ব হিসেবে আয় হয়েছে ৮.০৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৫৮টি জাহাজে আমদানি হয়েছে ৭ লাখ ২৯ হাজার মেট্রিক টন, রাজস্ব আয় ৯.১১ মিলিয়ন টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৬৪টি জাহাজে আমদানি পণ্য এসেছে ৭ লাখ ৩২ মেট্রিক টন, রাজস্ব আয় ১০.৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৭০টি জাহাজে ৭ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়েছে, রাজস্ব আয় ১১.৫৩ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৬৮টি জাহাজে আমদানি পণ্য এসেছে ৭ লাখ ৮৪ হাজার মেট্রিক টন, রাজস্ব হিসেব আয় হয়েছে ১২.২৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে বড় বড় জাহাজ থেকে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত ছোট বার্জ-কার্গো জাহাজে করে নওয়াপাড়া বন্দরে নিয়ে অসে। সেখান থেকে পণ্যসামগ্রী স্থলপথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে পাঠানো হয়। পাশাপাশি ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীও সড়ক ও নৌপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নওয়াপাড়া বন্দর থেকে ২ লাখ ২৬ হাজার মেট্রিক টন সার, ১ লাখ ৯৫ হাজার মেট্রিক টন কয়লা, ১ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন গম, ১ লাখ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট এবং ৫৪ হাজার মেট্রিক টন অন্যান্য পণ্যসামগ্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে।

সহকারী বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা মো. মাসুদ পারভেজ জানান, নওয়াপাড়া নদীবন্দরকে একটি অত্যাধুনিক বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার একটি বড় প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। ভৈরব নদ থেকে ৯০টি স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ৫৯টি অবৈধ স্থাপনা ইতিমধ্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দরের ৩৭ কিলোমিটারের ৩০ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে। যার মধ্যে ২৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজারের সাহায্যে বাকি ৫ লক্ষ ঘনমিটার এক্সাভেটরের সাহায্যে খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি কাজ শেষ হলে জাহাজ চলাচল আরও বৃদ্ধি পাবে।

সমস্যা

নওয়াপাড়ায় নদীবন্দর স্থাপনের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে।কিন্তু বন্দরের উন্নয়নকাজে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। গত বছর ভৈরব নদে ড্রেজিং শুরু হলেও দ্রুত পলি পড়ে নাব্য সংকট দেখা দিয়েছে। নদীবন্দর উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিরা নওয়াপাড়া নদীবন্দর পরিদর্শন করতে এসে ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরঘেঁষে গড়ে ওঠা অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা দেখতে পান। বন্দরের উন্নয়নকাজ করার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে এসব স্থাপনা। স্থাপনাগুলো সরিয়ে নিতে এলাকাবাসীকে বারবার তাগিদ দেওয়া হয়। এ নিয়ে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ী, দখলদার, জনপ্রতিনিধিদের কয়েক দফা বৈঠকও হয়। সভায় সিআরডিপি (City Regional Development Project) প্রস্তাবনার ১২ কিলোমিটারের পরিবর্তে ৬ কিলোমিটার কি্-ওয়াল, ১৩ ফুট রাস্তা করাসহ বন্দর উন্নয়নে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পাশাপাশি যাদের বৈধ স্থাপনা ভাঙা পড়বে সেসব মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়।

কিন্তু স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতা ও দখলদারদের উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ হয়ে এডিবি ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দকৃত প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি আরও কয়েক কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দীর্ঘদিন ফাইলবন্দী রয়েছে। এর জন্য অবশ্য কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতাকে দায়ী করছে নওয়াপাড়াবাসী। এলাকাবাসীর আশঙ্কা নওয়াপাড়াকে পরিপূর্ণ নদীবন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে বন্দর ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ভেস্তে যাবে। বন্দরকে ঘিরে যে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি হয়েছিল তা-ও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপরদিকে সরকার হারাবে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব।

জয়েন্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন ম্যানেজার আবদুর রহমান বলেন, ভাটার সময় পানি এত নিচে নেমে যায় যে জাহাজ কিনারায় ভেড়ানো সম্ভব হয় না। নাব্য সংকট হওয়ায় বন্দরে জাহাজ আসার পরিমাণও কমেছে। নওয়াপাড়া সার ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ জালাল হোসেন বলেন, 'ভৈরব নদকে ঘিরে নওয়াপাড়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। আমরা ঠিকমতো ট্যাক্স দিচ্ছি। কিন্তু বন্দরের কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না।' যশোর চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি ও আমদানিকারক মিজানুর রহমান খান বলেন, প্রতিবছর এই বন্দরটিতে পণ্য আমাদানি বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যবসায়ীরা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। নদী খনন করে এর পরিধি ও সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন। তাহলে ব্যবসায়ীরা বন্দরটি ব্যবহারে বেশি অগ্রহ দেখাবে। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন পরিচালক আব্দুল্লাহ হেল বাকী বলেন, আগে ১০০০-১২০০ টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ নওয়াপাড়া ভিড়তে পারত। এখন সেখানে নাব্য সংকটের কারণে ৭০০-৮০০ টনের বেশি জাহাজ ভিড়তে পারে না। নওয়াপাড়ার পৌরসভার মেয়র সুশান্ত দাস বলেন, বিআইডব্লিউটিএ ট্যাক্সের হিস্যা ঠিকমতো নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নদীবন্দরের কোনো উন্নয়ন করছে না। স্থানীয় নেতৃত্ব, বিআইডব্লিউটিএ এবং কিছু ব্যবসায়ীর অসহযোগিতার কারণে এডিবির প্রকল্পের টাকাও ফিরে গেছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বন্দর স্থাপনের পর যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি। নওয়াপাড়ার চেঙ্গুটিয়া থেকে রাজঘাট পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএর ৯টি জেটি থাকলেও তার অধিকাংশ বিকল থাকায় কোনো কাজে আসছে না। স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদন মোতাবেক বন্দর এলাকায় নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন ও নৌপুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, অভয়নগর, নওয়াপাড়া শাখার নামে চাঁদাবাজি চক্র নওয়াপাড়া নদীবন্দরে আসা জাহাজ, কার্গো, ট্রলার ও বোটে নিয়মিত চাঁদাবাজি করে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। অভিযোগ আছে নদীবন্দরে জাহাজ থেকে তেল চোর চক্র দীর্ঘ দিন ধরে তেল চুরি করে এলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো মাসোহারায় তুষ্ট থাকে নৌপুলিশ। অভিযোগ ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে জানা যায়, শুধু জাহাজ-কার্গো বা ছোট-বড় ট্রলার নয়, ঘাটমালিক, আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় হয়রানি ও প্রতারণার ফাঁদ তৈরি করে মোটা অঙ্কের চাঁদাও আদায় করা হয়ে থাকে। চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও জাহাজ মালিকেরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য বরাবরের মতো এসব অভিযোগ অস্বীকারই করছে নৌপুলিশ কর্তৃপক্ষ।

ঘাটশ্রমিকদের অভিযোগ, ঘাটে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন প্রতিমাসে তাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে । কিন্তু তাদেরকে ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না। নারীশ্রমিকদের পুরুষের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া হয়। ঘাট এলাকায় বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা নেই। নারীশ্রমিকদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। পণ্য ওঠানো-নামানোর ভালো ব্যবস্থা না থাকায় তাদের সবসময়

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। গতবছর দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন প্রায় ১০৬ জন এবং মারা গেছেন ৩ জন শ্রমিক। কিন্তু শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষ মৃতের পরিবারকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেয়নি। এখানে রক্ষকই ভক্ষক হিসেবে কাজ করে।

বন্দর উন্নয়নে কিছু সুপারিশ

১) বন্দর উন্নয়নে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

২) নদীর উভয় পাড়ের অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

৩) পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য গাইডওয়াল এবং মালবাহী ট্রাকের জন্য পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ করতে হবে।

৪) নদীর ভাঙন রোধে কি-ওয়াল তৈরি করতে হবে।

৫) নদীর নাব্য সংকট দূরীকরণে নিয়মিত ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) চাঁদাবাজি, তেলচুরি, সন্ত্রাস বন্ধে নৌপুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিসহ দুঘর্টনায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৮) নদীতে সবধরনের বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে।

সম্ভাবনা

প্রতিদিন প্রায় অর্ধশত বার্জ-কার্গো জাহাজ নদীবন্দরে মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করে। নদীপথে কম খরচে পণ্য পরিবহনের সুযোগ থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীরা নওয়াপাড়াতে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছেন। শিল্পপতিরাও নওয়াপাড়ার নদীবন্দরকে কেন্দ্র করে পাট, সার, সিমেন্ট, চাল, তেল, মৎস্য খাবার, চামড়ার মিল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। ভারত দেশ থেকে স্থল ও রেলপথে আমদানিকৃত মালামাল কম খরচে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনাসহ প্রভৃতি স্থানে সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে বার্জ-কার্গো জাহাজে প্রতিদিন মালামাল পরিবহন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্দরকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষভাবে ২০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। জাহাজের সংখ্যা, মালামাল আমদানি ও রাজস্ব আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীরে ধীরে নওয়াপাড়া নদীবন্দর প্রথম শ্রেণির বন্দরে উন্নীত হচ্ছে।

পরিশেষে বলতে চাই "ভৈরব নদ বাঁচলে নওয়াপাড়াবাসী বাঁচবে"। বন্দরের উন্নয়নে সকল পক্ষকে একসাথে কাজ করতে হবে। তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ভিশন-২০৪১' ও উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নওয়াপাড়া নদীবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

তথ্যসূত্র

১। দৈনিক কল্যাণ- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮
২। কালের কণ্ঠ- ১১ অক্টোবর ২০১৮
২। দৈনিক সংগ্রাম- ২৯ অক্টোবর ২০১৮
৩। দৈনিক ইনকিলাব- ৬ নভেম্বর ২০১৮
৪। সময়ের কথা - ২৩ মার্চ ২০১৯
৫। দৈনিক জনকণ্ঠ- ২৮ জুন ২০১৯
৬। দৈনিক নওয়াপাড়া- ৬ অক্টোবর ২০১৯
৭। বিআইডাব্লিউটিএ ওয়েবসাইট
৮। বিআইডব্লিউটিএ, নওয়াপাড়া, যশোর।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৫৯-২৬২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে পেঁয়াজ অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি: একটি পর্যালোচনা

মোঃ সাইদুর রহমান*

পেঁয়াজ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর একটি অন্যতম খাদ্য উপকরণ। রসুন এবং আদার কদরও প্রায় সমানতালে চলে। তরকারিতে পেঁয়াজ না হলে বা কম হলে যেন চলেই না। মজাদার খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে পবিত্র রমজান ও কোরবানির ঈদের সময়ে পেঁয়াজ এক অপরিহার্য পণ্য। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারণা করা হয় যে, বাংলাদেশে সারা বছর ২৪ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান (বিবিএস, ২০১৮) এর তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট উৎপাদিত পেঁয়াজের পরিমাণ ১৭.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা বিগত বছরে ছিল ১৮.৬৭ মেট্রিক টন। আর আমদানি করা হয় প্রায় ১১ লক্ষ মেট্রিক টন (সারণি-১)।

হিসাবে কিছুটা গড়মিল মনে হলেও পচনশীল পণ্য বিবেচনায় বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ কিছুটা বেশি রাখার চেষ্টা সঙ্গত কারণেই খুব স্বাভাবিক। গত বছর এপ্রিল মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে কৃষকের নিজস্ব পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা পেঁয়াজ পচে যায়। বাজারে দেশীয় পেঁয়াজ ঘাটতির মূল কারণ এটি। আর দ্বিতীয় কারণ হিসেবে দেখা হয় অতিমাত্রায় আমদানিনির্ভরতা। মূলত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকেই সিংহভাগ পেঁয়াজ আমদানি করা হয়ে থাকে। মিয়ানমার, মিসর, তুরস্ক থেকেও কিছু পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারতে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশের বাজারেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। কয়েক দিনের ব্যবধানেই কেজিপ্রতি দাম ৪০-৪৫ টাকা থেকে ৫৫-৬০ টাকা হয়ে যায়। হঠাৎ করে ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব ট্রেড (ডিজিএফটি) ঘোষণা করেন যে, ভারত থেকে রপ্তানি করা পিয়াজের দাম টনপ্রতি সর্বনিম্ন মূল্য হবে ৮৫০ ডলার, যা পূর্বে ছিল ৩৫০ ডলার। ভারত সরকার তাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই দাম বাড়ার বিষয়টি আমলে নিয়ে প্রথমে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল নেয় এবং পরে তাদের ভোক্তাদের চাহিদা অটুট রাখার স্বার্থে গত ২৯ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করে পেঁয়াজ আর রপ্তানি করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়। এমনকি পূর্বের অর্ডারও বাতিল করে দেয়। এর সাথে যোগ হয় কিছুসংখ্যক অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীর অসাধু

* অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; ফোন: ০১৭৩৩ ৯৮০ ৪২৮, ই-মেইল: saidurbau@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯

সারণি-১: বাংলাদেশে বিগত ১০ বছরে পেঁয়াজ, রসুন এবং আদার আবাদি জমির আয়তন, উৎপাদনের পরিমাণ এবং আমদানির পরিমাণ নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

উৎপাদন বছর	পেঁয়াজ আবাদি জমির আয়তন (একর)	পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ (মেট্রিক টন)	রসুন আবাদি জমির আয়তন (একর)	রসুন উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	রসুন আমদানির পরিমাণ (মেট্রিক টন)	আদা আবাদি জমির আয়তন (একর)	আদা উৎপাদন পরিমাণ (মেট্রিক টন)	আদা আমদানি পরিমাণ (মেট্রিক টন)
২০০৮-০৯	২৬৬০০০	৭৩৫০০০	১১৩৪৬৮.০১	৮৫০০০	১৫৫০০০	৬৩৯৯০.৬২	২২২৮২	৭২৬০৮	এনএ
২০০৯-১০	২৯১০০০	৮৭২০০০	৭৩৬৮৭.৩৮	৯২০০০	১৬৪০০০	৫৬৬২.০১	২২৪০৩	৭৪৮৪১	এনএ
২০১০-১১	৩১৬০০০	১০৫২০০০	১৬০৯৮.০০	১০৪০০০	২০৯০০০	৩৪৩১৬.২৪	২২৫২৭	৭৪৩৮০	এনএ
২০১১-১২	৩৩৫০০০	১১৫৯০০০	২২৮৮৩.৬৮	১০৯০০০	২৩৪০০০	৪৮৭২৬.৬৬	২২৫২৮	৭২০৮৪	এনএ
২০১২-১৩	৩৩২০০০	১১৬৮০০০	৪৭৭৩৫.৬০	১০৫০০০	২২৪০০০	২০৮১৭.৭৯	২২০৯৪	৬৮৮৫৫	এনএ
২০১৩-১৪	৩৭৩০০০	১৩৮৭০০০	৪৩০০০.০০	১৩১০০০	৩১২০০০	৬৩২২৮.০৫	২৩৪৭২	৭৭০৫২	এনএ
২০১৪-১৫	৪১৯০০০	১৭০৪০০০	৪২৩৪১০.৭০	১৪১০০০	৩৪৬০০০	৭৪৮৯.৯০	২৫২৪৬	৮৩০০৪	এনএ
২০১৫-১৬	৪৩৮০০০	১৭৩৫০০০	৫৭৬০৯৩.৯০	১৫০০০০	৩৮২০০০	৩৮২১৯.৪৩	২২৪০০	৭৭২৯০	এনএ
২০১৬-১৭	৪৫৯০০০	১৮৬৭০০০	১০৯৮৪২২.১	১৬৪০০০	৪২৫০০০	৫৪৭৯০.৩০	২২৯৯৮	৭৭৪৭৮	এনএ
২০১৭-১৮	৪৪১০০০	১৭৩৭৭১৪	১০৬৪৩৪৬.৬	১৭৬০০০	৪৬১৯৭০	৭০২০৯.১০	২৩৭৪৫	৭৯৪৩৮	এনএ

তথ্যসূত্র: বিবিএস কৃষি পরিসংখ্যান, ২০১৩, ২০১৬ এবং ২০১৮; বি. দ্র. এনএ অর্থ তথ্য পাওয়া যায়নি

আচরণ। ফলে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ১২০ টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। এক মাসের ব্যবধানে এখন বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২০০-২৫০ টাকায়। এতে বিপাকে পড়েন লাখ লাখ ভোক্তা, যারা তাদের রান্নাবান্নায় প্রচুর পরিমাণ পেঁয়াজ ব্যবহার করে অভ্যস্ত। বাজার অস্থিতিশীল হওয়ায় সরকারকেও পেঁয়াজের বাজারের লাগাম ধরতে 'ব্যর্থ' বলে তকমা নিতে হয়। মিডিয়ার ব্যাপক প্রচারে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ নড়েচড়ে বসে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। টিসিবি প্রতিদিন ঢাকা শহরে ৫ টন করে পেঁয়াজ ৪৫ টাকা কেজিদরে খোলাবাজারে বিক্রির ঘোষণা দেয়। শুধু ঢাকা শহরে খোলাবাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করার ঘোষণায় চট্টগ্রামসহ অন্য জেলাশহরের ভোক্তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। ফলে পেঁয়াজের উচ্চদামের বিষয়টি সরকারকে ভীষণ বিপাকে ফেলে দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, ২০০৭-০৮ সালে নিজস্ব ভোক্তাদের কথা বলে চাল রপ্তানি নিয়ে ভারত একই কাজ করেছিল এবং ২০১৫ ও ২০১৭ সালে পেঁয়াজ রপ্তানিতেও ভারত হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, যার প্রভাবে বাজারদর বেড়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের এহেন বৈরী আচরণ এ দেশের মানুষকে দারুণভাবে ব্যথিত করে; সাথে সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বেশি নির্ভরশীলতার সুযোগ যাতে কেউ না নিতে পারে, তার জন্য আভ্যন্তরীণ সক্ষমতাও বাড়ানো প্রয়োজন। তা না-হলে বাজার অস্থিতিশীল হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং এর দায় সরকারের পক্ষে এড়ানোও কঠিন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ভারতে বার্ষিক পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ ২২-২৩ মিলিয়ন টন, যা গোটা পৃথিবীর পেঁয়াজ উৎপাদনের ২৫ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ভারত ১৯ লক্ষ ৯০ হাজার টন পেঁয়াজ রপ্তানি করেছে (তথ্যসূত্র: মশিউল আলম, প্রথম আলো)।

মিয়ানমার, মিসর এবং তুরস্ক থেকে ১ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানির উদ্যোগ এবং গত কয়েক দিনে জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্যোগে বাজার তদারকির নামে অভিযান পরিচালনা করায় পেয়াজের ঝাঁজ কিছুটা কমে এসেছে। এটি নেহায়েত সাময়িক পদক্ষেপ এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না। হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এহেন আচরণে একটু বাড়াবাড়ি হলে বাজার আরও অস্থিতিশীল হওয়ার ঝুঁকিতে পরতে পারে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটে যোগদানের পর ভারত-বাংলাদেশ ব্যবসায়ী ফোরমের অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানির খবর যথাসম্ভব পূর্বে বাংলাদেশকে জানানো হলে ভালো হতো বলে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত অভিমত ব্যক্ত করায় তার প্রভাব পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল হতে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাজার মনিটরিং ও অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাময়িক সমাধানের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন যদিও এগুলো কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়। দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের নিমিত্তে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা হলো:

১। পেঁয়াজকে শুধু মসলা পণ্য হিসেবে গণ্য করলেই চলবে না বরং বিদ্যমান স্বল্পসুদে (৪ শতাশ হারে) ঋণ সুবিধার পরিধির ব্যাপক বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে বেশিসংখ্যক কৃষক পেঁয়াজ উৎপাদনে উৎসাহী হন এবং এতে পেঁয়াজের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে; ২। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কৃষিবিপণন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে পেঁয়াজের চাহিদা নিরূপণ করে দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পেঁয়াজ উৎপাদনকারী একাধিক দেশ থেকে সঠিক পরিকল্পণা অনুযায়ী তা সঠিক সময়ে আমদানির উদ্যোগ নিতে হবে; ৩। নিয়মিত বাজার তদারকির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান বছরব্যাপী অব্যাহত রাখতে হবে; ৪। দেশীয় পেঁয়াজ সংরক্ষণের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণায় বিনিয়োগসহ উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষককে উৎসাহিত করতে হবে; ৫। ব্যবসায়ীদেরকে শুধু

দোষারোপ না করে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলে বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে; ৬। কৃষক উৎপাদন মৌসুমে যেন ভালো দাম পান, তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ন্যূনতম দাম নির্ধারণ আমদানি নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। এ বছর ভালো দাম পেলে আগামী বছর বেশি পেঁয়াজ উৎপাদনে কৃষকেরা এগিয়ে আসবেন; ৭। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে বাজারে পেঁয়াজের জোগান বৃদ্ধি পেলে দাম কমে আসবে, সেটা স্বাভাবিক; কিন্তু সে জোগান যেন কেউ বাধাগ্রস্থ না করতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা রাখতে হবে; ৮। দাম কিছুটা বাড়লেই খুচরো ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা যেন হুজুগে বেশি মাত্রায় ক্রয় করে মজুত না করেন, তার জন্য সচেতনতা তৈরি করতে হবে; ৯। মৌসুমে পেঁয়াজের দাম যাতে খুব বেশি কমে না যায়, তার জন্য পেঁয়াজচাষিদের উৎপাদনখরচের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তাদের উপকরণ খরচে ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; ১০। দেশের যেসব অঞ্চলে পেঁয়াজ উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে (ফরিদপুর, পাবনা, নাটোর, রজিশাহী) সেসব অঞ্চলে কৃষকদের পেঁয়াজ উৎপাদনে এবং সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; ১১। উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজের জাত উদ্ভাবনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর বরাদ্দ বাড়াতে হবে; এবং ১২। আমাদের দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা যাতে না বাড়ে, সে জন্য উৎপাদন মৌসুমে কম দামে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বেশি পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানির সুদূরপ্রসারী কৌশলকে মোকাবিলা করার সুষ্ঠু পরিকল্পনাও থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারত নিজ দেশের ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রথমে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে ভবিষ্যতে রপ্তানিতে প্রভাব পড়বে জেনেও পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ আমাদের দেশের সরকার বাজার তদারকির নামে স্বল্প মেয়াদে কিছু ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত দাম কমে যাবে বলে যে কৌশল নিয়েছে, যাতে ভোক্তার ভোগান্তি কোনোভাবেই কমছে না; বরং দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমদানিমূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ের অভাবে ব্যবসায়ীরা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো খড়্গ নেমে আসতে পারে, সে আশঙ্কায় সঙ্গত এখন আর তারা বেশি পরিমাণে আমদানি করার ঝুঁকি নেবেন না। এখন যেটা বেশি প্রয়োজন তা হলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় দ্রুত পেঁয়াজ আমদানি করা এবং টিসিবির মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করা। অন্যথায় পেঁয়াজের ঝাঁজ আর চোটপাট যা-ই বলি না কেন তা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে যা হবে অনাকাঙ্ক্ষিত। আশা করি সদাশয় সরকারের কার্যকরী মহল বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৬৩-২৬৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

গ্রন্থ পর্যালোচনা

গ্রন্থ আলোচনা

বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে

গ্রন্থকার: **আবুল বারকাত***

ভাষা: বাংলা ➢ প্রকাশক: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা
প্রথম প্রকাশ: ১ নভেম্বর, ২০২০ ➢ প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা ➢ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০৩ + lvi
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৮৩৬৪-৫

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৬৫-২৭১
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা*

মো. আব্দুল হান্নান**

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত অতিসম্প্রতি "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র; ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" শিরোনামে একটি অনন্য গবেষণালব্ধ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটির নাম এবং কলেবর (৭৩৬ পৃষ্ঠা) যেকোনো আগ্রহী পাঠককে শুরুতেই ভাবাতে পারে—একটানা দেখে শেষ করা যাবে তো! এ দ্বিধা আমারও ছিল। কৃতজ্ঞতা স্বীকারপর্বও গতানুগতিকতার বাইরে। এ পর্বে পাঠক বিস্মিত হতে পারেন ব্যক্তি লেখক ড. বারকাতকে দেখে—তিনি কত সরল, বিনয়ী, মানবিক, মৌলিক চিন্তাভাবাপন্ন এবং সাদামনের। প্রকৃতির সাথে তার সখ্যতা, তার জ্ঞানের ঈর্ষণীয় ব্যাপ্তি ও গভীরতা এবং অকপটে নির্মোহ মত প্রকাশের সৎসাহস। নিরন্তর জ্ঞান অসন্ধানের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় তার অর্জিত দার্শনিক ভিত্তি। পাঠক হয়তো ভাবতেও পারেন, প্রকৃতির বিধিবিধানের অধীনতা স্বীকার করে, বিশুদ্ধ ও বৈপ্লবিক চিন্তার দৃঢ়তা নিয়ে ড. বারকাতের বাংলাদেশের সন্ধানযাত্রায়, তার দর্শণ অনুসন্ধানে পর্যাপ্ত সময় তো দেয়াই যায়। এ অনুভূতি আমার বেলায়ও ঘটেছে।

এ বইয়ের মুখবন্ধের বিস্তৃত কলেবরও গতানুগতিকতার বাইরে। বেশ দীর্ঘ হলেও, পড়ে মনে হবে যেন একটি সম্পূর্ণ বই। লেখক তার স্বভাবজাত প্রজ্ঞা ও মুন্সিয়ানায়, অত্যন্ত সফলভাবে পাঠককে এত বড় মৌলিক গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণতা উপলব্ধির নিমিত্তে সহজ-পাঠ প্রণয়ন করেছেন। বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র এর মতো এত ব্যাপক ও জটিল সমীকরণের প্রেক্ষাপটে শোভন বাংলাদেশের ধারণাকে অবয়ব দিয়েছেন। তার মৌলিক চিন্তা চেতনা ও বিশ্লেষণে যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ ড. বারকাতকে বৈশ্বিক মাত্রায় তুলে ধরেছে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব বিখ্যাত মার্কিন লেখক Noam Chomsky থেকে Congratulations on the book সম্বলিত বার্তা, সম্ভবত এই প্রথম একজন বাঙালি লেখক ও চিন্তাবিদ ড. বারকাত পেয়েছেন—যা অপরিমেয় সম্মানের।

* অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের গ্রন্থর একটি পর্যালোচনা, মুক্তমত, ৪-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ইউনাইটেড কিংডম (ইউকে) সংস্করণ; 'অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা', মতামত, ২৯ ডিসেম্বর ২০২১, বিডিনিউজ ২৪, কম

** অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ও সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। ফোন: ০১৭৪৯১৩০১৪৯, ই-মেইল: md.a.hannan@gmail.com

এ বইতে লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্তমান চলমান বৈশ্বিক পুঁজিবাদ প্রভাবিত ব্যবস্থাকে অশোভন আখ্যায়িত করে, ক্রমবর্ধমান শোষণ এবং বৈষম্যতাকে উত্তরণশীল বলে দাবি করেছেন। শোষণ এবং বৈষম্যতার ভিত্তিকে উপড়ে ফেলে মানবমুক্তির লক্ষ্যে, প্রকৃতির বিধিবিধানকে মান্য ও লালন করে আলোকিত মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে, তার প্রস্তাবিত এবং বিনির্মিত শোভন সমাজব্যবস্থা অথবা শোভন জীবনব্যবস্থার তত্ত্বকাঠামোকে General Theory of Decent Society & Decent Life আখ্যায়িত করে তা পাঠকের গ্রহণ-বর্জনের বিবেচনায় উদারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

লেখক, বর্তমান বৈশ্বিক মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির যে সকল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ধারণাসমূহকে নিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তথাকথিত অবশ্যম্ভাবী সফলতা ও কার্যকারিতার দাবি করে, তাকে একটি সূক্ষ্ম (বিভ্রান্তি) আখ্যায়িত করে তা চ্যালেঞ্জ করেছেন। অত্যন্ত জোরালো যুক্তি, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পুঁজিবাদ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনসহায়ক নয়। এমনকি efficient, civilized নয়। তার মতে, এ সকল ধারণা, সত্যিকার অর্থে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে, সকল দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে আদৌ সৎভাবে ক্রিয়াশীল নয় এবং দাবিকৃত সুবিধাদিও নিশ্চিত করে না। বরং, তিনি অধিকতর স্পষ্টভাবে বলেছেন, "মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতি, সবকিছু সূক্ষ্ম এবং সচেতনভাবে একমাত্র কর্পোরেট ও মুনাফার স্বার্থে" চালিত। এসবের সত্যতা নিরূপণে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারিকালে উন্নত বিশ্বসহ সকল রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ভঙ্গুরতার উন্মীলন এবং প্রকৃতির কাছে বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার অসহায় আত্মসমর্পণ। অনেক দেশের গণতন্ত্রহীনতা এবং চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনকে বিবেচনায় না নিয়ে, মুক্তবাজার অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক দেশসমূহের, সেসব দেশ ও নেতৃত্বের অব্যাহত সমর্থন প্রদান। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ওপর কর্তৃত্ব অব্যাহতভাবে বজায় রাখা ও অন্যের জন্য তা সহজলভ্য না করা এবং নিজেদের স্বার্থেই বিদ্যমান অনাকাঙ্ক্ষিত অসাম্যতা ও দারিদ্র্যতার চলমানতা বজায় রাখা। সর্বোপরি, বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশ ও মানবকল্যাণকে অব্যাহতভাবে একটা নেতিবাচক ঘূর্ণয়মান চক্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখা।

ক্যাপিটালিজমের মিথ বিশ্লেষণের একপর্যায়ে ড. বারকাত তার গ্রন্থে পুঁজিবাদের পতনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বৈশ্বিক রাজনীতি ও অর্থনীতির বিকাশের পরিক্রমায়, সমাজ বিবর্তনের ধারায়, সাম্রাজ্যবাদ, রাজতন্ত্র, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, উদারনীতি, বিশ্বায়ন, নব্য-উদারনীতিসহ অসংখ্য বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী মৌলিক আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক এবং বাস্তবতার নিরিখে, বিশেষভাবে তিনি আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং ধারণার ওপর, যেমন: মানুষ মানুষের ওপরে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য; প্রকৃতির পণ্যায়ন; সমাজের পণ্যায়ন; আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি; মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব; আইনের শাসন; আন্তর্জাতিক শ্রেণি-সংগ্রাম; বৈশ্বিক ক্ষমতার বিন্যাস; এবং একবিংশ শতকের অর্থনৈতিক মহামন্দা ও ভাইরাস বিপর্যয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপ্রাপ্ত যে সকল সার্বজনীন সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি, যা যেকোনো অনিসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

লেখকের গ্রন্থের নামকরণে "বড় পর্দার" বিষয়টির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা দেখে নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মাণ হবে, এটি একটি Testament of inquiry of the causes of possible (inevitable!) collapse of the dominance of capitalism–not just driven by the forces of events but causation of all factors holistically perceived। পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের নিরিখে ড.

বারকাত মনে করেন, এ পরিক্রমায় পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চিরায়ত দ্বন্দ্বই সকল সমস্যার মূল। Post-Capitalist Order-এ, সকল সমস্যার ক্লাসিক সমাধানে, ঐ দ্বন্দকে সমূলে উৎপাটিত করতেই হবে।

ড. বারকাতের গ্রন্থের বলিষ্ঠতা, পোস্ট-ক্যাপিটালিস্ট অর্ডারের বিকল্প হিসেবে শোভন রাষ্ট্রের মডেল উপস্থাপন। তবে তা নিঃসন্দেহে অনেক বিতর্কের জন্ম দেবে। এ মডেলের প্রতিপাদ্য হিসাবে তিনি মনে করেন: (ক) গণতান্ত্রিক সম্মতির ভিত্তিতে শোভন দেশ প্রতিষ্ঠিত হবে; ক্যাপিটাল এবং লেবার-এর মধ্যে চিরায়ত দ্বন্দ্ব দূরীভূত করা হবে; প্রকৃতিকে মান্য ও লালন করা যাবে; এবং জনগণকে করা হবে আলোকিত। (খ) Means of Production (উৎপাদনের উপায়) রাষ্ট্রীয় মালিকানায়" থাকবে (যেমন শিল্প ও কৃষি)। রাষ্ট্রীয় মালিকানার বিষয়টি সমঝোতার ভিত্তিতে বা ভোটের মাধ্যমে হতে পারে (অথবা শ্রেণিসংগ্রাম বা বিপ্লব-এর মাধ্যমে হওয়ার কথা অনেকে ভাবতে পারে)। (গ) উৎপাদনের উপায়ের ওপর শ্রমজীবী-কর্মজীবী জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং তা পরিচালিত হবে যৌথ-মালিকানাভিত্তিক সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এখানেই, প্রচলিত সমাজতন্ত্রের প্রায়োগিকতার সাথে ড. বারকাতের শোভন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পার্থক্য। তিনি বলেছেন, প্রায়োগিক সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদীদের হাত থেকে উৎপাদনের উপায় কব্জা করা গেছে, কিন্তু তা কখনো শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের প্রত্যক্ষ মালিকানায় নেওয়া যায়নি।

ড. আবুল বারকাত তার General Theory of Decent Society বিনির্মাণে পরস্পরসম্পর্কিত ও নির্ভরশীল তিনটি বৃহৎবর্গীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি উপাদানের (broad foundational components) সমন্বয়ে যে একশিলা স্তম্ভের (Monolithic Pillar) ধারণা উপস্থাপন করেছেন এবং তা সত্যিই চমৎকার। তার শোভন সমাজের আলোকিত জনগণ হবে জ্ঞানসমৃদ্ধ, মুক্তচিন্তার, সংস্কৃতিবাণ, বিজ্ঞানমনস্ক, এবং পাস্পরিক সহমর্মিতায় উচ্চ-সংহতিসমৃদ্ধ সৃজনশীল মানুষ। শোভন রাষ্ট্র হবে সত্যিকারের জনগণের রাষ্ট্র, গণতন্ত্র হবে প্রকৃত অর্থের Demos-দের শাসন। শাসনপদ্ধতি হবে নিচ থেকে উপরে (bottom-up)। আমলাতন্ত্র হবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্ক নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। দেশ রক্ষা করবে জনগণ। এবং এসবের মিথষ্ক্রিয়ায় শক্তিশালী হবে শোভন সমাজের ভিত্তি, সমাজ হবে সত্যিকারের বৈষম্যহীন। তাতে রাষ্ট্র ও জনগণের কাঙ্ক্ষিত সত্যিকারের ক্ষমতা (power) গুটিকয়েক পুঁজিপতির oligarchy থেকে রাজনীতির (Politics) কাছেই ফিরে আসবে।

মুক্তবাজার ব্যবস্থার আলোকে ড. বারকাত জাতীয় বাজেট নিয়ে প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, Budget shouldn't be based on consideration of revenue first, rather the reverse, needs first। তার শোভন সমাজব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হবে সত্যিকারের জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন—যা সবার জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, কাজ এবং বিশ্রাম ও বিনোদনসহ সামাজিক ন্যায়-অধিকার (socially justifiable rights) নিশ্চিত করবে। শুধু দরকার বাজেট বিষয়ে প্রথাগত মানসিকতার পরিবর্তন। বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত মৌলিক বিষয়ে বিস্তৃ ত তথ্য-উপাত্ত, এবং বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে তিনি বলেছেন, এগুলো দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়। উপরন্ত দাবি করেছেন, সামাজিক ন্যায়-অধিকারকে তার প্রস্তাবিত শোভন সমাজ ও রাষ্ট্র অত্যন্ত সম্মানের সাথে স্বাভাবিক দায়িত্ব হিসাবে নিশ্চিত করবে।

লেখক জোরাল যুক্তি তুলে ধরেছেন, মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকেরা কীভাবে religious tradition–কে এড়িয়ে politics of religion-এর মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থে সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রে নেতিবাচক প্রভাব চলমান রেখে প্রকারান্তরে তাদেরই শক্তিশালী করছে।

প্রশ্ন হতে পারে লেখক ড. আবুল বারকাত কী Idealist or Realist? তিনি কী সমাজতন্ত্রী না সাম্যবাদী? এর বাইরেও প্রশ্ন থাকে, প্রস্তাবিত শোভন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? বাস্তবতার নিরিখে, শোভন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গণতান্ত্রিক সম্মতির ভিত্তিতে শোভন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনের উপায়ের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা যে সহজ নয়, তা ইতিহাসই বলে। তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটও সংঘাতপূর্ণ ও রক্তক্ষয়ী ছিল।

আজকে পুঁজিবাদী বিশ্বের যে ক্রাইসিস, তা নিয়ে অনেক আগে থেকেই গবেষণা, আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকে বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ এবং আমেরিকার নেতৃত্ব ও ক্ষমতার আধিপত্যের পতনেরও ইঙ্গিত দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা, সমর্থক এবং নেতৃত্বদানকারী দেশসমূহ হয়তো একটু বেশি মাত্রায় আত্মপ্রসাদেই ভুগেছে। বিশ্বায়নের ধারণাকে সামনে এনে, নব্য-উদারনীতি ও উদার বৈদেশিক বাণিজ্যেই সকল দেশের উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি—এ ধারণাকে জনপ্রিয় এবং বাস্তবায়ন করেছে। সবকিছুতে রাষ্ট্রের ভূমিকা একেবারে গৌণ করা হয়েছে। তাতে, শেষ বিচারে তাদের লাভ হয়নি। ইতোমধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশসমূহের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বৈশ্বিক মহামারি, বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিবেচ্য বিষয়সমূহ যেমন—স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, উন্নয়ন, প্রযুক্তি এবং জলবায়ুসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক ক্ষমতার প্রাধান্যের বিন্যাসকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

অন্যদিকে পুঁজিবাদের বিপরীতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতনও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানকার বাস্তবতা হচ্ছে উৎপাদনের উপায়ের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দীর্ঘমেয়াদে স্থায়িত্ব (sustainable) পায়নি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিশ্চিতভাবে intrinsic fallacies, contradictions and weakness ছিল (যেমন, রাষ্ট্র ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তি, দল ও নেতৃত্বের দলীয় আমলাতান্ত্রিকতার নিগড়, দুর্নীতি, অপচয়, অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি ও অব্যবস্থাপনা), যা বড় পর্দায়, শোভন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিবেচনায় নিতে হবে। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, বিনোদন ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে বাজার অর্থনীতির চেয়ে আজকের প্রেক্ষাপটে ভালো মনে হতে পারে। তবে স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, মানুষের নিজস্বতা ও প্রতিভাকে শাণিত করে কোনো কিছুর উদ্ভাবন এবং তার স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি কোন ব্যবস্থায় প্রাধান্য পাবে তা বিশেষভাবে বিচার্যের বিষয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে অনেক দেশ বেরিয়ে এসে বাজার অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের বাস্তব অভিজ্ঞতায়, চীন নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানকে বজায় রেখে মুক্তবাজার বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উন্নয়নের উল্লম্ফন ঘটিয়েছে। এখন বাজার অর্থনীতির দুরবস্থা দেখে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটিয়ে (২০২৫ সালের মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন) আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়ে, তাদের উন্নয়নের ইতিবাচক ধারা বজায় রাখার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির নেতৃত্বে থাকতে চায়। বৈশ্বিক কৌশলগত ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসে তা কতটুকু স্থায়ীত্বশীল (sustainable) এবং শান্তিপূর্ণ হবে, উপরন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যেও পারস্পরিক-নির্ভরশীলতা (interdependence) ও পরিপূরকতা (complementaritz) কত দিন শান্তিপূর্ণভাবে চলমান থাকবে তা কে জানে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে চীন পিছিয়ে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণে বিশ্বে প্রথম। অস্তিত্বের হুমকিসহ, বিশ্ব আজ অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এটাই আজ বিশ্ববাস্তবতা।

অর্থনীতিতে, পুঁজিবাদলালিত অসমতা এবং দারিদ্রের দুষ্টচক্রকে ভাঙতে ইউরোপের ধনী দেশসমূহের "কল্যাণরাষ্ট্র" ধারণাও বাস্তবে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরে Post neo-Liberal Order নিয়েও বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃত্বপর্যায়ে ডায়ালগ শুরু হলেও ভাইরাসের বিধ্বংসী আবির্ভাব সকল বিবেচনাকে নিশ্চিতভাবে পাল্টে দিয়েছে। দেখার বিষয়, তারা Post neo-Liberal Order এর লক্ষ্যে, বৈশ্বিক প্রাধান্যের বিন্যাসে মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শনকেই প্রাধান্য দিয়ে সমাধান খুঁজবেন, না রাষ্ট্রের অধিকতর ভূমিকার বিষয়ে কোনো আমূল পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেবেন এবং প্রকৃতিকে মান্য ও লালন করে এগিয়ে যেতে সমাধান খুঁজবেন।

শোভন সমাজের আলোকে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব বেশ জটিল। মার্কসীয় Theory of value by physical labour-এর ভিত্তিতে মূল্যায়িত, সেখানে মানুষের intellectual and cognitive labour (মেধা ও মননভিত্তিক শ্রম) মূল্যায়ন কীভাবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়টি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারেনি, যা ছিল সে ব্যবস্থার এক বড় দুর্বলতা। যদি তার সুরাহা না হয়, তাহলে মেধা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কে কী ভূমিকা রাখবে? সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, ব্যক্তির স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ধারায়, রাষ্ট্রযন্ত্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে কি না। প্রশ্ন আসে এ জন্য যে, শোভন রাষ্ট্র ও সমাজের মূল ভিত্তিই হচ্ছে—আলোকিত মানুষ এবং ঐ আলোকিত মানুষেরই গণতান্ত্রিক সম্মতি (democratic consent)। তবে, বাস্তবতার নিরিখে শোভন রাষ্ট্রকেই, সমাজ ও অর্থনীতিতে অধিকতর গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। আবারও প্রশ্ন—সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে শোভন রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিন্যাসের পার্থক্য কী? বাজার অর্থনীতির বিপরীতে, শোভন সমাজ ও রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক না হলে, শোভন সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে দার্শনিক, তাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং জটিল বাস্তবতার কী পার্থক্য? আর যদি সমাজতন্ত্রের আঙ্গিকে শোভন সমাজ তার ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ তৈরি করে এগুতে চায়, বিদ্যমান বাস্তবতায় চীন কি শোভন সমাজের সকল উপাদান বিশেষ করে আলোকিত মানুষ তৈরি করে সঠিক পথে এগুচ্ছে? আবার, যে সকল রাষ্ট্র বাজার অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও জনগণ কি সার্বিকভাবে মূলধারায় সম্পৃক্ত? এসব নিয়ে আবুল বারকাতের বিশ্লেষণমতে সমাজতন্ত্র তার মূল অভীষ্ট অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং মুক্তবাজার বলে কোথায়ও কোনো কিছু ছিল না এবং নেই।

শোভন রাষ্ট্রের পত্তন এবং অগ্রগতিকে স্থায়ীত্বশীল করতে, বিশেষ করে transition, transformation, and establishment of Cooperatives of workers joint-ownership সম্পর্কিত কার্যকরণের মৌলিক বিষয়ে ড. বারকাত এখনই বিস্তৃত কিছু বলতে চাননি। শোভন রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার উত্তরণপর্ব (transition phase) ও রূপান্তরপর্বের (transformation phase) বিষয়ে তিনি ২০৫০ সালের দিকে নিখুঁতভাবে বলা সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতার নিরিখে বিষয়গুলি বেশ জটিল এবং যেকোনো সমাজ ও দেশের জন্যই অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা, বাজার অর্থনীতির ক্ষমতা-কাঠামোয় বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থান্বেষী মহলের সক্রিয় অবস্থান এবং তার সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থের মিলন, যা সকলদেশেই তথাকথিত এক কঠিন ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। এমতাবস্থায়, শুধু আলোচনা বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সমাধাযোগ্য নয়। আর, বাজার অর্থনীতির বর্তমান সকল সুবিধাভোগী শ্রেণি (যেমন আমলা, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, প্রেস ও মিডিয়া) তো সক্রিয় আছেই। তাদের তথাকথিত ক্ষমতার steel frame-কে ধর্তব্যে নিতেই হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদ কৃষি, শিল্প ও টেকনোলজির বিপ্লব ঘটিয়ে, সকলকে তা শুধুমাত্র অনুসরণের এক এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। সবাই তাদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে এবং উন্নত পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে, অনেকেই ভাবতে পারেন, ড. বারকাত বোধহয় Ideal State (আদর্শ রাষ্ট্র)-এর কথা ভাবছেন। এ বিষয়ে লেখক স্পষ্টই বলেছেন, কেউ সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে বড় পর্দায় দেখতে চায়নি বা দেখেনি। মানুষকে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেনি, বরং উল্টোটাই ভাবনাজগৎ ও কর্মকাণ্ডে নিয়ামক ছিল। তাই, শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবু, লেখকের কাছে জানতে ইচ্ছে করে—সমাজের কোন অংশীজন (stakeholder) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, সমঝোতার ভিত্তিতে, শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ডায়লাগ বা ডিসকোর্স শুরুর মাধ্যমে জনমত তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা রাখবে। এখানে নিবেদিত রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কি? না, আলোকিত মানুষগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনটি আনবে। বিষয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং বৈকি। লেখক নিজেই বলেছেন, পুঁজিবাদ তার স্বার্থে, প্রয়োজনে অনেক ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর।

ড. বারকাত বৈশ্বিক শোভন সমাজ বিনির্মাণে আলোকিত মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঝোতা এবং ডায়লগকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষভাবে দাবি করেছেন, আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদের নেতিবাচক চক্র ও কুফল এবং ভাইরাসের সর্বগ্রাসী ক্ষতি মিলে বড় পর্দায় প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-আস্থা-সম্মানভিত্তিক নতুন এক জীবনব্যবস্থা শোভন সমাজব্যবস্থা-উদ্দিষ্ট আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ সময়ের দাবি। যেহেতু, ইতিহাসের গতিধারার অভিজ্ঞতায়, সকল দেশ ও সমাজ কোনো না-কোনোভাবে, যেকোনো সমাজ ও অর্থনীতির দর্শনের সফল মডেলকেই অনুসরণ করে এগিয়ে যায়; সেহেতু, আলোকিত মানুষসমেত শোভন সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে কোন ভূখণ্ড বা অঞ্চলের নেতৃত্ব এক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে—তা ভাববার ও দেখার বিষয়।

এখানে, আরও বড় প্রশ্ন হতে পারে, এই আলোকিত মানুষ কীভাবে পাওয়া যাবে। এ জন্যে, বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ কি ইতোপূর্বে বর্ণিত একশিলা স্তম্ভ" তৈরিতে একনিষ্ঠ হবে? পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবে? যেখানে দরকার (আবুল বারকাতের গ্রন্থের উদ্ধৃতি মতে) জ্ঞান বলতে শুধু what to think but how to think কে প্রধান্য দিয়ে নির্মোহ বিশ্ব ইতিহাস, বস্তুনিষ্ঠ দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস, গণিতের দর্শন, মানবশ্রমের ইতিহাস, অর্থাৎ মানুষের মেধা ও মননের স্ফূরণ ও বিকাশের নিমিত্তে জীবন, দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক সৃজনশীল শিক্ষার ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন। এই আলোকিত মানুষের ধারণা থেকে বাংলাদেশ এখনই বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে।

ড. আবুল বারকাতের শোভন সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণার সাথে কোনো সচেতন পাঠক, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলার প্রাসঙ্গিকতা বিচার্যে আগ্রহী হতে পারেন। জাতির পিতাও একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, আলোকিত সোনার বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। সে লক্ষ্যে, সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনে শিক্ষানীতিসহ অনেক কার্যকর উদ্যোগ নেয়া শুরু করেছিলেন, যাতে তার সোনার সন্তানেরা আলোকিত মানুষ হয়। চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের আমলারা হবে জনগণের সত্যিকারের বন্ধু। তিনি অন্তর থেকে বলতেন, 'আমার কৃষক, আমার শ্রমিক, আমার মেহনতি জনতা; তোমরা আমলারা (যারা সকল সাব!) তাদেরকে সম্মান করে কথা বলবে।' জাতির পিতার এ উদাত্ত আহ্বানের ভিত্তি ছিল মহান স্বাধীনতার মূল্যবোধস্নাত দেশের আপামর জনসাধারণকে সত্যিকারের মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ। বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়ে ভূমি সংস্কারসহ বহুমুখী সমবায়েরও" প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, তাঁকে সপরিবারে (১৫ অগাস্ট, ১৯৭৫) নিহত হতে হলো। ড. বারকাত, তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টতই পুঁজিবাদী সমাজের এই ভয়ঙ্কর দিকটির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্পষ্টভাবে বলেছেন, "জাতির জনক সদ্য স্বাধীন (১৯৭১) বাংলাদেশকে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি বিনির্মাণে উদ্যোগী হলে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো দিকে চালিত করে।"

বাস্তবতার নিরিখে নিশ্চিতভাবে ড. বারকাতের গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অনেক বির্তক হবে। অনেকে হয়তো ভাববে, আবুল বারকাত ইউটোপিয়ান। কল্পনার জগতে বাস করেন। হতেই পারে। এ বির্তকে না গিয়ে বলা যায়, কেউ কি ভেবেছিল, আমাদের জীবদ্দশায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটবে? পরবর্তীতে রাশিয়া আবার ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে? পুঁজিবাদ, উদারবাদ, নব্য-উদারবাদের ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের মতো দেশ (যাকে আমেরিকাই বিশ্বায়নের সাথে সম্পৃক্ত করেছে) বৈশ্বিক ক্ষমতার প্রাধান্যের বিন্যাসে চার দশকের মধ্যেই অপ্রতিরোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে? একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক ক্ষমতার প্রাধান্যের বিন্যাস এশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বে? রাশিয়া, ইরান, ভারত, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইসরায়েল আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বৈশ্বিক ক্ষমতার প্রাধান্যের বিন্যাসে প্রভাব বিস্তার করবে? আমেরিকা ও ইউরোপের সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি হবে? জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের উত্থান সারা পৃথিবীকে কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেবে? সর্বশেষ, বৈশ্বিক মহামারি সারা পৃথিবীর সকল কর্মকাণ্ড, জীবনযাত্রা, এবং সার্বিক অর্থনীতিকে অচল করে দেবে? যা আগে কল্পনা করা যায়নি, তাই তো আজ বাস্তবতা। এটাই, সময় ও ইতিহাসের পরিক্রমার নির্মোহ বাস্তবতা।

এ পরিক্রমায়, সকল সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশ ও কল্যাণে কিছু কিছু দূরদর্শী প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের দর্শন ও মতবাদ নিয়ে হাজির হন। সে সকল দর্শনের দৃঢ়ভিত্তিতে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার, বিনির্মাণ, কল্যাণ ও বিকাশে রাষ্ট্রনায়করা, স্ব স্ব রূপকল্প সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে, অনুকরণীয় যুগান্তকারী নতুন বাস্তবতাও সৃষ্টি করেন। চিন্তাবিদ ড. আবুল বারকাত, সময়ের তাগিদেই, তাঁর বড় পর্দায়, সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র ভাবনায় ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে প্রণীত গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সময়োপযোগী।

শোভন সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্শন ও ধারণার সাথে দ্বিমত থাকবে, বিতর্ক হবে এটাই তো স্বাভাবিক। মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব, বিতর্ক ও ডিসকোর্সের মাধ্যমেই সমাজ বিকাশের দর্শনের ধারা বিকশিত হবে। সভ্য সমাজে অতীতে তা-ই হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বাংলাদেশ তো, সেই সমাজেরই অংশী হতে প্রত্যাশী।

চিন্তাবিদ ড. আবুল বারকাত আমাদের চিন্তা, ভাবনা, ও মননের জগৎকে provoke করেছেন। Also, ignited our mind। আমরা কি বড় পর্দায়, শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, আলোকিত পথে মনোজগতের এ যাত্রায় অংশী হতে পারি না! নিশ্চয়ই পারি। ড. বারকাতকে তার দর্শন ও মতাদর্শের আলোকে তাঁকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছুই ভাববেন। আমি তার এই মৌলিক গ্রন্থের সান্নিধ্যে এসে, মানুষের সম্মান, ন্যায্যতা, সাম্য, এবং কল্যাণে শোভন সমাজের দর্শন, আদর্শ, যৌক্তিকতা এবং প্রায়োগিকতার রূপকল্প তৈরিতে তাঁর মধ্যে এক ঐকান্তিক ও নিবেতদিতপ্রাণ মানবতাবাদীকে দেখেছি। তাঁর শোভন সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্শন আমাদের সচেতন পাঠকসমাজের চিন্তা ও ভাবনার জগৎকে ঋদ্ধ করবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৭৩-২৭৬
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

করোনায় বৃদ্ধি পাওয়া আয় বৈষম্য হ্রাসে করণীয়*

মতিউর রহমান**
শিশির রেজা***

অতিসম্প্রতি গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত তাঁর "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" শীর্ষক মাস্টারপিস গ্রন্থে গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে, কভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন (২০২০ সালে ঘোষিত) বাংলাদেশের শ্রেণিকাঠামোতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়-বৈষম্য অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কী করণীয় সে সম্পর্কে তিনি নীতি-নির্ধারকদের জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন।

শ্রেণিকাঠামোতে পরিবর্তন

অধ্যাপক আবুল বারকাত দেখিয়েছেন যে, ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ২০২০ সালে কভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের আগের শ্রেণিকাঠামো ছিল এ রকম: (দেশের মোট খানার মধ্যে) দরিদ্র ২০ শতাংশ, মধ্যবিত্ত ৭০ শতাংশ, ধনী ১০ শতাংশ। আর লকডাউনের পরে শ্রেণিকাঠামো সম্পূর্ণ পাল্টে হয়েছে এ রকম: দরিদ্র ৪০ শতাংশ, মধ্যবিত্ত ৫০ শতাংশ, ধনী ১০ শতাংশ। সুতরাং নিশ্চিত যে কভিড-১৯-এর কারণে মাত্র দুই মাসের মধ্যে ব্যাপক মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান পাল্টে গেছে নিম্নগামী হয়েছে, অবনতি হয়েছে।

ড. বারকাত হিসেব করে দেখিয়েছেন, গত বছরের (২০২০ সালের) লকডাউনের আগে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ আর (ঠিক দুই মাস পরে) কভিড-১৯-এ লকডাউন করার দুই মাস পরে ৩১ মে (২০২০) নাগাদ এক লাফে ওই দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৮০ লক্ষে। অর্থাৎ কভিড-১৯-এর কারণে মাত্র দুই মাসে নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। আবার দরিদ্রদের মধ্যে যারা

* পৃষ্ঠা-১৬, যুগান্তর ০৮ এপ্রিল ২০২১ প্রিন্ট সংস্করণ

** গবেষণা পরামর্শক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি), ঢাকা; ফোন: ০১৭৩১৪৬৮৯৬৯, ই-মেইল: motiursohel@gmail.com

*** পরিবেশ বিশ্লেষক ও সহযোগী সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; ফোন: ০১৯১৬৯৭১৫৭০, ই-মেইল: shishirmjs@gmail.com

হতদরিদ্র "যারা দিন আনে দিন খায়" (অথবা যাদের সরকারি পরিসংখ্যানে খানার আয়ের সর্বনিম্ন ১০ ডিসাইল হিসেবে ধরা হয়) তাদের সংখ্যা ছিল লকডাউনের আগে মোট খানার ১০ শতাংশ কিন্তু লকডাউনের ২ মাস পরে তাদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ লকডাউনের আগে তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা ছিল যেখানে মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ, সেখানে লকডাউনের পরে (মাত্র ২ মাসের মধ্যে) সে মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ২৫ লক্ষ অর্থাৎ হতদরিদ্র গ্রুপে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন ২ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষ। এরা লকডাউনের আগে দরিদ্র শ্রেণিতে ছিলেন— ৬৬ দিনে হতদরিদ্র গ্রুপে নেমে গেছেন। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, কভিড-১৯-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকাঠামোতে পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপক এবং বহুধা। লকডাউনের আগে ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা ছিল (মোট খানার ৭০ শতাংশ) ১১ কোটি ৯০ লক্ষ, যা লকডাউনের পর (মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে) কমে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ। অর্থাৎ মাত্র ২ মাসের মধ্যে কভিড-১৯ অতীতের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মধ্যবিত্ত গ্রুপের মানুষকে টেনে নিচে নামিয়ে ছেড়েছে। তিনি এই বইয়ে সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাব্য শক্তি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনার কথাও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবাই একইরকম মধ্যবিত্ত নয়। মধ্যবিত্তদের মধ্যে বড় তিনটি উপশ্রেণি আছে: নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত। অধ্যাপক বারকাত আরো উল্লেখ করেছেন যে, কভিড-১৯ (ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন) এই তিন ধরনের মধ্যবিত্তের (মধ্যবিত্তের উপশ্রেণির) ওপর একই রকম প্রভাব ফেলেনি। তাঁর হিসেবে, লকডাউন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে নিম্ন-মধ্যবিত্তের: লকডাউনের আগে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে ছিলেন মোট ৫ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ, যাদের সংখ্যা লকডাউনের ৬৬ দিনের মাথায় হয়েছে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ অর্থাৎ মাত্র ২ মাসের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ১ কোটি ১৯ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ আসলে হারিয়ে যাননি, তারা দরিদ্র শ্রেণিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। মধ্য-মধ্যবিত্তের মানুষের অবস্থাও নাকাল। লকডাউনের আগে তারা ছিলেন মোট খানার ২০ শতাংশ আর লকডাউনের (২ মাস) পরে নেমে এসেছেন ১৪ শতাংশে অর্থাৎ ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্তের সাইজ সংকুচিত হয়ে এখন তা ২ কোটি ৩৮ লক্ষ হয়েছে। অর্থাৎ ১ কোটি ২ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্তদের ৮০ শতাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রুপে আর ২০ শতাংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছেন। উচ্চ-মধ্যবিত্তরাও কিন্তু আগের জায়গায় নেই। লকডাউনের আগে দেশে উচ্চ-মধ্যবিত্তরা (মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে সবচেয়ে উপরে যাদের অবস্থান) ছিলেন মোট খানার ২০ শতাংশ লকডাউনের পরে যা নেমে এসেছে ১৩ শতাংশে। অর্থাৎ লকডাউনের আগে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, যা লকডাউনের পরে নেমে এসেছে ২ কোটি ২১ লক্ষে। অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ১ কোটি ১৯ লক্ষ মানুষ শ্রেণি মইয়ে নিচের দিকে চলে গেছেন, সম্ভবত যোগদান করেছেন মধ্য-মধ্যবিত্ত গ্রুপে। তবে এদের মধ্যে নগণ্যসংখ্যক শ্রেণি মইয়ে উঠে ধনীও হয়ে যেতে পারেন (কারণ মহামারি অবস্থায় বিভিন্ন কারণে কিছু মানুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়)। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রেণি মইয়ের সবচেয়ে উপরে বসবাসকারী ধনীদের (অতি ধনীসহ) অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং তাদের কারো কারো অবস্থা আরো ভালো হয়েছে। গবেষক বারকাত দেখিয়েছেন যে, কভিড-১৯-এর ফলে মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশের শ্রেণিকাঠামো পুরো পাল্টে গেছে। ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে লকডাউনের আগের তুলনায় লকডাউনের পরে (মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে) কমপক্ষে ৫ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ শ্রেণি মইয়ে নিচের দিকে নেমে গেছেন। এই যে ৫ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ লকডাউন থাকার মাত্র ২ মাসের মধ্যে শ্রেণি মইয়ে উপর থেকে নিচের দিকে নামতে বাধ্য হলেন তারা কারা? লকডাউনের আগের মাসেও—ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ ছিলেন দরিদ্র, যারা হতদরিদ্র গ্রুপে নেমে গেছেন (দরিদ্র শ্রেণিতেই আছেন

তবে দরিদ্রতর হয়েছেন), ১ কোটি ১৯ লক্ষ মানুষ ছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত যারা দরিদ্র শ্রেণিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন, ১ কোটি ২ লক্ষ মানুষ ছিলেন মধ্যবিত্ত যারা প্রধানত নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন, আর ১ কোটি ১৯ লক্ষ উচ্চ-মধ্যবিত্ত যারা মধ্য-মধ্যবিত্তে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। লকডাউনের ৬৬ দিনে শ্রেণি মইয়ের উপর থেকে নিচে নামতে বাধ্য হওয়া মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ১০ লক্ষ নয়, আসলে সে সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। এ দুই সংখ্যার যে পার্থক্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ তারা আসলে হতদরিদ্র ছিলেন, আর লকডাউনে হয়েছেন নিঃস্ব-ভিক্ষুক।

আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি

অধ্যাপক আবুল বারকাত তাঁর বই-এ উল্লেখ করেছেন যে, কভিড-১৯ যে শুধু শ্রেণিকাঠামো পাল্টে দিয়েছে তা-ই নয়—মারাত্মক কথা হলো করোনার লকডাউন দেশে আয় বৈষম্য বাড়িয়েছে, এবং তা বাড়িয়েছে খুবই বিপজ্জনক মাত্রায়। তিনি লিখেছেন: যদি ধনীদের অবস্থা (এমনকি) অপরিবর্তিত থাকে আর অন্যসব শ্রেণির অধোগতি হয়, তাহলে বৈষম্য বাড়তে বাধ্য। ঠিক সেটাই ঘটেছে কভিড-১৯-এ লকডাউনের কারণে বাংলাদেশে (সম্ভবত বিশ্বের সব দেশে)। অধ্যাপক বারকাতের হিসেবে কভিড-১৯ দেশের খানার মোট আয় বণ্টনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। যেমন লকডাউনের আগে দরিদ্র শ্রেণি ছিল মোট খানার ২০ শতাংশ আর দেশের খানার মোট আয়ে তাদের হিস্যা ছিল ৩.৮৫ শতাংশ আর লকডাউনের ৬৬ দিন পরে খানার সংখ্যায় তারা দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ৪০ শতাংশ আর দেশের খানার মোট আয়ে তাদের হিস্যা হয়েছে ৬.১২ শতাংশ (আগের দরিদ্র অবস্থায় থাকলেও সেটা হবার কথা ৭.৭ শতাংশ)। দেশের মোট খানার আয়ে মধ্যবিত্তের হিস্যা ছিল লকডাউনের আগে ৫৮.০৭ শতাংশ, যা লকডাউনের পরে নেমে গেছে ৪৭.৭৯ শতাংশে। দেশের খানার মোট আয়ে হিস্যা বেড়েছে ধনীদের লকডাউনের আগে ছিল ৩৮.০৯ শতাংশ, যা লকডাউনের ২ মাসের মধ্যে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬.০৯ শতাংশ আর তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি বেড়েছে অতিধনী'দের তাদের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩৭.৮০ শতাংশ, যা লকডাউনের আগে ছিল ২৭.৮২ শতাংশ। তাহলে কভিড-১৯-এর লকডাউন শুধু শ্রেণিকাঠামোই বদলে দেয়নি আয় বৈষম্যও বাড়িয়েছে, যা নিঃসন্দেহে অন্যান্য বহু ধরনের বৈষম্য বৃদ্ধির লক্ষণ।

আয় বৈষম্য' মারাত্মক বলা হয় তখন, যখন বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগ/জিনি সহগ-এর মান ০.৫ অতিক্রম করে; গিনি সহগ বাড়তে থাকা মানে আয় বৈষম্য বাড়তে থাকা, আর তা যত বাড়বে তত খারাপ হবে। আয় বৈষম্য মারাত্মক বিপজ্জনক' বলা হয় যখন পালমা বা পা'মা অনুপাত সংখ্যাটি ৩-এর কাছাকাছি বা ৩ অতিক্রম করে। লকডাউনের আগে আমাদের গিনি সহগ ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের ৬৬ দিন পরে হয়েছে ০.৬৩৫; আর লকডাউনের আগে পালমা অনুপাত ছিল ২.৯২, যা লকডাউনের পরে এখন ৭.৫৩ (বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং কভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের'-এর দেশে রূপান্তরিত করে ছেড়েছে।

করণীয়

এমতাবস্থায়, অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নকারী নীতিনির্ধারকের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ও সরাসরি প্রস্তাব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, আয়-সম্পদ বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে তার সবই যত দ্রুত সম্ভব আশু, উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন

যে, এ বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিলে মহাবিপদ সমাসন্ন। তিনি দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে এ মহাবিপদ থেকে মুক্তির পথ বের না করতে পারলে দেশে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতা এমন পর্যায়ে যেতে পারে, যখন শাসকগোষ্ঠীর আর করার কিছুই থাকবে না; ক্ষমতা বিপদাপন্ন হবে।

দেশের সার্বিক অবস্থা বিশেষ করে কভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের সম্ভাব্য প্রভাব-অভিঘাত বিশ্লেষণে তিনি প্রস্তাব করেন যে আগামী অন্তত পাঁচ বছরের বাজেটে ও অন্যান্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নীতিকৌশল দলিল প্রণয়নে যে বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের প্রধানতম ভিত্তিনীতি হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে তা হলো: সমাজ থেকে চার ধরনের বৈষম্য– আয় বৈষম্য, ধন-সম্পদের বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য চিরতরে নির্মূল করা (প্রাথমিক স্তরে হ্রাস করা)। এ লক্ষ্যকে প্রধান লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে বাজেটের আয় খাত (বাজেটের ভাষায় অর্থায়নের উৎস) ও ব্যয় খাত (বাজেটের ভাষায় সম্পদের ব্যবহার)-এ মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। বাজেটে অর্থায়নের উৎস (অর্থাৎ বাজেটে সরকারের আয় খাত) নির্ধারণে কোনোভাবেই যা করা যাবে না, তা হলো– দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত– এই দুই শ্রেণির ওপর কোনো ধরনের কর-দাসত্ব আরোপ করা যাবে না; বিপরীতে দৃঢ়তার সাথে ধনীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে তা শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করতে হবে। আর এ কর্মকাণ্ডে পথ-পদ্ধতির মধ্যে থাকবে: যথেষ্টবেশি হারে সম্পদ কর আরোপ, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ (যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জরুরি অবস্থায়, মহামন্দা সময়ে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরোপ করা হয়েছিল), পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ও অর্থ পাচার রোধ, কালোটাকা উদ্ধার ও কালোটাকা সৃষ্টির পথ-পদ্ধতি রোধ করা; ধনীদের (সে যেই হোক না কেন, যে ব্যবসায়েরই হোক না কেন, যে শিল্পেরই হোক না কেন) নগদ অর্থে কোনো ধরনের প্রণোদনা প্রদান না করা। আর বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ (সম্পদের ব্যবহার') নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শনের' নিরিখে সেসব খাত উপখাত-ক্ষেত্রকেই প্রাধান্য দেয়া, যা আপাতত বড় মাত্রায় বহুমুখী বৈষম্য হ্রাস করবে (পরবর্তীতে উচ্ছেদ করবে) হ্রাস করবে আয় বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য। এ বিবেচনা থেকে অগ্রাধিকার দিতে হবে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের প্রায় সকল কর্মকাণ্ড (দেশের ৮৫ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে মোট ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমশক্তির মধ্যে সাড়ে ৫ কোটি), যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প—কুটির শিল্প, কৃষি খাতশস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ, স্বাস্থ্য খাত। জরুরি ভিত্তিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম' প্রতিষ্ঠাসহ; সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনী ও শিক্ষা ও গবেষণা।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৭৭-২৮৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

মুক্ত আলোচনা

আবুল বারকাত-এর
"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"
শীর্ষক গ্রন্থের ওপর 'একক আলোচনা (Sole Discussant Based)' ওয়েবিনারের প্রথম আয়োজন

একক আলোচক: **মহিউদ্দিন খান আলমগীর**

অনুষ্ঠান সঞ্চালক: এ জেড এম সালেহ্, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
আয়োজনে: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
তারিখ: ০৩ জুলাই, শনিবার ২০২১, বাংলাদেশ সময়: সন্ধ্যা ৭:৩০টা

পটভূমি

নজিরবিহীন মহামারি করোনাভাইরাসের দ্বিতীয়-তৃতীয় ঢেউয়ে আমাদের প্রিয় স্বদেশ আজ ভীষণভাবে বিপন্ন-অসহায়। পৃথিবীজুড়ে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক মহামন্দা। এরই সাথে অতিমারির অনিশ্চিত প্রতাপ। বৈশ্বিক এই মহা দুঃসময়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি খুঁজছে **শোভন সমাজ, শোভন রাষ্ট্র, শোভন বিশ্বব্যবস্থা**। আর সে জন্যই আয়োজন ভার্চ্যুয়াল আলোচনা—**"শোভন সমাজের সন্ধানে"**। এই আলোচনায়দেশ ও দেশের বাইরে থেকে Zoom, YouTube এবং Facebook-এ যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ভার্চ্যুয়াল পরিমণ্ডলের এই একক আলোচনায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—**"একটি শোভন সমাজ, শোভন সংস্কৃতি, শোভন জীবনবোধ, শোভন জীবনব্যবস্থা, শোভন অর্থনীতি, শোভন রাষ্ট্র বিনির্মাণেজ্ঞানভিত্তিক প্রভাবকের ভূমিকা পালন করা"**।

এই আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেদেশে-বিদেশে সাড়াজাগানো অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত রচিত ৬০৩+lvi পৃষ্ঠা সংবলিত **একটি মৌলিক গ্রন্থ—"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"**। অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তৃতীয় দফা নির্বাচিত সভাপতি। তাঁর দীর্ঘ চার দশকের জ্ঞানসাধনার ফসলএই গ্রন্থটিতে একটি স্বব্যাখ্যায়িত বিস্তৃ ত মুখবন্ধসহ আছে ১২টি অধ্যায়। বড় দাগে এসব অধ্যায়ে আছে: ১. শোভন সমাজের তত্ত্বকাঠামো; ২. প্রচলিত মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা ও নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা; ৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনৈতিক অর্থনীতি; ৪. ধনী-দরিদ্র শ্রেণিবৈষম্য ও অসমতা; ৫. ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা,

মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ; ৬. বিশ্বায়নের স্বরূপ; ৭. দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সীমানা প্রসঙ্গ; ৮. কভিড-১৯ এ ক্ষতির বিশ্লেষণ; ৯. শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণের মডেল; ১০. সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতি; ১১. কেমন হওয়া উচিত শোভন সমাজ বিনির্মাণের জাতীয় বাজেট? এবং ১২. উপসংহার।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্প্রতি ঐতিহাসিক এই গবেষণাগ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে ১৩ সিরিজের ওয়েবিনার সম্পন্ন করেছে। দীর্ঘ চার মাসের ওই আয়োজনে দেশ ও বিদেশ থেকে আলোচক হিসেবে ছিলেন অর্ধশতাধিক অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, আইন বিশারদ, ভাষাবিজ্ঞানী, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ, সুশীলসমাজ প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিত্ব। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে Zoom, YouTube এবং Facebook-এ কয়েক সহস্রাধিক শ্রোতা-দর্শকও এতে অংশ নিয়েছিলেন। মননশীল জ্ঞানবিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনার সিরিজের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় দর্শক-শ্রোতাদের অনেকেই ছিলেন অতৃপ্ত। তাদের অনুরোধে অর্থনীতি সমিতি সমগ্র গ্রন্থের ওপর একক আলোচনার নতুন এই কার্যক্রমের সূচনা করেছে। তিন পর্বভিত্তিক ৯০ মিনিটের এই আলোচনার প্রথম ৩০ মিনিট গ্রন্থের ওপর আলোচকের বিশ্লেষণী বক্তব্য। দ্বিতীয় ৩০ মিনিট আলোচকের কাছে শ্রোতা-দর্শকদের প্রশ্ন এবং শেষ ৩০ মিনিট আলোচকের উত্তর প্রদান পর্ব। এই ওয়েবিনারে একক আলোচক হিসেবে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব **ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর**।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহিউদ্দিন খান আলমগীর ১৯৯১-৯২ সময়কালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬২ থেকে সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকতা করেন। পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তিতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য।

বক্তব্যের চুম্বক অংশ

- পুঁজিবাদ যে অসভ্য-বর্বর সে ব্যাপারে আমি ড. আবুল বারকাতের সঙ্গে একমত।
- ইতিমধ্যে মানবসমাজ যা অর্জন করেছে, তা দুমড়ে-মুচড়ে দূরে সরিয়ে বিপরীতাত্মক শোভন সমাজ সৃষ্টি করা কতটুকু সম্ভব কিংবা মানবকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা নিরিখকরণে ড. বারকাত যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপরেখা এই গ্রন্থে দিয়েছেন, বর্তমান বাস্তবতায় তা ঘটানো, অনুসরণ এমনকি সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। ২০০ বছর ধরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা স্থান বা স্তরবিশেষে সংস্কারের দাবি রাখে, কিন্তু উপড়ে ফেলে দেয়ার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করে না।

- সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ে ড. বারকাতের চিন্তা ও কথা তাঁকে প্রশংসনীয় মাত্রায় একজন সাহসী চিন্তাবিদের পরিচিতিতে উদ্ভাসিত করেছে।
- ড. আবুল বারকাত তাঁর গ্রন্থে যে ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে তার সমতুল্য বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের সামনে হাজির করেছেন।
- প্রথাগত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের পাঠ থেকে তাঁর বিশ্লেষণ ও বিধানপত্র নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং আমাদের প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের অনুশাসন থেকে সাহসিক মাত্রায় ভিন্নতর।
- মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রে কভিড-১৯ এর সমাধান নেই, সেটা সত্যি। তবে আংশিক পথ দেখানো হয়েছে। সবকিছু এখানে থাকবে, সেটা আশা করা তো ঠিক না।
- ড. বারকাত যেসব বিষয় আমাদের জন্য গ্রহণীয় বলে প্রস্তাব করেছেন, সেগুলো যদি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করি, তাহলে তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে।
- প্রথাগতভাবে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে কিংবা সরবরাহ বাড়লে দাম কমবে—এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।
- ড. বারকাতের এই গ্রন্থের অভিজ্ঞানের আলোকে আমাদের তরফ থেকে যা যা করণীয়, তা যদি আমরা করি—সেক্ষেত্রে একটি উন্নত সমাজ গঠন করা সহজ হবে।
- অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থার সংস্কারের যে প্রস্তাব ড. বারকাত করেছেন, সেসব প্রস্তাব আমরা ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করে যাব। তবে যে ব্যবস্থা আমাদের ইতিবাচক ফল দিয়েছে, সেগুলো উপড়ে ফেলে দেব—সেটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।
- ড. বারকাত আমাদের ধাক্কা মেরেছেন। ইতিমধ্যে যা করণীয় ছিল, তা যে আমরা করিনি—তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ জন্য তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই।
- গত বছরের বাজেটের তুলনায় এ বছরের ঘোষিত বাজেটে ড. বারকাতের প্রস্তাব বেশি গ্রহণ করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি।
- ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা নিশ্চিতভাবে হচ্ছে।
- ড. বারকাত তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে আমরা যে অসম সমাজব্যবস্থায় বাস করি, সেখানেই এই করব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। এটি নিশ্চিতভাবেই সত্যি। তবে একে উপড়ে না ফেলে সংস্কার করতে হবে।
- ড. বারকাতের এই গ্রন্থ আমাদের সাহস বাড়িয়েছে।
- হ্যাঁ, বাংলাদেশ এখন বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের দেশ।
- হ্যাঁ, কেবল নির্বিচার প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিলে দারিদ্র্য কমবে না।
- যে প্রণোদনা সরকার দিয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে দরিদ্রদের পুরোপুরি সহায়তা করছে না।
- আয় বৈষম্য প্রকট হলে তা নিরাপত্তার প্রতিকূল হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে একমত।

মহিউদ্দিন খান আলমগীর-এর উপস্থাপনা

ধন্যবাদ সঞ্চালক। সবার প্রতি রইল একরাশ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত আমাদের বাংলাদেশের সামনের সারির বরেণ্য অর্থনীতিবিদ। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'বড় পর্দায় সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' সকল সুধীজনকে ভাবিয়ে তোলার খোরাক দিয়েছে। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও কথা তাঁকে প্রশংসনীয় মাত্রায় একজন সাহসী চিন্তাবিদের পরিচিতিতে উদ্ভাসিত করেছে। ড. বারকাত এসব বিষয়ে তাঁর গভীর ও ব্যাপ্ত চিন্তাসমূহ একীভূত করেছেন 'শোভন সমাজের সাধারণ তত্ত্ব'-এর অবয়বে। বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি তাঁর তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে পুরো বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে তিনি বিদ্যমান পুঁজিবাদকে শোষণ, লালসা, ব্যক্তিস্বার্থ ও মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থা বা সিস্টেম বলে বিশেষায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সিস্টেম (১) গণতন্ত্রবিরোধী, (২) অসভ্য-বর্বর, (৩) অদক্ষ ও জাতীয়সম্পদ অপচয়কারী ও (৪) জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশবিরোধী। গণতন্ত্রবিরোধী এই সিস্টেমে উৎপাদনের ৯৯% উৎপাদনকৃত পণ্যসামগ্রী বা সেবার মালিক হন পুঁজির মালিক, আর ১ শতাংশ প্রযুক্ত হয় ৯৯ শতাংশ শ্রমিকের অনুকূলে বা তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। পুঁজিবাদ বর্বর-অসভ্য এই কারণে যে, মুষ্টিমেয় পুঁজির মালিকেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সাধারণ জনগণের স্বার্থবিরোধী সকল দুষ্কর্ম করে থাকেন। পুঁজিবাদ যে অসভ্য-বর্বর সে ব্যাপার আমি ড. আবুল বারকাতের সঙ্গে একমত। সকল জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে প্রযুক্ত হওয়ার বিকল্পে মুষ্টিমেয়রা উপযোগ, সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী পান বা ব্যবহার করেন বলে পুঁজিবাদ জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ঘটায় এবং উৎপাদন ও সেবার ক্ষেত্রে সম্পদ অপচয় করে। মুনাফার আয় প্রবাহ ইতিমধ্যে উৎপাদনে প্রযুক্ত প্রযুক্তি অপরিবর্তিত রাখার অভিলাষে পুঁজিবাদ নিত্যনতুন উদ্ভাবন কিংবা সে উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশকে ব্যাহত করে। সুতরাং তাঁর মতে, এ সিস্টেমকে বিকল্পায়িত করতে হবে তিনটি মৌল উপাদানভিত্তিক শোভন সমাজব্যবস্থা দিয়ে।

ড. বারকাত বলেছেন, এই তিনটি উপাদান পরস্পরসম্পর্কিত ও পরস্পরনির্ভরশীল বৃহৎবর্গীয় ভিত্তিবিশিষ্ট। এর প্রথমটি হলো সামাজিক ভিত্তি উপাদান, যার মূল অভীষ্ট হলো—আলোকিত মানুষ-জ্ঞানসমৃদ্ধ মুক্তচিন্তার সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সংহতিসমৃদ্ধ, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা ও অপসংস্কৃতিমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিশীল মানুষ কর্তৃক সমাজ পরিচালন। দ্বিতীয়টি হলো, অর্থনৈতিক ভিত্তি- উপাদান—যার অভীষ্ট হলো সাধারণের বৈষম্য থেকে মুক্তি। এই অর্জনে প্রকৃতিসৃষ্ট সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হবে জনগণের তরফ থেকে রাষ্ট্রের, মানুষের সৃষ্ট সকল উৎপাদনের উপায়ের মালিক হবেন জনগণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া সব ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শেয়ারবাজারের বিলুপ্তি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণির মূলোৎপাটন। আর তৃতীয়টি হবে রাজনৈতিক ভিত্তি উপাদান, যেখানে রাষ্ট্র হবে নিপীড়নবিহীন সার্বভৌম জনগণের রাষ্ট্র—গণতন্ত্র হবে প্রকৃত অর্থের জনগণের গণতন্ত্র, প্রভুহীন গণবিরোধী আমলাতন্ত্রবিহীন স্বাধীন মানুষের স্থানীয় সমাজ পরিচালিত নাগরিক শাসন এবং দেশরক্ষা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন সাধারণ জনগণ।

ড. বারকাতের মতে, এসব পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে দেখতে হবে বড় পর্দায়। তাঁর ভাষায়, "মানুষকে দেখতে হবে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। কিন্তু উল্টোটাই এতকাল আমাদের ভাবনাজগৎ ও কর্মকাণ্ডজগতে নিয়ামক-নির্ধারক ছিল। সে কারণেই কোনো 'শোভন' সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র

বিনির্মিত হয়নি। শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি-শোভন রাষ্ট্র হলো শেষ বিচারে প্রকৃতির প্রতি অনুগত থেকে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও উচ্চ নীতিনৈতিকতাসম্পন্ন আলোকিত মানুষের জীবনব্যবস্থা। এসব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একবিংশ শতকের এই সময়ে 'সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র' ত্রিমাত্রিক বিপর্যয়ের শিকার— আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং-পরজীবী-লুটেরা পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্যে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা-বিচ্ছিন্নতার নিরন্তর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-পুনরুৎপাদন, যা অর্থনীতিতে অবশ্যম্ভাবী করেছে গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি মহামন্দা (প্রথম বিপর্যয়), আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদ ক্ষমতাকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছেদিত করেছে, অর্থাৎ রাজনীতি-সরকার থেকে ক্ষমতা অভিবাসিত হয়েছে (দ্বিতীয় বিপর্যয়), আর একই সময়ে ভাইরাসের (আপাতত কোভিড-১৯) কারণে বিশ্বব্যাপী মানুষ হয়েছে গৃহবন্দী-আতঙ্কিত-বিষণ্ন-অবসাদগ্রস্ত মানসিকভাবে চরম বিপন্ন-হতাশ-নিরাশ (তৃতীয় বিপর্যয়)। এই তিন বিপর্যয়ের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এমন অবস্থা, যখন বড় পর্দায় প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-আস্থা-সম্মানভিত্তিক নতুন এক জীবনব্যবস্থা 'শোভন সমাজব্যবস্থা'-উদ্দিষ্ট আলোকিত মানুষের বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ সময়ের দাবি। এ পথে হাঁটা ছাড়া চলমান অশোভন পৃথিবীকে শোভন পৃথিবীতে রূপান্তরের বিকল্প কোনো পথ নেই। পথটা দেখাবে 'শোভন রাজনীতি'।" ড. বারকাতের মতে, এটাই 'শোভন সমাজব্যবস্থার সাধারণ তত্ত্ব'। তাঁর এই ভাষ্য পাঠককে মনে করিয়ে দেয় সমাজ বিবর্তনের অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কসীয় তত্ত্ব এবং মুদ্রা, সুদ ও কর্মসংস্থানের বিংশ শতাব্দীর কেইনসীয় সমাধান।

আমার দৃষ্টিতে (ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর), গত ১০০ বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ সমাজতন্ত্রের কতিপয় জনসমর্থিত উপাদান গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়েছে। এরূপ প্রচেষ্টা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বিস্তারের মাধ্যমে সুযোগের সমতা সৃষ্টি করেছে, সামাজিক কুশলতা ও নিরাপত্তার পরিধি বাড়িয়েছে এবং নিপুণতর উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের লভ্যতা সৃষ্টি করেছে। তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তার অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিবর্গের সন্দীপনের ভূমিকা স্বীকার করে সামাজিক সেবাসমূহ ব্যাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিল্প ও অর্থযোগ সংগঠন সৃজন করছে। এই প্রক্রিয়ায় স্ক্যান্ডেনিভিয়ান দেশসমূহ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের উৎপাদনশীল মিশ্রণ গ্রহণ করে সমাজ থেকে অভাব অনটন দূর করার লক্ষ্যে পরিশ্রম, মেধা ও উদ্যমের সৃজনশীল ভূমিকা সৃষ্টি ও রক্ষণ করে চলেছে। অনুরূপভাবে উত্তর গোলার্ধের আইসল্যান্ড ও দক্ষিণ গোলার্ধের নিউজিল্যান্ড পরিমিত ধনতন্ত্রে সামাজিক প্রতিরক্ষণ ও সন্দীপন বিকশিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে মানবসমাজ যা অর্জন করেছে, তা দুমড়ে-মুচড়ে দূরে সরিয়ে বিপরীতাত্মক শোভন সমাজ সৃষ্টি করা কতটুকু সম্ভব কিংবা মানবকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা নিরিখকরণে ড. বারকাত যে বিপ্লবের রূপরেখা এই বইয়ে দিয়েছেন, তা ঘটানো কিংবা অনুসরণ করা সম্ভব ও এমনকি সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। ২০০ বছর ধরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা স্থান বা স্তরবিশেষে সংস্কারের দাবি রাখে, কিন্তু উপড়ে ফেলে দেওয়ার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করে না।

ড. বারকাতের প্রস্তাবনার বিপরীতে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি না যে, দেশরক্ষার ভার পেশাদার পারদর্শী বাহিনী বিলুপ্ত করে জনগণের ওপর অর্পিত করা কার্যকরণ সূত্র অনুযায়ী গ্রহণীয় হবে। যেমন এও বলা যায় না যে, প্রশিক্ষিত আমলা নিযুক্ত বা প্রয়োগ না করে স্থানীয় সমাজ উৎসারিত প্রযুক্তি বা মনোযোগের ভিত্তিতে আমরা সমকালের বহু কাজ ও সামাজিক কুশলে নিযুক্তীয় আমলাতন্ত্র উঠিয়ে দিতে পারব। কিংবা সমাজে উৎপাদনবর্ধক বা সহায়ক সন্দীপনীয় শক্তিসম্পদের সমমালিকানা দিয়ে সৃষ্টি

কিংবা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। সমাজের সঞ্চয়কারীর অর্থ ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগকারী বা উদ্যোগীর অনুকূলে সঞ্চালিত করার সমকালীন যে ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা কার্যশীল, তা উঠিয়ে দিয়ে সঞ্চয় ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি।

এসব বলার পরও ড. বারকাতকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি বলিষ্ঠভাবে বড় পর্দায় সমকালীন সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো সামনে নিয়ে এসেছেন। একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ ও জ্ঞানতাপস সমাজে এসব ত্রুটি দ্রুত দূর করা, উৎপাদনের নতুনতর ক্ষেত্র শনাক্ত এবং সুযোগের সমতা বিস্তৃত করা এবং সমাজ ব্যবস্থাপনায় সমতা ও মানবতাবোধকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ ও ব্যবহার করার পথে ড. বারকাত আমাদের তাঁর ভাষা, উপলব্ধি ও আনুগত্যবোধ দিয়ে উদ্দীপ্ত করেছেন সন্দেহ নেই এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের বড় পর্দার সংস্কারের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্রত্ব, ফ্যাসিবাদ, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ, আধিপত্যবাদ, ধর্মভিত্তিক বর্ণবাদ শোভন রাষ্ট্র বিনির্মাণের মারাত্মক প্রতিপক্ষ ও প্রতিবন্ধক। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ার লক্ষ্যে ও অনুকূলে তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য কিংবা সামাজিক বৈষম্য কমায় না, দারিদ্র্য অলসতা কিংবা উদ্যোগের অপ্রতুলতায় সৃষ্টি হয় না, চাহিদা বাড়লেই দাম বাড়ে না কিংবা সরবরাহ বাড়লেই দাম কমে না, উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেই মূল্যস্ফীতি ঘটে না, টাকা ছাপলেই মূল্যস্ফীতি দেখা দেয় না। তিনি বলেছেন, আমাদের সমাজে সামাজিক প্রতিরক্ষণ বিস্তৃত না করে আমরা প্রবৃদ্ধির সুফল সকল ঘরে পৌঁছাতে বা নিশ্চিত করতে সক্ষম হব না।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ড. বারকাত বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বিষয়ে পাঁচটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। (১) কর্মসংস্থানের ব্যাপ্তি বাড়ানোর বিবেচনায় প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ১.০১ শতাংশ থেকে ১.৯৯ শতাংশে সীমিত রাখা, (২) কর্মসংস্থানের হার ৯১ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশে বাড়ানো, (৩) প্রবৃদ্ধির জন্যই প্রবৃদ্ধি অর্জন বা অনুসরণ না করা, (৪) আর্থসামাজিক বৈষম্য কমানো এবং (৫) সংবিধান অনুযায়ী সম্মানজনক কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ। তিনি বলেছেন, আর্থসামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে এই পাঁচটি প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করতে হবে (বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে, আবুল বারকাত, পৃ. ২৪৩-২৪৪)।

তিনি বলেছেন, সমাজ থেকে আয় বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে এবং প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দূর করতে হবে। তাঁর প্রস্তাবে দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের অধিকতর উন্নয়ন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, পাহাড়ি ও সীমান্ত এলাকা, আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, জেলে, বেদেদের দ্রুততর উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকা অভিপ্রেত। এর সঙ্গে কৃষিপণ্যের বিনিময় হার দেশের শিল্পপণ্যের তুলনায় কৃষির প্রতিকূল যাতে না হয়, তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্গাস্বত্ব আইন দ্রুত সংস্কার ও বাস্তবায়ন করা জরুরি বলে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এলাকা ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে নারী-পুরুষের সম-উত্তরাধিকারসহ আইন প্রণয়ন করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণে শিক্ষাকে ব্যয় হিসেবে না দেখে মানুষ ও সমতা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। তাঁর মতে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে দ্রুততার সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় রূপান্তরিত করতে হবে এবং মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের চারণভূমির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর মতে, স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচনা করে, এই খাতে বিনিয়োগ ব্যয় কমপক্ষে পাঁচ গুণ বাড়ানো সমীচীন হবে। ড. বারকাতের মতে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নব্য উদারবাদী মনোভাব ও কার্যক্রম

বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী উদ্যোগে দেশজ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং ভারী শিল্পের দিকে অগ্রসর হতে হবে। গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চায় বরাদ্দকে ব্যয় বিবেচনা না করে বিনিয়োগ হিসেবে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বাজেটকে জনকল্যাণমূলক করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ক্ষেত্রে বাজেটের ১২ শতাংশ এবং গৃহায়ণ খাতে ৪ শতাংশ বরাদ্দকরণ লক্ষ্যানুগ হবে। ড. বারকাতের প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকল্যাণ খাতে মোট বরাদ্দ বাজেটের সমকালীন ২৭ শতাংশ থেকে প্রায় ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। বাংলাদেশের সমকালীন কোভিড-১৯ উৎসারিত বিপর্যয়ের শিকার বিত্তহীন ও মধ্যবিত্তের জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর কর্মপ্রচেষ্টার নিরিখে ড. বারকাতের এ ধরনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অবশ্যই প্রণিধান ও গ্রহণযোগ্য।

বড় পর্দায় সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র শীর্ষক বইয়ে গ্রন্থিত ড. বারকাতের উপরোক্ত সংস্কার ও পরিবর্তন প্রস্তাবসমূহ ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে যথাসম্ভব পরিবর্তন ও সংস্কার আনলে দেশ ও সমাজ উন্নততর এবং প্রবৃদ্ধি দ্রুততর ও সাম্যধর্মী হবে বলে বলা চলে। প্রথাগত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের পাঠ থেকে তাঁর বিশ্লেষণ ও বিধানপত্র নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং আমাদের প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের অনুশাসন থেকে সাহসিক মাত্রায় ভিন্নতর। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থাপনার সাহসী বিশ্লেষক ও প্রতিষ্ঠিত সমালোচক সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নোয়াম চমস্কি এ জন্যই তাঁকে এই বই উপস্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ড. বারকাতের বিশ্লেষণ ও মত অনুযায়ী সরকারের সমকালীন উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে সংস্কার আনলে তা জনহিতকর ও কুশলধর্মী হবে বলে সমর্থন করা যায়। বড় পর্দায় ড. বারকাত যে ধরনের ভিন্নতর, জনকুশলধর্মী ও সাহসী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেছেন, সে জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

শ্রোতা-দর্শকদের প্রশ্ন এবং মহিউদ্দিন খান আলমগীর-এর উত্তর

আজকে অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের 'বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে' শীর্ষক গ্রন্থের আলোকে প্রথম পর্বে আমি যে সারমর্ম উপস্থাপন করেছি, সে সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা ভিন্নতর ব্যাখ্যা দাবি করেছেন। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের এই জিজ্ঞাসা ও উৎসাহকে আমি স্বাগত জানাই এবং উৎসাহ গড়ে তোলার কার্যকরণ সৃষ্টির প্রবর্তক ড. আবুল বারকাতকে সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

- *দেশে বৈষম্যের তীব্র বিস্তার ঘটছে।*

  ম. খা. আলমগীর: হ্যাঁ, দেশে বৈষম্য আছে এবং সেই বৈষম্য দূর করার জন্যই কিন্তু আজকে এই আলোচনা। বৈষম্য দূরীকরণের জন্যই ড. আবুল বারকাত তাঁর তরফ থেকে যা জোরেশোরে বলা প্রয়োজন, নির্ভয়ে বলা প্রয়োজন তা তিনি বলেছেন। আমরা সবাই যদি অর্থাৎ অর্থনীতির যারা ছাত্র, শিক্ষক কিংবা আমরা যারা ব্যবহারবিদ, তারা যদি বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন থাকি, তাহলে নিশ্চিতভাবে জনকল্যাণে এই বৈষম্য দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন আমাদের তরফ থেকে, সেসব পদক্ষেপ শনাক্ত করতে সক্ষম হব।

- *পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকের শ্রমে রপ্তানি আয়ের ৪১ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তান সরাসরি আত্মসাৎ করত।*

ম. খা. আলমগীর: তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আয়কৃত বা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এ দেশে ব্যবহৃত হয়নি, সঞ্চারিত হয়নি। সেসব মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে, যেটা বৈষম্যের নামান্তর বলে আমরা মনে করি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা এর যে তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং ভিত্তি তা পৃথিবীর কাছে উপস্থাপন করেছি, যেখানে এই তথ্যগুলো সন্নিবেশিত আছে।

- *প্রণোদনা প্যাকেজের ১ পয়সাও ধনীদের নগদ অর্থে দেওয়া উচিত না।*

ম. খা. আলমগীর: এ ব্যাপারে আমি মনে করি, এই সংখ্যাটা অত বেশি হবে না বলে আমরা নিশ্চিত। তবে হ্যাঁ, যে বৈষম্যের কথা এখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে, সেই বৈষম্য যাতে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত হতে না পারে এবং ইতিমধ্যে যা উদ্ভূত হয়েছে, তা যেন যথাযথভাবে নিচে নামিয়ে আনতে পারি, সে জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

- *মানুষের স্বাস্থ্য এখন জিম্মি।*

ম. খা. আলমগীর: স্বাস্থ্যব্যবস্থা কতিপয় লোকের হাতে জিম্মি হয়ে আছে—এমনটা আমি মনে করি না। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যে নিপুণতার অভাব আছে, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কতিপয় লোকের হাতে চলে গেছে সেটা বলা ঠিক হবে না। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে গড়ে প্রতি ১৫ হাজার লোকের জন্য একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে কিংবা করার শেষ পর্যায়ে আছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেগুলো আমরা স্থাপন করছি সাধারণ মানুষের জন্য, তা যদি সুচারুভাবে পরিচালিত করতে পারি, তাহলে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, তা এই মাত্রায় উত্থাপিত হবে না।

- *আয়-ধন-স্বাস্থ্য-শিক্ষা বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তে থাকলে নিরাপত্তার হুমকিতে পড়ে ।*

ম. খা. আলমগীর: আয় বৈষম্য প্রকট হলে তা আমাদের নিরাপত্তার প্রতিকূল। হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে একমত। আয় বৈষম্য প্রকট হলে তা মানুষের নিরাপত্তার প্রতিকূলে যায়, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। এখানে উপস্থিত সবাই এবং ড. আবুল বারকাত যাঁরা এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বারবার বলছেন, তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই। এই উৎসাহ যদি অব্যাহত থাকে, তবে আমি নিশ্চিত এক্ষেত্রেআমরা যে অপূর্ণাঙ্গতা লক্ষ করছি, তা সফলভাবে দূর করতে সক্ষম হব।

- *কালো টাকা সাদা নীতিগতভাবে কতটা সমর্থনযোগ্য?*

ম. খা. আলমগীর: হ্যাঁ। বাজেটে গত বছর যারা যে আয় করেছেন তার যে অংশ তারা আয়করের আওতায় আনার প্রস্তাব করেননি বা উপস্থাপন করেননি, তারা ১০ শতাংশ কর দিয়ে তা আয়করের আওতায় আনতে পারবেন—এটা নীতিগতভাবে সবাই আমরা সমর্থন

করব, সেটা আমি আশা করছি না। তবে এখানে পরিচালন দৃষ্টিতে আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমরা গত প্রায় ১০ বছর ধরে এমনকি তারও আগে থেকে এ ধরনের অপ্রদর্শিত আয়কে প্রদর্শিত করার ক্ষেত্রে সন্দীপনীয় শর্ত আয়কর আইনে এনেছি। তথাপি কিছু সফলতা এসেছে, সার্বিক সফলতা আসেনি। এখানে যে কথাটি পরিচালন ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়েও একবার যদি তা প্রদর্শন করেনই, তাহলে কিন্তু তিনি আয়করের জালে আটকে গেলেন। পরবর্তী বছর তাকে পূর্ণাঙ্গ আয়কর দিতে হবে। যেখানে আমাদের সামাজিক অথবা প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে সকল অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শন করতে সক্ষম নই, সেখানে একবার প্রদর্শন করার সুযোগ দিয়ে তাদের সবাইকে যদি পরবর্তী বছরগুলোর জন্য আয়করের বেড়াজালে আবদ্ধ করা যায়, তাহলে সেটা সামাজিকভাবে আমাদের সবার জন্য লাভজনক হবে বলে মনে করি।

- *অনুৎপাদনশীল আর্থিকীকরণকৃত-রেন্টসিকিং পুঁজি সব খেয়ে ফেলছে। সরকারের লক্ষ-কোটি টাকা প্রণোদনার কতটুকু দরিদ্র জনগণ পাচ্ছেন?*

ম. খা. আলমগীর: মহামন্দা দূর করার জন্য যে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে দরিদ্রদের পুরোপুরি সহায়তা করছে না। তবু আমাদের মনে রাখা দরকার, এই প্রণোদনার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে যদি আমরা বাঁচাতে পারি, প্রসারিত করতে পারি এবং সেখানে যদি কর্মসংস্থানের মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে বা বাড়ে, তাহলে এটা জনস্বার্থে প্রযোজ্য হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

- *যত বেশি প্রবৃদ্ধি তত বেশি বহুমাত্রিক দারিদ্র্য। ৭০-৮০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ফল ১-২ শতাংশ ধনীর হাতে।*

ম. খা. আলমগীর: এটা ঠিক এভাবে বলা বা গ্রহণ করা আমার মনে হয় ঠিক নয়। ঠিক নয় এ জন্য যে, আমরা বলতে চাচ্ছি যে কেবল নির্বিচার প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিলে দারিদ্র্য কমবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রবৃদ্ধিকে বাদ দিয়ে আমরা দারিদ্র্য কমিয়ে রাখতে পারব। মনে রাখতে হবে, আমরা সবকিছু বিতরণ করতে পারি; কিন্তু দারিদ্র্য বিতরণ করা সম্ভব নয়।

- *বাংলাদেশ এখন বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের দেশ।*

ম. খা. আলমগীর: হ্যাঁ, আমাদের এই অসমতা দূর করতে হবে। কারণ, স্রষ্টার সৃষ্টির সকল মানুষকে সমান মনে করে সবার জন্য উপরে ওঠার সিঁড়ি উন্মোচিত রাখতে হবে। সবার উপড়ে ওঠার সিঁড়ি যদি উন্মোচিত রাখি, তাহলে সত্যি একটা চলিষ্ণু এবং প্রগতিশীল অর্থ ও সমাজব্যবস্থা আমরা অন্তবর্তীকালীন এই সময়ে সৃজন করতে সক্ষম হব বলে আমি বিশ্বাস করি।

- *কৃষি থেকে শিল্প উন্নয়ন বাদ দিয়ে সেবা পর্যায়ে আমরা উৎপাদনক্ষমতা সৃজন করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছি।*

ম. খা. আলমগীর: আমার মনে হয়, এই কথাটা বোধহয় সঠিক নয়। এটা ঠিক যে আমরা শিল্পকে অনেক অবহেলা করেছি। কিন্তু শিল্পকে বাদ দিয়ে চট করে আমরা সেবাতে চলে

যাব; তার ভিত্তি তো আমাদের পেতে হবে, যা পেতে হলে কৃষির পর শিল্প এবং শিল্পের পর আমাদের সেবায় যেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, কৃষি-শিল্প-সেবা প্রায় একযোগে, সম্মিলিতভাবে সব মানুষের প্রচেষ্টার হৃদয় হিসেবে আমাদের গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হবে।

- *বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের লোকজন প্রায়ই বাংলাদেশে কেন আসে, এতে আমাদের কী উপকার?*

ম. খা. আলমগীর: সব ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নেতিবাচক নয়। দু-এক ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক হতে পারে। মনে রাখা দরকার, আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক আমাদের উপদেশ দেয়, তবে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়নি। তাদের উপদেশ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে যদি আমাদের তরফ থেকে প্রণীত অর্থনৈতিক প্রস্তাবগুলো পরিশীলিত করতে পারি, তাহলে সবার জন্য মঙ্গলকর হবে। গত সপ্তাহে বিশ্বব্যাংক কভিড-১৯ অতিমারির জন্য যে সহায়তা দিয়েছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। সব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক যে খারাপ কাজ করে সেটা বলা ঠিক হবে না। ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটটন উডস্ চুক্তি অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠানগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো তাদের সীমাবদ্ধতার পরও এই পৃথিবীতে বাণিজ্য সম্প্রসারণে এবং আর্থিক বিনিয়োগবর্ধনে মোটামুটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে বলে আমরা বলতে পারি। আমরা যতটুকু ফল পেয়েছি, এদের অবর্তমানে ততটুকু ফল অর্জন করতে সক্ষম হতাম না।

- *মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রে কভিড-১৯ এর সমাধান নেই।*

ম. খা. আলমগীর: নাই। আংশিকভাবে পথ তো দেখানো আছে। সবকিছু এখানে থাকবে, সেটা আশা করা তো ঠিক না। কভিড-১৯ এর সমাধান দুই পর্যায়ে-প্রথমত, চিকিৎসাভিত্তিক অর্থাৎ প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দুই ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করতে হবে।

- *শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বাড়াতে হবে।*

ম. খা. আলমগীর: অবশ্যই শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে এখন ৫-১২ বয়সের সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে। ১০৬টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার প্রায় ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর সাথে সব ক্ষেত্রে যদি আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গুণগত উৎকর্ষ বাড়াতে চাই, তাহলে নিশ্চিতভাবে শিক্ষাকে আমাদের উন্নয়নের বড় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার ওপর আমরা যত বেশি জোর দেব, আমাদের জন্য তত বেশি মঙ্গলজনক হবে।

- *শতকরা ৩৫ ভাগ এফডিএ বা সেকেন্ড রাউন্ড বেইল আউট।*

ম. খা. আলমগীর: আমরা আমাদের সঞ্চয় বা বিনিময়যোগ্য যে সম্পদ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি, আমাদের জাতীয় আয়ের ৩৫ শতাংশ ব্যবহারের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করেছি। এটা আমাদের জন্য মোটামুটিভাবে প্রচেষ্টার জন্য ভালো হবে। এক্ষেত্রে ড. বারকাত যেসব সংস্কার প্রস্তাব আমাদের দিয়েছেন, আমরা সম্পন্ন না করে সেটা করতে পারব না। আর ২৫ লক্ষ কর্মসৃজন করার কথা যেটা বলেছেন, আমি সে ব্যাপরে

একমত। বিদেশি বিনিয়োগ আমাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের চেয়ে কম হবে। গত বছরও কম হয়েছে। বিদেশি বিনিযোগ আমরা সব ক্ষেত্রে গ্রহণ করি না। বিদেশি বিনিয়োগের প্রতি আমাদের যে নির্ভরশীলতা, সেটা আমরা সৌভাগ্যবশত কমাতে সক্ষম হয়েছি।

- *অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের গ্রন্থের মূল্যায়ন।*

ম. খা. আলমগীর: এ প্রসঙ্গে আমি বলত চাই যে, ড. বারকাতের এই বই আপনারা সবাই যেভাবে নিবিড়ভাবে পড়েছেন, সেটা আমাদের সবার জন্যই সাহসবর্ধক। আমাদের সঞ্চটির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করেছে। আমি আশা করি, এই মনোযোগ যদি বজায় থাকে, তাহলে তিনি যেসব বিষয় আমাদের প্রস্তাব করেছেন, সেসব বিষয় ভবিষ্যতে আমরা আমাদের পরিশ্রম, কাজ ও সেবায় অধিকতর ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হব বলে আমি মনে করি।

- *'কর ব্যবস্থা' একধরনের দাসত্ব।*

ম. খা. আলমগীর: কর ব্যবস্থার উৎপত্তির ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে ড. বারকাত তাঁর গ্রন্থে যে কথা বলেছেন অর্থাৎ আমরা যে অসম সমাজব্যবস্থায় বাস করি, এই করব্যবস্থা তার উদ্ভাবন। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে তারই উদ্ভাবন। তবে হ্যাঁ, এই উদ্ভাবিত ব্যবস্থা ছাড়া উদ্বৃত্ত সম্পদ যে গোষ্ঠীর কাছে আছে, তার কাছ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে আহরণ করতে সক্ষম হতাম না। এই করব্যবস্থা উন্নত করা ও সংস্কারের সুযোগ যথেষ্ট বিস্তৃত। কিন্তু এই করব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারব, সমাজব্যবস্থা পরিচালন করতে পারব, এটা বোধহয় আমরা বলছি না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তরফ থেকে যেসব প্রস্তাব, সেগুলো যদি আমরা উত্থাপন করি, তাহলে তা সবার জন্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

- *ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশত।*
- **ম. খা. আলমগীর:** ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা নিশ্চিতভাবে হচ্ছে। ধর্মকে যাতে কোনোভাবে কখনো রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা না হয়, তার দিকে আমাদের প্রখর দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং একটি ধর্মান্ধ রাষ্ট্র-সমাজ যাতে সৃষ্টি না হয়, সে জন্য প্রখর নজর রেখে আমরা যাতে সবার অধিকারসমৃদ্ধ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র সৃষ্টি ও পরিচালন করতে পারি, সে জন্য আমাদের অনুশাসন আছে সংবিধানে। এই বক্তব্যের নির্যাসকে আমি স্বাগত জানাই।

- *শোভন সমাজ বিনির্মাণে এ বছরের বাজেট কতটুকু কাজে লাগবে।*

ম. খা. আলমগীর: এখানে আমি দুটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, ড. বারকাত যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো অনুযায়ী আমাদের পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে—এমন কথা কিন্তু আমরা গ্রহণ করছি না। হ্যাঁ, তিনি আমাদের ধাক্কা মেরেছেন, ধাক্কা মেরে ইতিমধ্যে যা করণীয় ছিল, তা যে আমরা করিনি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ জন্য তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই। এবং সে লক্ষ্যে আমরা গত বছরের বাজেটের তুলনায় এ বছরের ঘোষিত বাজেটে বেশি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি। আমরা এও মনে করি যে, শোভন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার তরফ থেকে করণীয় কাজ যদি আমরা আংশিকভাবেও সম্পন্ন করতে সক্ষম হই, তাহলে ২০২২-২৩ সালে আমরা অধিকতর নিষ্ঠা ও পারঙ্গমতা নিয়ে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব।

- *অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়ে গুরুতর পুনর্ভাবনা জরুরি।*

ম. খা. আলমগীর: যে মাত্রায় বা যে অবয়বে তথাকথিত ধনবাদী সমাজে এই বিত্তবানেরা আছেন, তাদের কর্মতৎপরতা যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে বলতে হয়—কিছু ক্ষেত্রে তারা আছেন। এই যে ব্রিটেনের কর্নওয়ালে জি-৭ জোটের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছে, সেখানে কোভিড নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে নেওয়া যায়, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেলিন্ডা গেটস একটি ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের কেন্দ্র করেছেন। ভারতের টাটার কলকারখানায় কিন্তু শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব আছে, সেখানে শ্রমিক ধর্মঘট হবে বলে আমরা মনে করি না। ধনবাদী ব্যবস্থা সর্বদা দারিদ্র্যের প্রতিকূলে কাজ করে তেমনটা বলা সব ক্ষেত্রে সত্য হবে না।

অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থার সংস্কারের যে প্রস্তাব ড. বারকাত করেছেন, সে প্রস্তাবগুলো আমরা ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করে যাব। কিন্তু গ্রহণ করার আগে ইতিমধ্যে যে ব্যবস্থা আমাদের ইতিবাচক ফল দিয়েছে, সেগুলো উপড়ে ফেলে দেব—সেটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

- *চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, সরবরাহ বাড়লে দাম কমে—এ এক মহাভ্রান্ত তত্ত্ব।*

ম. খা. আলমগীর: এটা সমকালীন অর্থবিজ্ঞানের সূত্র। এটা নিয়ে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। তেমনিভাবে চাহিদা কমলে দাম কমে যায়, এটাও কিন্তু সমকালীন অর্থশাস্ত্রের যে বিশ্লেষণ, সেখানে প্রতিভাত নয়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বিশ্লেষণ করে অমর্ত্য সেন নোবেল পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে যোসেফ স্টিগলিজ যে কথাগুলো বলেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখব যে, এখানে চাহিদা বা সররবাহ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে অন্য যেসব অর্থনৈতিক হাতিয়ার আছে, সেগুলো যদি সঠিকভাবে আমরা প্রয়োগ করতে সক্ষম হই, তাহলে প্রথাগতভাবে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে কিংবা চাহিদা কমলে দাম কমবে—এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এবং এই বিশ্বাস গ্রহণ না করে আমাদের রাষ্ট্রের তরফ থেকে আর্থসামাজিক যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা দরকার, তার জন্য আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

যতটা সম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আমি সবশেষে জোর দিয়ে বলতে চাই—ড. বারকাত যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার যে ধরনের বিশ্লেষণ—আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে, বাংলাদেশের বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে এই দেশে এই সমতুল্য বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি।

আমাদের সমাজকে সংস্কার করতে হবে, আমাদের রাজনীতিকে সংস্কার করতে হবে, আমাদের সকলের জীবনমান উন্নয়ন করতে হবে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গ্রহণযোগ্য তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে সামষ্টিক অর্থব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ জন্য আমাদের সকলের তরফ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৮৯-৩০১
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

একক আলোচক: **সুশান্ত কুমার দাস**

সঞ্চালক: জামালউদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
আয়োজক:বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০২১ তারিখ শনিবার বাংলাদেশ সময়: সন্ধ্যা ৭:১৫টা

পটভূমি

নজিরবিহীন মহামারি করোনাভাইরাসের দ্বিতীয়-তৃতীয় ঢেউয়ে আমাদের প্রিয় স্বদেশ আজ ভীষণভাবে বিপন্ন-অসহায়। পৃথিবীজুড়ে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক মহামন্দা। এরই সাথে অতিমারির অনিশ্চিত প্রতাপ। বৈশ্বিক এই মহা দুঃসময়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি খুঁজছে**শোভন সমাজ, শোভন রাষ্ট্র, শোভন বিশ্বব্যবস্থা**। আর সে জন্যই আয়োজন ভার্চ্যুয়াল আলোচনা—**"শোভন সমাজের সন্ধানে"**। এই আলোচনায়দেশ ও দেশের বাইরে থেকে Zoom, YouTube এবং Facebook-এ যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।ভার্চ্যুয়াল পরিমণ্ডলের এই একক আলোচনায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো—**"একটি শোভন সমাজ, শোভন সংস্কৃতি, শোভন জীবনবোধ, শোভন জীবনব্যবস্থা, শোভন অর্থনীতি, শোভন রাষ্ট্র বিনির্মাণেজ্ঞানভিত্তিক প্রভাবকের ভূমিকা পালন করা"**।

এই আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেদেশে-বিদেশে সাড়াজাগানো অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত রচিত ৬০৩+lvi পৃষ্ঠাসংবলিত**একটি মৌলিক গ্রন্থ—"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"**। অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তৃতীয় দফা নির্বাচিত সভাপতি। তাঁর দীর্ঘ চার দশকের জ্ঞানসাধনার ফসলএই গ্রন্থটিতে একটি স্বব্যাখ্যায়িত বিস্তৃ ত মুখবন্ধসহ আছে **১২টি** অধ্যায়। বড় দাগে এসব অধ্যায়ে আছে: ১. শোভন সমাজের তত্ত্বকাঠামো; ২. প্রচলিত মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা ও নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা; ৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনৈতিক অর্থনীতি; ৪. ধনী-দরিদ্র শ্রেণিবৈষম্য ও অসমতা; ৫. ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ; ৬. বিশ্বায়নের স্বরূপ; ৭. দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সীমানা প্রসঙ্গ; ৮. কভিড-১৯ এ ক্ষতির বিশ্লেষণ; ৯. শোভন সমাজ-শোভন অর্থনীতি বিনির্মাণের মডেল; ১০. সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতি; ১১. কেমন হওয়া উচিত শোভন সমাজ বিনির্মাণের জাতীয় বাজেট? এবং ১২. উপসংহার।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্প্রতি ঐতিহাসিক এই গবেষণাগ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে ১৩ সিরিজের ওয়েবিনার সম্পন্ন করেছে। দীর্ঘ চার মাসের ওই আয়োজনে দেশ ও

বিদেশ থেকে আলোচক হিসেবে ছিলেন অর্ধশতাধিক অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, আইন বিশারদ, ভাষাবিজ্ঞানী, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ, সুশীলসমাজ প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিত্ব। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে Zoom, YouTube এবং Facebook-এ কয়েক সহস্রাধিক শ্রোতা-দর্শকও এতে অংশ নিয়েছিলেন। মননশীল জ্ঞানবিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনার সিরিজের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় দর্শক-শ্রোতাদের অনেকেই ছিলেন অতৃপ্ত। তাদের অনুরোধে অর্থনীতি সমিতি সমগ্র গ্রন্থের ওপর একক আলোচনার নতুন এই কার্যক্রমের সূচনা করেছে। ৩ পর্বভিত্তিক ৯০ মিনিটের এই আলোচনারপ্রথম ৩০ মিনিট গ্রন্থের ওপর আলোচকের বিশ্লেষণী বক্তব্য। দ্বিতীয় ৩০ মিনিট আলোচকের কাছে শ্রোতা-দর্শকদের প্রশ্ন এবং শেষ ৩০ মিনিট আলোচকের উত্তর প্রদান পর্ব। আজ এই ওয়েবিনারেএকক আলোচক হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন **অধ্যাপক ড. সুশান্ত কুমার দাস**।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অধ্যাপক সুশান্ত কুমার দাস শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ভূগোল বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ২০০১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে তিনি পিএইচডি করেন। ২০০৪-২০০৫ সময়কালের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির আজীবন সদস্য। ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীঅধ্যাপক ড. সুশান্ত কুমার দাস ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য।

বক্তব্যের চুম্বক অংশ

- ✓ দেশের বুদ্ধিজীবীসহ বিশ্বব্যাপী অনেকের ধারণা, প্রবৃদ্ধি দিয়ে যে পথে বাংলাদেশ এগোচ্ছে, তাতে সংকট থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব। কিন্তু ড. বারকাত এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন—এই প্রবৃদ্ধি কত দূর হবে এবং এর সীমাবদ্ধতাই বা কী।
- ✓ 'শোভন সমাজ ও জীবনব্যবস্থা' পুঁজিবাদের বিকল্প।
- ✓ গ্রন্থে পুঁজিবাদের বিকল্প অন্বেষণ করে, নতুন পথের সন্ধান রয়েছে ।
- ✓ গ্রন্থটি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার গবেষণালব্ধ বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমৃদ্ধ।
- ✓ বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ এবং বৃদ্ধিবৃত্তির সমস্ত ক্ষেত্র নিয়ে তিনি যে মূল্যায়ন করেছেন, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে—তা কাজে দেবে।
- ✓ গোটা গবেষণাগ্রন্থের কাঠামো একদিকে যেমন তাত্ত্বিক মডেল এবং সেই সাথে অন্যদিকে আমাদের দেশের বাস্তবতায় সেই মডেল কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে তার পথনির্দেশক।
- ✓ তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—যে বিশ্ব এখন আছে, মহামারির পরে সেই বিশ্ব আর থাকবে না। বিশ্ববাসী নতুন পৃথিবী দেখবে এবং নতুন পরিবর্তনের সামনে দাঁড়াবে—এ-ই হলো ড. বারকাতের গবেষণাগ্রন্থটির মূল নির্যাস।

- ✓ গ্রন্থকার শোভন জীবনের অশোভন প্রতিপক্ষহিসেবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে চিহ্নিত করেছেন, যা বাংলাদেশের জন্য তাঁর একটি মৌলিক অবদান।ক্ষ
- ✓ সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের যে চিত্র গ্রন্থিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সমৃদ্ধ।
- ✓ যাঁরা পুঁজিবাদকে শেষ কথা মনে করেন, অসাধারণ এইগ্রন্থ—"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"—তাঁদের ভালো লাগবে না। পরিষ্কারভাবেই বলি, অনেক ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। এই গ্রন্থ সার্বিকভাবে সকল ধরনের পুঁজিবাদের মুখোশ উন্মোচন করেছে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
- ✓ যাঁরা পুঁজিবাদের বিকল্প ভাবেন, তাঁদের এই বইয়ের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যকে অনুধাবন করতে হবে গভীরভাবে—নিজেদের প্রয়োজনে, তাতে একমত বা দ্বিমত যা-ই হোন না কেন।
- ✓ পুঁজিবাদের পক্ষের লোকেরা যাঁরা সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, তাঁরা বলবেন—গ্রন্থকার 'সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে', কারণ, তিনি 'শোভন সমাজ'-এর কথা বলেছেন, সমাজতন্ত্রের নয়। কিন্তু তিনি যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন—এটা বলবেন না।
- ✓ সমাজতন্ত্রের পক্ষে যাঁরা, তাঁরা বলবেন—'তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষে বলেননি'। তার মানে, তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষে নন। কিন্তু তিনি যে পুঁজিবাদের বিকল্পের কথা বলেছেন, তা আমলেই নেবেন না হয়তো। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই—সতর্কতা এখানেই।

সুশান্ত কুমার দাস-এর উপস্থাপনা

অর্থনীতি সমিতিকে ধন্যবাদ জানাই গুরুত্বপূর্ণ এই আয়োজনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমরা সবাই জানি শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা মানবজাতি আজ কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের অতিমারির মহাবিপর্যয়ের মধ্যে আছে। আজ যে গ্রন্থটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব—"সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"—গ্রন্থটির লেখক অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তক, শুধু বাংলাদেশ নয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অর্থাৎ তাঁর বেড়ে ওঠা, ইন্টেলেক্টচুয়াল ক্রমবিকাশ ও ধারার সঙ্গে আমি পরিচিত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। আমি পদার্থবিজ্ঞানের একজন ছাত্র, শিক্ষকও ছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছি। এখনও আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করছি। ফলে আমার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক বিষয়গুলো আসবে। বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি।

বিশাল এই গবেষণাগ্রন্থের সমস্ত দিক নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এত সীমিত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। মৌলিকভাবে গ্রন্থটির সার্বিক বিষয় নিয়ে এক নজরে বলব। তারপর কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলব এবং এর সঙ্গে আমার নিজস্ব চিন্তার মিল-অমিল নিয়ে কিছু বলব। গ্রন্থটি ১২টি অধ্যায় এবং ৭১৬ পৃষ্ঠার। ২৭৫টি তথ্যপঞ্জি বা রেফারেন্স আছে, যা যেকোনো গবেষণাগ্রন্থের জন্য খুব বড় বিষয়। মুখবন্ধটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে লেখা।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক তাঁর প্রস্তাবিত শোভন সমাজের ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো উপস্থাপন করেছেন। তিনি শোভন সমাজ বলতে কী বোঝাতে চান, শোভন সমাজের মৌলিক মতাদর্শগত দিক কী হবে, তার কাঠামো কী হবে—সে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—'শোভন সমাজের সন্ধানে: প্রচলিত মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা ও নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা'। এখানে তিনি শোভন সমাজসংশ্লিষ্ট অর্থনীতিশাস্ত্র কেন প্রয়োজন, সেটি আলোচনা করেছেন। প্রচলিত সব ধারার অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর কেন তিনি শোভন সমাজের জন্য নতুন অর্থনীতিশাস্ত্র প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়—আমি যেটা মনে করি, শোভন সমাজের মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনৈতিক অর্থনীতি: শোভন জীবনব্যবস্থার ভিত্তি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম—ধনী-দরিদ্র শ্রেণিবৈষম্য-অসমতা: শোভন সমাজ বিনির্মাণে প্রধান দুর্ভাবনার বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়—'সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ: শোভন সমাজের অশোভন প্রতিপক্ষ'। বিশেষ বাস্তবতায় বাংলাদেশের একজন অর্থনীতি ও সমাজবিদ হিসেবে ড. বারকাত তাঁর গবেষণার মৌলিক বিষয় হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে এবং অতীতেও অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি শোভন জীবনের অশোভন প্রতিপক্ষ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে চিহ্নিত করেছেন, যা বাংলাদেশের জন্য তাঁর একটি মৌলিক অবদান।ক্ষ

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম—'পাল্টে যাচ্ছে বিশ্বায়ন: শোভন সমাজের লক্ষ্যে বিশ্বায়ন নাকি দেশজায়ন?'। এখানে বিশ্বায়নের যাবতীয় বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং একই সঙ্গে বিশ্বায়নের এন্টিথিসিস হিসেবে দেশজায়ন, যাকে আমরা ন্যাশনালাইজেশন বলি, তার সম্পর্কটা নির্ধারণ করেছেন এবং আসলে ন্যাশনাল অ্যাসপেক্ট বাদ দিয়ে গ্লোবালাইজেশন হয় কি না, সে প্রশ্নই তিনি তুলেছেন।

সপ্তম অধ্যায়—'দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি—কেন হচ্ছে, কত দূর হবে?' আমরা সবসময় বলি যে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশ অগ্রসর হচ্ছে—এসবের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক এখানে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কেন এই প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এবং এটি কত দূর যেতে পারে, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের বুদ্ধিজীবীসহ বিশ্বব্যাপী অনেকের ধারণা, প্রবৃদ্ধি দিয়ে যে পথে বাংলাদেশ এগোচ্ছে, তাতে সংকট থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব। কিন্তু ড. বারকাত এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন—এই প্রবৃদ্ধি কত দূর হবে এবং এর সীমাবদ্ধতাই বা কী।

অষ্টম অধ্যায়—'কভিড-১৯ এর প্রত্যক্ষ ক্ষতির বিশ্লেষণ এবং মোকাবেলা ভাবনা: শোভন সমাজের অভীষ্ট প্রাথমিক কর্মকাণ্ড'। এখানে ড. বারকাত বিশ্বব্যাপী সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রে কভিড-১৯-এর ক্ষতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং কীভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে এবং শোভন একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

নবম অধ্যায়ে ড. বারকাত 'কভিড-১৯: পুনরুদ্ধার ও শোভন সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণ মডেল' শিরোনামে এখন যে বিশ্ব অর্থনীতিতে মহামন্দা চলছে, তাকে তিনি কভিড-১৯-এর কারণে নয় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার

অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে তুলে ধরে কভিড-১৯-এর ক্ষতির আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এবং এ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে, যাকে তিনি 'শোভন সমাজ ও জীবনব্যবস্থা' হিসেবে উল্লেখ করছেন এবং সেই ব্যবস্থার 'অর্থনৈতিক মডেল' উপস্থাপন করেছেন।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের এই গ্রন্থের আমার দৃষ্টিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মূল অধ্যায় হলো দশম অধ্যায়—'সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতি: শোভন সমাজ-অর্থনীতির সন্ধানে'। এ প্রসঙ্গে আমি এখন থেকে পাঁচ-ছয় বছর আগে ড. বারকাতের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত আলোচনার প্রসঙ্গে বলব। তাঁকে সে সময় বলেছিলাম, 'আপনার উচিত বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার গবেষণালব্ধ একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরা।' তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'এটা কি আমাকেই করতে হবে?' আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ আপনাকেই করতে হবে।' আমি আজকে এই প্রসঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ দিই—'সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতি: শোভন সমাজ-অর্থনীতির সন্ধানে'-এর ১৫টি উপ-অধ্যায়ে সেসব বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে একমত-দ্বিমতের প্রসঙ্গ যা-ই থাকুক, আমি মনে করি, এটি একটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান এবং বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ এবং বুদ্ধিবৃত্তির সমস্ত ক্ষেত্র নিয়ে যে তিনি যে মূল্যায়ন করেছেন, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে—তা কাজে দেবে।

একাদশ অধ্যায়—'ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশ: বিকল্প বাজেট ২০২০-২০২১'। বেশ কয়েক বছর ধরে লক্ষ করছি, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবছর জাতীয় বাজেট উত্থাপনের ঠিক আগেই আগেই অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত জাতির কাছে একটি বিকল্প বাজেট পেশ করেন। কোভিড-১৯-এর এই মহাবিপর্যয়কালে সরকার যে বাজেট ঘোষণা করেছে, তার বিপরীতে বাংলাদেশের বাজেট আসলে কেমন হওয়া উচিত, সেটিও এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন।

ড. বারকাত বলেছেন, তিনি গবেষণাগ্রন্থটি এমনভাবে বিনির্মাণ করেছেন—প্রথমে তিনি একটি তাত্ত্বিক মডেল নির্মাণ করেছেন এবং সত্যিকারভাবে তার অনুশীলন ও ব্যবহারিক দিক কী হওয়া উচিত, আমাদের দেশের বাস্তবতায় কীভাবে তা প্রয়োগ ও অনুশীলন করতে পারি, সে জন্য তিনি বিকল্প বাজেট থেকে শুরু করে সমাজ সমগ্রকের রাজনৈতিক অর্থনীতির সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে 'শোভন একটি সমাজ ও অর্থনীতির' সন্ধান করেছেন। ফলে তাঁর গোটা গবেষণাগ্রন্থের কাঠামো একদিকে যেমন তাত্ত্বিক মডেল এবং সেই সাথে অন্যদিকে আমাদের দেশের বাস্তবতায় সেই মডেল কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে তার পথনির্দেশক।

সবশেষে উপসংহারে পৌঁছেছেন এবং বলেছেন, এই মহামারির বিশ্বে পরিবর্তন অনিবার্য। এই পরিবর্তনে আমরা কী চাই। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—যে বিশ্ব এখন আছে, মহামারির পরে সেই বিশ্ব আর থাকবে না। আমরা গত শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বে যে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল, তার সঙ্গে আমরা একমত বা দ্বিমত হতে পারি। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির লড়াই আমরা দেখেছি। এখন এই ভাইরাসের মহাবিপর্যয়ের পরে আমার মনে হয়, লেখক এই গ্রন্থে পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, গোটা বিশ্ব একটি নতুন পৃথিবী দেখবে এবং নতুন পরিবর্তনের সামনে দাঁড়াবে—এটাই হলো ড. বারকাতের উপসংহার। এক বাক্যে বলা যায়, তাঁর এই গবেষণাগ্রন্থের এটাই হলো মূল নির্যাস।

আমি সব অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব না, সীমিত এই পরিসরে সেটা সম্ভবও না। চারটি অধ্যায় আলোচনা করব এবং অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে আমার মতামত তুলে ধরব।

এই গবেষণাগ্রন্থের মুখবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন, যেকোনো গবেষণাগ্রন্থ তা কার্ল মার্কসের *পুঁজি* হোক বা অ্যাডাম স্মিথের *ওয়েলথ অব নেশনস* হোক, যেকোনো গবেষাণাগ্রন্থের জন্যই মুখবন্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে ড. বারকাত সার্বিকভাবে কতগুলো বিষয় এনেছেন। প্রথম কথা হলো, তিনি মানুষ ও তার সামাজিক কাঠামোর ইতিহাসের কথা বলেছেন এবং আমার মনে হয়, তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ভিত্তি করেই সেসব কথা বলেছেন। আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, ফিউডাল সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ—এসব কাঠামোকে তিনি আমার দৃষ্টিতে মার্কসীয় প্যারাডাইমের আলোকে বলেছেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে বলেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি এসব ঐতিহাসিক বিষয় বস্তুবাদের কাঠামোর আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি 'শোভন সমাজ ও জীবনব্যবস্থা'র প্রস্তাব করেছেন এবং সেটির মতাদর্শগত যে ভিত্তি, যা মূল বিষয় এই গবেষণাগ্রন্থের, তা-ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বিস্তৃতভাবে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোগত সারসংক্ষেপ এবং তার বিপরীত বা এন্টিথিসিস হিসেবে 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র অপরিহার্যতার কথা বলেছেন এবং তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন—গবেষণার মেথডোলজি হিসেবে তিনি ডায়ালেকটিক মেথড ব্যবহার করেছেন এবং তিনি আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আমি মনে করি, মূলত তিনি দ্বন্দ্ব-দর্শনব্যবহার করেছেন। যাঁরা মার্কসবাদী স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বলবেন, তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ভাববাদী নয়, বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব-দর্শন তিনি ব্যবহার করেছেন। আমি এ নিয়ে নতুন কোনো বিতর্কের কথা বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তিনি যে ডায়ালেকটিকস ব্যবহার করেছেন, থিসিস-এন্টিথিসিস-থিনসিসিস ব্যবহার করেছেন যদিও তা ভাববাদী দর্শনেও আছে।

গ্রন্থের মুখবন্ধের ১০ নম্বর পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও তার উপায় এবং এই রাষ্ট্রের রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন। আমরা জানি যে মার্কসীয় দর্শন বা সমাজবিজ্ঞানের বহু মতবাদে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বিষয়ে অনেক বিতর্ক আছে। ড. বারকাত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সব উপায়ের বিশ্লেষণ করেছেন, সেটা সশস্ত্র উপায়, নির্বাচন, অভ্যুত্থান বা অন্য যেকোনো উপায়েই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল হতে পারে বলে তিনি নিজের বক্তব্য রেখেছেন। এ নিয়ে একমত-দ্বিমত হতেই পারে। তবে কেন তিনি বলেছেন, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে সারসংক্ষেপ আকারে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এসবের পরে তিনি 'শোভন জীবনব্যবস্থা'র কাঠামোগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এসবই এই গ্রন্থের মুখবন্ধের উল্লেখযোগ্য এবং সার্বিক বিষয়।

প্রথম অধ্যায়ের শোভন সমাজের ধারণাত্মক তত্ত্বকাঠামো এবং তাঁর যে প্রস্তাবনা, সে বিষয়ে কিছু বলব। প্রথম অধ্যায়ের ৪ নম্বর পৃষ্ঠার লেখচিত্র ১-এ তিনি 'শোভন সমাজ' ধারণার তিনটি বৃহৎবর্গীয় অঙ্গ, অঙ্গসমূহের ভিত্তি-উপাদান ও যোগসূত্র'তুলে ধরেছেন:

এই ভিত্তিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো বৃহত্তর আলোচনার দাবি রাখে, তার মধ্যে প্রথমত, 'মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট বিজ্ঞান চর্চা' অর্থাৎ এমন বিধ্বংসী বা এমন কোনো বিজ্ঞান চর্চা হওয়া উচিত না, যা সমাজ-সভ্যতা-পৃথিবীকে ধ্বংস করে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপাদান-এর 'বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বঞ্চনামুক্ত অর্থনীতি' ব্যবস্থার কথা বলেছেন—এগুলোর প্রতিটিই আলোচনার দাবি রাখে। এখানে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—কেন বৈষম্য সৃষ্টি হয়, কোথায় বৈষম্য হয় এবং কে শোষণ

'শোভন সমাজ' ধারণা:
প্রকৃতির বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য-অধীনস্থতাভিত্তিক

সামাজিক ভিত্তি-উপাদান	⟷	অর্থনৈতিক ভিত্তি-উপাদান	⟷	রাজনৈতিক ভিত্তি-উপাদান
আলোকিত মানুষ	⟷	বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বঞ্চনামুক্ত অর্থনীতি	⟷	শোভন রাষ্ট্র ব্যবস্থা: জনগণের রাষ্ট্র, জনগণের প্রাধান্য
• জ্ঞানসমৃদ্ধ; মুক্তচিন্তা ও সৃজন বিকাশ-উদ্দিষ্ট • উচ্চমাত্রা সংহতিবোধসমৃদ্ধ • অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা, অসাম্প্রদায়িকতামুক্ত যুক্তিবাদী মানুষ • মানবকল্যাণ-উদ্দিষ্ট বিজ্ঞান চর্চা	⟷	• প্রাকৃতিক সম্পদে জনগণের মালিকানা (ব্যক্তিমালিকানা নয়) • উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা: জনগণের মালিকানা, রাষ্ট্রের ও যৌথ-সমবায়ী মালিকানা (ব্যক্তিমালিকানা নয়) • বিলুপ্ত হবে—সব ব্যাংক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত), শেয়ার (পুঁজি) বাজার, মজুরিশ্রম (মেহনতি মানুষ উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিক হেতু), পুঁজিপতি, অশ্লীল ধনী	⟷	• জন-গণের গণতন্ত্র • প্রভুহীন শাসনব্যবস্থা (জনগণই প্রভু) • 'নিচ থেকে উপর' শাসনব্যবস্থা • স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রাধান্য • গণকল্যাণমুখী ন্যায় বিচার কাঠামো • প্রথাগত আমলাতন্ত্রের বিলুপ্তি • কম্যুনিটি প্রশাসনব্যবস্থা • দেশরক্ষা, প্রতিরক্ষা—জনগণের দায়িত্ব (সমরাস্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র, মারণাস্ত্রের বিলুপ্তি)

করে, কে শোষক, কে শোষিত—এসব বিষয়। তিনি দেখিয়েছেন, আসলে দারিদ্র্যের উৎস কোথায়, কারণ কী এবং যে অর্থনীতিশাস্ত্র এসব সমস্যা এড়িয়ে চলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, তাকে তিনি 'শোভন সমাজের অর্থনীতিশাস্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এখানে তিনি একটি মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে জনগণের মালিকানা। ব্যক্তিমালিকানা নয়, সামাজিক মালিকানা; যেখানে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা: জনগণের মালিকানা, রাষ্ট্রের ও যৌথ-সমবায়ী মালিকানা থাকবে। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ড. বারকাত উল্লেখ করেছেন, যিনি ব্যাংকিং সিস্টেমেরও একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত সকল ব্যাংক বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, আমাদের দেশ, বা পুঁজিবাদী সমাজের মৌলিক শোষণের অন্যতম ক্ষেত্রটা হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন সিস্টেম। অতএব এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা যদি জনগণের হাতে না থাকে, জনগণের অধিকারের মধ্যে না থাকে—তাহলে তা সমাজে বৈষম্য-শোষণ-বঞ্চনার সৃষ্টি করতেই থাকবে। তৃতীয় ভিত্তি উপাদানে তিনি 'শোভন রাষ্ট্র'-এর কথা বলেছেন। এই 'শোভন রাষ্ট্র' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন—জনগণের রাষ্ট্র, যেখানে জনগণের প্রাধান্যই মূল কথা। রাষ্ট্র নিয়ে বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী-নেতৃত্ব এবং সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক-বিস্তৃত বিতর্ক আছে। ড. বারকাত বলছেন, জনগণের রাষ্ট্র, যেখানে সর্বত্র জনগণের প্রাধান্য থাকবে, জনগণের গণতন্ত্র থাকবে, আমরা পিপলস ডেমোক্রেসি বলতে যা বুঝি। এটি মার্কসীয় পরিকাঠামো নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরাও পিপলস ডেমোক্রেসির *কথা বলেন। ড. বারকাত এসব পরিকাঠামোর সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থার পার্থক্য কী, সেটা ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি নতুন ধরনের নাগরিক শাসনের কথা বলেছেন, যেটা 'নিচ থেকে উপরে' অর্থাৎ 'উপর থেকে নিচে নয়', যেখানে প্রথাগত আমলাতন্ত্র, যা এখনকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় রয়েছে, তা থাকবে না। কীভাবে থাকবে না, কেন থাকবে না সেসবও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি বলেছেন*—দেশরক্ষা, প্রতিরক্ষা—জনগণের দায়িত্ব। এটি নিয়ে বড় ধরনের আলোচনা হতে পারে।

ড. বারকাত শোভন যে সমাজের কথা বলছেন, সেখানে একটি শোভন রাষ্ট্র থাকবে। আমরা যাঁরা মার্কসবাদী কর্মী বা যাঁরা সমাজ বিপ্লবের কথা বলি, আমরা যাকে কমিউনিস্ট সোসাইটি বা সাম্যবাদী সমাজ বলি, যেখানে মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায় 'রাষ্ট্রের বিলুপ্তি' অর্থাৎ রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে, রাষ্ট্র থাকবে না। কিন্তু অধ্যাপক আবুল বারকাত বলছেন, 'শোভন সমাজে' একটি বিস্তৃত কাল ধরে রাষ্ট্র থাকবে অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। ফলে এখানে যাঁরা পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে, সমাজতন্ত্রের কথা বলেন এবং সমাজতন্ত্রে একটা বিস্তৃত সময় ধরে একটা রাষ্ট্র থাকবে। শুধু সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র শুকিয়ে মরবে বা বিলুপ্ত হবে, যা মার্কসীয় পরিকাঠামোয় বলা আছে। ড. বারকাত এটির সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের পার্থক্যের কথা বলেছেন। তিনি অবশ্য সাম্যবাদী সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত শোভন সমাজের কিছু মিলের কথা বলেছেন। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে যাওয়ার পরে যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই থাকতে পারে না, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কিছু বলেননি—এমনটাই আমার মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেখানে তিনি শোভন সমাজের সন্ধান করতে গিয়ে প্রচলিত মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের অপারগতা ও নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা তুলে ধরে শোভন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি কেমন হতে পারে, সেটা বলেছেন। এখানে তিনি প্রচলতি অর্থনীতিশাস্ত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটিকে মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্র বলেছেন, অন্যটিকে তিনি কোভিড-১৯ এবং বৈশ্বিক এই সংকটের বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্য নতুন অর্থনীতিশাস্ত্রীয় ধারা বলেছেন। এখানে তিনি মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের মধ্যে মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্রকে রেখেছেন। আমার দৃষ্টিতে আমি তাঁর এই বিভাজনের সঙ্গে একমত নই। কারণ, তিনি নিজেই বলেছেন, মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্রকে এখন মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্র বলতে যা বোঝায়, যার দুটি ধারা আছে—একটি ধারা সার্বিকভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে গ্রহণ করেছে, আর অন্যটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রের পরিকাঠামো কিছুটা পরিবর্তন নতুন অর্থনীতি বলছে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকল্প হিসেবে যেসব অর্থনীতিশাস্ত্র রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান ধারা হচ্ছে, মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্র—এটা অস্বীকার করার কিছু নেই; ড. বারকাত এটা বলেছেন মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে। তাঁর এ কথার যুক্তি আছে—কোভিড-১৯ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মহামন্দা মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। আর এই অর্থেই তিনি মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্রকে মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। এ বিষয়ে আমার দ্বিমত আছে।

আমি আগেই বলেছি যে, এই গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে সমাজ সমগ্রকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, তা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আনা সম্ভব না। সে কারণে আমি উপসংহারে আসি। তিনি উপসংহারে কতগুলো কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়তপরিবর্তনশীল—সত্য কথা। তিনি বলেছেন, ইতিহাস হামাগুড়ি দেয় না, লাফিয়ে চলে। তিনি বিশ্ব ধ্বংসের চারটি উপাদানের কথাও বলেছেন।

আমার দৃষ্টিতে, ড. আবুল বারকাতের এই গবেষণাগ্রন্থটির যেসব বিষয় চিন্তা উদ্রেককারী বা চিন্তার খোরাক জোগায়, তা হলো—সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, আমার কাছে সেটাকে মনে হয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পুঁজিবাদের নির্বিশেষ স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যত ধরনের আবেদন আছে, সেসবের তিনি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংকটগ্রস্ত এই সমাজকে সামনে এগিয়ে নিতে পারবে না। তিনি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষ করে কৃষি এবং শিল্পের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন গবেষণালব্ধ জ্ঞান দিয়ে, যা আমাদের সবাইকে সাহায্য করবে।

এবং সবশেষে তিনি পুঁজিবাদের বিকল্প অন্বেষণ করে, নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই চারটি দিক আমার মনে হয় এই গ্রন্থের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক, যা আমাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক করে।

এখন আমি কয়েকটি গ্রন্থের রেফারেন্স উল্লেখ করব। অ্যাডাম স্মিথের *ওয়েলথ অব নেশনস*, কার্ল মার্কসের *দ্যস ক্যাপিটাল*, যোশেফ সুমপিটারের *ক্যাপিটালিজম সোসালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি*, ফুকুয়ামার *দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান*, জিওভান্নি আরাহির *দ্য লং টোয়েনটিথ সেঞ্চুরি* এবং টমাস পিকেটির *দ্য ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েনটি ফার্স্ট সেঞ্চুরি*। এই গ্রন্থগুলো খুব প্রাসঙ্গিক, যার মধ্যে সম্ভবত চারটি গ্রন্থের রেফারেন্স অধ্যাপক আবুল বারকাত তাঁর গবেষণাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি এগুলোর নাম এ জন্য উল্লেখ করেছি যে, এর প্রতিটি গ্রন্থই একেকটি বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে রচিত। এর মধ্যে একটি কথা গবেষক অধ্যাপক আবুল বারকাত, যেটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পরে বিখ্যাত বলি আর কুখ্যাত বলি ফুকুয়ামার লেখা *দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান* গ্রন্থটির উল্লেখ এই গবেষণাগ্রন্থে করেছেন। কিন্তু একটা বিষয় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই—এই ফুকুয়ামা ২০১৮ সালে 'রিসারজেন্স অব সোসালিজম ইন দ্য ইউএসএ' প্রসঙ্গে নিউ স্টেটসম্যান-এ একটি বক্তব্য রেখেছেন, যেটি আমি উদ্ধৃত করছি:

"At this juncture, it seems to me that certain things Karl Marx said are turning to be true. He talked about the crisis of over production… That workers would be impoverished and there would be insufficient demand" *(Resurgence of Socialism in the USA, Y F Fukuyama, New Statesman, 2018)*

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ২৬ বছর আগে বলেছেন, *দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান*, জানি না তার বোধদয় কী—কিন্তু তিনি পুঁজিবাদের এই যে সংকট, তার জন্য আবার কার্ল মার্কসের দ্বারস্থ হয়েছেন। কথাটা বলা দরকার কারণ, আমাদের দেশের এই প্রজন্মের অনেক তরুণ, যাঁরা ফুকুয়ামার অনেক তত্ত্বে প্রভাবিত হন। কিন্তু তার শেষ বক্তব্য পুঁজিবাদের বিকল্প সে মার্কসই হোক বা অন্য যেকোনো মতবাদই হোক, তাদের যে আসতে হবে, সে বিষয়টি তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

শ্রোতা-দর্শকদের প্রশ্ন এবং অধ্যাপক সুশান্ত কুমার দাস-এর উত্তর

আমি শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমার কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। কারণ এর মাধ্যমে শ্রোতাদের অনেকের প্রশ্নের উত্তর হয়েও যেতে পারে।

প্রথমত, এই শোভন সমাজ ধারণাটি নতুন কি না? আপনারা হয়তো জানেন ১৯৯৮ সালের দিকে ইসরাইলের একজন অধ্যাপক অভিসাই মার্গালিট *দ্য ডিসেন্ট সোসাইটি* শিরোনামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। ফলে ডিসেন্ট সোসাইটির এই ধারণাটা আক্ষরিক অর্থে একেবারে নতুন না। তবে অধ্যাপক মার্গালিট ডিসেন্ট সোসাইটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আর অধ্যাপক আবুল বারকাত যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এ ধরনের অনেক প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক বারকাত তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন।

- *শোভন সমাজ বনাম সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র*

অধ্যাপক বারকাত এই গ্রন্থে নিজেই বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা এসেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এন্টিথিসিস বা বিকল্প হিসেবে। সমাজতান্ত্রিক যে ব্যবস্থার কথা এসেছে, সেখানে শোভন সমাজও এসেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে। অনেক বিষয় আছে, যা লেখক নিজেও বলেছেন, এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেসব মডেল আছে, তার সঙ্গে তিনি দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজের যে ধারণা মার্কস দিয়েছেন, সেসবের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তিনি একমত প্রকাশ করেছেন। তবে সেই সমাজ অর্জনের জন্য ড. বারকাত তাঁর নিজস্ব চিন্তার কথা বলেছেন—যা মার্কসের জীবদ্দশায় বা মার্কসীয় যাঁরা, তাঁরা অনেক জায়গায় তাঁদের মতো করে বলেছেন।

- *শোভন সমাজব্যবস্থা ও ইউটোপিয়া*

গ্রন্থকার বলেছেন, ধারণার দিক দিয়ে এটি ইউটোপিয়া। কারণ যদি বাস্তবে অর্জন করা না যায়, তাহলে ইউটোপিয়া। তবে বহু ইউটোপিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে।

- *শোভন সমাজব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা*

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে শ্রমিক শ্রেণি যদি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বা পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে যদি শ্রমিক শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, তাহলে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে। এ সম্পর্কে মার্কসের ধারণা, যা তিনি 'গোথা কর্মসূচি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ডিক্টেটরশিপ অব প্রলেতারিয়েট'-এর কথা। অর্থাৎ সাম্যবাদে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত একটা রাষ্ট্র থাকবে, যে রাষ্ট্র পুঁজিবাদের যে শোষণ তার বিরুদ্ধে কাজ করবে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ বা যারা উৎপাদক শ্রেণি—তাদের পক্ষে কাজ করবে। এটাই হলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটা ঐতিহাসিক পর্যায়কাল। মার্কস তাঁর *দ্য ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স*-এর মধ্যেও বলেছেন, *ক্রিটিক অব দ্যা গোথা প্রোগ্রাম*-এর মধ্যেও বলেছেন।

এই গ্রন্থে অধ্যাপক বারকাত শোভন রাষ্ট্রের যে কথা বলেছেন, শোভন রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা তিনি বলেছেন, তা অর্জনের দিক দিয়ে মার্কসীয় কাঠামোয় যেসব মডেল আছে, তার সঙ্গে হয়তো পার্থক্য আছে। কিন্তু ধারণার দিক দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ধারণা থেকে একেবারে বিপরীত—সেটি আমার মনে হয়নি। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ধারণা-কাঠামোর মধ্যেই তিনি অবস্থান করেছেন, পুঁজিবাদের বিকল্পের সন্ধান দিয়েছেন।

- *পুঁজিবাদ থেকে উত্তরণ ও শোভন সমাজ ধারণা*

এই গ্রন্থে অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির কথা এসেছে, যাঁর একটি নিজস্ব চিন্তা আছে। তাঁর মতবাদকে বলা হয়, 'অ্যানার্কো সিন্ডিক্যালিজম' সেখানে তিনি রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করেছেন। মার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য থাকতে পারে।

পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের বহু পথ আছে। তার মধ্যে মার্কসীয় পরিকাঠামোটি একটি প্রধান ধারা। এ ছাড়া অন্য ধারণা নেই, এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই এবং পৃথিবীতে তার ব্যবহারিক প্রয়োগেরও অনেক জায়গা আছে। ফলে এখন সময় এসেছে; আমাদের এসব বিষয় নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। মার্কসবাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, সুনির্দিষ্ট বাস্তবে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া। ফলে শোভন সমাজের যে ধারণার কথা বলা হচ্ছে, সেই ধারণা পুঁজিবাদের একটা বিকল্প হিসেবে আসতেই পারে। তবে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিষয়গুলো এখানে থাকতে হবে।

- *সমাজতান্ত্রিক মডেল ও স্টেট ক্যাপিটালিজম*

ড. বারকাত তাঁর গ্রন্থে অনেক মডেলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন যেমন সোভিয়েত মডেল, পূর্ব ইউরোপীয় মডেল, ল্যাতিন আমেরিকান মডেল প্রভৃতি। কোনো কোনো জায়গায় এসব মডেলের শর্টকামিং সত্ত্বেও এদের সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে তিনি বলেছেন স্টেট ক্যাপিটালিজম। তিনি বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭০ বছরের ইতিহাসে এই স্টেট ক্যাপিটালিজম একরকম ছিল না। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই স্টেট ক্যাপিটালিজম বলাটা সঠিক বলে মনে করি না। সোস্যালিজম থাকবে আবার স্টেট থাকবে, সে ব্যাপারে অনেকের দ্বিমত আছে। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার—সাম্যবাদে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত একটা দীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল ধরে একটি রাষ্ট্র থাকবে, যেটা জনগণের রাষ্ট্র হবে, উৎপাদক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করবে। নিশ্চয়ই শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করবে না। ফলে সমাজতন্ত্রের এই বিষয়টি, সে শোভন রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হোক—একটা ঐতিহাসিক কালজুড়ে তাকে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে ডিক্টেটরশিপ প্রয়োগ করতেই হবে।

- *শোভন রাষ্ট্রে রূপান্তর*

গ্রন্থে ড. বারকাত বলেছেন, রাষ্ট্রে রূপান্তর প্রয়োজন। অর্থাৎ রাষ্ট্র শুধু ক্ষমতা দখল করলেই হবে না। শোভন রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রয়োজন হবে এবং জনগণের জন্য অধিকতর গণতন্ত্রে রূপান্তর না হলে, সেই রাষ্ট্র আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। ইতিহাসে সে অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে।

- *অর্থনীতির শ্রেণি বিভাজন প্রসঙ্গে*

আমি মনে করি, অর্থনীতিশাস্ত্রের দুটি ভাগ হওয়া উচিত। একটি পুঁজিবাদ রক্ষাকারী অর্থনীতিশাস্ত্র। অন্যটি পুঁজিবাদের বিকল্প অর্থনীতিশাস্ত্র এবং এর পরিকাঠামো কী হতে পারে, সেই অর্থনীতিশাস্ত্র। সেখানে মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্র থেকে শুরু করে ড. বারকাত যে শোভন অর্থনীতিশাস্ত্র প্রস্তাব করেছেন, কোভিড অর্থনীতিশাস্ত্রের কথা বলেছেন—সেসবও থাকবে। এদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে এরা পুঁজিবাদের বিকল্প।

- *শোভন সমাজ ও মার্কসবাদের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য*

মার্কসবাদের একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো আছে। মার্কসবাদ মতবাদটাই হলো এমন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি—এটাই মার্কসবাদের মূল কথা।

অধ্যাপক বারকাতকে আমি ধন্যবাদ দেব যে, তিনি তাঁর শোভন মতবাদকেও স্ট্যাটিক বলেননি, ডায়নামিক বলেছেন। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে এটি পরিবর্তিত হবে, আরও পরিশীলত হবে। মার্কসবাদের সঙ্গে এখানে সাযুজ্য রয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি অধ্যাপক বারকাতকে মার্কসবাদে বিশ্বাসীদের অনেক বড় বন্ধু বলে মনে করি। তাঁর নিজস্ব কোনো চিন্তা-ধারণা থাকতেই পারে, বৈপরীত্য থাকতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর চিন্তাকে আমি গ্রহণ করব এই জায়গা থেকে যে, তিনি পুঁজিবাদের বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিকল্প হিসেবে একটি 'শোভন সমাজ ও জীবনব্যস্থা'র ধারণা প্রস্তাব করেছেন।

পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে অধ্যাপক বারকাত যে কথাগুলো বলছেন, একজন মার্কসিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আমি মনে করি—তাঁর প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি প্রস্তাবনা আমি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করব, যাতে তা সমাজ পরিবর্তনের এই জায়গা থেকে আমি সামনে থেকে এগিয়ে নিতে পারি।

বিপ্লব অর্থই নতুন একটি রাষ্ট্রকাঠামো। আমরা যে প্রস্তাবই করি না কেন, শোভন সমাজের যে প্রস্তাব ড. বারকাত করেছেন, তা এখন যে ডোমিনেটিং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো আমাদের দেশে বা বিশ্বে চলছে, সেখানে কোনোভাবেই অর্জন সম্ভব নয়। এই অবস্থায় শোভন কোনো কিছু অর্জিত হবে—এটা মনে করার কোনো কারণই নেই। শোভন বা সাম্যবাদী যে ধারণাই হোক, তা শোষকনিয়ন্ত্রিত এই কাঠামোয় অর্জন সম্ভব নয়।

- *শোভন রাষ্ট্র অর্জন*

শোভন রাষ্ট্র অর্জন করতে হলে রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হবে। নতুন একটি রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। অধ্যাপক বারকাত এই গ্রন্থের কোনো জায়গায় এমন কোনো রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ করেননি। সেই দল কার স্বার্থ রক্ষা করবে? আমি চাইব, তিনি সেই রাজনৈতিক দলের কথা বলবেন, যে দলটি এই রাজনীতি করবে, যারা পরবর্তী সময়ে শোভন রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করবে।

- *বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ও নিও লিবারেল পলিসি*

এই গ্রন্থে উল্লেখ করা এ বিষয়টি সত্যি। আমাদের দেশে যারা ক্রনি ক্যাপিটালিজম করেন, তাদের ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী না, একটি মতাদর্শকে হত্যা করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধেও লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। শুধু কয়েকজনের বিচার করলেই হবে না। যারা বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাদেরও বিচার করতে হবে। এদের বিরুদ্ধে লড়াই তা শোভন বলি কিংবা সাম্যবাদী বা অন্য যেকোনো মতাদর্শই বলি, তারই অংশ।

- *দাম বাড়া 'গরিবের শত্রু' আর দাম কমা 'গরিবের মহাশত্রু'*

আমি মনে করি, অধ্যাপক বারকাত দাম বাড়া আর দাম কমা নিয়ে যা বলেছেন, তা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বলেছেন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে পুরোপুরি সমর্থন করি। এই সংকটের সময় দরিদ্র মানুষের পক্ষে এই দাম বাড়া কমার সঙ্গে কোনোভাবেই ব্যালান্স করা সম্ভব না। এর জন্য নতুন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন।

- *সংসদে যাওয়া না-যাওয়া*

আমাদের রাজনৈতিক জায়গা থেকে বলি, এটা একটি রাজনৈতিক লড়াই। আমাদের দেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিবাচক-নেতিবাচক বহু আলোচনা আমরা করেছি। নেতিবাচক অবস্থার দায় আমাদেরও যে বহন করতে হয় না, তা না। কিন্তু এর অর্থ এই না যে আমরা তা গ্রহণ বা সমর্থন করি। এখন যারা ক্ষমতায় আছে গণতন্ত্রের নামে, তারা যদি এই জায়গা থেকে সরে না দাঁড়ায় তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

পরিশেষে বলব, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াইয়ে অধ্যাপক বারকাতকে আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা বলে মনে করি।

যারা পুঁজিবাদকে শেষ কথা বলে মনে করেন, অসাধারণ এই গ্রন্থ—"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"—তাঁদের ভালো লাগবে না। পরিষ্কারভাবেই বলি, অনেক ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। এই গ্রন্থ সার্বিকভাবে সকল ধরনের পুঁজিবাদের মুখোশ উন্মোচন করেছে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

যারা পুঁজিবাদের বিকল্প ভাবেন, তাদের এই বইয়ের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যকে অনুধাবন করতে হবে গভীরভাবে— নিজেদের প্রয়োজনে, তাতে একমত বা দ্বিমত যা-ই হোন না কেন।

সাধারণভাবে যে-কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—প্রফেসর আবুল বারকাতের গ্রন্থটি সমাজতন্ত্রের পক্ষে না বিপক্ষে? উত্তর হবে—

১) পুঁজিবাদের পক্ষের লোকেরা, যাঁরা সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, তাঁরা বলবেন—'সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে', কারণ, তিনি 'শোভন সমাজ'-এর কথা বলেছেন, সমাজতন্ত্রের নয়। কিন্তু তিনি যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন—এটা বলবেন না।

২) সমাজতন্ত্রের পক্ষে যাঁরা, তাঁরা বলবেন 'তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষে বলেননি'। তার মানে, তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষে নন। কিন্তু তিনি যে পুঁজিবাদের বিকল্পের কথা বলেছেন, তা আমলেই নেবেন না হয়তো। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই—সতর্কতা এখানেই। কোনো গ্রন্থের 'মলাট' দেখে গ্রন্থটির বিচার করা ঠিক নয়—ভেতরে কী আছে সেটাই দেখতে হবে। ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ৩০৩-৩০৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

অনূদিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

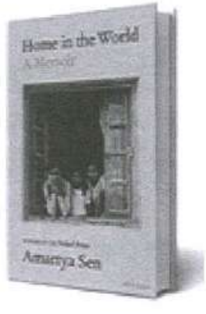

হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার

গ্রন্থকার: **অমর্ত্য সেন***

ভাষা: ইংরেজি ⅄ প্রকাশক: পেঙ্গুইন বুক্স–এ্যালেন লেন

প্রথম প্রকাশ: ৮ জুন, ২০২১ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৮০, আইএসবিএন: ৯৭৮১৮৪৬১৪৪৮৬৮

* অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী (১৯৯৮) অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যামন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।

বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ৩০৫-৩৪৫
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার*

অমর্ত্য সেন

স্মৃতিকথা: ঘরে-বাইরে

মূল: **অমর্ত্য সেন**
অনুবাদ: আহমেদ জাভেদ**

¤ মুখবন্ধ ¤ ঢাকা ও মান্দালয় ¤ বাঙলার নদী

অনুবাদকের কথা

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেন আমাদের সময়ের একজন অগ্রগণ্য চিন্তাবিদ। নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের লেখা গ্রন্থ ৫০টির বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা। তিনি বাংলা ভাষার আদি উৎস—সংস্কৃত ভাষারও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় তাঁর সুলিখিত আত্মজীবনী "হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার" প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত প্রকাশনী পেঙ্গুইনের অ্যালেন লেন থেকে। এটি জুলাই ২০২১ সালের ঘটনা। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার

---

* অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বহুল প্রতীক্ষিত আত্মজীবনী "হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার" (স্মৃতিকথা: ঘরে-বাইরে) প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের জুলাই মাসে বিখ্যাত পেঙ্গুইন বুক্সের এ্যালেন লেন প্রকাশনী থেকে। অধ্যাপক সেনের এ আত্মজীবনী গ্রন্থে তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বছরের (১৯৩৩ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত) বিবরণ অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে বিধৃত হয়েছে। ৪৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি ৫টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে রয়েছে ৬টি অধ্যায়—ঢাকা ও মান্দালয়, বাঙলার নদী, দেয়ালবিহীন স্কুল, নানা-নানির সাহচর্য, তর্কবিশ্ব এবং বিগতের বিদ্যমানতা। ২য় খণ্ডে ৪টি অধ্যায়—সর্বশেষ দুর্ভিক্ষ, বাঙলা ও বাংলাদেশের ধারণা, প্রতিরোধ ও বিভক্তি এবং ব্রিটেন ও ভারত। ৩য় খণ্ডে ৫টি অধ্যায়—কলকাতার নাগরিকতা, কলেজ স্ট্রিট, মার্কস বিষয়ে করণীয়, প্রারম্ভিক যুদ্ধ এবং যুক্তরাজ্যের পথে। ৪র্থ খণ্ডে ৯টি অধ্যায়—ট্রিনিটির দরজা, বন্ধুবান্ধব ও পরিচয়ের বৃত্ত, কোন অর্থনীতি?, ইউরোপ কোথায়?, কথোপকথন ও রাজনীতি, কেমব্রিজ ও কলকাতার মধ্যে, ডব, স্রাফা ও রবার্টসন, আমেরিকার মুখোমুখি এবং পুনঃপরীক্ষায় কেমব্রিজ। ৫ম খণ্ডে রয়েছে ২টি অধ্যায়— প্ররোচনা ও সহযোগিতা এবং দূরে-কাছে।

** সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, দ্য পিপল্‌স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন 'বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি; 'বাংলা ভাষায় অমর্ত্য সেন পাঠচক্র'র সমন্বয়ক। ফোন: ০১৯১৪৪৪৪৩২০, ই-মেইল: ronieleo@gmail.com

পরের মাসে, অর্থাৎ আগস্ট মাসে আমি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কাছ থেকে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদের অনুমতি পাই। এটি আমার জন্য ছিল একইসঙ্গে আনন্দের এবং শঙ্কার। এই শঙ্কার কারণ হলো—এই বইটিতে তাঁর জীবন-নদীটি যেসব ঘটনা পরিক্রমায় বিভিন্ন বাঁক নিয়েছে এবং তাঁর ভেতরের সত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, সেসব অভিজ্ঞতার নির্যাস তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সহজবোধ্য ভাষায়। বইটির প্রতিটি বাক্য কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা এবং মনে হবে অধ্যাপক সেন আপনার সঙ্গেই 'কথা কইছেন'। বইটি পড়া শুরু করলে এর বিষয়বস্তু ও ভাষার কোমল সৌরভ আপনার মনকে মোহিত করে তুলবে। তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বছরের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা গ্রন্থটি পড়া শেষ করলেও পাঠকের মনটা ভরবে না, বরং পাঠক তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড পড়ার জন্য ব্যাকুল হবেন।

সুতরাং, একজন অনুবাদক যখন এমন একজন বিদগ্ধ মনিষীর ইংরেজিতে লেখা বইয়ের বাংলায় ভাষান্তরকর্মটি করেন, যাঁর নিজের মাতৃভাষা আবার বাংলা—তখন অনুবাদকের জন্য কাজটি বেশ ঝুঁকির বৈকি! কারণ, ভুলত্রুটি হলে অধ্যাপক সেনের কথাই লোকে বলবেন, যদিও এই কাজে (বাংলায় ভাষান্তর) তাঁর নিজের কোনো 'দায়' নেই। অর্থাৎ, ভুলের কাজটি করেছেন একজন অনুবাদক, আর বদনাম কুড়াতে হচ্ছে একজন নির্দোষ লেখককে। তা ছাড়া এই অনুবাদকর্মটি বাংলা ভাষায়, বিধায় এমন অনেক জায়গা থাকবে—যেখানে লেখকের ইংরেজিতে নিজস্ব ভাব প্রকাশের ভঙ্গিটির মাত্রা-ধরণ হয়তো ভিন্ন হতোই, ফলে অধ্যাপক সেনের স্বকীয় প্রকাশভঙ্গির তৃপ্তি এখান থেকে পুরোপুরি পাবেন না—যদিও লেখাটি তাঁর নামেই ছাপা হচ্ছে।

উল্লিখিত খামতি ছাড়াও সব অনুবাদকর্মের দুটি প্রায় চিরন্তন সমস্যা আমার এই অনুবাদেও রয়েছে, যে সম্পর্কে এই জার্নালের সম্পাদক আমাকে সচেতন করেছেন। অনুবাদের চিরন্তন ওই সমস্যা দুটির প্রথমটি হলো—'লস্ট ইন ট্রান্সলেশন' বা 'তর্জমায় হারিয়ে যাওয়া' ভাব। আমরা জানি, প্রতিটি ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের স্থান-কাল ও পরিপ্রেক্ষিত আলাদা ধরনের। ফলে একটি ভাষায় যে ইতিহাস সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থাকে, অন্য ভাষায় সেগুলো অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থেকে যায়। ফলে এক ভাষার 'ভাব' অন্য ভাষায় হারিয়ে যায়—চেতনে কিংবা অবচেতনে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভাষার 'ঘরেই বাস' করে। আর এই শূন্যস্থান পূরণে অনুবাদককে তার 'টার্গেট' পাঠকের সঙ্গে আরও ভালোভাবে যোগাযোগের জন্য 'ট্রান্সলিটারেশন'-এর আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ, মূল লেখায় (ইংরেজি ভাষায়) যা নেই, তা তাকে টার্গেট ভাষা (বাংলা ভাষায়) বোঝাতে গেলে কিছু নতুন বাক্য-শব্দ জুড়ে দিতে হয়, যাতে করে পাঠক মূল টেক্সটের কাছাকাছি স্বাদ পেতে পারেন। এসব কারণেই অনুবাদ করাবেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ। তবে এর উল্টো দিকে অনুবাদকের আনন্দ হলো—টেক্সট বা লেখাটি তাঁর খুব গভীর উপলব্ধিতে পড়া হয়ে যায়, যা তিনি 'সাধারণ পাঠে' হয়তো পেতেন না। আর কোনো লেখা গভীর উপলব্ধিতে পাঠের ফলে অনুবাদক তথা পাঠকের জীবনের বোধে যেটুকু অমূল্য নির্যাস সঞ্চারিত হয়,তা তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও ঋদ্ধ করে।

মুখবন্ধ

আমার শৈশবের স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটি দৃশ্যের কথা খুব মনে পড়ে। জাহাজের হুইসেলের শব্দে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। শব্দটি ক্রমে ক্ষীণ থেকে বাড়তে শুরু করে ধীরে ধীরে বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। হুইসেলের বিকট চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার বয়স তখন বছর তিনেক হবে। হঠাৎ

প্রচণ্ড শব্দের কারণে আমি ঘুম থেকে উদ্বেগ নিয়ে উঠে বসি। মা-বাবা আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। আমরা তখন কলকাতা থেকে বার্মার রেঙ্গুন যাচ্ছি। জাহাজে চেপে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিচ্ছিলাম। তখন আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা করছিলেন। সে সময় তিনি ৩ বছরের জন্য অতিথি (ভিজিটিং) অধ্যাপক হিসেবে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে বার্মার রেঙ্গুনে মান্দালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন। হুইসেলের শব্দে যখন আমি জেগে উঠি, ততক্ষণে আমাদের জাহাজটি কলকাতা থেকে গঙ্গা নদীর মধ্যে দিয়ে ১০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। সেই সময়ে কলকাতা বন্দরেই বড় বড় সব জাহাজ নোঙর করত এবং ছেড়ে যেত। বাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাদের জাহাজটি এইমাত্র উন্মুক্ত সমুদ্রে প্রবেশ করেছে এবং এভাবে কয়েকদিন চলার পর আমরা বার্মায় রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছে যাব। সমুদ্রযাত্রা কেমন হতে পারে তা নিয়ে এর আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে কীভাবে যাতায়াত করে, সেসম্পর্কেও আমার আগাম কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি একটি রোমাঞ্চকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম—যখন মনে হচ্ছিল—আমার জীবনে এমন সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, যা আগে ঘটেনি। বঙ্গোপসাগরের স্থির গাঢ় নীল জলরাশিকে মনে হচ্ছিল—আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ থেকে এইমাত্র বেরিয়ে নীল আভা সৃষ্টি করেছে।

আমার শৈশব-স্মৃতির প্রায় পুরোটার উৎস হলো আমাদের পরিবারের বার্মার সময়টা। বার্মায় আমরা বছর তিনেকের কিছু বেশি সময় ছিলাম। সেখানকার কিছু স্মৃতি আমার আজও অম্লান। যেমন মান্দালায়ে খুব সুন্দর রাজপ্রাসাদ দেখার কথা মনে আছে, যার চারপাশটা কমনীয় পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল, ইরাবতী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দিগন্ত প্রসারিত অপরূপ দৃশ্য, আর আমরা শহরের যে প্রান্তেই যাই না কেন সবত্রই ছিল সুন্দর সুন্দর প্যাগোডার ছড়াছড়ি! কিন্তু আমার কমনীয় স্মৃতির মান্দালয়ের সঙ্গে অন্যদের দেখা ধুলোময় মান্দালয় শহরের বর্ণনা নাও মিলতে পারে। এমনকি আমরা যে সনাতন বার্মিজ বাড়িটায় থাকতাম, সেটির সৌন্দর্যের বর্ণনায় যে ভাষার ব্যবহার করেছি, সেটিও কিছুটা বাড়তি মনে হতে পারে—তার প্রতি আমার ভালোবাসার কারণে। আসল কথা হলো, এর চেয়ে বেশি সুখী হওয়ার কথা, তখন আমি ভাবতেই পারতাম না। একদম ছোটবেলা থেকেই আমি ভ্রমণ করছি। বার্মায় আমার ছেলেবেলা কাটানোর পর আমি ঢাকায় ফিরে আসি। ফিরে আসার অল্পকিছুদিন পরই বেশ তাড়াহুড়ো করে ঢাকার স্কুল থেকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হতে হয়। শান্তিনিকেতন ছিল আবাসিক স্কুল। দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় নতুন ধরনের নীরিক্ষাধর্মী বিদ্যাপীঠ শান্তিনিকেতন গড়ে তোলেন। আমার পারিবারিক জীবন ও আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাঁর প্রভাব আমার ওপর কতখানি তার প্রমাণ হিসেবে আমি বলতে পারি—এই গ্রন্থটির শিরোনামটিই আমি নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস "ঘরে-বাইরে" ("দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড") থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে চিত্তাকর্ষক ১০ বছরের স্কুলপাঠ শেষে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম আমার কলেজ জীবন শুরু করতে। কলেজে আমি বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী ও মেধাদীপ্ত সহপাঠী পেলাম। কলেজের আনুষ্ঠানিক বিদ্যার পরিপূরক হিসেবে কলেজ ভবনের খুব কাছেই বিখ্যাত কফি হাউজ পেয়ে যাই। কফি হাউজের আড্ডা ছিল সমৃদ্ধ আলোচনা ও তর্কবিতর্কে ভরপুর। এবং অবশ্যই সে সময়টি ছিল উত্তেজনাময়। এরপর সেখান থেকে আমি যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাই। আবারও জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু এবার কলকাতা থেকে নয়; বোম্বে সমুদ্রবন্দর থেকে সোজা লন্ডন যাত্রা। ভ্রমণের পুরোটাই ছিল উত্তেজনায় ঠাসা। আমি ভর্তি হই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে। ট্রিনিটি কলেজ ও কেমব্রিজ উভয়েরই সমৃদ্ধ ইতিহাস আমাকে এর ভেতরে টেনে নিয়ে গেছে।

এরপর আমার সুযোগ আসে আটলান্টিকের অপর পাড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরের জন্যে পড়ানোর। এই এক বছরে আমি বোস্টনের কেমব্রিজের ম্যাসাচুসেস্টস ইনস্টিটিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) ও ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। বছর শেষে ভারতে ফেরার আগে আমি বিভিন্ন জায়গায় আমার শেকড় রাখার চেষ্টা করেছি। যেমন পাকিস্তানের লাহোর ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি কাজ করেছি। ভারতে ফিরে এসে আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। এখানে পড়ানোর সময় আমি অর্থশাস্ত্র, দর্শন, গেম থিওরি, গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা এবং তুলনামূলকভাবে কিছুটা নতুন বিষয়—সামাজিক চয়ন তত্ত্ব কোর্স দিই। তরুণ শিক্ষক হিসেবে সুখী দিন অতিবাহিত করার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনের প্রারম্ভিক তিন দশক সমাপ্ত হয়। আমার প্রত্যাশা ছিল জীবনের পরবর্তী পর্বগুলো হবে নতুন অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এবং আরও পরিণত পর্যায়ে জীবনকে নিয়ে যাওয়ার অধ্যায়।

দিল্লিতে থিতু হওয়ার পর আমি আমার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর সময় পাই। আমার নিজের জীবনকে তখন নানা ধরনের অভিজ্ঞতায় ভরপুর মনে হয়। আমি তখন বুঝতে পারি যে, পৃথিবীর সভ্যতা ব্যাখ্যায় দুটি ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি ধারার দৃষ্টিভঙ্গি হলো 'খণ্ডিত'। এই দৃষ্টিকোণটির আওতায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তার প্রকাশভঙ্গিগুলো আলাদা আলাদা সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধারার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার অংশগুলোর মধ্যে প্রতিকূল সম্পর্ক দেখানো হয়। বর্তমান সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশ প্রচলিত, যেটি 'সভ্যতার সংঘাত' নামে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আর অন্য ধারাটি হলো 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণের আগ্রহ হলো বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গিগুলো চূড়ান্তভাবে একটি সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা। এটিকে বিশ্বসভ্যতা নাম দেওয়া যায়। এই বিশ্বসভ্যতার গাছটি সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র মানবজাতির পরস্পরসম্পর্কিত আন্তজীবন যাপনের মাধ্যমে—বিভিন্ন জায়গায় সে তার শেকড় ও শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় ফুল ফুটিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই, আমার এ গ্রন্থটি যদিও সভ্যতার প্রকৃতির যুক্তিসিদ্ধ অনুসন্ধানে নিবেদিত নয়, কিন্তু পাঠক হিসেবে আপনি দেখবেন যে, পৃথিবীর যা-কিছু অবদান তার ব্যাখ্যায় খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বরং সভ্যতার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমার সহমর্মিতা রয়েছে।

মধ্যযুগের ক্রুসেড থেকে শুরু করে বিগত শতকের নাৎসিদের আক্রমণ, ধর্মীয় রাজনীতির যুদ্ধ-বৈরীতার অবস্থা থেকে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা ও দাঙ্গার সৃষ্টি, বিভিন্ন ধরনের গোঁড়া মতের গোষ্ঠীগুলোর ভেতর রেষারেষি ও ঝগড়া— এসব হিংসা ও সংঘাত থাকা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিশালী ধারাও বহমান ছিল। আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ করি, তবে বুঝতে পারব—একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে কীভাবে জ্ঞান সঞ্চারিত হয় এবং এক দেশ থেকে অন্য আরেকটি দেশে বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। সভ্যতার এই পারস্পরিক বিনিময়ের পথ ধরে হাঁটতে থাকলে আমরা দেখব যে, বৃহত্তর ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির কাহিনীগুলো আমরা কিছুতেই এড়াতে পারছি না। পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে আমাদের সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার গুরুত্বকে কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না।

চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষ হলো গঠনমূলক অভিজ্ঞতার বিশাল এক ভান্ডার। এক হাজার বছর আগে, প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে এবং ১১ শতকের প্রথম দিকে ইরানী গণিতজ্ঞ আল-বেরুনি বেশ কিছু বছর ভারতে ছিলেন। আল-বেরুনির সুলিখিত "তারিখ আল-হিন্দ" গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেন যে,

পরস্পরের কাছ থেকে শেখার বিষয়টি সমৃদ্ধ জ্ঞান ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে কতটা সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। তিনি ভারতে থেকেই গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে চমৎকার সব অবদান রেখে গেছেন। সেটি কম দিনের কথা নয়, আজ থেকে প্রায় এক সহস্রাব্দ বছর আগেই তিনি দেখিয়েছেন যে, পারস্পরিক বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে কীভাবে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলা যায়। ভারতীয়দের প্রতি আল-বেরুনির ভালোবাসা ভারতীয় গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ একদিকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছে, ঠিক তেমনই এটাই ভারতীয় এসব শাস্ত্রে তাঁর নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ। যা হোক, অবশ্য তাঁর এই মুগ্ধতা ভারতীয় বিদ্যাশাস্ত্র নিয়ে খানিকটা ঠাট্টায় বাধা হতে পারেনি। বেরুনির মতে, ভারতীয় গণিতশাস্ত্র অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের অধিকাংশের ভেতরই কিছুটা ভিন্ন অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। তাঁরা অসাধারণ বাক্‌পটু—এমনকি কোনো বিষয় সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলেও তাঁরা সে বিষয়ে অনর্গল আলাপ চালিয়ে যেতে সক্ষম!

আমার মধ্যে সেই গুণাগুণ যদি থেকে থাকে, তবে কি আমার তাতে গর্বিত হওয়া উচিত? আমি ঠিক জানি না।তবে আমার মনে হয়, আমি যা জানি তা দিয়েই আমার নিজের কথা শুরু হতে পারে। আমার এই আত্মজীবনীটি এই জানার চেষ্টারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াশ; কিংবা ন্যূনতম আমার জীবনে যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে—সেগুলোই এখানে আমি বলবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য তাতে এটি বলা যায় না যে, আমি আসলেই সেসব বিষয় সম্পর্কে খুব জানি।

ঢাকা ও মান্দালয়

“কোন বাড়িটিকে আপনার নিজের ঘর বলে মনে করেন?” আমার দিকে এই প্রশ্নটি করলেন লন্ডনের বিবিসির কার্যালয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী। আমরা দুজনেই সে সময়ে আমাদের একটি আলাপচারিতা ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তিনি আমার একধরনের জীবনচরিত জানার জন্য এই প্রশ্নটি ছুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, ‘এই কিছুদিন আগে আপনিযুক্তরাষ্ট্রের কেমব্রিজের হার্ভার্ড থেকে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজে ফিরলেন। অর্থাৎ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ফিরে এলেন। আপনি যুক্তরাজ্যে কয়েক দশক ধরে বসবাস করলেও আপনার নাগরিকত্ব ভারতীয়। আমি অনুমান করি, আপনার পাসপোর্টটি ভিসায় একেবারে ভরে গেছে। সুতরাং বলুন তো মশাই আসলে আপনার ঘর কোনটি?” ঘটনাটি ১৯৯৮ সালের। আমি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ (মাস্টার) হিসেবে মাত্রই ফিরে এসেছি। আমার এই যোগদানই এই সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ তৈরি করেছে। তার প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, ‘এই মুহূর্তে এ জায়গাটিকেই আমার আরামদায়ক ঘর মনে হচ্ছে।’ কেন এ রকমটি আমি মনে করছি, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তরাজের সঙ্গে আমার অতীত সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে তাকে ব্যাখ্যা করলাম। আমি তাকে বললাম, দেখুন, আমি মাত্র ১৯ বছর বয়সে (যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের) ট্রিনিটি কলেজে অনার্সের ছাত্র হিসেবে পড়তে আসি। এরপর একজন গবেষক ছাত্র হিসেবে, পরে ফেলো গবেষক পদে এবং আরও পরে এই কলেজেই শিক্ষক হিসেবে পড়াতে শুরু করি। এ কথার সঙ্গে আমি আরও যোগ করি—কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুকাল আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন অঙ্গরাজ্যে কেমব্রিজ শহরের হার্ভার্ড স্কয়ারের কাছে আমার যে পুরোনো বাড়ি রয়েছে, সেটিও আমার কাছে একইরকম আরামদায়ক ঘর মনে হয়। শুধু তা-ই নয়, ভারতেও আমার থাকতে খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে আমাদের যে ছোট্ট বাড়িটি রয়েছে, শৈশবে যেখান আমি বড় হয়েছি এবং এখনো আমি বছরের একটি অংশ সেই বাড়িতে কাটাতে ভালোবাসি।

আমার এমন অপ্রচলিত জবাব শুনে বিবিসির লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যে, 'তাহলে তো বাড়ির অর্থ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই দেখছি!' তার কথার প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'আমার একাধিক আরামদায়ক ঘর রয়েছে; কিন্তু ঘর বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেবল একটি ঘরই থাকতে হবে আপনার এমন ধারণা আমি সহভাগ করে নিতে পারছি না।' বিবিসির লোকটির কাছে আমার উত্তরটি মনঃপূত হলো না।

ঘরের ধারণা নিয়ে কাছাকাছি ধরনের ধাক্কা খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আরও হয়েছে। বিশেষ করে, ব্যক্তিপরিচিতির সঙ্গে যারা একটি সুনির্দিষ্ট স্থানের সম্পর্কের ভাবনাটি অনমনীয়ভাবে মাথায় রেখে চলেন, তাদের সঙ্গে আমার এধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমার কথায় তৃপ্তি না পেয়ে, তারা আমায় জিজ্ঞেস করে, 'আমার প্রিয় খাবার কোনটা?' আমার দিক থেকে এরও উত্তর একটি নয়, একাধিক। আমার পছন্দের খাবারগুলোর মধ্যে আমি প্রথমেই বেছে নেব *ত্যাগলিওনি কন ভনগলে* অথবা *শেজওয়ান হাঁস*, এবং অবশ্যই আমার প্রিয় ইলিশ মাছ বেছে নেব। তবে ইলিশটি যদি ঝোল করে রান্না হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। প্রিয় খাবার সম্পর্কে এটুকু বলেই আমি থেমে যেতে পারি না। আমার পছন্দের ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতে যোগ করি যে, তবে ইলিশটি কিন্তু রান্না হতে হবে ঢাকাইয়া (পুরান ঢাকার) রীতিতে সর্ষে বাটা দিয়ে। আমার এমন জবাব শুনে প্রশ্নকর্তার খটকা কাটে না। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বুঝলাম, কিন্তু এগুলোর মধ্যে আসলেই কোনটি আপনার সত্যি সত্যিই প্রিয় খাবার?' তার প্রশ্ন শুনে মনে হলো, আমার উত্তরটি প্রশ্নকর্তাকে তৃপ্ত করতে পারেনি।

এমন প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমি তাকে বলি যে, 'এগুলো সবই আমার অত্যন্ত প্রিয় খাবার, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনো একটিমাত্র খাবারকে আমি বেছে নিয়ে বাকিগুলো বাদ দিতে পারছি না।' প্রায়ই আমার কথোপকথনের সঙ্গী তার সহজ প্রশ্নের এমন উত্তর প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। যা হোক, সৌভাগ্যবশত কখনো কখনো আমার প্রিয় খাবারের আলোচনা শুনে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও 'ঘরে'র প্রশ্নের মতো জরুরি বিষয়ে কারও মধ্যেই আমি এতটুকু ভাবান্তর দেখিনি। তারা বলতে চান যে, 'বুঝলাম, কিন্তু সত্যি সত্যিই আপনার একটি নির্দিষ্ট ঘর থাকার কথা, যেখানে আপনি প্রশান্তি অনুভব করেন, সেটি কোনটি?'

দুই.

বসবাসের ক্ষেত্রে মানুষ কেন একটিমাত্র জায়গা নিয়েই আগ্রহী হয়? এমনও হতে পারে যে, আমি বিনা বাধায় একাধিক স্থানে সমান আরামবোধ করি। সনাতন বাঙালি সংস্কৃতিতে 'আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?' এ প্রশ্নটির সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, যেটি আবার ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষদের বোধ থেকে বেশ আলাদা। বাংলা ভাষায় 'ঘর' কিংবা 'বাটি' শব্দটি দিয়ে বোঝায় যে, আপনার পরিবার (পূর্বপুরুষ) কোন স্থান থেকে আগত। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান কোথায় ছিল? যদিও সেই মানুষটি বা তার নিকটপ্রজন্ম সেখানে আর থাকেন না। তারা বর্তমানে অন্যত্র বসবাস করছেন। বংশসূত্রের সঙ্গে বিশেষ স্থানের সম্পর্ক শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী অন্য জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় কথপোকথনে অনেক সময় ঘরের এই স্থানভিত্তিক অর্থ কিছুটা বদলে যায়। একারণে ভারতীয়-ইংরেজি ভাষায় কথাটি এভাবে চলে আসে: 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' হতে পারে আপনি এখন যে 'ঘরে' বসবাস করছেন, সেটি আপনার পূর্বপুরুষের প্রাণপ্রিয় জন্মস্থান থেকে বহুদূরে।

আমার জন্মের সময়, আমার পরিবার ঢাকা শহরের বাসিন্দা হলেও আমার জন্ম কিন্তু ঢাকায় নয়। ১৯৩৩ সালের শরৎ কালের শেষ দিকে আমার জন্ম। পরে আমি জেনেছি, সেই সময়টায় ইউরোপে মহামন্দার কারণে প্রচুর মানুষের জীবন ও বসতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। কমপক্ষে ৬০ হাজার লেখক, কারিগর, বিজ্ঞানী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী জার্মানি থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকাতে অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়। অল্প কিছুসংখ্যক অভিবাসী, মূলত ইহুদীরা সেখান থেকে ভারতে চলে আসে। আজকের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিশাল ব্যাপ্তি, প্রাণচাঞ্চল্য এবং কিছুটা অবাক বিস্ময়ের শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে, তখনকার ঢাকা ছিল অনেকটা কোলাহলমুক্ত, শান্ত ও ছোট্ট শহর, যেখানে মানুষের জীবন সহমর্মিতার বোধ নিয়ে ধীরলয়ে এগিয়ে চলত। আমরা থাকতাম ঐতিহাসিক পুরান ঢাকার ওয়ারীতে। ওয়ারী এলাকাটি ছিল রমনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটি বেশি দূরে নয়। আমার বাবা আশুতোষ সেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগে পড়াতেন। আমি অবশ্য পুরান ঢাকার কথাই বলছি, কিন্তু বর্তমানের আধুনিক ঢাকা সেখান থেকে ১০ মাইলেরও বেশি বিস্তৃত হয়েছে।

আমার পিতামাতা ঢাকায় থাকতে ভালোবাসতেন। অতএব আমি ও আমার ছোটবোন মঞ্জুও (ভালো নাম সুপূর্ণা) ঢাকাকে ভালোবাসতাম। মঞ্জু বয়সে আমার থেকে চার বছরের ছোট। আমাদের পুরান ঢাকার বাড়িটি তৈরি করেন আমার দাদা সারদা প্রসাদ সেন। তিনি ঢাকা কোর্টে বিচারক ছিলেন। আমার দাদার বড় সন্তান ছিলেন জিতেন্দ্র প্রসাদ সেন। তিনি আমার বাবার থেকে বয়সে বড়। বড় চাচা জিতেন্দ্র প্রসাদ সেন কাদাচিৎ ঢাকায় থাকতেন। কারণ, সরকারি চাকরিসূত্রে বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বদলি হওয়াতে তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হতো। কিন্তু ছুটিতে যখন বড় চাচা আমাদের পুরান ঢাকার যৌথপরিবারের বাড়িতে ফিরতেন, সেই সময়টি ছিল আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত। বিশেষ করে আমার বড় চাচার মেয়ে মীরাদিদির কথা বলতে হবে। বয়সে সে ছিল আমার সমান। আমার আরও চাচাতো ভাইবোন ছিল, যারা ঢাকাতেই থাকত। যেমন চিনিকাকা, ছোটকাকা, মেজ দাদা, বাবুয়া এবং আরও কিছু আত্মীয়। পরিবারের সবার আদর-ভালোবাসা পেয়ে আমি আর মঞ্জু কিছুটা বখেই গিয়েছিলাম বলতে হবে।

আমার অভিবাসী বড় চাচার জ্যেষ্ঠ সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত এবং ঢাকায় আমাদের সঙ্গেই থাকত। তার নাম ছিল বসু, কিন্তু আমি তাকে দাদামণি বলতাম। আমার কাছে সে ছিল প্রজ্ঞার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। তার সঙ্গটি ছিল আমার কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য ও আনন্দের। তিনি ছোটদের সিনেমা দেখাতে ভালোবাসতেন। আমার মনে পড়ে, তার সঙ্গেই আমি অসাধারণ সব সিনেমা দেখেছিলাম। তার উদ্যোগের কারণেই আমি বুঝতে পারি আমার চেনাজানা জগতের বাইরের এক 'বাস্তব পৃথিবী', যা আমার কাছে ধরা পড়েছিল "দ্য থিফ অব বাগদাদ"-এর মতো সিনেমা দেখে।

ছোটবেলার স্মৃতিগুলোর মধ্যে খুব মনে পড়ে আমার বাবার কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগের পরীক্ষাগারের কথা। সেই পরীক্ষাগারে আমি প্রচণ্ড উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ করতাম যে ল্যাবের একটি পরীক্ষায় একধরনের তরল পদার্থ টেস্টটিউবের মধ্যে অন্য দ্রবণের মধ্যে ঢালার ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ নতুন একটি যৌগের সৃষ্টি হচ্ছে। ল্যাবে আমার বাবার একজন সহকারী ছিলেন, যার নাম ছিল করিম। তিনিই আমাকে এসব অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষণগুলো দেখাতেন। এসব দেখে আমি ভাবতাম, তার করা পরীক্ষণগুলো সবসময়ই বোধহয় এমন চমৎকার ফলাফল উপহার দেবে।

আমার জীবনে এমন সুখস্মৃতির কাল আবার ফিরে আসে ১২ বছর বয়সে। বাংলা ভাষার আদি উৎস সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করতে পারা আমার জন্য অত্যন্ত গৌরবের। কিন্তু যখন আমি প্রথমবারের মতো সংস্কৃত পড়তে শুরু করি, তখন ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। ভারতে বস্তুবাদী ভাবনার ভিত্তি ছিল লোকায়ত দর্শন। আর এই লোকায়ত দর্শনের ভিত্তিতেই সংস্কৃত ভাষার প্রাণরসায়ন তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। ভারতে লোকায়ত দর্শন গড়ে ওঠে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সেখানে বলা হয় যে, 'দৃশ্যমান এসব পদার্থগুলো যখন নির্দিষ্ট অবয়বে রূপান্তরিত হবে, তখনই বুদ্ধিবৃত্তির জন্ম হবে। কারণ, বুদ্ধিসৃষ্টির উৎস হিসেবে বস্তুগুলোর মিশ্রণে এসবের ভেতরকার উপাদানগুলো নতুন ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দীপনায় বের হয়ে আসে। আর যদি উপাদানগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যাবে।' এই উদ্ধৃতিটি পড়ে তখন আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল; কারণ, আমি আমার জীবনে রসায়নের চেয়েও বেশি কিছু আশা করেছিলাম। আরও অনেক পরে—আমার বেড়ে ওঠার পর, জীবনসম্পর্কিত নানা তত্ত্ব জানার পর—আমার ছেলেবেলার সেই স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন পরীক্ষাগার এবং করিমের সেই স্নেহময় প্রদর্শনী আমার জীবনে আবার ভূতুড়েভাবে ফিরে এলেও সেটি ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

আমি জানতাম আমি ঢাকারই ছেলে। কিন্তু অন্যসব শহুরে ছেলেমেয়ের মতোই আমিও আসলে গ্রামের বাড়ি থেকেই ঢাকা শহরে এসে উঠেছি 'মত্ত' নামের ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে। এটি মানিকগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। ঢাকা শহর থেকে মানিকগঞ্জ কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু আমার ছেলেবেলায় সেখানে যেতে প্রায় আস্ত একটা দিন লেগে যেত। সেখানে যাওয়ার বেশিরভাগ পথই পাড়ি দিতে হতো বিভিন্ন নদ-নদীর সর্পিল পথ ধরে, নৌকায় করে। এখনকার সময়ে ঢাকা থেকে মত্ততে যেতে লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আর যেতেও তেমন কষ্ট নেই। কারণ, সেখানে ভালো মানের প্রশস্ত রাস্তা হয়েছে। সেই সময়ে আমরা বছরে একবার দাদাবাড়ি যেতাম, তাও মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য। সেখানে যাওয়ার ফলে আমি মনে খুব প্রশান্তি অনুভব করতাম। তখন মনে হতো, আমি আমার ঘরে ফিরে এসেছি। মত্ত গ্রামে আমার খেলার সাথী আরও যেসব ছেলেমেয়ে ছিল, তারাও দূর-দূরান্তের কোনো না কোনো শহর থেকে নানা উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে আসত। সেসময়ে তাদের সঙ্গে আমার ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যদিও সে সম্পর্কগুলো ছিল ক্ষণকালের। শহরে ফেরার সময় হলে প্রতিবছরই তাদের মন খারাপ করে বিদায় জানাতে হতো।

তিন.

আমাদের পুরান ঢাকার বাড়িটির নাম ছিল 'জগৎ কুটির'। জগৎ কুটির বলতে বোঝায় 'পৃথিবীর ঘর'। বাড়ির এমন নামকরণের পেছনে আমার দাদার জাতীয়তাবাদের প্রতি তার কিছুটা সংশয়ী মনের প্রকাশ রয়েছে। যদিও আমাদের পরিবার ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে কিছু সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীর জন্ম দিয়েছে (এবিষয়ে আমি পরে বিস্তারিত বলব)। কিন্তু বাড়ির নামকরণের পেছনে আরও একটি অনুভব কাজ করেছে। আমার দাদার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী অর্থাৎ আমার প্রয়াত দাদির নাম ছিল জগৎলক্ষ্মী (এটি সংস্কৃত ভাষারও শব্দ)। সুতরাং জগৎ কুটিরের অর্থ দাঁড়ায় আমার দাদি জগৎ-এর কুটির বা ঘর। আমি তাকে কখনো দেখিনি। কারণ, আমার জন্মের অনেক আগেই তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু আমার দাদি জগৎলক্ষ্মীর শূন্যতায়ও তাঁর সত্তার বিশেষ উপস্থিতি আমাদের আবিষ্ট করে রাখত। কারণ, তিনি জীবনযাপনে যে প্রজ্ঞার চর্চা রেখে গিয়েছিলেন, সেটি আমাদের পরিবারের সব সদস্যের যাপিত জীবন বিপুলভাবে প্রভাবিত করত। এমনকি আমি এখনো মাঝেমধ্যে হেঁচকি উঠলে তাঁর শেখানো দাওয়াইটিই গ্রহণ করি। আমার

দাদির দাওয়াইটি খুব সোজা। এক গ্লাস ঠান্ডা জলে কয়েক চামচ চিনি মিশিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে দ্রবণটি খাওয়া। ঘটনাক্রমে যদি আপনার কখনো হেঁচকি ওঠে, তাহলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কিছুক্ষণ পর পর হিক্কার কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে সমস্যাটি থেকে আপনি খুব আরামেই বেরিয়ে আসতে পারবেন।

যদিও আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, কিন্তু তাঁর বাবা, মানে আমার দাদা সারদা প্রসাদ সেন ছিলেন আদালতের বিচারক। কিন্তু তাসত্ত্বেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়টির আইনি ও আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে। আমাদের বাড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজনের পদচারণে সবসময় মুখর থাকত। দাদার কাছে আসা এসব দর্শনার্থীর কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি, তারা কত দূরদূরান্ত থেকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিছু কিছু জায়গা অবশ্য তাদের কাছে বেশি দূর মনে হতো না। তখনকার সেসব স্থানের মধ্যে উপমহাদেশ ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা ছিল: কলকাতা ও দিল্লী তো ছিলই; এর সঙ্গে বোম্বে থেকেও মানষজন আসত, এমনকি হংকং ও কুয়ালালামপুর থেকেও লোকজন দেখা করতে দাদার কাছে আসত। কিন্তু আমার সেই ছেলেবেলার কল্পনায় এসব স্থানের সমষ্টিকেই আমি সমগ্র পৃথিবী বলে ভাবতাম। বাড়ির ছাদে সুগন্ধী চম্পা ফুলের গাছের ছায়ায় বসতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। সেখানে বসেই আমি অতিথিদের কাছ থেকে তাদের দূরের ভ্রমণের রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার গল্প উপভোগ করতাম এবং এসব শুনে আমি ভাবতাম যে এধরনের রোমঞ্চকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও আসবে।

আমার মায়ের নাম অমিতা। কিন্তু বিয়ের পর তার নামের শেষাংশ পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজনই পড়েনি। কারণ, আমার নানা ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শনে খুব নামকরা পণ্ডিত। আমার নানার নাম ছিল ক্ষিতিমোহন সেন। কিন্তু আমার বাবা-মা দুজনেরই বংশের নাম একই 'সেন' হওয়ায় আজও আমার নিজের নামের শেষাংশের পরিচিতির নির্দিষ্ট উৎস নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয় আমাকে। আমার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা– যারা নিরাপদ যোগাযোগে অভ্যস্ত, তারা যখন আমার বংশপরিচয়ের বিষয়টি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন বিশেষত আমার নানার বংশের পরিচিতি, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে আমি বলি, 'না, না, আমিআমার মায়ের মূল নাম এটাই।'

আমার নানা ক্ষিতিমোহন পড়াতেন শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে শান্তিনিকেতন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত। শান্তিনিকেতন এখন বিশ্বভারতী বিদ্যাপীঠের অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বভারতী নামের ভেতর বিশ্ব শব্দের অর্থ হলো সমগ্র বিশ্বকে অঙ্গীভূত করে বুঝবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। আর ভারতীয় শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এই বিদ্যাপীঠটি সমগ্র পৃথিবীকে একক সত্তা হিসেবে দেখার প্রজ্ঞা সৃষ্টি করবে। যদিও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটি শান্তিনিকেতনের মতো গুণী প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও উচ্চতর গবেষণায়ও এটি তার পরিধি বাড়িয়েছে, যার জন্য সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালে। এই প্রতিষ্ঠান গড়তে ক্ষিতিমোহন কেবল রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য-সহযোগিতার হাতই বাড়িয়ে দেননি, বরং বিদ্যাপীঠ হিসেবে বিশ্বভারতীর নিজস্ব বিদ্যাচর্চার আদল সৃষ্টিতেও তিনি অবদান রেখেছেন। কেবল ক্ষিতিমোহনের দ্বারাই সেটি সম্ভব হয়েছিল; কারণ, পণ্ডিত হিসেবে তাঁর নিজের খ্যাতি এবং বিভিন্ন ভাষায় তাঁর সুলিখিত গ্রন্থগুলো বেশ সমীহ জাগিয়েছিল। বহুভাষাবিদ ক্ষিতিমোহনের বইগুলোর মধ্যে যেমন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বই ছিল, ঠিক তেমনি বাংলা, হিন্দি ও গুজরাটি ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মায়ের পরিবারের সবারই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমার মা অমিতা ছিলেন একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী। মা নৃত্যে নতুন রীতি রপ্ত করেছিলেন। এই রীতিটি আবিষ্কারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল। বর্তমানে এই নৃত্যরীতিকে 'আধুনিক নৃত্যকলা' বলা হলেও সে সময়ের প্রেক্ষাপটে বড় বেশি আধুনিক মনে করা হতো। রবীন্দ্রনাথ রচিত নৃত্যনাটকগুলোর অনেকগুলোতেই মা প্রধান নারী নৃত্যশিল্পী হিসেবে কলকাতার প্রদর্শনীগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন। সে সময় অবশ্য 'সম্ভ্রান্ত ঘরের' মেয়েদের মঞ্চে ওঠা প্রচলিত ছিল না। আমার মা শান্তিনিকেতনে থাকতে জুডোও শিখেছিলেন, যেটি তখনকার সময়ের মেয়েদের মধ্যে শেখার চল ছিল না। নারী শিক্ষার্থীদের বিকাশে অবারিত এ চর্চার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে আমাদের এমন একটি ধারণা দেয়, যা আজ থেকে ১০০ বছর আগেই তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

আমি জেনেছিলাম যে আমার বাবা-মায়ের বিয়ের যখন কথাবার্তা চলছিল, তখন আব্বা আমার মা সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা রাখতেন। আব্বার এমন বোধের কারণ হলো, আমার মা অমিতা মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথম নারী, যিনি মঞ্চে নৃত্যশিল্পী হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদাবান ও সমৃদ্ধ নৃত্যনাট্যে নাচের পারফরমেন্স শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেন। আম্মার সেসব অনুষ্ঠানের খবর সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত হলে,তার পেপার কাটিং আব্বা সংরক্ষণ করতেন। আম্মার সেসব চমৎকার শৈল্পিক উপস্থাপনা নিয়ে কাগজগুলোর উচ্চ প্রশংসার অংশগুলো যেমন আব্বা আনন্দচিত্তে সংরক্ষণ করতেন, আবার ঠিক তেমনি জনসমক্ষে মেয়েদের নাচের বিষয়ে অপ্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের সমালোচনার পেপার কাটিংও কেটে রাখতেন। নৃত্যশিল্পী হিসেবে অমিতার শৈল্পিক দক্ষতা ছাড়াও আব্বাদের পরিবার থেকে যখন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন আম্মা নিজেই খুব দ্রুত ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল প্রথা ভাঙার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। যদিও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই তাদের বিয়ে হয়েছিল, তবু এবিষয়টি নিয়ে বিয়ের অনেক পরেও তারা আলাপে মজে উঠতেন ও খুব আনন্দ পেতেন। ঘরের বাইরে দুজনে একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে আলাপচারিতা ছিল তাদের কথপোকথনের প্রিয় একটি বিষয়। সে কথা শুনে আমি উপলব্ধি করতাম, তাদের মধ্যে বোধ হয় 'বিয়েসংক্রান্ত কথাবার্তা'র সূচনাতেই একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল! আমার আব্বার মতে, পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলো কিন্তু আমার আম্মার নৃত্যের পরিবেশনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হতো, যদিও আম্মার করা সেই নাটকগুলো রবীন্দ্রনাথেরই রচিত ও নির্দেশিত ছিল।

আমার যখন জন্ম হয়, আমার মাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে শিশুর নামের ক্ষেত্রে অতি-ব্যবহারে জীর্ণ নামগুলোর পুনরাবৃত্তি বেশ একঘেয়ে বিষয়। এই বলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমার জন্য একটি সুন্দর নতুন নাম প্রস্তাব করেন। আমাকে দেওয়া সেই নাম হলো—অমর্ত্য। সংস্কৃত ভাষায় 'অমর্ত্য' অর্থ হলো'অমর'। সংস্কৃত ভাষায় এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো'মর্ত্য'। 'মর্ত্য' শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো'মৃত্যু'। অর্থাৎ 'মর্ত্য' মানে, আমাদের এই পৃথিবী, যেখানে মানুষ মরে যায়। কিন্তু অমর্ত্য হলো এমন মানুষ যে মরবে না, যে স্বর্গ থেকে আগত। আমার নামের এই কঠিন অর্থ বহু লোকজনকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়। ফলে লোকদের বোঝানোর এই কষ্টসাধ্য কাজটি এড়ানোর জন্য আমি এর গূঢ় অর্থে না গিয়ে, কথাবার্তার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে এর অর্থটি বলে চালিয়ে দিই। তাদের বলি—'অমর্ত্য' শব্দের মানে হলো'অলৌকিক'।

বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি পুরোনো রীতি হলো প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হয় মায়ের পৈত্রিক বাড়িতে। অর্থাৎ সন্তানের নানাবাড়িতে। মেয়েদের বিয়ে হওয়ার পর নতুন যে বাড়ি, সেখানে প্রথম সন্তান জন্ম নেওয়ার রীতি নেই এই অঞ্চলে। আমার মনে হয় এই রীতিটির মূলে রয়েছে মেয়ের বাবা-মায়ের পরিবারের

সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে সংশয়ী মনোভাব থেকে রীতিটি উদ্ভূত। কারণ, গর্ভাবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের মানসিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে মেয়ের পরিবারের উদ্বেগ রয়েই যায়। এই রীতি অনুসরণ করেই আমার মা ঢাকা থেকে শান্তিনিকেতনে আমার নানাবাড়িতে চলে আসেন, যেখানে আমি জন্মাই। আমি জন্ম নেওয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে ঢাকায় ফেরেন।

বাংলা ভাষায় শান্তিনিকেতন মানে হলো 'শান্তির বাসস্থান।' ফলে শান্তিনিকেতনও আমাকে ঢাকার বাড়ির মতোই আরেকটি ঠিকানা দিল। শুরুতে শান্তিনিকেতনের বাড়িটি শান্তিনিকেতন বিদ্যাপীঠ থেকে আমার নানাকে থাকার জন্য দেওয়া হয়। এটি দেখতে একটি সাধারণ দোচালা ছনের কুটিরের মতো হলেও এর মধ্যেও আভিজাত্য প্রকাশ পেত। আমার নানাবাড়িটি ছিল শান্তিনিকেতনের এমন একটি অংশে, যেদিকটিকে বলা হতো 'গুরুপল্লী', অর্থাৎ শিক্ষকদের বসবাসের গ্রাম। এরপর আমার বাবা-মা ১৯৪১ সালে শান্তিনিকেতনের অন্য প্রান্ত যাকে 'শ্রীপল্লী' বলা হয়, সেখানে ছোট্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করেন তাদের নিজেদের বসবাসের জন্য। বাবা-মা নতুন এই বাড়িটির নাম দেন 'প্রতীচী'। সংস্কৃত ভাষায় 'প্রতীচী' শব্দের অর্থ হলো'পশ্চিমের শেষ সীমা'। পরবর্তী সময়ে আমাদের এই নতুন বাড়িটির খুব কাছেই আমার নানা তাদের থাকার জন্য নতুন একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। নানার এই নতুন বাড়িটি নির্মাণের পেছনে কারণ ছিল তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজটি ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। আর শিক্ষকতার কাজটি ছেড়ে দিলে কোনো না কোনো পর্যায়ে তাঁকে শিক্ষকদের নিবাস গুরুপল্লীর বাড়িটি আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে, এমন ভাবনা থেকেই তিনি এই নতুন বাড়িটি নির্মাণ করেন।

আমি আমার নানির খুব আদরের ছিলাম। আমার নানির নাম কীরণবালা। তাঁকে আমি 'দিদিমা' বলতাম। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী মৃৎশিল্পী। মাটির বিভিন্ন পাত্রে তাঁর আঁকা শিল্পকর্মগুলো তাঁর সমৃদ্ধ মেধার পরিচয় বহন করত। এ ছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ একজন ধাত্রী। সে সময়ের আধুনিক চিকিৎসাপূর্ব শান্তিনিকেতনে যত শিশু জন্ম নিত, তার সবই তাঁর হাতেই জন্মাত। এমনকি তাঁর নিজের সব নাতিপুতির জন্ম তাঁর নিজের হাতেই হয়েছে। বহু বছর ধরে ধাত্রীর কাজ করতে গিয়ে তিনি মাতৃপ্রসবজনিত বিদ্যার বিশাল এক ভান্ডার অর্জন করেছিলেন। আমার দিদিমার কথাগুলো খুব স্পষ্টই আমার মনে গেঁথে আছে। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করছিলেন, প্রসূতির জীবনের নিরাপত্তায় জীবাণুমুক্ত সামগ্রীর ব্যবহার বাঁচা-মরার মতো চরম বাস্তবতার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এর থেকে আরও যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো—জীবাণুমুক্ততার বিষয়ে জ্ঞানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ এন্টিসেপটিক বা জীবাণুমুক্ত সামগ্রীর ব্যবহারের কথা তিনি জোর দিয়ে বলতেন। এন্টিসেপ্টিকের পর্যাপ্ত পরিমাণ বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ পরিস্থিতিতে কতটা পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে, তা তিনি শিখেছিলেন নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে। অথচ সেই সময়ে শান্তিনিকেতনের বাড়িঘরে যেসব শিশু ভূমিষ্ঠ হতো, তাদের বাড়ির লোকেরা এ বিষয়টির প্রতি প্রায়শই অবহেলা করত। আমি তাঁর কাছ থেকে নতুন অনেক কিছুই শিখেছিলাম। কিন্তু ভারতে শিশু জন্মের ক্ষেত্রে প্রসূতি মা ও জন্মের সময় শিশুমৃত্যুর উচ্চহার খুব সহজেই এড়ানো যেত, যা খুব সাধারণ কিছু সতর্কতাকে অবহেলার কারণেই ঘটে। পরবর্তী সময়ে আমার কর্মজীবনে, প্রসূতিমৃত্যু ও প্রসবের সময় শিশুমৃত্যুর হার নিয়ে আমি গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, আমার দিদিমার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপচারিতায় দিদিমা যে কথাগুলো বলতেন সেগুলোই সত্য। সেই সময়ে দিদিমা রান্নাঘরে বেতের মোড়ায় বসে কাজ করতেন আর গল্প করতেন, আর আমি তাঁর পাশে বসে সেগুলো শুনতাম। ফলে দিদিমার প্রতিটি কাজের পেছনে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

চার.

ছেলেবেলা থেকেই আমার দেখা ছোট্ট দুটি শহর—ঢাকা ও শান্তিনিকেতনকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার জীবনের সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতিগুলো এই শহর দুটোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। আমার জীবনের প্রথম স্মৃতিগুলো বার্মাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। কারণ, আমার বয়স তিন বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র অল্প কয়েক দিন আগে আমার বাবা-মা বার্মায় চলে আসেন। সেখানে আমরা যাই ১৯৩৬ সালে এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। এর কারণ ছিল আমার বাবা তিন বছরের জন্য তাঁর নতুন কর্মস্থল বার্মায় ছিলেন। আব্বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটিতে তিন বছরের জন্য 'মান্দালয় কৃষি কলেজ'-এ অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পড়াতে যান। আমি ভ্রমণের ব্যাপারে রোমাঞ্চ অনুভব করলেও প্রিয় দিদিমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার জন্য সহজ ছিল না। বিদায়ের মুহূর্তটি কেমন ছিল সেটি আমার মনে নেই। তবে পরে আমি শুনেছিলাম, কলকাতা থেকে রেঙ্গুনের উদ্দেশে জাহাজটি যখন ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন বন্দরে বিদায় জানাতে আসা আমার দিদিমার অবয়বটি ক্রমে ম্লান ও ধীরে ধীরে ছোট হয়ে সরে যাচ্ছিল বলে আমি তীব্রভাবে বিশাল জাহাজটিকে থামানোর জন্য জোরে জোরে চীৎকার করছিলাম। সুখের কথা হলো, দিদিমার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ অনন্তকালের জন্য ছিল না। প্রতি বছরই আমরা ঢাকা ও শান্তিনিকেতনে ছুটিতে ফিরে আসতাম। আমার মতোই আমার বোনেরও জন্ম যথারীতিতে শান্তিনিকেতনের নানা বাড়িতে। কিন্তু বার্মায় আমার মতো তাকে তিন বছর কাটাতে হয়নি। সে তার জীবনের প্রথম দেড় বছর বার্মার কাটানোর সুযোগ পেয়েছে। ১৯৩৯ সালে পুরোনো ঢাকার ওয়ারীর শান্ত-সুন্দর বাড়িটিতে আমরা ফিরে আসি। আর তখন থেকেই শান্তিনিকেতনের নানা বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়ার যোগাযোগটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বার্মায় থাকার সময়টি যখন ফুরিয়ে আসছিল, তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ছয় বছর। এই বয়স থেকেই আমার জীবনের ঘটনাগুলোর স্মৃতি আমার করোটিতে জমতে থাকে। মান্দালয়ে থাকতে আমি বেশ সুখে ছিলাম। সেখানকার নানা ধরনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার খুব স্পষ্টই মনে আছে। বিশেষ করে বার্মিজ উৎসবগুলো ছিল খুবই দারুণ। বাজারগুলো ছিল বেশ মুখরিত। মজার মজার অনেক খেলা ও খেলনায় বাজার ভরা থাকত। বার্মায় আমরা যে বাড়িটিতে ছিলাম সেটি ছিল কাঠের তৈরি। বাড়িটির অঙ্গসজ্জা ছিল মান্দালয়ের সনাতনী ধারার। কিন্তু আমার চোখে বাড়িটির সৌন্দর্যের কোনো শেষ ছিল না। এই বাড়িটিতে থাকতে আমি ভীষণ উপভোগ করতাম। নতুন কিছুর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল তীব্র, বিশেষ করে মনকাড়া উজ্জ্বল রঙের প্রতি। যখনই আমি আব্বা-আম্মার হাত ধরে কিংবা আমাদের বাসার আয়ার সঙ্গে বাইরে যেতাম, তখন যা-কিছুই চোখে পড়ত সেগুলোর প্রায় সবকিছুরই বার্মিজ ভাষ্য জেনে নিতাম।

বাবা-মায়ের সঙ্গে বার্মার নতুন নতুন জায়গা ভ্রমণ আমার জন্য ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সেসব দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রেঙ্গুন তো বটেই, এছাড়াও বার্মার বিভিন্ন জায়গা যেমন পেগু, পাগান এমনকি এগুলো থেকে অনেক দূরের ভামোও ছিল। সেসব জায়গায় পৌঁছে আমি উপলব্ধি করতাম যে এসব জায়গার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। বড় বড় সব বিল্ডিং ও প্যাগোডা ছিল রাজকীয় প্রাসাদের মতো দেখতে। কতগুলো স্থাপনাকে আমি আস্ত একখানা রাজপ্রাসাদ বলেই ঠাহর হতো। মায়মো জায়গাটি দেখতে আমার ভারি ভালো লাগত। তবে আমাদের বাসা থেকে মায়মো ছিল বেশ খানিকটা দূরে। সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে প্রায় ২৫ মাইল দূরের এই মায়মোতেই আমাদের পরিবার ও বন্ধুদের পরিবারসহ বেড়াতে যেতাম।

সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েল একসময় স্থায়ীভাবে বার্মায় থাকতে শুরু করেন। অরওয়েলের লেখায় মান্দালয় থেকে মায়মো যাত্রার প্রলুব্ধকর ও আকর্ষণীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেক পরে অরওয়েলের লেখা বার্মার দৃশ্যকল্পগুলোর বিবরণ পড়ে আমি একদম মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি। তাঁর ভষায়:

> *মায়মোতে ট্রেনটি পৌঁছে গেলেও মানসিকভাবে আপনি মান্দালয়তেই পড়ে থাকবেন। মায়মো হলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মাইল উঁচুতে। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে বাইরে পা রাখামাত্রই যে-কারোরই মনে হবে যে, তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক গোলার্ধে এসে পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ আপনার নাকে পাতলা মিষ্টি হাওয়ার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করবেন। তখন মনে হবে যেন আপনি ইংল্যান্ডে চলে এসেছেন। আপনার চারপাশের সবটাই সবুজ ঘাসের বেষ্টনীতে ঘেরা। সবুজ ঘাসের প্রান্তরের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় দেবদারুগাছ। আর সেখানে পাহাড়ি মেয়েরা গোলাপী রঙের টুকটুকে গাল নিয়ে ঝুড়িতে করে স্ট্রবেরি ফল বিক্রি করছে।*

আমরা মান্দালয় থেকে মায়মো যেতাম ব্যক্তিগত গাড়িতে করে। আব্বা গাড়ি চালাতেন। মাঝে মাঝে পথে বিরতি দিয়ে আব্বা সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখাতেন। যাত্রাপথে আমার এক রাতের কথা মনে পড়ে। ঘটনাটি উপভোগ করতে পারা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একটি বড়সড় চিতাবাঘ হঠাৎ আমাদের গাড়ির সামনে এসে পড়ে। গাড়ির হেডলাইটে চিতাবাঘটির চোখের মণিকোঠা দুটি খুব জ্বলজ্বল করছিল।

ইরাবতী নদীতে নৌকা ভ্রমণের সময়, আমাদের আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো প্রতি মুহূর্তেই নতুন রূপে বদলে যেত। নদীর তীরে হেঁটে বেড়ানোর সময় আমি সেখানকার মাটি ও মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতাম। সেখানকার বিভিন্ন আদিবাসী, নানা ধরনের গোত্র ও গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষজন বেশ আকর্ষণীয় পোশাক পরে আসত। আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করতে অগুনতি অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব দৃশ্যকল্পের এক বিশাল ভান্ডার উপহার দিয়েছে বার্মা। বার্মা থেকেই আমার সামনে সমগ্র পৃথিবীর দুয়ার উন্মুক্ত হয়। আমি আমার পরবর্তী জীবনে যা-কিছু দেখেছি, তার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার নবীন চোখে অবশিষ্ট পৃথিবীর সৌন্দর্যটি এড়িয়ে যায়নি।

পাঁচ.

অনেকে মান্দালয়কে 'দ্য গোল্ডেন সিটি' ('সোনালী শহর') বলে থাকেন, কারণ শহরটি সুন্দর সব প্যাগোডা ও দর্শনীয় স্থানে ভরা। এই শহর নিয়ে সাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কিপলিং একটি কবিতা লিখেছিলেন যদিও তিনি কখনো বার্মায় যাননি। কিন্তু 'মান্দালয়' নামে যে মার্জিত কবিতা তিনি লিখেছিলেন, সেটি মান্দালয় নিয়ে তাঁর রোমান্টিক ভাবনায় ছিল ভরপুর। তবু আমার বাবার মতে, কবিতাটির বস্তুগত ত্রুটি ছাড়া অন্যসব কিছু তার ভালো লেগেছিল। বাবার কথা শুনে আমি সেসব সমস্যা ভূগোলবিদদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে কবিতার কল্পচিত্রে নিজেকে ভাসিয়ে দেব। কিপলিংয়ের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি ছিল "ভোরের আলো ফুটে উঠছে দেখে মনে হচ্ছে যেন চীনের আকাশে বজ্রপাত হলো"—'উপসাগর'।

জর্জ অরওয়েলের মূল নাম ছিল এরিক আর্থার ব্লেয়ার। তিনি বহু বছর মান্দালয়ে থেকেছেন। ১৯২২ সালে তিনি পুলিশ একাডেমিতে চাকরি নিয়ে মান্দালয়ে চলে আসেন। প্রথম প্রথম তাঁর কাছে এটি ছিল 'ধুলোময়

ও অসহনীয় গরমের' জায়গা এবং সাধারণভাবে তাঁর কাছে মনে হতো 'শহরটি কোথায় যেন আপসহীন' ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মান্দালয় আমার কাছে তা ছিল না। আমার কাছে মান্দালয় শহরের অর্থ ছিল ভিন্ন মাত্রার। আমার স্মৃতিতে মান্দালয় হলো মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সৌম্য ঐক্যের বন্ধনে মোড়া একটি শহর। কারণ, আমার চোখে দৃষ্টিনন্দন সব দালানকোঠা, অপূর্ব বাগবাগিচা, অজানা গন্তব্যে ছোটা কৌতূহলী সব রাস্তাঘাট, গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো সব রাজপ্রাসাদ যার চারপাশটি সৌম্য পরিখার বেষ্টনীতে ঘেরা। এই সবকিছুর বাইরেও বার্মার মানুষগুলোকে আমার কাছে অত্যন্ত উষ্ণ মনে হতো। তাদের মুখে হাসি লেগেই থাকত এবং আপনি তাদের সঙ্গে কথা বললে পছন্দ না করে থাকতে পারবেন না।

আমার বাবা পিএইচডি সফলভাবে সমাপ্ত করায় লোকে তাঁকে 'ড. সেন' বলত। ফলে প্রায়ই দেখা যেত যে আব্বার অজানতেই আমাদের বাসায় স্বপ্রণোদিত হয়ে অনেক অতিথি চলে আসত এবং বলত, 'ড. সেনের কাছে ডাক্তারি পরামর্শের জন্য এসেছি।' আমার বাবার অবশ্য ওষুধবিদ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। এসব ঘটনার পরও অবশ্য আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে, 'আমরা আসলে বৃহৎ অর্থে ডাক্তার গোত্রেরই—বৃহৎ জ্ঞানশাস্ত্রেরই আওতায় পড়ি—অবশ্য সেটি ছিল বহু প্রজন্মের আগের কথা। তা সত্ত্বেও তিনি বিরক্ত না হয়ে রোগীদের যথাসাধ্য করতেন, যেন তারা 'মান্দালয় সরকারি হাসপাতাল'-এর সেবা ও চিকিৎসা যতটা সম্ভব ভালো পেতে পারে।

আজকের বার্মাতেও সেখানকার জনগণের স্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শোনা যায়, যেটি আশপাশের অন্যসব দেশ থেকে অন্তত শোনা যায় না। যেমন থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ড জনস্বাস্থ্যে খুব ভালো সরকারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বার্মার জাতিগত সমস্যা রাষ্ট্রটিকে মোটামুটি অচল করে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো যেসব ছোট ছোট জাতিসত্তা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তারাও সঠিক কোন দিশা দেখাতে পারছে না। সামরিক শক্তি সেখানে বাইরে থেকে নিপীড়ন চালিয়ে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, ফলে আজকের দিনেও সেখানে স্বাস্থ্যসেবার কোনো সু-স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। ফলে বার্মায় চিকিৎসাসেবা সাধারণের কাছে খুবই অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জরুরি প্রয়োজনে যখন চিকিৎসাসেবার দরকার হয়, তখন যুক্তরাষ্ট্রের 'জন হপকিন্স মেডিকেল স্কুল'-এর একদল 'সংকল্পী বিশেষজ্ঞ'র কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়। এই দৃঢ় অঙ্গীকারসমৃদ্ধ দলটি পৃথিবীর বিভিন্ন বিপদসঙ্কুল জায়গায় নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উজ্জ্বল সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মানবিক কর্তব্যের এই কাজ করার সময় দলটির ছয়জন মহৎপ্রাণ সদস্যকে ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে হত্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কারেন নামে একজন অসুস্থ রোগীর জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজনে আপনি সাড়া দেওয়ার ফলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো।

ছয়.

বেড়ানোর প্রয়োজনে মান্দালয়ের বাইরে গেলে মান্দালয়ে ফিরে আসার অনুভূতি আমার জন্য ছিল অত্যন্ত আনন্দের স্মৃতি। আমাদের বাড়িটি ছিল মান্দালয় শহরের পূর্বপ্রান্তের একদম শেষ সীমানায়। মান্দালয় কৃষি কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে আমাদের কাঠের তৈরি বাড়িটি দেখে মনে হবে যেন এক সৌম্য সত্তা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির জানালা দিয়ে মিমো পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা আমার কাছে বাড়িটির আকর্ষণ আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিমো পাহাড়ের আড়াল থেকে ভোরের সূর্যোদয় দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়তাম। ফলে মান্দালয় ছিল আমার নিজেরই প্রাণপ্রিয় ঘর,

ঠিক যেমনটি ছিল পুরান ঢাকার বাড়িটি, মানিকগঞ্জের মত্তের মায়ময় আবাসটি; আর ঠিক তেমনই শান্তিনিকেতনের বাড়িটি আমার কাছে সমান পছন্দের ঘর ছিল। আমার কাছে এগুলোর কোনোটিই কারোর তুলনায় কোনো অংশেই কম ছিল না।

তবে যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, আমার অনুভূতিতে বার্মা বিশেষ সংবেদনশীলতার অর্থ বহন করত। এ ছাড়া আমার জীবনের প্রারম্ভস্মৃতির প্রথম দেশ বার্মা। আমি বার্মিজ ভাষাও কিছুটা শিখেছিলাম এবং ভাঙা ভাঙাভাবে সেটি দিয়ে কিছুটা আলাপও করতে পারতাম। আমায় দেখভাল করা বার্মিজ আয়া, যিনি আমার বোন জন্মের পর আমাদের দুজনকেইদেখাশোনা করেছেন—তিনি কিছু বাংলা ভাষার শব্দও জানতেন, এমনকি তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজি ভাষাতেও কথা বলতে পারতেন। আমার মনে আছে, সেই সময়ে আমি যতটা ইংরেজি বলতে পারতাম, তার থেকেও তিনি ইংরেজি ভালো জানতেন। তাঁর মুখটা আমার চোখে এখনো ভাসে। তিনি কি সুন্দরীই না ছিলেন! পরে, আমার বয়স যখন ১২ হয়, আমি আম্মার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি কি সত্যি সত্যিই দেখতে সুন্দর টুকটুকে গোলাপী রঙের ছিলেন কি না। জবাবে আম্মা বললেন, তিনি সত্যিই 'খুব সুন্দরী' ছিলেন। আম্মার কাছ থেকে বিষয়টি অনুমোদনের পর আমারও মনে হতো যে আমি যে ভাষাতেই তাঁর সৌন্দর্যের বিবরণ দিই না কেন, সেটি তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যের তুলনায় যথার্থ হবে না।

কিন্তু তাসত্ত্বেও সৌন্দর্যই আমার প্রিয় আয়াদির একমাত্র বিশেষত্ব ছিল না। তীব্র আক্ষেপ নিয়েই বলতে হচ্ছে, তাঁর নামটি যেন আমি মনে করতে পারি। তিনি আমাদের বাসার সবাইকেই বলে দিতেন কীভাবে কী করতে হবে। আমার মনে আছে, আম্মা কোনো কাজ করার আগে প্রায়ই তাঁর পরামর্শ নিতেন। তাঁর পরামর্শগুলো ছিল অত্যন্ত সুচারু ও নিপুণ। তিনিই আমার বাবা-মাকে বলে দিতেন যে বাইরে থেকে বাড়িতে ফেরার কোন পথটি দিয়ে এলে বাসায় পৌঁছতে সবচেয়ে সুবিধা হবে। বাবা-মা বাইরে থেকে ফিরলে আমার পেনসিলে আঁকা তারতাজা ছবিগুলো তিনি বাসার ড্রইংরুমের দেয়ালে টানিয়ে দিয়ে তাঁদের পুলকিত করতেন। আর আমাকে তাঁদের কাছে তিনি মেধাবী শিল্পী হিসেবে তুলে ধরতেন। তাঁর এ ধরনের প্রোৎসাহের ধাক্কায় আমার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমি নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতাম। কখনো কখনো আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠতাম এই ভেবে যে, আমার শৈল্পিক মেধা নিয়ে আমি আরও একটু চেষ্টা করতে পারতাম, যেটি আমার মধ্যে আয়াদি আবিষ্কার করেছিলেন।

বার্মায় নারীরা কিন্তু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক আর্থিক কর্মকাণ্ডেরই একেবারে কেন্দ্রে আছে সেখানকার নারীরা। পরিবারের ভেতর সিদ্ধান্ত গ্রহণেও নারীদের মতামত বেশ শক্তিশালী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বার্মার সঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশের সাব-সাহারা অঞ্চলের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ খানিকটা মিল রয়েছে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের মেয়েদের সঙ্গে এর মিল নেই। এমনকি বর্তমান পাকিস্তান কিংবা পশ্চিম এশিয়াতেও এটি নেই। বার্মায় আমার প্রারম্ভিক স্মৃতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত স্মৃতি হলো, সমাজে নারীর অমোচনীয় অবদানের ঘটনাগুলো। সে সময় যখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ কি ছয় বছর, সেরকম বয়সে সমাজে নারীর অবদানকে আলাদা করে বোঝার কথা নয়। কিন্তু পরে যখন আমি আমার জীবনে বার্মা ছাড়া বাদবাকি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বোঝার ক্ষমতা হয়েছে, তখন বার্মার স্মৃতিগুলোই ছিল আমার বিশুদ্ধ মানদণ্ড, যার সঙ্গে আমি জীবনে বাকি যা-কিছুই দেখি না কেন সেসব কিছুর তুলনা করেছি। এমনকি এটিও হতে পারে যে, লিঙ্গ সমতার দাবি ও অঙ্গীকার নিয়ে আমার গবেষণাতেও এর প্রভাব পড়েছে। আমার বার্মার অভিজ্ঞতাই নারীর এজেন্সি বা করণভবনকে গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আনার ভাবনাকে তাড়িত করেছে। আমার জীবনের পরবর্তী অংশে এই বিষয়টিই আমার গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে।

সাত.

আমার ছেলেবেলার বার্মার স্মৃতিগুলো এখনো আমার মনে থাকার অনেক কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ যে, আমার মনটা এখনো বার্মায় পড়ে থাকে। বার্মা সম্পর্কে আমার অনুরাগ আরও বহুগুণে বেড়ে যায়, যখন অং সান সু চি সম্পর্কে আমি জানতে পারি। সু চি আমার দেখা একজন অসাধারণ নারী। ১৯৬২ সালে সেনাবাহিনী সীমাহীন হিংস্রতা চালিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করার পর সু চি অসীম সাহসিকতা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে সেই অচলায়তন ভেঙে দেশকে মুক্ত করেন। আমি সু চিকে একজন আপসহীন নেত্রী হিসেবেই জানতাম। ফলে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করতাম এই ভেবে যে, আমি এমন একজন অসাধারণ ও সাহসী নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি এই ভেবেও গর্বিত ছিলাম যে বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি অকথ্য নির্যাতন ও দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় গৃহবন্দী হয়ে থেকেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর স্বামী মিশেল আরিসেরও পরিচয় হয়েছিল। স্ত্রীভক্ত এই স্বামীটি ছিলেন এশিয়া বিষয়ের ওপর একজন উঁচুমাপের পণ্ডিত ব্যক্তি। বিশেষ করে তিব্বত ও ভুটান নিয়ে তাঁর গবেষণা সুবিদিত।

সেনাবাহিনী অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণভাবে মিশেলকে বার্মা থেকে বহিষ্কার করে। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডের বাসিন্দা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জোনসকলেজের সম্মাননীয় ফেলো হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। অগত্যা তিনি অক্সফোর্ডে থেকেই সু চিকে সর্বোতভাবে সাহায্যের চেষ্টা করেছেন। শুধু নিজের স্ত্রীকেই নয়, বার্মা দেশটি পুনরুদ্ধারের জন্যও কাজ করেছেন। ১৯৯১ সালে সু চিকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণার পরপরই মিশেল (যুক্তরাষ্ট্রের) হার্ভার্ডে আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মিশেলের সঙ্গে আমি উপস্থিত থাকতে পেরে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না যে দুঃখের সময় এই এল বলে। সেটি ছিল ১৯৯৯ সাল। মিশেল তখন কর্কট রোগে মৃত্যুপথযাত্রী। সেটি ছিল মেটাস্টেসাইজ ক্যানসার। ততদিনে আমি যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড থেকে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে চলে গেছি। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকের কোনো এক সকালবেলার কথা। আমার ফোন বেজে ওঠে। আমি ভয়ে ভয়ে ফোনটি তুলি। ওপাশ থেকে মিশেলের কণ্ঠস্বর। মিশেল আমাকে বলছিলেন, যদিও ডাক্তার তাঁকে বলে দিয়েছেন তিনি আর বাঁচবেন না, তবু তিনি সেকথা বিশ্বাস করেন না। কারণ, 'আমার সু ও বার্মার জন্য এখনো অনেক জরুরি সব কাজ বাকি রয়ে গেছে।' তাঁর সেই জরুরি কাজগুলোর কথা সবই আমি জানতাম। ফলে তাঁর মনে কী খেলে যাচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম। ফোনালাপের ঠিক দুদিনের মাথায় অক্সফোর্ড থেকে আমার কাছে একটি চিঠি এল। মিশেল এইমাত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। তারিখটি ছিল ২৭ মার্চ। সেদিন ছিল তাঁর জন্মদিন। সু কেবলমাত্র একজন ভালোবাসার সঙ্গীকেই হারাননি, সেই সঙ্গে তিনি এমন একজন প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়েছেন যিনি তাঁকে সবসময় সুপরামর্শ দিতেন ও তাঁর সাহায্যে সর্বদা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

২০১০ সাল। সে বছর সু চি অবশেষে সেনাবহিনীকে হটিয়ে বিজয়ী হন। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ পদে তিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারেন বটে, তবে সে জন্য তাকে উচ্চমূল্যের ছাড় কবুল করতে হয়। যা হোক তখন থেকেই তার সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে। কিন্তু কপালের লিখন যায় না খণ্ডন। বার্মার অন্যান্য মানুষের মতোই নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তিনিও ছাড় পান না।

নিশ্চিতভাবেই সু চির নেতৃত্বে বড় ধরনের ভুল ছিল। বার্মার দুর্বল, নাজুক ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেওয়ার সংকল্পটি ছিল তাঁর চরম ভুল সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে বাংলাভাষী রোহিঙ্গা ক্ষুদ্রজাতিসত্তা থেকে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ। রোহিঙ্গা

ছাড়াও বার্মার অন্যন্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিও তাঁর মনোভাব ভালো ছিল না। বার্মার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ বর্বরতা চালায়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার জন্য সে সময় অসহিষ্ণু বৌদ্ধ অধিকারকর্মীরাও সু চিকে কোনো ধরনের সাহায্য করেননি।

সু চিকে বোঝার যদি কোনো ধাঁধাঁ থেকেও থাকে, তবে তার থেকেও কঠিন রহস্যের হলো সু চির ব্যক্তিত্বকে বোঝা। বিশেষ করে এটাই আমাকে বেশ পীড়া দিয়েছে। কারণ, আমার ছেলেবেলায় আমি বার্মিজদের দয়ালু আচার-ব্যবহারে একবারে অভিভূত ছিলাম। তাদের মতো মানুষ কেমন করে হঠাৎ রোহিঙ্গাদের প্রতি এতটা নির্মম হতে পারল? আর তা ছাড়া রোহিঙ্গাদেরও কেন এই পর্বতপরিমাণ গণহত্যা, বর্বরতা ও নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে? এসব নির্মম নিষ্ঠুর ঘটনায় আমার মনটা খুব খারাপ হওয়ার বাইরেও আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি—মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি আমার যে স্বতঃস্ফূর্ত উষ্ণতা ও আবেগ কাজ করে, তার পুরোটা কি কেবলই মায়া নাকি বিভ্রম? কিন্তু কথা বলে আমি এও বুঝতে পেরেছি, অন্যান্য মানুষেরও তাদের প্রতি আমার মতোই সহানুভূতি ও উষ্ণতা রয়েছে। অ্যাডাম রিচার্ডস। জন হপকিনসের নিবেদিতপ্রাণ আমার ডাক্তার বন্ধুটি, যিনি মেডিকেল স্যুটকেস নিয়ে সর্বদা তৈরি থাকতেন স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত নিরুপায় বার্মার রোগীদের স্বাস্থ্যসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে। চিঠিতে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, "এখানকার মানুষেরা সবসময়ই খুব হাসিখুশি, গলা ছেড়ে গান গায় আর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। এদের জীবনের রসবোধ দেখে যাপিত জীবনে ঘটে চলা সব প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলোকেও মনে হতো যেন সেগুলোও তাদের জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস।" ছেলেবেলার সেই সীমিত পরিধির ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা ও অপরীক্ষিত মুগ্ধতা ছাড়া বার্মিজ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমার অনুভবগুলো কেবল বাতুলতামাত্র।

বার্মার এই অনিবার্য পরিস্থিতি আমার দিকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। প্রশ্নটি হলো,বার্মায় পরিবর্তনটি কোথায় ঘটেছিল? জবাবে আমি কেবল আমার জল্পনা-কল্পনার কথাগুলোই বলতে পারি। পরিস্থিতির ভিন্নতা নিয়ে আমার প্রথমেই যেকথাটি মনে আসে সেটি হলো, রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার-প্রপাগান্ডার বিষয়টি বেশ চোখে পড়ার মতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেনাবাহিনী পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধভাবে এই প্রচার-প্রপাগান্ডার কাজটি বেশ জোরেসোরেই চালিয়ে নিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর সেই নিখুঁত ও কূটপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রভাবশালী এক ভূমিকা রাখে সমাজের মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনে। ফলে আমাদের প্রতিবেশী ভদ্র বার্মিজ পরিবারগুলোর মধ্যে যাদের আমি জানি, তারাও খুব হিংস্র ও বিদ্বেষী মনোভাব ধারণ করতে শুরু করে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি। এই প্রচার-প্রপাগান্ডাই তাদের মনে ধীরে ধীরে বিদ্বেষের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেয়। এই কাজে তারা বর্ণবিদ্বেষী প্রপাগান্ডার অস্ত্রটি খুব সংগঠিতভাবে ব্যবহার করে। শুধু তা-ই নয়, অত্যন্ত গোঁড়া, ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী শক্তিশালী ভাষ্যও তারা বিপুলভাবে ব্যবহার করেছে নির্যাতন ও হত্যাকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে। তাদের উদ্দেশ্য হলোবার্মা থেকে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করা।

একটি সভ্য ও ভদ্র জনগোষ্ঠীকে আমূল পাল্টে ফেলার দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ার জন্যই শিক্ষণীয়। প্রচার-প্রপাগান্ডার ক্ষমতা কেবল বার্মাতেই ঘটেছে, তা নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশেই এটি ঘটছে। বার্মা দেশটির বর্তমান নাম মিয়ানমার। দেশটির নামটাই সেনাবাহিনী পাল্টে দিয়েছে। নয়া নামকরণে তাদের চেয়ে আর সেরা কে হতে পারবে? বরং বলতে হবে যে, বার্মার সেনাবাহিনী বিশেষ বর্বর গোষ্ঠী। কিন্তু বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর সেনাবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের মতো একইরকম উদাহরণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ হাঙ্গেরি তাদের দেশে আসা অভিবাসীদের প্রতি, পোল্যান্ড তাদের দেশের সমকামীদের প্রতি অথবা সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠী, যারা যাযাবর জীবন যাপন করে ও নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাদের প্রতি এই

ইউরোপীয় দেশগুলোর বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহারের ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের সবার জন্যই এসব থেকে শিক্ষণীয় রয়েছে। বিশেষ করে সাবেক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতের জন্য এসব ঘটনা থেকে অনেক বড় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কারণ, বর্তমান ভারতে ধর্মীয় উগ্রবাদীরা খুব জোরেসোরেই কাজ করছে। কাগজে-কলমে সরকারি নীতি একভাবে লেখা থাকলেও বাস্তবে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি ক্রমাগত হুমকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আন্তজনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের অবনমন ঘটছে।

দীর্ঘ সময় ধরে বার্মার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শত্রুতা দেগে আসছে। কেবল তা-ই নয়, এটুকুতেই তারা থেমে থাকেনি। তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও আইনি অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। এই ঘটনাও কম দিন আগের কথা নয়। ১৯৮০ সাল কিংবা তারও কিছুদিন আগে থেকে বার্মার সেনাবাহিনী এই কাজ করেছে। কিন্তু তখনকার সময়ে ভেতরে ভেতরের এসব কর্মকাণ্ড কারও চোখে ধরা পড়েনি। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরে তারা এসব নির্যাতন-পীড়ন বিপুলভাবে বাড়িয়েছে। বিশেষ করে ২০১২ সালের ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। সেবছর বৌদ্ধধর্মের মানুষদের দিয়ে সরকার রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালায়। এটি তারা করে রোহিঙ্গারা যেখানে বসবাস করে আসছিল সেখানে গিয়ে। রাখাইনে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সেখানে গিয়ে রোহিঙ্গাদের ডেকে রোহিঙ্গা 'মুসলিম জাতি' কাহাকে বলে তা 'শেখায়'। সেনাবাহিনী বড় কোনো বাধা ছাড়াই তাদের প্রচার-প্রপাগান্ডার যুদ্ধে জিতে যায়। এই জেতার ফলে সেনাবাহিনী সেখানে নিজেদের খুব শক্তিশালী ভূমি পেয়ে যায়। এতে তারা একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে রোহিঙ্গাদের আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এরই ফলে শেষমেশ তারা রোহিঙ্গাদের তাদের বসবাসের ভূমি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়। এমন জঘন্য কাজে তারা নাগরিক অধিকারকর্মীদের প্রতিবাদের বাধাও পায় না; কারণ, সে ব্যবস্থা তারা আগেই সেরে রেখেছিল। দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনী তার পূর্বপরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করে ফেলতে পারায় এই অন্যায়ের প্রতি নাগরিকদের দুর্ভাগ্যজনক সম্মতিগুলো আগে থেকেই তৈরি ছিল।

তবে এই প্রপাগান্ডা যুদ্ধের শুরুতে ব্যতিক্রমী কিছু করার সুযোগ ছিল। সু চি তখন এই নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতেন। সু চি এই মেকি গল্পগুলো রুখে দিতে পারতেন। সেনাবাহিনী প্রায় বিনা বাধায় যেসব জঘন্য কাজ নিরন্তর করে যাচ্ছিল, সেসব নিকৃষ্ট কাজের বিরুদ্ধে সু চি চাইলে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। সু চি এর কিছুই করলেন না। ফলে রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে বার্মা থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। বরং ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে যে বিভাজনগুলো হয়েছে, সেখানে রোহিঙ্গারা রাখাইনের (পুরোনো আরাকান) অঞ্চলে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করে আসছিল। ব্রিটিশদের কাছ থেকে বার্মা স্বাধীনতা লাভের সময় এই আরাকান অঞ্চলটি বার্মার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রপাগান্ডা-যুদ্ধের সময়ে সু চি ছিলেন অদ্ভুতভাবে নিষ্ক্রিয়। সেনাবাহিনী যখন পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে বিকৃত প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করছিল এবং অন্যদের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লেলিয়ে দিচ্ছিল, তখন সু চি কিছুই করেননি। অবস্থা দেখে মনে হবে যে, সু চি সেনাবহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ধরনের চেষ্টাই করতে পারলেন না? আশ্চর্য! এটি কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সু চির নিজের হাতে তো রাজনৈতিক দল ছিল, তার মিত্ররা ছিল। আর তা ছাড়া এমন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তিনি অতীতে অনেকবারই করে এসেছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় বার্মার মূল্যবোধগুলো তিনি কীভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, সেটির তো আমরা সবাই প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। কিন্তু এক্ষেত্রে সু চির সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত নির্মম। সু চি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অপমান-অপদস্থতার বিরুদ্ধে কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অথচ ঘটনাটি এমন এক সময়ের সন্ধিক্ষণে ছিল যে তিনি চাইলেই এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। প্রতিরোধের জন্য সব রসদ

তাঁর হাতের নাগালেই ছিল। কিন্তু সু চি সে সন্ধিক্ষণটি হাতছাড়া করে ফেললেন। অবশ্য সু চি পরে চেয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি প্রচার-প্রপাগান্ডার চাতুর্যপূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে নাগরিক মতামতগুলো এতটাই বদলে যায় যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পক্ষে কেউ কথা বললে তার কঠোর বিরুদ্ধাচরণ একটি নিত্যঘটনায় পরিণত হয়। বিশেষ করে বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ বেশ জোরালো। এসবের ফলেবর্তমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা নিরূপণই বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। কঠিন করার এই কাজটি সেনাবাহিনী নিশ্চিত করে ছেড়েছে। প্রপাগান্ডা চালিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে পর্যুদস্ত করার পর সু চি যদি রোহিঙ্গাদের পক্ষে দাঁড়াতেও চাইতেন, তাহলে সেটি হতো বার্মায় তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। বর্তমান বাস্তবতায় এ কথাটি আমি নিজেও স্বীকার করব। যদিও আমার নিজের মনে বার্মার জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। সু চি ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিপর্যয়কর এই পরিণতির দায় কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। সামনের দিনগুলোতেও তাঁকে ক্রমাগত এটির মুখোমুখি হতে হবে। পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করলে বের হবে যে, কোন সময়ে কীভাবে তিনি এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাবেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষণীয় যদি কিছু থেকে থাকে, তবে, সেটি কেবল নৈতিক ও নীতিশাস্ত্রের বিষয় নয়। এগুলো তো রয়েছেই। বরং একইসঙ্গে এটি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিষয়। এবং এ বিষয়টি অবশ্যই প্রকাশ্য যুক্তিপ্রয়োগের ব্যর্থতা। এখানে যেহেতু বিশেষভাবে নির্বাচিত নির্দিষ্ট ঘৃণা উসকে দেওয়ার বিষয় কাজ করেছে, আজকের দুনিয়ায় ইউরোপ থেকে ভারত পর্যন্ত সবখানেই এই জঘন্য কাজটি চালানো হচ্ছে। ফলে সময় ও পরিস্থিতির বিশেষ গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর পৃথিবীর সমাজগুলোর মধ্যে সম্পর্কের নবতর বন্ধন সৃষ্টি ও তাদের দূরত্ব ঘোচানোর জন্য অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমার ব্যক্তিজীবনেও আমি বিচ্ছিন্ন সম্পর্কগুলো জোড়া লাগানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতার বাতাবরণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবেও আমি অনেক উদ্যোগ নিয়েছি। আমার প্রচণ্ড ভয় হয়, অসহিষ্ণুতার এই অপ্রতিরোধ্য গতি সম্মিলিতভাবে আমাদের সবার তিল তিল করে শ্রম ও যত্নে-কষ্টে গড়ে তোলা এই বন্ধনগুলোকে একটানে ছিড়ে ফেলবে? আর আমার প্রিয় বার্মাকেই হতে হবে তার দৃষ্টান্ত? পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কিন্তু এই সংকট ঘণীভূত হচ্ছে।

আট.

স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে আমি কিছুটা গৃহশিক্ষা পেয়েছিলাম বার্মায় আমার ছেলেবেলার সময়টায়। ঢাকায় ফেরত এসেই আমার বিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। আমি ভর্তি হই সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। স্কুলটি ছিল পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে। স্কুলটা আমাদের ওয়ারির বাসার বেশি দূরে ছিল না। সেন্ট গ্রেগরি ছিল একটি মিশনারি স্কুল। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চলত স্কুলটি। কিন্তু সেন্ট গ্রেগরি সম্পর্কে এমন সোজাসাপ্টাভাবে জ্ঞান তখন আমার ছিল না। এখন কোনো গৌরবর্ণের শিক্ষককে দেখেই বুঝতে পারি যে তিনি আমেরিকান ইংরেজ কিনা; কিন্তু তখন আমাদের চোখ এমন পরিপক্ক ছিল না। ফলে ছেলেরা তাদের বেলজিয়ামের শিক্ষক ভাবত। আমার সহপাঠীরা কেন এমনটি ভাবত, তা এখন আর আমার মনে নেই। বিদ্বৎসমাজে সেন্ট গ্রেগরি ছিল একটি গুণী প্রতিষ্ঠান। প্রধান শিক্ষক ব্রাদার জুড শুধু শিক্ষার গুণগত মান নিয়েই মনোযোগী ছিলেন না, বরং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে সে অঞ্চলের অন্য সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেবল গ্রেগরীয়দের ফলই যেন সবচেয়ে উজ্জ্বল হয় তা তিনি নিশ্চিত করে ছাড়তেন। ২০০৭ সালে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ১২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সংখ্যায় স্কুলের পুরোনো দিনগুলোর

স্মৃতিচারণায় ব্রাদার জুডের কথায় তার রেশ পাওয়া যায়: 'আমাদের ছেলেরাই প্রথম থেকে দশম স্থানগুলো দখল করে আছে, এবং এটি প্রতি বছরই হচ্ছে, ভবিষ্যতেও এভাবে চলবে।' অবশ্য কিছু গ্রেগরীয় ছাত্রছাত্রী সত্যিই নামকরা বিদ্যাবেত্তা ও বিখ্যাত আইনজীবী হতে পেরেছিলেন। এমনকি বড় রাজনৈতিক নেতাও হতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিও হয়েছিলেন। কামাল হোসেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। কামাল হোসেনও সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র। কামাল হোসেন স্কুলের ভালো ফলাফলের পেছনে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি আরও বলেছেন, শিক্ষার্থীদের সাহায্যে যথাসম্ভব সবকিছু করতেই শিক্ষকেরা প্রস্তুত থাকতেন। শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষের ভেতরে যেমন ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন, তেমনি শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তাদের প্রয়োজনে অসাধারণভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

কিন্তু হতাশার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের কঠিন সব শৃঙ্খলা ও সর্বোচ্চ ফলাফলের এই সংস্কৃতি আমার তেমন মনের মতো ছিল না। বিষয়টি যত সোজা মনে হয়, বাস্তবে তেমনটি ছিল না। স্কুলের এই চর্চাটি আমার কাছে বেশ আঁটোসাঁটো মনে হতো। ফলে আমি একটি উজ্জ্বল তারকা ছাত্রের মতো দীপ্তি ছড়ানোর রূপকল্পে আমার নিজেকে দেখতে চাইতাম না। অন্তত প্রধান শিক্ষক ব্রাদার জুডের চোখে তো নয়ই। অনেক বছর পরে আমি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে অল্প সময়ের জন্য ঢাকায় বেড়াতে গেলে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের সেসময়ের প্রধান শিক্ষক আমার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বক্তৃতায় বলেন, তিনি এই আয়োজনটি করেছেন বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। এই কথা বলে বহু পুরোনো বস্তা থেকে আমার পরীক্ষার খাতা বের করে সবার সামনে দেখালেন। এই কাণ্ড দেখে আমি তো একেবারে থ! অবশ্য আমার খাতাটি দেখিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার বদলে খানিকটা দমে যেতে হলো তাঁকে। কারণ, আমার সেই খাতার প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ফলাফল তাঁকে আপ্লুত করতে ব্যর্থ হলো। কারণ, 'ক্লাসের মোট ৩৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমার মেধাক্রম ছিল ৩৩তম।' কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার প্রতি উষ্ণ হৃদয় নিয়ে বলেছিলেন যে, 'আমার মনে হয় আপনি সেন্ট গ্রেগরি ছাড়ার পরপরই ভালো ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন!' প্রধান শিক্ষক মহোদয় অবশ্য ভুল কিছু বলেননি। আমার মনে হয় আমি তখনই ভালো ছাত্র হয়ে উঠেছিলাম, যখন ভালো ছাত্র হয়ে ওঠার পরোয়া কেউ করত না।

ঢাকায় স্কুলজীবনের বছরগুলোতেও আমি শান্তিনিকেতনে নিয়মিত বিরতিতে বেড়াতে যেতাম। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে মন চাইল শান্তিনিকেতনে চললাম, নইলে নয়। শান্তিনিকেতনে বেড়ানোটা ছিল একেবারে নিয়মিত। তাতে কোনো ছেদ ঘটত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমার লেখাপড়ার জন্য স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হওয়ার কোনো লক্ষণ তখনো তৈরি হয়নি। অন্তত ঢাকার জীবনের শুরুর দিনগুলোতে তো নয়ই। যা হোক, ১৯৪১ সালে জাপানি সৈন্যরা বার্মা দখল করলে বাবা-মা আমাকে শান্তিনিকেতনে নানাবাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং সেখানেই স্কুলে ভর্তি করান। আব্বা অবশ্য চাইতেন আমি সেন্ট গ্রেগরিতেই পড়াশোনা করি। কারণ, তুলনামূলকভাবে সেন্ট গ্রেগরি ছিল অনেক ভালো স্কুল। স্কুলের ফলাফল ছিল সবার চেয়ে সেরা এবং যেকোনো বিচারেই স্কুলটি ছিল উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু বিকাশমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আব্বার মনে হতে থাকে, জাপানি সেনারা যখন ঢাকা ও কলকাতায় বোমা বর্ষণ করতে শুরু করবে, তখন শান্তিনিকেতনের মতো শহর থেকে এতটা দূরবর্তী স্থানে বোমা ফেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি।

সুখের কথা হলো জাপানী সৈনিকদের আক্রমণের পরিধি সম্পর্কে আব্বার মূল্যায়ন সঠিক ছিল। যুদ্ধের সেই বছরগুলোতে ঢাকা ও কলকাতা উভয় শহরেই নিয়মিত বোমা বর্ষণ হতো। ফলে বিকট শব্দে মুহুর্মুহু সাইরেন

বাজানো হতো। কারণ, বোমা বর্ষণের সময় মানুষকে বাঁচাতে যেন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়। বোমা বর্ষণের একটি ঘটনা আমার মনে আছে। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময়ে আমি ও আমাদের পরিবারিক বন্ধুরা মিলে ছুটি কাটানোর জন্য কলকাতায় নদীর ধারে বেড়াতে গেলে বোমা বর্ষণের মধ্যে পড়ে যাই। সেটিতে অল্প সময়ের জন্য হলেও আমরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের সেই এক সপ্তাহে কলকাতা শহরে জাপানিরা পাঁচ দফা বোমা বর্ষণ করে। এ সময় নদীর ধারগুলোও বাদ যায়নি। এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যা নামতেই আমার বিছানায় যেতে হয়েছিল। আমি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছি—মিছিমিছি এমন ঘুমের ভান করছিলাম, এভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাসার তিন তলার বারান্দায় উঁকি দিয়ে দূরে বোমা বর্ষণের কারণে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের আভা দেখেছি। যদিও ঘটনাস্থলটি আমাদের বাড়ি থেকে বহুদূরে ছিল, কিন্তু আমার মতো বাচ্চা ছেলের কাছে সেটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়ার মতো ঘটনা। কলকাতায় বোমা বর্ষণ হলেও সৌভাগ্যবশত ঢাকায় বোমা বর্ষণ হয়নি।

শান্তিনিকেতনে আমার স্কুলজীবন শুরুর কারণ ছিল আব্বার যুদ্ধদিনের যুক্তি প্রয়োগ। উদ্ভূত এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আব্বার যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের ফলাফল হলো—ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের পাট চুকিয়ে শান্তিনিকেতনের স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সূচনা। নতুন স্কুলের শেষ দিকে এর প্রগতিশীল চিন্তাধারার কারণে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটিকে আমার ভীষণ ভালো লেগে যায়। শান্তিনিকেতন ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রমী একটি বিদ্যাপীঠ। তারা অগ্রাধিকার নিয়ে ছিল নিরুদ্বেগ। অন্তত সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের মতো অতটা আঁটোসাঁটো বিদ্যায়তনিক চর্চার মধ্যে তারা ছিল না। শান্তিনিকেতনের স্কুলটি ভারতে আবহমানকাল ধরে চলে আসা শিক্ষার সনাতনী নানা ধারাকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে। সেখানে শিক্ষার অভিমুখটি ছিল সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেশগুলোর শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, ছাত্রছাত্রীদের মনে সত্যিকারের বিশ্ববীক্ষার উদ্বোধন ঘটানো। শান্তিনিকেতনে যে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হতো, সেটি হলো শিশুদের মনকে কৌতূহলী করে গড়ে তোলা। শান্তিনিকেতন শিশুর কৌতূহলকে তার কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে বিকশিত করতে শেখায়। শান্তিনিকেতন তার শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগতায় নিপুণভাবে তৈরি করার লক্ষ নিয়ে চলত না। ফলে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষায় ভালো ফল করার চাপ ও ভালো গ্রেড অর্জনের অভিমুখী করে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা হতো না। কেবল তা-ই নয়,এহেন প্রতিযোগিতার প্রতি বিদ্যার্থীদের যথেষ্ট নিরুৎসাহিত করা হতো। শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত গ্রন্থাগারের বইয়ের তাকে থরেথরে সাজানো গ্রন্থগুলো যেন ছিল আমায় ঘেরা এক সমৃদ্ধ পৃথিবী। স্কুলের পরীক্ষায় আমি ভালো ফল না করায় আমি আমাকে নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম। ভালো ফলের পেছনে দৌড়ঝাঁপ না করাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

শান্তিনিকেতনে থিতু হওয়ার অল্পকিছুদিন পরই যুদ্ধের দামামা থেমে গেল। জাপানিরা পিছু হটলেও আমি আমার নতুন স্কুল থেকে কিছুতেই পিছু হটলাম না। বরং আমার নতুন স্কুল শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসে ফেললাম। আমার জন্মের মুহূর্তটুকুর মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার নাড়ির বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। আমার জীবনের সুদীর্ঘ সময়ের ভালোবাসার ঘর হলো শান্তিনিকেতন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে থাকলেও ঢাকায় আব্বার কর্মস্থলে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে নিয়মিত যেতে হতো। সেখানে আমার বাবা-মা ও ছোট বোন মঞ্জু সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতেন। স্কুলের পড়াশোনার জন্য শান্তিনিকেতনে থাকা এবং দীর্ঘ ছুটিতে ঢাকায় যাওয়া—এ দুটির সমন্বয় আমার জন্য ছিল আদর্শ সংমিশ্রণ। আমার চাচাতো ভাইবোনেরা বিশেষ করে মিরাদি (মিরা সেন, পরে মিরা রায়) আমার ছুটির দিনগুলোকে আনন্দে ভরিয়ে দিত।

সাতচল্লিশের দেশভাগ আমার জীবনের আনন্দঘন এই পরিবেশকে উল্টেপাল্টে দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নিষ্ঠুর রক্তপাত মানুষের মনকে বিষণ্ন ও দুঃখাতুর করে তোলে। পরিস্থিতি আমাদের বলে যে আমাদের

এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। ঢাকা তখন সদ্য জন্ম নেওয়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। তখন আমাদের পরিবার বসবাসের জন্য শান্তিনিকেতনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। আমি শান্তিনিকেতন ভালোবাসলেও ঢাকাকে বড় বেশি অনুভব করি। বিশেষ করে আমাদের বাড়িটি—জগৎ কুটির। পল্লবিত ছায়াঘেরা চম্পা গাছটি আমাদের ঢাকার বাড়িটির উপর তলার বারান্দাকে সুগন্ধে ভরিয়ে রাখত—সেই গাছটি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। ঢাকায় আমার খেলার পুরোনো বন্ধুরা কে কোথায় আছে জানি না। আমি মনে মনে তাদের খোঁজ করি। আমাদের বাড়ির বাগানের আম-কাঁঠালের গাছগুলো কোথায় গেল? সেগুলো এখন কোথায় আছে? মোট কথা, আমার পৃথিবীটাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। বিলুপ্ত আমার ঢাকাকে কি কেউ এখন পূরণ করে দিতে পারবে? আমার জীবন ঢাকায় কিংবা শান্তিনিকেতনে যেমনটি ছিল, সেটি কি আমি আর কখনো ফিরে পাব? নতুন জীবন শুরু করে আমি দ্রুতই আবিষ্কার করি, পুরোনো যা-কিছু নিয়ে আমার হারানোর বেদনা রয়েছে, তাকে আমি আমার জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারছি না।

বাঙলার নদী

এক.

প্রমত্ত পদ্মা নদী থেকে ঢাকা খুব বেশি দূরে নয়। সুপ্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত গঙ্গা নদীর যে দুটি বড় শাখানদী রয়েছে পদ্মা হলো তার একটি। ইংরেজি ভাষাভাষীর মানুষজন গঙ্গা নদীকে 'দ্য গেঞ্জেস' বলেন। গঙ্গা নদীটি বাঙলা অঞ্চলে প্রবেশ করে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অতীতে উত্তর ভারতের প্রাচীন শহরগুলো, যার মধ্যে বেনারস ও পাটনার মতো ঐতিহ্যবাহী পুরোনো শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলোর সবই বৃহত্তর বাঙলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'পদ্মা' সংস্কৃত ভাষার শব্দ, যা পরে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'পদ্মা' শব্দটির উদ্ভব একটি ফুলের নাম 'পদ্ম' থেকে। পদ্মা নদী বঙ্গোপসাগরে শেষ হওয়ার আগে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আয়াস ও অলস ভঙ্গিতে নিজেকে প্রসারিত করেছে। গঙ্গার অন্য শাখাটির নাম হলো ভাগিরথী। ভাগীরথী নদী অবশ্য পদ্মার মতো অতোটা আয়াস করতে পারেনি। সে সোজাসুজি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। তার চলার পথ এতই সোজা দিকে যে, সে সরাসরি কলকাতা শহরের উপর দিয়েই চলে গেছে। বঙ্গোপসাগরে গিয়ে নিজের সমাপ্তি ঘোষণা করলেও তাকে ঘুরতে হয়েছে কম। অল্প পথ অতিক্রম করেই সে বঙ্গোপসাগরের দেখা পেয়েছে। আমি বলতে পারব না, কীভাবে যেন ভাগীরথীর ছোট্ট একটি শাখার নাম মূল নদী 'গঙ্গা'র নামেই নামকরণ হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন স্থানে ভাগীরথী ও 'গঙ্গা' তাদের নাম অদল-বদল করে প্রবাহিত হয়েছে। সম্প্রতি এদের কোনো কোনো অংশকে হুগলী নদী বলে। বাংলা সাহিত্যে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী বেশ বড় পরিসর নিয়ে আছে। ভাগীরথী ও পদ্মা—কোনটির মাহাত্ম্য বেশি—তা নিয়ে রেশারেশি আছে। আমার মনে পড়ে, আমরা তখন ঢাকায় থাকি; ঢাকার বালক হিসেবে পদ্মা নদীকে আমার পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর লাগে—এ কথা বলায়, আমার কলকাতার বন্ধুটি গাল ফুলিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল।

গঙ্গার জলের বণ্টনের বিষয়টি অবশ্য এমন তুলতুলে নরম ব্যাপার নয়। এটি খুবই মারাত্মক বিষয়। শুধু তা-ই নয়, এটি তীব্রভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারও। এই রাজনৈতিক তীব্রতার বিষয়টি গতি পেয়েছে যখন ভারত সরকার গঙ্গা নদীতে বিশাল বাঁধ নির্মাণ করল। ১৯৭০ সালে ভারত গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। এই বাঁধ নির্মাণের প্রধান লক্ষ্য ছিল গঙ্গার জল প্রত্যাহার করে ভাগীরথী নদীর জলকে আরও

বাড়িয়ে তোলা। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের আরও একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হলো কলকাতা বন্দরে জমতে থাকা পলির কারণে জাহাজ ভিড়তে যে সমস্যা হয়, তা দূর করা। অর্থাৎ পলি পরিষ্কার করা। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ করেও বন্দরের পলি জমা সমস্যার সমাধান করা গেল না। কিন্তু এর ফলাফল হলো ভয়াবহ। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে পূর্ব বাঙলার মানুষদের নিজেদের মধ্যে অকল্পনীয় শত্রুতা সৃষ্টি হলো। আমার ছেলেবেলায় আমি এতটা রাজনৈতিক কলহ দেখিনি। বরং এসব একটু দূরের বিষয়ই ছিল। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের পর জল নিয়ে শত্রুতা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিল।

পদ্মা নদী নিয়ে আমার গর্বের কোনো ভিত্তি আসলে ছিল না। কারণ, প্রকৃকপক্ষে ঢাকা তো পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল না। কথিত আছে, কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে, পদ্মার তীরে ঢাকা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটি কয়েক শত বছর আগের কথা। পদ্মা নদীর গতিপথ সেখান থেকে অনেকটা সরে গেছে। বাঙলার অসাধারণ নরম পলিমাটি গুণের কারণে নদ-নদীগুলো তাদের চলার পথ সহজে পরিবর্তন করার 'নরম' সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে। এই সুযোগের ব্যবহার সে করে থাকে যতটা না ঐতিহাসিক কারণে, তার চেয়েও অনেক বেশি—মাটির বৈশিষ্ট্য ও সময়ের বিশেষ বাঁকের কারণে। বর্তমানে ঢাকা অনেক ছোট একটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছোট্ট নদীটির নাম বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা শব্দটির অর্থ হলো সে গঙ্গা নদীর বড় বোন। অবশ্য বুড়িগঙ্গা শব্দ দিয়ে এটিও বোঝায় যে, বড় এই বোনটির বেশ বয়স হয়ে গেছে—বয়সে সে এখন একজন বুড়ি। ঢাকা থেকে পদ্মা নদী দেখতে যেতে লম্বা ভ্রমণের প্রয়োজন নেই। অল্প ভ্রমণেই অপূর্ব পদ্মা নদীটি দেখতে পাওয়া যাবে। পদ্মা নদী শহরকে বিদায় জানিয়ে যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই তার অপার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করতে শুরু করেছে। কারণ, কখনোকখনোসে তার উপ নদ-নদীগুলোর ঘাড়ে হাত রেখে গলাগলি করে চলতে থাকে। চলতে চলতে পদ্মা যখন উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় নদী ব্রহ্মপুত্রের হাত ধরে ফেলে এবংতার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন এদুজনের সম্মিলিত সত্তার নতুন নাম হয় যমুনা নদী। এই নতুন নাম—যমুনা নদী—উত্তর ভারতের বাসিন্দাদের ধন্দে ফেলে দেয়। কারণ, দিল্লীর আগ্রারবিখ্যাত তাজমহলও বিখ্যাত যমুনা নদীর তীরেই অবস্থিত। কিন্তু সেই যমুনা নদী আগে থেকেই নামকরা, এটি এই নতুন যমুনা নদী নয়। যা হোক, আগের জায়গায় ফিরে যাই। পদ্মা যেখানে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলে যমুনা নদী নাম নিয়ে কিছুদূর এগিয়েছে, সেখান থেকে একটু নিচে নেমে পদ্মা নদী মেঘনাকে আলিঙ্গন করেছে। এই মিলনস্থলটি বিপুল ও বিশাল। আমার নিজের চোখে দেখা সেই স্থানটির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। এখনো আমার মনে পড়ে যে, রাজকীয় সেই বিস্তৃত জলরাশির কোনো কূলকিনারা দেখতে আমি সক্ষম হইনি। আমি এটি দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে যাই, আর আব্বাকে জিজ্ঞেস করি—'এটি কি সত্যি সত্যিই একটি নদী?' 'আব্বা, পানিতে কী হাঙর আছে?'

পূর্ব বাঙলায় বসবাসের সময় আমাদের জীবনকে নদী আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। আমার ছোটবেলার সেই পূর্ব বাঙলা হলো বর্তমান বাংলাদেশ। যখন আমরা ঢাকা থেকে কলকাতায় যেতাম—সেটি কলকাতার বড় শহর হোক কিংবা বা শান্তিনিকেতন হোক—গন্তব্যে পৌঁছতে হলে রেলগাড়িতে আমাদের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করতেই হতো। সরাসরি শেষ গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা তখন ছিল না। প্রথমে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে যেতে হতো। নারায়ণগঞ্জ পৌঁছবার পর সেখান থেকে পদ্মা নদী দিয়ে স্টিমারে করে দীর্ঘ নৌপথের ভ্রমণ করতেই হতো। পদ্মার দুই ধারের বৈচিত্র্যময় অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে আমরা গোয়ালন্দ রেলস্টেশনে পৌঁছে গেছি, তা খেয়ালই করতে পারতাম না। এই গোয়ালন্দ রেলস্টেশন থেকে রেলগাড়িতে উঠলে সোজা কলকাতায় পৌঁছে যেতাম।

পদ্মা নদীতে এই স্টিমার ভ্রমণ আমার কাছে সবসময়ই ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। প্রতি মুহূর্তে রূপ বদলানো বাঙলার অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো উপভোগ না করে কোনো উপায় ছিল না। সেসব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও ব্যস্ত গ্রামীণ জনপদের জীবনচিত্র চোখে পড়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাদের স্কুলে যাওয়ার সময় হয়নি, তারা দৌড়ে নদীর ধারে এসে আমাদের নৌযাত্রার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকত। এই তরতাজা আনন্দ খুঁজে পেয়ে তারা সুন্দর করে হাসত। বর্তমানে আমার মধ্যে উদ্বিগ্ন হওয়ার যে একটা বাতিক আছে, সেটি তখন কাজ করত না। সেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে না গেলেও আমার তাদের নিয়ে কোনো চিন্তা হতো না। কিন্তু আমার আব্বা আমার মতো ছিলেন না। আব্বা আমাকে বলতেন যে, অধিকাংশ ভারতীয় শিশু স্কুলে যেতে পারে না; কারণ, যাওয়ার মতো পর্যাপ্তসংখ্যক স্কুলই নেই। ভারতে স্কুল খুব অপ্রতুল। আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে, এমন জঘন্য পরিস্থিতির কেবল তখনই অবসান হবে, যখন ভারত স্বাধীন হবে। আব্বার এই কথা শুনে তখন আমার মনে হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত কোনো বিষয়। তারপরও কিন্তু আব্বার কথাটা আমি বিশ্বাস করতাম। হায়! আমার তখন একবারের জন্যেও মনে আসেনি—ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও আগের অচলায়তনের তেমন কোনো বদলই ঘটবে না; আর সবকিছু বাদ দিলেও কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাটাও বাড়ানো যাবে না; শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব সম্পর্কে জোরের বিষয়টি আমার জীবনে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠবে; এতটা দৃঢ় অঙ্গীকার আমার জীবন আমার কাছ থেকে আদায় করে নেবে—ভারতের জন্যে তো বটেই অন্যত্রও—এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের পরেও সেটি করতে হবে, সেটি আমি আগে বুঝতে পারিনি।

স্টিমারের সেসব ভ্রমণ আমাকে প্রকৌশলপ্রযুক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটায়। স্টিমারের ইঞ্জিন ঘরটি দেখলে যে কারোরই নাক সিটকানোর কথা। আধুনিক যন্ত্রের তুলনায় সেটি ছিল হতাশাজনক সেকেলে। কিন্তু আমার এসবের বালাই ছিল না। আমি বরং উত্তেজিতই ছিলাম। কারণ, স্টিমারের চালক আব্বাকে সসম্মানে ইঞ্জিন ঘরটিতে বসার অনুমতি দিলে আব্বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতেন। বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, এই সুযোগটি উপভোগ করার জন্য আমরা কিন্তু প্রায়ই ইঞ্জিনঘরে গিয়ে বসতাম। ইঞ্জিন চলার প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে, ইঞ্জিনের লোহার দণ্ডটি একবার উপরে উঠছে আর নিচে নামছে। পাশাপাশি লোহার চাকাটি কোনোরকম আব্রু ছাড়াই দৃশ্যমান। প্রচণ্ড জোরে ঘুরছে চাকাটি। ইঞ্জিনের তেল ও গ্রিজের মিলিত গন্ধ বাতাসে আলাদা একধরনের সৌরভের সৃষ্টি করে রাখে! আমার চোখের সামনে পৃথিবীজুড়ে চলমান নিরন্তর সব কর্মকাণ্ড দেখে আমি খুব আনন্দ পাই। কিন্তু আমাদের স্টিমারটি সেসব কাজের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারতো না। বরং উল্টো, স্টিমারটি ধীরে ধীরে নরম পায়ে সামনে এগিয়ে যেত। আব্বা আর আমি ডেকে বসে গতিময় পৃথিবীর কর্মকাণ্ড দেখতাম। আমি এখন বুঝতে পারছি, জটিল এক পৃথিবীর স্বরূপ উন্মোচনে সেটাই ছিল আমার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। জাহাজের ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে—সেই জটিলতর বিষয়টি আমাকে বাস্তব দুনিয়ার জটিলতা বুঝতে মসকো করিয়েছে।

দুই.

নৌপথে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে আবার ফেরার সময় গোয়ালন্দেই ফিরে আসা হলো আমার নদীকেন্দ্রিক শৈশবের বাস্তব অভিজ্ঞতার একমাত্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূর্ব বাঙলায় বর্ষা ঋতুতে বিভিন্ন ছুটির দিনগুলোর বেশিরভাগই ছিল ভেজা ভেজা। দিনগুলো ছিল জলময়। ঢাকা থেকে দাদাবাড়ি মানিকগঞ্জের মত্ততে বিভিন্ন নদ-নদীর সর্পিল পথ ধরে নৌকায় করে ছোটবড় খাল-বিল পাড়ি দিয়ে যাত্রাপথের অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল, সেটি আমি এই বইয়ের আগের অংশেই বর্ণনা করেছি। ওইটুকু পথ পাড়ি দিতে কত লম্বা সময়ই না লেগে যেত! আব্বা-আম্মা ও ছোটবোন মঞ্জুসহ আমরা যখন বিক্রমপুরের

সোনারঙে নানাবাড়ি যেতাম, তখনও দাদাবাড়ি যাওয়া কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হতো। পূর্ব বাঙলায় ঢাকার বেশ কাছেই ছিল বিক্রমপুর। কিন্তু কাছে হলেও নদীপথের সেই যাত্রায় কত যে খাল-বিল নদী-নালা পাড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছতে হতো তার কোনো হিসেব নেই। আমার নানা-নানি পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতন থেকে সোনারঙে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সোনারঙ ছিল আমার নানার পূর্বপুরুষদের বাড়ি। অর্থাৎ আমার নানার 'মূল গ্রামের বাড়ি' ছিল এই সোনারঙ গ্রামে। আমার নানার কর্মস্থল ও বসবাসের জায়গা ছিল শান্তিনিকেতনে। নানার পৈত্রিক বাড়ি সোনারঙ হলেও বাস্তবে আমার নানা তাঁর পরিবার নিয়ে সোনারঙ গ্রামে বাস করতেন না। তিনি থাকতেন সেখান থেকে বহুদূরে, শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার নানা—বাড়ি বলতে সোনারঙই বুঝতেন।

আমার যখন বয়স প্রায় নয় বছর, তখন আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি একটি নৌকাঘর ভাড়া করবেন। বাঙলার সমস্ত অঞ্চলজুড়ে জালের মতো নদী-নালার যে বিস্তৃত অন্তর্জাল, তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে গ্রীষ্মের ছুটির এক মাসেরজন্য ঘুরে বেড়াতে তিনি নৌকাঘরটি ভাড়া করতে চান। নৌকাটিতে একটি ছোট ইঞ্জিন লাগানো ছিল। আব্বার প্রস্তাব শুনে আমার মনে হয়েছিল যে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি আসতে চলেছে। আসলে হয়েছিলও তাই। সেই এক মাসে আমার দুর্লভ মুহূর্তগুলো—আমি যা আশা করেছিলাম, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর ছিল। আমার মনে পড়ে, সেই দিনগুলোর কথা। নৌকাটি ধীরে ধীরে আমাদের শরীরে শিহরণ জাগিয়ে এগিয়ে চলত। সময়টি যেমন রোমাঞ্চকর হবে বলে আশা করেছিলাম, ঠিক তেমনই শিহরণজাগানিয়া ছিল। মাসব্যপী নদীবাসের প্রথমেই আমরা পদ্মা নদী দিয়ে আরম্ভ করি। পদ্মা নদীতে মনভরে ভ্রমণ শেষ করে আমরা অন্য নদীতে যাত্রা করি। আমরা ধলেশ্বরীর কমনীয়তা উপভোগ করতে করতে সর্ববৃহৎ ও সুন্দর মেঘনার বুকে চলে আসি। নদীতে কাটানো আমাদের যাপিত জীবনের সেসময়টির কথা আমি বলে বোঝাতে পারব না। সব মিলিয়ে সময়টি ছিল নতুন নতুন রোমাঞ্চে টইটম্বুর। আনন্দে একেবারে পরিপূর্ণ। বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে তাকালে কেবল জলের প্রান্তের গাছগাছালিই চোখে পড়ত না, বরং জলের তলায়ও নানা ধরনের উদ্ভিদ চোখে পড়ত। জলের নিচের উদ্ভিদগুলো আমার কাছে ছিল অপরিচিত; কারণ, আমি আগে এগুলো কখনো দেখিনি। নৌভ্রমণে মাঝেমধ্যে আমাদের মাথার উপর পাখিরা বৃত্তাকারে ঘুরত, কখনোকখনো তারা নৌকায় এসেও বিশ্রাম নিত, এই দৃশ্যে আমার চোখ জুড়িয়ে যেত। পাখিগুলোর দিক থেকে আমি আমার চোখ সরাতে পারতাম না। পাখিগুলোর মধ্যে কতকগুলোর নাম আমার জানা ছিল, সেগুলো আমি আমার পাঁচ বছর বয়সী ছোট্ট বোন মঞ্জুকে বলতাম। পাখির নাম শুনে মঞ্জু খুব খুশি হতো। সে হাসত। নদী তার জলের কলধ্বনিতে আমাদের আবদ্ধ করে রাখত। মনে হতো, যেন নদী আমাদের সঙ্গে কথা বলছে। নদীর এই পরিবেশটি ঢাকায় আমাদের বাড়ির শান্ত-নীরব বাগানটির ঠিক বিপরীত। নদীতে ঝড়ো বাতাসের সময় একটু বড় আওয়াজ তুলে জলরাশি আমাদের নৌকার প্রান্তে বাধা পেয়ে ছলকে উঠত। নদীর স্বচ্ছ জলরাশি ময়ূরের মতো পেখম মেলে আমাদের চোখেমুখে পরশ বুলিয়ে শিহরণ জাগাত।

সে সময় নদীতে যেসব মাছ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেগুলো আগে আমার চোখে পড়েনি। আব্বা আমাকে সেসব মাছের নাম বলে দিতেন। শুনে আমার মনে হতো, আব্বা পৃথিবীর সবকিছুই জানেন। শুধু নাম কেন, আব্বা সেই মাছগুলোর প্রতিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোও আমার নজরে আনতেন। তখন নদীতে ছোট ছোট ডলফিন থাকত, যারা নদীর ছোট মাছ খেয়ে বেঁচে থাকত। অবশ্য আমরা ডলফিনকে ডলফিন বলতাম না। বাংলা ভাষায় ডলফিনকে বলে শুশুক। শুশুকের বৈজ্ঞানিক নাম প্লাটানিস্তা গেনজেটিকা। শুশুকগুলো ছিল কালো রঙের। কিন্তু চিকচিক করত। আমরা শুশুকগুলোর সৌন্দর্য দেখে নিতে পারতাম যে মুহূর্তে তারা শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য জলের উপরে মাথা তুলত। কিন্তু শ্বাস নেওয়ার

পরমুহূর্তেই এরা ডুব দিয়ে অনেক গভীরে চলে যেত। দূর থেকে শুশুকদের গতিময় খেলা আমি বেশ উপভোগ করতাম। কিন্তু এই শুশুকদলের সঙ্গেই আছি এমন অনুভূতির কারণে তাদের পুনরায় না দেখতে পাওয়ার কোনো উদ্বেগ আমার ছিল না। এমনকি আমার এই ভয়ও হতো না যে, আমার পায়ের বুড়ো আঙুলকে তারা অজানা কোনো মাছ ভেবে খেয়ে নিতে পারে!

রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের লেখায় বার্মার 'উড়ন্ত মাছ'-এর মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পাওয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে সেগুলোকে বাস্তবে দেখা যায় পদ্মা ও মেঘনা নদীতে। একটি দুটি নয়, প্রচুর পরিমাণে। নিজের চোখে সেই বাস্তব দৃশ্য অবলোকন করা ছিল এক মোহনীয় দৃশ্যকল্প উপভোগ করা। আমার মা-বাবা তাঁদের সঙ্গে কবিতার অনেক বই এনেছিলেন। কাব্যগ্রন্থগুলো বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ছিল। আমি সেসময় প্রচুর কবিতা পড়েছি। নদীতে ভাসতে ভাসতে কবিতা পাঠ। সেই কবিতাগুলোর মধ্যে, কিপলিংয়ের 'মান্দালয়' কবিতাটাও ছিল। কিপলিং পড়ে আমার একটু বিভ্রান্তি হতো। আমার মনে প্রশ্নের উদয় হতো, বিভিন্ন প্রজাতির মাছের লাফালাফি ইংরেজ এই লেখক কোথায় দেখেছিলেন? বার্মার একটি শহর মৌলমিন। এই মৌলমিনে বসেই তিনি 'মান্দালয়' কবিতাটি লিখেছিলেন। আব্বা আমাকে বলেছিলেন, বার্মায় থাকতে আমরা একবার মৌলমিন শহর দেখতে গিয়েছিলাম। মান্দালয় থেকে মৌলমিন অনেকটা দূরে। যেহেতু কিপলিং কখনো মান্দালয় যাননি, তাই তিনি এত সুন্দর বৈচিত্র্যময় মাছগুলোকে 'মান্দালয় যাওয়ার পথের উপর' বসিয়ে দিয়েছিলেন।

পথের উপর? সেটি কী করে সম্ভব? আমার মনে আছে, কবিতাটি পড়ে আমার অদ্ভুত রকমের অনুভূতি হচ্ছিল। ঘুমাতে যাওয়া সময় আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে এই ইংরেজ লেখকের কাছে কেমন করে ইরাবতী নদীকে একটি রাস্তা বলে ঠাহর করা সম্ভব? অথবা কিপলিং কি এটি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে ইরাবতী নদী কোনো একটি রাস্তার পাশেই রয়েছে? যে রাস্তাটি আমি স্মরণ করতে পারছি না। এমন জরুরি সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে, সেটা ভাবতে ভাবতেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। রাত গভীর হয়ে শেষ হতে চললেও কিপলিং আমার সঙ্গেই ছিলেন, এমনকি তাঁর ভাষায় 'বজ্রপাতের মতো ভোর নেমে' আসার মুহূর্ত পর্যন্ত কিপলিং আমাকে ছেড়ে যাননি। রাত ফুরিয়ে নতুন দিনের আলো ফুটতে থাকলে আমি যখন আমার রাতের দুঃশ্চিন্তাকে নির্বাসনে পাঠানোর চিন্তা করছিলাম—নৌকায় যাপিত জীবনের আরেকটি নতুন দিনের জন্য আমার চোখ ও কান তখন আড়মোড়া ভেঙে খুলল—দুঃশ্চিন্তাগুলো নদীর জলে অতি সাবধানে আমাদের ঘিরে সাঁতার দিচ্ছিল।

প্রতিটি নদীর তীরই গ্রামের মানুষজনের আনাগোনায় পূর্ণ থাকত। কিছু গ্রাম সমৃদ্ধ; অন্যগুলো কিছুটা জীর্ণশীর্ণ বলা যায়। কিছু গ্রাম এতটাই ছোট্ট যে, দেখলে মনে হবে যেন পানির কিনারে ঝুলে আছে। দেখতে গেলে অল্পতেই ফুরিয়ে যায়। এমন ছোটখাটো গ্রাম দেখে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো তো সামান্য পানি বাড়লেই ডুবে যাওয়ার বিপদে পড়তে পারে বলে মনে হচ্ছে। আম্মা বললেন যে, হ্যাঁ, তারা তো ঝুঁকিতেই আছে। সত্যিকার অর্থে সাদা চোখে দেখে তাদের অবস্থা যা মনে হয়েছিল,তাদের প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও বিপজ্জনক ছিল। সেসব বিপন্ন গ্রাম দেখে আমার মনে হতো—নদীর তীরগুলোকে ঘেরা দিয়ে ফেললে হয়তো নদীর জলের গ্রাস থেকে সেসব গ্রাম বাঁচানো যেতে পারে। বাঙলার নদী হলো এ অঞ্চলের সমৃদ্ধির মূল উৎসগুলোর মধ্যে প্রধানতম। তবে এই নদীগুলোইআবার মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়, অকল্পনীয়ভাবে। নদীতীরের জীবন যে কতটা কঠিন সংগ্রামের, বিশেষ করে নদীভাঙন ও তার গতিপথের পরিবর্তন মানুষগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার যে সংকট তৈরি করেছে, তা আমার মনকে একবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিপদ ও সুন্দরের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তাদের মেলবন্ধন আমাকে এখনো মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুগ্ধ নয়নে সৌন্দর্য উপভোগ অন্যরকম

অনুভূতি—সে মুহূর্তে নদীদেহের মহিমা আমার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং নদীবুকের প্রাণবৈচিত্র্য দেখে আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি। মুদ্রার অন্য পিঠের বাস্তবতা কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। নদীর দ্বৈত স্বভাবের মাত্রাটি আমি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি পূর্ব বাঙলার মানুষের মনের মধ্যেও নদীর মতোই দ্বৈত স্বভাব সহজাতভাবে রয়েছে।

সাধারণত শান্ত হয়ে থাকা বাঙলার নদীগুলোর রূপের সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যের মুগ্ধতা একমাত্র মিলতে পারে নদীগুলোর বদরাগী হয়ে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মতো বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। এই দ্বৈত স্বভাবের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় নদীগুলোর নামের ভেতর। বাঙলার নদীগুলোর নামকরণে এবং তার আগে-পরে যেসব বিশেষণ দেওয়া হয়, তার সবই অতি যত্নে প্রদত্ত—এগুলো তাদের ভেতরের এই দ্বৈত স্বভাবকে খুব যত্নসহকারেই প্রকাশ করে। বাঙলা অঞ্চলে নদীর নামগুলো খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ ময়ূরাক্ষী নদী, যার লিখিত নাম 'ময়ূরাক্ষি' (ময়ূরের চোখ), রূপনারায়ণ (স্বর্গীয় সৌন্দর্য), মধুমতি (মধুর মতো মিষ্টি), ইছামতি (আমাদের বাসনাকে যে পূর্ণতা দেয়), এবং আমাদের নিকটবর্তী পদ্মা (পদ্মফুলের মতো)। নদীর এই নামের ভেতরেও প্রায়শই ঘটা বন্যা ও নদীভাঙনের বৈশিষ্ট্যগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। এই নামের ভেতরে নদীর শহর ও গ্রামকে ডুবিয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও উল্লেখ থাকে। উদাহরণস্বরূপ—পদ্মা নদীর আরেক নাম হলো কীর্তিনাশা। কীর্তিনাশা মানে হলো মানুষের সব অর্জন যে বিনাশ করে দেয়। যখন আমি ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসি, সেই স্থানান্তরকেও 'কীর্তিনাশা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কারণ, আমার জীবনের দুই ধারের মতোই এক পাড় অর্থাৎ আমার ঢাকার জীবন ভেঙেশান্তিনিকেতনেআমার জীবন গড়ার ব্যাপারটিও রয়েছে—যে জীবনটি একসময় অতি যত্নে গড়া হয়েছিল—ঢাকার জীবনের কীর্তিনাশা নদীর সে পাড় ভেঙে সেখান থেকে এর বিপরীত প্রান্তে শান্তিনিকেতনে অজেয় এক জীবন গড়া হয়েছিল। অজেয় অর্থ অপরাজেয়। বছরের অধিকাংশ সময় যে নদীটি শান্ত থাকে, বর্ষা মৌসুমে সেটি অকল্পনীয়ভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠে অনেক বড় বড় শহর-গ্রাম আর আশপাশের এলাকা একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাঙলার নদীর এই দ্বৈত স্বভাব সমাজে মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দ্বৈত ধারাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বাঙলার সমাজের ভেতর প্রবাহমান ক্ষয়িষ্ণু ও সহযোগিতার যুগল বৈশিষ্ট্যের এই পিচ্ছিল পথেই সমাজের মানুষ আস্থা রেখে চলে।

তিন.

আমাদের এক মাসের নৌ-জীবনে আমরা ছোটখাটো নদী থেকে বড়সড় নদীর দিকে যখন যাত্রা করলাম, তখন জলের রং গেল পাল্টে। ছোট নদীর জলের রং হালকা ধূসর হলেও আমরা যখন বড় নদীতে পৌছালাম, সেটির জলের রঙ তখন ছিল নীল। ধলেশ্বরী নদীর নাম রাখা হয়েছে 'ধলেশ্বরী'।এই নামকরণতার সৌন্দর্যের জন্য। ধলেশ্বরী নামটির দুটি অংশ। 'ধল' শব্দটি কিছুটা অপ্রচলিত হলেও এর অর্থ হলো'ফ্যাকাশে রং'। রং অর্থে 'ধলো' হলো সাদা রং, যা কালো রঙের বিপরীত। মেঘনা নদীর জল কৃষ্ণসুন্দর। মেঘনা নামটি মেঘ থেকে এসেছে। বর্ষা মৌসুমে আকাশে যে কালো মেঘের আনাগোনা হয়, সেই মেঘ কালো হলেও কী সুন্দরই না দেখতে! আমাদের ঘিরে থাকা বিস্তীর্ণ জলরাশি সম্ভব সব পন্থাতেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখছিল। আমি রবীন্দনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ কবিতা 'নদী' পড়তে শুরু করি। কবিতাটি আমার মনকে একেবারে বিভোর করে রাখল। ইংরেজি শব্দ 'রিভার'-এর অনেক বাংলা অর্থের ভেতর 'নদী'ই বেশির ভাগ লোকে ব্যবহার করে। যদিও নদীর আরও অনেক সমার্থক অর্থ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথতাঁর 'নদী' কবিতায় নদীকে কেন্দ্র করে মানুষ ও তাদের জীবনেরমনোমুগ্ধকর দৃশ্যকল্প তুলে

ধরেছেন। সম্ভবত এই কবিতা তিনি গঙ্গা নদীকে নিয়েই লিখেছেন। গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হলো হিমালয় পর্বতমালায়। হিমালয়ে জন্ম নিয়ে গঙ্গা নদী বহু জনপদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে সমাপ্ত হয়েছে। এই কবিতাটি পড়ে আমার অনুভবে নদীর স্বরূপ উন্মোচিত হলো। আমি এও বুঝতে পারলাম— নদী নিয়ে লোকে কেন এত শোরগোল করে।

ভ্রমণের সময় আব্বা সবসময় মানচিত্র সঙ্গে রাখতেন এবং সেটি দেখেই চলতেন। আমার মনে হতো যে বাঙলার ভূগোল বিষয়ে আমি বড়সড় একজন আবিষ্কারক। আমার মনে হতে লাগল, স্কুলের ভূগোল ক্লাসে আমার এই আবিষ্কার সম্পর্কে অন্য ছাত্রছাত্রীদের তো জানা থাকা উচিৎ। এ সম্পর্কে আমার আত্মবিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে আমার উদ্ভাবনটি কেন আমার সহপাঠীরা জানছে না, সেটা ভেবেই আমি খুব পীড়িত হতে লাগলাম। আমার আবিষ্কারটি ছিল—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হলেও, তারা কিন্তু একই হ্রদ থেকে সৃষ্ট। হ্রদটির নাম মানস সরোবর। মানস সরোবরের অর্থ হলো—মন থেকে যে জলাধারটির জন্ম হয়েছে। হিমালয়ের একেবারে চূড়ায় মানস সরোবর হ্রদ। সংস্কৃত সাহিত্যে মানস সরোবরের বিস্তর প্রশংসা করা হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীদ্বয় দুটি সম্পূর্ণ আলাদা যাত্রাপথে দীর্ঘ এক ভ্রমণ শেষে বাঙলায় প্রবেশ করে পরস্পরের হাত ধরে মিলে যায়। তাদের এই মিলন ঘটে জন্মস্থান থেকে বহুদূরে আসার পর। গঙ্গা নদী সৃষ্টি হয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিমালয়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে, উত্তর ভারতের সমতল ভূমি দিয়ে সে অগ্রসর হয়েছে। গঙ্গা নদী বিস্তীর্ণজনপদের ভেতর দিয়ে ভ্রমণেরপথ করে নিয়েছে। যাত্রাপথে যেসব ঘন বসতিপূর্ণ প্রাচীন নগর রয়েছে, সেগুলো হলো— ঋষিকেশ, কানপুর ও বানারস (ভারানসি) থেকে পাটনা। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের ব্যাপার একদমই গঙ্গার মতো নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হয়েছে হিমালয়ের উত্তর দিক দিয়ে। ব্রহ্মপুত্রের যাত্রাপথের বেশির ভাগ অংশজুড়ে রয়েছে সমতল ভূমি। গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্বতমালা থেকে শুরু করে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ব্রহ্মপুত্র ডানদিকে এমনভাবে মোড় নিয়েছে যে দেখে মনে হবে সে হিমালয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে খাতির দেখিয়ে তাকে অতিক্রম করতে চাইছে। অবশ্য ব্রহ্মপুত্রের খাতিরের ধরনটি একটু আলাদা। আমাদের ছেলেবেলার প্রিয় কোনো বন্ধুকে হারিয়ে ফেলে তারপর বহুবছর পর তাকে আবার খুঁজে পেলে যেমন আনন্দ হয়—ব্রহ্মপুত্রের আনন্দটি অনেকটা সেরকমই। আমার এমনতর উপলব্ধির সঙ্গে একটি সংজ্ঞাও যুক্ত করতে হবে, যেটি আমি শিখেছিলাম অল্প কিছুদিন আগে, স্কুলে। সেটি হলো 'দ্বীপ কাহাকে বলে?' তার সংজ্ঞা। দ্বীপের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, দ্বীপ হলো এমন একটি ভূমি, যার চারদিক প্রচুর জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। নতুন শব্দকোষ জানা থাকা একটি শিশুর তূণে তীর থাকার মতো ব্যাপার। আমি ঠিক করলাম ক্লান্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় পণ্ডিতিপনা জাহির করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো— লোকদের এই তথ্য জানানো যে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ কিন্তু শ্রীলঙ্কা নয়। সেসময় বর্তমান শ্রীলঙ্কাকে সিলন বলা হতো। কিন্তু তখন আমাদের বলা হয়েছিল, শ্রীলঙ্কা নয় বরং উপমহাদেশের পুরো ভূখণ্ডটাই আসলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মানস সরোবর হ্রদের মাঝে আটকে পড়া বৃহৎ এক দ্বীপ।

আমার এই 'আবিষ্কার'-এর কথা ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের বাতাসে ছেড়ে দিতে সাহসে না কুলালেও শান্তিনিকেতনের নিরুদ্বেগ পরিবেশে তা প্রশ্রয় পেয়ে পেকে উঠল। অবশেষে আমি আমার ভাবনার পাখিটিকে মুক্ত করতে পারলাম। আমাদের ভূগোল ক্লাসেই সবার সামনে আমি হাটে হাড়ি ভাঙলাম। নতুন কথা শুনে আমাদের ভূগোল শিক্ষক আমাকে লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, তাহলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও তো বাছা! 'ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে বৃহৎ দ্বীপ কোনটি?' শিক্ষকের এই প্রশ্ন শুনে তাকে আমার বেশ গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ মনে হলো। কারণ, আমার প্রথাভাঙা

চিন্তাধারাকে তিনি খুব একটা আমলে নেননি, তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার স্কুলের সহপাঠী বন্ধুরা সে রকম ছিল না। ভূগোল শিক্ষক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে বসলেন, 'তুমি যা বোলছো, সেটি দ্বীপের সংজ্ঞার ভেতর পড়ে না।' প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কেন পড়ে না?' জবাবে তিনি বললেন, 'দ্বীপ কাহাকে বলে সেটি ভালো করে স্মরণ করে দেখ বাছা। সংজ্ঞায় বলা আছে—দ্বীপ হবে এমন একটি ভূখণ্ড, যেটির চারদিক জল দ্বারা বেষ্টিত থাকে!' আমার প্রতিবাদী শিক্ষকটি দ্বীপের কাগুজে সংজ্ঞার শেষে অদ্ভুত একটি লেজ লাগিয়ে দিয়ে আমার ওপর তার অবশিষ্ট গোস্‌সা ঝাড়লেন। তিনি বললেন, 'দ্বীপ তাকেই বলতে হবে, যে ভূখণ্ডটির চারদিকে জল দিয়ে ঘেরা থাকবে বটে, তবে সেই জল কোনো যেনতেন জল হতে পারবে না, এমনকি নদীর কিংবা হ্রদের জল তো হবেই না, বরং সেই জল হতে হবে সাগর অথবা মহাসাগরের।' এই কথা শুনে আমি তো থ! কিন্তু আমিও তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই।

যা হোক, বর্তমানে ফিরে আসি। কয়েক সপ্তাহ আগে প্যারিসের সেইন নদীর একেবারে মাঝখানে একটি নতুন দ্বীপ জেগে ওঠা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি তখন বললাম যে, এটিকে শুধুমাত্র একটি দ্বীপ বলে ছেড়ে দিলে আমরা বড় ধরনের ভুল করব। আমাদের অবশ্যই এই জেগে ওঠা ভূখণ্ডটিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। এবং সেটি করার এখনই সময়। আমি বলেছিলাম দ্বীপটির নামকরণ অন্যকিছুর নামে করতে। প্রস্তাব হিসেবে বলেছিলাম, 'কুমিরের নামে নামকরণ করা যেতে পারে।' আমার আশপাশের লোকজনকে একটুখানি ঘা দিতে এমনটি বলেছিলাম। স্কুলে ভূগোল ক্লাসে শিক্ষকের সঙ্গে তর্কে আমি শেষপর্যন্ত জিততে পারিনি। ফলে উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপ হিসেবে স্বীকৃতিটি সিলনেরই থাকল। তবে আমার নাম স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার নামটি সুনামের ছিল না, বরং আমার কিছুটা দুর্নামই হয়েছিল মনে হয়। আমার বদনাম হওয়ার কারণ ছিল বৈকি, যেটি সুস্পষ্ট দৃশ্যমান এবং বাস্তব সেটি অস্বীকার করে, অধিকতর অস্পষ্ট ও উদ্ভট যুক্তিপ্রয়োগের পথে আমার অনিশ্চিত যাত্রার জন্যে।

চার.

শান্তিনিকেতনে অনেক আলাপ-আলোচনায় অর্থনীতি ও সমাজের সমৃদ্ধিতে নদীর ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা বেশ জোরেশোরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কারভাবে এই সম্পর্ক দেখতে পেতেন। আর এই সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতেন বলেই তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোতে যেমন এ নিয়ে লিখেছেন, ঠিক তেমনই তাঁর কবিতায়ও মানুষের সমৃদ্ধিতে নদীর ভূমিকায় সরব থেকেছেন। কিন্তু আমি আমার ছোটবেলায় নদীর তাৎপর্য সম্পর্কে জানতাম না। আমি তখন বুঝতাম না যে, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাধারায় একজন অগ্রসর অর্থনীতিবিদের ভূমিকা নিয়েছিলেন। কারণ, ব্যবসা ও বাণিজ্যে নদীর গঠনমূলক ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটি তিনি তুলে ধরেছিলেন। পরে শান্তিনিকেতন স্কুলের দিনগুলোতে অর্থনীতির ওপর নদীর যে বড় ধরনের গঠনমূলক ভূমিকা রয়েছে—এই সম্পর্কের দিকটি আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। আরও পরে যখন আমি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভর্তি হই, তখন এদিকটি আমার গবেষণার একটি বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্সিতে থাকতেই আমি অ্যাডাম স্মিথের এ-সংক্রান্ত বিশ্লেষণী লেখা পড়েছি। অ্যাডাম স্মিথ বাজার অর্থনীতির পরিগঠনে নদীবন্দরগুলোর ভূমিকা নিয়ে চমৎকার সব লেখা লিখেছেন। স্মিথের চোখে আঠারশ শতকের বাঙলা আর্থিক কর্মকাণ্ডে যেরকম সমৃদ্ধ ছিল, সেটি কেবল দক্ষ ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের কারণেই সম্ভব ছিল না, বরং অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে নির্ভরশীল ছিল নদী ও নৌচালনাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ফলে যেসব আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

এমনকি অ্যাডাম স্মিথ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের স্কেচও আঁকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন—প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা নৌচালনাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কীভাবে নতুন নতুন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পেরেছে। স্মিথ বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন বড় বড় সব খাড়ির[১] ওপর। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপের বাল্টিক সাগর[২] ও অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের[৩] কথা বলা যায়। ভূমধ্য ও কৃষ্ণসাগর উভয়কেই ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ দুটি সহভাগ করে নিয়েছে। একইভাবে আরব উপসাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং এশিয়ার সিয়াম[৪] দেশ—এগুলোই সমুদ্রবাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের মহাদেশের অভ্যন্তরে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়িয়ে তুলতে জলপথের সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারে। স্মিথের বিশ্লেষণ এটুকুতেই সীমিত ছিল না। উত্তর আফ্রিকার সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে নীল নদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সে কথা স্মিথের বিশ্লেষণের যে সাধারণ ধারাটি আমরা দেখি তাতে বেশ গুরুত্বসহকারেই এসেছে। 'আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য দেশগুলো'র অনেকখানি পিছিয়ে থাকার জন্য স্মিথ সমুদ্রপথের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতে না পারাকে কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্মিথের ভাষায় 'আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ বড় নদীগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরত্বে রয়েছে। এ বিষয়টিই অভ্যন্তরীণ নৌযোগাযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।'

এশিয়ার ঐতিহাসিক আর্থিক পশ্চাদ্‌পদতার ক্ষেত্রেও একই কারণের কথা বলেছেন স্মিথ। স্মিথ বলছেন, 'কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে, প্রাচীন স্কাইথিয়া[৫], আধুনিক তারতারি[৬] ও সাইবেরিয়ায় এশিয়া মহাদেশের অবস্থান। তারতারি উপসাগরটি পুরোটা বরফে আচ্ছাদিত থাকায় কোনো নৌযোগাযোগ সম্ভবপর নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বড় নদীগুলোর কয়েকটি সেই

১. খাড়ি হলো কোনো সাগর বা হ্রদের মতো বৃহৎ জলরাশি থেকে স্থলভাগের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া দুই বা ততোধিক দ্বীপের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জলধারা।

২. বাল্টিক সাগর হলো আটলান্টিক মহাসাগরের একটি শাখা। এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন এবং ইউরোপের উত্তর ও মধ্যভাগের ভূখণ্ড।

৩. অ্যাড্রিয়াটিক সাগর হলো ভূমধ্যসাগরের সর্ব-উত্তরের একটি শাখা। বলকান উপদ্বীপ থেকে ইতালীয় উপদ্বীপকে পৃথক করেছে এই অ্যাড্রিয়াটিক সাগর। বলকান পর্বতমালা পুরো বুলগেরিয়াজুড়ে বিস্তৃত, যেটির নামানুসারে উপদ্বীপটির নাম হয়েছে বলকান উপদ্বীপ। ইতালীয় উপদ্বীপের জন্ম উত্তরের আল্পস পর্বতমালার দক্ষিণে। এখান থেকে শুরু করে দক্ষিণের মধ্য ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ইতালীয় উপদ্বীপের বিস্তার।

৪. বর্তমান থাইল্যান্ড দেশটির পূর্বের নাম ছিল সিয়াম। থাইল্যাণ্ডের আনুষ্ঠানিক নাম কিংডম অব থাইল্যান্ড, যেটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত। এটি ইন্দোচীন উপদ্বীপের একবারে কেন্দ্রে অবস্থিত।

৫. প্রাচীন যুগে স্কাইথিয়া বলা হতো ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যাঞ্চলকে। 'স্কাইথি শবেদর আকবসারক' অর্থ হলো কাস্তে। আর স্কাইথীয় অর্থ যেসব ব্যক্তি কাস্তে দিয়ে কাটে, অর্থাৎ কাস্তেওয়ালা বা কৃষক। ইউরো-এশীয় এ অঞ্চলটিতে পূবের ইরানি কৃষকেরা বেশির ভাগ অঞ্চলজুড়ে বসবাস করতেন। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, তারা থাকতেন মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের ভিস্তুলা নদীর পূর্ব পাড়ে। গ্রিকরা অস্পষ্টভাবে ধারণা করত যে, এই কৃষকেরা ইউরোপের পূর্ব দিকের শেষ সীমানায় রয়েছে।

৬. তারতারি হলো একটি পোশাকি নাম। পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্য ও মানচিত্র অঙ্কনবিদ্যায় এশিয়া মহাদেশের এ অঞ্চলটি বড় একটি অংশ, যেটি ঘিরে রয়েছে—কাস্পিয়ান সাগর, উরাল পর্বতমালা (পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত উরাল পর্বতমালা রাশিয়ার পশ্চিমাংশ ভেদ করে চলে গেছে, আর্কটিক সাগর থেকে উরাল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি কাজাখস্তানের উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত), প্রশান্ত মহাসাগর এবং চীন ও ভারতের উত্তরাঞ্চলের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। এটির এই নামকরণ করা হয়েছিল সেই সময়ে, যখন ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদেরা এ অঞ্চল সম্পর্কে খুব কমই ধারণা রাখতেন।

দেশটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই বড় নদীগুলোর মধ্যে দূরত্ব অনেক, যা বেশ অসুবিধাজনক।' স্মিথের মানবপ্রগতির তত্ত্ব এবং আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে নদীর অবদান সম্পর্কে যতই আমি পড়েছি, ততই তাঁর ধারণাগুলো বাঙালি সংস্কৃতিতে নদীকেন্দ্রিক উৎসব উদ্‌যাপন পুরো অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনকে সমৃদ্ধ করতে তার গঠনমূলক অবদানের যোগসূত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। কলকাতায় *ওয়াইএমসি*-এর হোস্টেলের রুমে রাত জেগে স্মিথের লেখা পড়তাম। স্মিথ পড়ে ভাবতাম নদীকেন্দ্রিক বাঙালির প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সংস্কৃতির কথা, যা আমার ছেলেবেলার দিনগুলোকে একেবারে মোহিত করে রাখত।

জীবদ্দশায় অ্যাডাম স্মিথ কখনো ভারতবর্ষে আসেননি। ফলে নিজ চোখে বাস্তব ভারতবর্ষ না দেখলেও স্মিথ বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙলার মানুষের জীবনে নদীর গুরুত্ব কতখানি। বাঙলার নদী কীভাবে মানুষের যাপিত জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, তা স্মিথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। নদী এবং নদীকেন্দ্রিক বসতির ধারাটি কয়েক হাজার বছর ধরে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে এটি একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করেছে, অন্যদিকে এসব পণ্য ও ব্যবসায়ের অনেকগুলোই বিদেশে বেশ সুখ্যাতি লাভ করেছিল। শুধু তা-ই নয়, বৈশ্বিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুসন্ধানে এসব সুখ্যাত পণ্যগুলো বেশ কাজে লেগেছিল। চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ পণ্ডিত ফা-হিয়েন ৪০১ খৃষ্টাব্দে এই বাঙলা অঞ্চল থেকেই প্রাচীন শহর তাম্রলিপির কাছের নদীবন্দর থেকে একটি সাধারণ জাহাজে করে শ্রীলঙ্কায় পাড়ি জমান। এরপর তিনি সেখান থেকে জাভা হয়ে সবশেষে আবার চীনে ফেরত আসেন। চীনে ফিরে আসার আগে এবং মধ্যবর্তী সময়ে ফা-হিয়েন প্রায় ১০ বছর ভারতে ছিলেন। প্রথমে হেঁটে তিনি চীন থেকে ভারতে আসেন উত্তর দিকের ভূমি দিয়ে। এই পথে তিনি আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে হেঁটে আসেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি গঙ্গা নদীর উপর দিকে তৎকালীন পাটালিপুত্রে[৭] (বর্তমান পাটনা) বেশ কিছুদিন বিরতি ও বিশ্রাম নেন। ভ্রমণ শেষে চীনে ফেরত আসার পর ফা-হিয়েন ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আ রেকর্ড অব বুদ্ধিস্টিক কিংডমস' শীর্ষক গ্রন্থটির পুরোটাই তিনি লেখেন চীনের নানঝিং শহরে ফিরে এসে। ফা-হিয়েন রচিত এ বইটিতে তাঁর নিজের চোখে দেখা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থার বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য, বইটি চীনা ভাষায় রচিত সবচেয়ে প্রাচীন বই, যেখানে ভারত সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

৭০০ খৃষ্টাব্দে চীনের একজন অত্যন্ত মেধাবী ও উদ্যমী ছাত্র য়ি ঝিং ভারতে আসেন শ্রী বিজয়া (বর্তমানে যে অঞ্চলটির নাম সুমাত্রা) অঞ্চল দিয়ে। বাঙলার তাম্রলিপিতে আসার আগে য়ি ঝিং ভারতে থেকে এক বছরেরওবেশি সময় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় ব্যয় করেন। তাম্রলিপি থেকে তিনি নদীর উজান দিকে রওয়ানা হন এবং এসে পৌছান এমন এক জায়গায়, বর্তমানে আমরা যে অঞ্চলটিকে বিহার বলে জানি। তিনি বিহারে অবস্থিত প্রচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায় যোগ দেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় উচ্চশিক্ষার বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নালন্দার সমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চার বিকাশ ও সুখ্যাতি পঞ্চম খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ সময় পর্যন্তধীরে ধীরেসারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। য়ি ঝিং তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি

---

৭. উত্তর-পূর্ব ভারতের অধুনা পাটনা বিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর। প্রাচীন ভারতে পাটনার নাম ছিল পাটালীপুত্র। খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে এ নগরটির পত্তন করেন মগধ শাসক অজাতশত্রু। গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিকের তীরের বিহার রাজ্যের অদূরবর্তী পাটালীপুত্রকে মগধ শাসক একটি দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলেন বহিঃশত্রুর হাত থেকে সুরক্ষার জন্য।

গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে প্রথমবারের মতো তিনি জ্ঞানের অগ্রগতির বিভিন্ন তুলনামূলক আলোচনা করেন। গ্রন্থটিতে য়ি ঝিংচীনা ও ভারতীয় ঔষধশাস্ত্র ও গণস্বাস্থ্যবিদ্যা চর্চার অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্রও উপস্থাপন করেন।

৭০০ খৃষ্টাব্দের অন্তিম ক্ষণে এসে কলকাতার কাছে গঙ্গামুখটি ভারতীয় পণ্য রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বাঙলার তুলাভিত্তিক নিজস্ব তাঁত দ্রব্যের রপ্তানি ছিল বিপুল পরিমাণে। বাঙলার তাঁতীদের তৈরি উঁচুমানের বস্ত্রের (যেমন মসলিন ও রেশম কাপড়, সুগন্ধি চাল, মসলা ইত্যাদি) সুখ্যাতি ইউরোপসহ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গঙ্গামুখটিতে ছিল কলকাতা বন্দর। এখান থেকে জাহাজে করে বাঙলার উৎকর্ষিত বস্ত্রই শুধু রপ্তানি হতো না, বরং ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত সব পণ্যও (এর মধ্যে পাটনার লবণপাত্রের খ্যাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। বাঙলা অঞ্চলটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ও আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে ওঠার কারণে বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো এ অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। এটাই ছিল বিদেশি কোম্পানিগুলোর বাঙলায় আসার মূল কারণ। ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ফার্ম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও অন্য বিদেশি বাণিজ্যিক ফার্মগুলোর মতো একই কারণে বাঙলা অঞ্চলে এসেছিল। পরবর্তী সময়েইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে। ইংরেজরা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভের পর, তারাই যে সমগ্র বাঙলা অঞ্চলজুড়ে একচেটিয়াভাবে নতুন নতুন ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করছিল, তা কিন্তু নয়। আরও যারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের টানে এই বাঙলায় এসেছিল, তাদের মধ্যে ছিল—ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, প্রুসীয়, দিনেমার ও ইউরোপীয় মহাদেশের অন্য আরও অনেক দেশের বিভিন্ন কোম্পানী।এরা বাঙলা অঞ্চলে থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করত।

প্রথমদিকে পূর্ব বাঙলার অভ্যন্তরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ বেশ দুরূহ ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল নৌপথে পণ্য পরিবহনের জন্য যোগাযোগব্যবস্থাটি তখন পর্যন্ত ছিল সমস্যাসংকুল। কিছু তথ্যপ্রমাণ সাক্ষ্য দেয় যে নদীপথে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে কোম্পানিগুলো ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সম্ভাবনার নতুন আশা দেখছিল। এর কারণ ছিল, একদিকে গঙ্গার মূল আদি ধারাটি— সেসময়কার হুগলি, যেটি এখন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা—এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে পানির পরিমাণ কমে আসছিল। কারণ, সেখানে প্রচুর পরিমাণে পলি জমে গিয়েছিল। তবে অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে সময় যতই গড়াচ্ছিল পূর্ব বাঙলায় গঙ্গার পানির প্রবাহ ক্রমেই বাড়ছিল। বাঙলা অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকভাবে পলি জমার কারণকে কাজে লাগিয়ে এখানে গঙ্গার প্রবণতা ছিল—যাত্রাপথের তীরবর্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করেই ক্রমশ পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পানি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগেইগঙ্গাতার যাত্রাপথে অনেক নতুন ছোট ছোট নদীর জন্ম দিয়ে সম্মুখে এগিয়েগেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এসব শাখানদীর কথা, যার মধ্যে রয়েছে—ভৈরব, মাথাভাঙা, গড়াই-মধুমতিসহ আরও বেশকিছু নদ-নদী। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে পদ্মা যখন বিশাল এবং প্রমত্ত নদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, তখন গঙ্গার সঙ্গে তার দূরত্ব ঘুচে সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। গঙ্গার সঙ্গে পদ্মার মিলনের ফলে নতুন যে বৃহৎ মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি হলো, সেটাই গঙ্গার আদি মূলধারাকে প্রধান ধারায় পরিণত করল, যা বিপুল পরিমাণ জল পূর্ববঙ্গে তথা এখনকার বাংলাদেশে প্রবাহিত করল। গঙ্গার গতিধারার এই পরিবর্তনের ফলে তাৎক্ষণিকভাবেই পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। কারণ, নদীপথে সংযোগের এই সুবিধা পূর্ববঙ্গকে সমগ্র উপমহাদেশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার পাশাপাশি বিশ্ববাজারের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যাপক অগ্রগতি সাধনের দ্বার খুলে দিয়েছে। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গেরই অভ্যন্তরেও আর্থিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি

ঘটে। পূর্ববঙ্গের আর্থিক সমৃদ্ধির বড় প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে মুঘল শাসকদের[৮] সরকারি আয়ের বিবরণ দেখে—এ সময় খুব দ্রুততার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কোষাগার অল্প সময়ের ভেতরেই পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল। মুঘল সম্রাটদের করব্যবস্থা থেকে আয় সবচেয়ে দ্রুত হয়েছিল এই পূর্ববঙ্গ থেকেই।

দেশের বাইরেঅর্থাৎ বিদেশের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে—দ্বিতীয় শতকে জ্যোতির্বিদ টলেমি তাঁর দেশের নানা অঞ্চল নিয়ে বেশ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'গঙ্গা নদীর পাঁচ মাস' শীর্ষক আলোচনাতে তিনি সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন, গঙ্গা নদীর জলরাশি বঙ্গোপসাগরে পৌঁছাতে পাঁচ মাস সময় লাগে। টলেমির সে লেখার বর্ণনা থেকে অবশ্য নির্দিষ্টভাবে কোন কোন অঞ্চল সমৃদ্ধ ছিল এবং কোন শহরগুলো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিল, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন।তা সত্ত্বেও তাঁর আলোচনায় এ অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থার চিত্র যথেষ্ঠ প্রশংসনীয়ভাবেই ফুটে উঠেছে। এ অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির বিষয়টি মোটা দাগে অন্য যেসব লেখকের লেখায় উঠে এসেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভার্জিল[৯] এবং প্রবীণ প্লিনি[১০]। এর প্রায় দেড় হাজার বছরের বেশি সময় পরে অ্যাডাম স্মিথ তাঁর লেখায় এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে খুবই স্পষ্টভাবে স্বীকার করে গেছেন। স্মিথ যে অঞ্চলটির কথা বলেছেন, সেটি হলো সমসাময়িক সময়ের কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ।

---

৮. মুঘল শাসকেরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সময়কাল পর্যন্ত। তাদের শাসনকাল ছিল ৩০০ বছরেরও বেশি। দীর্ঘ সময়ের শাসনকালে তাদের করব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় আয় আসত বিভাজিত অঞ্চলগুলো থেকে। বিভিন্ন অঞ্চলে তারা কখনো গভর্নর প্রথা, সরকার প্রথা, জেলা কিংবা পরগনাব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক গ্রামকে মহলের আওতায় সংযুক্ত করত। শ্রমবিভাজনের মতো অঞ্চল বিভাজনের মাধ্যমে মুঘলরা শাসনব্যবস্থা চালালেও এর কেন্দ্রীয় শাসক রাজধানী থেকেই সবকিছু পরিচালনা করতেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতেন। দীর্ঘ ৩০০ বছরের বিভিন্ন সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী বহুবার বদলেছে—আগ্রা, বিহার, লাহোর, ফতেহপুর সিক্রি এবং শেষে দিল্লিতে বসে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনকাজ পরিচালনা করতেন বিভিন্ন মুঘল কেন্দ্রীয় শাসক, সুলতান বা সম্রাটরা। উদাহরণস্বরূপ—সম্রাট বাবর এতটাই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন যে, তাঁর চার বছরের শাসনকালে তিনি সরকারি আয় বা করব্যবস্থার দিকে নজর দিতে প্রায় কোনো সময়ই পাননি। বাবরের উত্তরসূরী তাঁর ছেলে হুমায়ুনও আয় বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়েই নির্বাসনে কাটিয়েছেন। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আফগান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত—শেরশাহ সুরি (জীবনকাল: ১৪৭২-১৫৪৫, মুঘল সম্রাট হিসেবে শাসন করেন: ১৫৪০-১৫৪৫)। নতুন মুঘল সম্রাট শের শাহ সুরি চমৎকার একটি ভূমি করব্যবস্থার প্রচলন করেন, যা সম্রাট হুমায়ুন ও সম্রাট আকবরের মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো মুঘল শাসক করতে পারেননি। সম্রাট শের শাহর ভূমি করব্যবস্থার ভেতর আবাদি জমির পরিমাপ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটান সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র বিখ্যাত মুঘল সম্রাট আকবর (জীবনকাল: ১৫৪২-১৬০৫, মুঘল সম্রাট হিসেবে শাসন করেন: ১৫৫৬-১৬০৫)। মহান মুঘল সম্রাট আকবর নতুন এই পদ্ধতির নাম দেন 'যাবতি' (পদ্ধতিটি লোকমুখে 'জারিব' নামেও পরিচিত)।

৯. প্রাচীন রোমান কবি ভার্জিলের পুরো নাম পাবলিয়াস ভার্জিলাস মারো। তাঁর জন্ম খৃষ্টপূর্ব সত্তুর সালে এবং তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন উনিশ খৃষ্টাব্দে। ল্যাটিন সাহিত্যে তাঁর অন্তত তিনটি কবিতা অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করে এবং সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেয়। পশ্চিমা সাহিত্যে ভার্জিলের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। বিখ্যাত দান্তের "ডিভাইন কমেডি" মহাকাব্যে ভার্জিলকে এমন একটি চরিত্রে দেখানো হয়, যিনি লেখককে দোজখে যাওয়ার ও দৈহিক মৃত্যুপরবর্তী মধ্যবর্তী অবস্থায় পৌঁছে দেওয়ার পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় থাকেন। ভার্জিলকে রোমের মহান কবিদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়।

১০. প্রবীণ প্লিনির পুরো নাম গেইউস প্লিনিয়াস সেকান্ডাস। তাঁর জন্ম তেইশ খৃষ্টাব্দে ইতালির কোমোতে এবং তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন উনআশি খৃষ্টাব্দে। প্লিনি ছিলেন একাধারে একজন রোমান লেখক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও প্রাকৃতিক দার্শনিক। তিনি রোম সম্রাটের নৌ ও সেনা কমান্ডার ছিলেন, সম্রাট ভেসপাসিয়ানের বন্ধু ছিলেন। প্লিনি "প্রকৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাস" শীর্ষক বিশাল একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যাকে বর্তমান যুগের জ্ঞানকোষ রচনার মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হয়। অবসর সময়ের অধিকাংশই তিনি পড়াশোনা, লেখালেখি, প্রকৃতির রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান ও ভূগোলবিদ্যার উন্নয়নে ব্যয় করতেন।

পাঁচ.

বাংলা সাহিত্যে নদীর রূপের মনোমুগ্ধকর বর্ণনার ধ্রুপদী ঐতিহ্য রয়েছে। এটি এত আগের কথা যে বাংলা ভাষার ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই নদীর ধারাবাহিক উপস্থিতি সবার নজর কাড়ে। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে, এক হাজার খৃষ্টাব্দে, বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হয়। সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হলেও আলাদা ব্যাকরণ তৈরির ফলে বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিপুল পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষার অন্য একটি জনপ্রিয় ধারা—'প্রাকৃত' ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার বেশ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বাংলা ভাষার পুরোনো কিংবা ধ্রুপদী গল্পগুলোতে নদীর বিপুল উপস্থিতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বহুল পঠিত ও উচ্চমার্গীয় ধ্রুপদী কাব্যগ্রন্থ "মনসামঙ্গল কাব্য"র কথা বলা যায়। এটি রচিত হয় পনের শতকের শেষ দিকে এবং কাব্যটি সম্পূর্ণরূপে নদীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়। মনসামঙ্গল কাব্যর কাহিনী গড়ে উঠেছে গঙ্গা-ভগীরথী নদীকে কেন্দ্র করে। গঙ্গা ও ভগীরথী নদীতে চাঁদ সওদাগরের দুঃসাহসিক অভিযান এবং মনসা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ও তাদের কাছে তার চূড়ান্ত পরাজয় এবং সর্পদেবী মনসার মরণদংশনে চাঁদ সওদাগরের মৃত্যুর অনিবার্যতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পরিণতির দৃশ্যকল্প কী সুন্দরভাবেই না বিধৃত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে। মনসামঙ্গল কাব্যের মঞ্চনাটকও আমি দেখেছি। মঞ্চায়নটিও ছিল এককথায় সৃষ্টিশীল ও হৃদয়গ্রাহী।

আগে অবশ্য, অর্থাৎ আমার ছেলেবেলায় মনসামঙ্গল কাব্য পড়ে আমার ভীষণ মন খারাপ হতো। কারণ, আমি চাইতাম প্রতিবাদী চাঁদ সওদাগর কদর্য সর্পদেবী মনসার বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক। আমার এও মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি জনপ্রিয় গল্প ও নাটকে মানুষের তুলনায় অতিপ্রাকৃত সত্তার অতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করার বিষয়টি লক্ষ করে খুব হতাশ হয়ে পড়তাম। আর মনে মনে ভাবতাম, এইসব অতিপ্রাকৃত সত্তা একদিন না একদিন মানুষের কাছে পরাজিত হবেই। আমার সেই প্রত্যাশার বাস্তবায়ন ঘটত কালেভাদ্রে। যখন আমি ছেলেবেলার গন্ডি পেরিয়ে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে আমেরিকায় পড়াতে এসেছি, তখন যদি কোনো দিন টেলিভিশন দেখতে বসতাম—তাহলে টেলিভিশনে শক্তিশালী অতিপ্রাকৃত চরিত্রগুলোর ভীষণ জনপ্রিয়তা দেখে কালেভদ্রে প্রত্যাশা পূরণের সেই ছিটেফোঁটা আনন্দগুলোও আমার মাটি হয়ে যেত। বিশেষ করে কেব্‌ল টিভিতে রাতের অনুষ্ঠানগুলো ছিল এসবে ভরপুর। টেলিভিশন খুলে প্রথমে ভালোকিছু দেখার আশা নিয়েই আপনি বসবেন। কাহিনীর শুরুতে আপনার মনে সেরকম বিশ্বাসই তৈরি হবে। মনে হবে যেন আপনি যে গল্পটি দেখছেন, সেটি একটি অপরাধ-রহস্য উদ্‌ঘাটনের গোয়েন্দা কাহিনী। গল্পটি গড়িয়ে এমন এক জায়গায় চলে আসবে, যেখানে ভিলেন কোণঠাসা হয়ে আত্মরক্ষার জন্য হঠাৎ তার ধারালো দাঁতসমেত বিরাট হা করল। অতঃপর সেই মুখগহ্বর থেকে হঠাৎ ১০ ফুট লম্বা বিশাল এক জিহ্বা বেরিয়ে এল। এরকম উদ্ভট দৃশ্য দেখে আমার যেমনই লাগুক না কেন, আমেরিকার প্রশিক্ষিত দর্শকেরা কিন্তু আমার মতো খুব বেশি হকচকিয়ে যান না। গল্পের কাহিনীটি যতই চরম পরিণতির দিকে এগোবে—অবশ্য গল্পের পটভূমি এভাবেই তৈরি করা—বাস্তবে আমাদের শরীরের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্টে যেতে থাকে। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে এই পৃথিবীতে যত দেশ রয়েছে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হলো জ্ঞানবিজ্ঞানে সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর দেশ। বিজ্ঞানের মাঠে অগ্রগণ্য একটি দেশের জনগণের মানসকল্পনায় কেমন করে এমনসব গল্প জনপ্রিয়তা পায়, যেখানে অতিপ্রাকৃত সত্তার ভূমিকা এতখানি প্রবল? আমেরিকায় টেলিভিশন খুলে আপনার মনে হতে পারে যে শত শত সর্পদেবীসদৃশ অতিপ্রাকৃত মনসা টিভির গল্পগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে, যেগুলো সৃষ্টিতে সৃজনশীল মেধার কোনো ধরনের ছাপই নেই। এসব গল্পের কোনো সাহিত্য-মেধার পরিচয় না থাকলেও, রাতের বেলায় টেলিভিশন থেকে হঠাৎ

বেরিয়ে আসা অতিপ্রাকৃত সত্তাগুলোর গল্প আশ্চর্যজনকভাবে জনগণের মনে ঠিকই ঠাঁই করে নিতে পেরেছে।

প্রাচীন বাঙলার নদীভিত্তিক সাহিত্যগুলোর বিষয়বস্তু (থিম) ও সমকেন্দ্রিকতায় (কনসেন্ট্রেশন) একটি অপরটি থেকে বিপুলভাবে পৃথক থাকত। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি বৌদ্ধসাহিত্য পড়ে খুব রোমাঞ্চিত হতাম। যদিও আমি সেই গল্পগুলো নানা মুখ থেকে আগেই জানতাম, পড়তে গিয়ে অনেক সময় চর্বিতচর্বণ মনে হলেও আমি উত্তেজিত হতাম। সংস্কৃত ভাষা জানা থাকায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধ্রুপদী রচনা "চর্যাপদ" (চর্যাপদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) মূল ভাষাতেই পড়ার স্বাদ পেয়েছি। মনে করা হয় চর্যাপদ রচনার কাল এক হাজার খৃষ্টাব্দ থেকে খৃষ্টাব্দ বারো শত শতাব্দীর মধ্যে। বাংলা ভাষায় লিখিত যত প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে চর্যাপদই হলো সবচেয়ে প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম। চর্যাপদ পড়তে গিয়ে এর ভাষিক গঠনে মুগ্ধ হয়ে এর বর্ণনাধারায় আবিষ্ট হতে আপনার সময় লাগবে না। কিছুটা অনুশীলনের পর আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, কীভাবে পুরোনো বাংলা শব্দ সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে আধুনিক বাংলা শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। কোনো পাঠকের ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনে আগ্রহ থাকলে দেখতে পাবেন যে, নিবেদিতপ্রাণ এসব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তাদের জীবনবোধ ও চর্চায় কোন কাজগুলোকে প্রধান্য দিতেন এবং কী কারণে সেগুলোর প্রধান্য ছিল তাদের জীবনে। চর্যাপদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ভূসুকু চর্যাপদে পদ্য রচনা করতে পারার আনন্দকে যুদ্ধে বিজয় লাভের গৌরবদীপ্ত আনন্দের মতোই উপভোগ্য বিষয় বলে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ভূসুকু প্রফুল্লভাবে লিখেছেন, চর্যাপদ লেখায় তিনি এতটাই আনন্দিত—পদ্মা নদীতে থাকা তার সব ধনসম্পদ যদি এই মুহূর্তে ডাকাতিও হয়ে যায়, তবু তার কোনো দুঃখ থাকবে না, বরং এসব থাকার ঝামেলা থেকে তিনি পরিত্রাণ পাবেন। ভূসুকু অত্যন্ত নিচু জাতের একজন মহিলাকে বিয়ে করে বললেন যে, এখন থেকে তিনি (ভূসুকু) 'একজন খাঁটি বাঙালি' হতে পেরেছেন।

সে জন্যই সিদ্ধাচার্য লিখছেন:

> *পদ্মায় যখন আমার বজরা নৌকাকে আমি প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রবলভাবে চালিত করছিলাম, তখনই ডাকাতরা আমার বজরা নৌকাতে যা-কিছু ছিল তার সবই লুটে নিয়ে আমার দুর্দশাকে চরম অবস্থায় ফেলল।*
>
> *ভূসুক, আজ তুমি খাঁটি 'বাঙালি' হতে পারলে একজন চণ্ডাল মেয়েকে স্ত্রীর মর্যাদা দানের কারণেই তুমি তা সম্ভব করেছো।*

ভূসুকু শেষপর্যন্ত জাতচ্যুত ও সম্পদবিযুক্ত হয়ে একজন গর্বিত সাম্যবাদী বাঙালি হওয়ার ধারণা নিজের বাস্তব জীবনে পরিষ্কারভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধ জাতপ্রথার রক্ষণশীলতা ভেঙে তিনি বেরিয়ে এসেছেন অনায়াসে। জাত প্রথার মইটিতে চণ্ডাল জাতটি হলো সবচেয়ে নিচের স্তরের। নিজের জাতপ্রথার সামাজিক দেয়াল ভেঙে তিনি নিচু স্তরের জাতে বিয়ে করে—বাঙালি হতে হলে যে সাম্যবাদী ভাবধারার মানুষ হতে হয়—তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়েছেন।

এক হাজার থেকে বারো শত খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'বাঙালি' অথবা 'বাঙাল' হওয়ার অর্থ কী ছিল তা চর্যাপদেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে বর্তমানে বাঙালি বলতে যা বোঝানো হয়, তার সঙ্গে চর্যাপদে বর্ণিত অর্থের মিল নেই। বাঙালি অর্থের আগের উৎস থেকে আমরা দূরে, বহুদূরে চলে এসেছি। সাম্যবাদী অর্থে বাঙালির বিকাশের জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। বরং এক হাজার খৃষ্টাব্দে 'বাঙাল' শব্দ

দিয়ে বোঝানো হতো কোনো একজন ব্যক্তি, যিনি একটি নির্দিষ্ট উপ-অঞ্চল অর্থাৎ বাঙলা অঞ্চল থেকে এসেছেন। এঅঞ্চল থেকে আগত লোকদের "বাঙ্গা"ও ডাকা হতো। এ অঞ্চলটি ভৌগোলিকভাবে পুরোপুরি এখনকার বাংলাদেশের অন্তর্গত। দীর্ঘ সময় ধরে এ অঞ্চলটির নাম ছিল "পূর্ববঙ্গ"। পুরাতন বঙ্গ অথবা বাঙ্গা বলতে যে অঞ্চলকে বোঝানো হতো, তার ভেতর বাংলাদেশের ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকায় জন্মলগ্ন থেকে ঢাকায় বসবাস করায় বাঙালির আধুনিক সংজ্ঞার মধ্যে আমি পড়ি, এবং ধ্রুপদী বর্ণনার মধ্যেও, যাকে 'বাঙালি' কিংবা 'বাঙ্গালি' বলে অভিহিত করা হয়, তার ভেতরও আমি রয়েছি। এ কারণেই আমি শুধু ভূসুকুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক অনুভব করি তা নয়, অধিকন্তু তার বৌদ্ধধর্মের চর্চার কারণেও আমার সঙ্গে তার নৈকট্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, স্কুলে পড়ার দিনগুলোতে আমি গৌতম বুদ্ধের চিন্তাভাবনার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হয়! দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হাজার বছরের পুরোনো ভূসুকুর ভাবনা-চিন্তাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যখন আমি স্কুলের বন্ধুদের উৎসাহিত করতে উদ্যেগী হলাম, সেটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল শান্তিনিকেতনে আমার সহপাঠী চীনা বন্ধুটি। আমার চীনা বন্ধুটির নাম ছিল টেন লি। ভূসুকুর বিষয়ে বন্ধু টেন লির আগ্রহ থাকলেও আমি খুব নিশ্চিত নই যে সে আমার চর্যাপদের আবৃত্তি শুনে বুঝতে পারছিল, নাকি আমার মন খারাপ হতে পারে ভেবে সে চুপচাপ আমার বাধ্যগত হয়ে বসে থাকত। অথবা এমনও হতে পারে যে ভূসুকু বিষয়ে তার সত্যি সত্যিই আগ্রহ ছিল বলেই সে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার আবৃত্তি শুনত।

ছয়.

বিগত কয়েক শত বছর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে যথেষ্ঠ রকমের পার্থক্য গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা 'বাঙাল' বলে চিহ্নিত করে থাকে। এই বাঙাল কোনো সম্মানসূচক উপাধি নয়, বরং এর দ্বারা বোঝানো হয় যে তারা পুরোপুরিভাবে অপরিপক্ক রয়ে গেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা 'ঘটি' বলে চিহ্নিত করে থাকে। এই উপাধিও সম্মানসূচক কোনো নাম নয়, বরং অবজ্ঞাই রয়েছে এতে। পূর্ববঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের পূর্ববঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার বিরুদ্ধে বাধাদানকারী হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। ঘটি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো হাতলবিহীন মগ। অবশ্য এই বিভাজনের সঙ্গে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক বিভেদের কোনো নির্দিষ্ট যোগসূত্র নেই। সেসময় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একইসঙ্গে আগের অখণ্ড বাঙলা অঞ্চলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাঙলার একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে, যা বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং বাঙলা অঞ্চলটির অন্য অংশটি ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে রয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে বাঙলা অঞ্চলের অবশিষ্টাংশ একটি রাজ্য হিসেবে যুক্ত থাকে যেটির নাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। সাতচল্লিশের রাজনৈতিক দেশভাগ ধর্মীয় ভাবধারার ভিত্তিতে সৃষ্ট হলেও দুই বাঙলার বাঙাল ও ঘটিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য বহুদিনের পুরোনো। ধর্মীয় পরিধির বিভেদের সঙ্গে এই বিভাজনের কোনো রকমের সম্পর্কই নেই। বর্তমান বাস্তবতা হলো সংখ্যগরিষ্ঠ বাঙালরা এখন মুসলমান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘটিরা বর্তমানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাসত্ত্বেও ঘটি-বাঙালের মধ্যেকার এই রেশারেশি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধর্মীয় বিভেদের সঙ্গে খুব কমই সম্পর্কিত।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিভক্তির একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আমার উপরোল্লিখিত অলোচনাসূত্রকে এগিয়ে নিতে আমরা এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক যোগসূত্রের অনুসন্ধান করব। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত এবং অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলটির অধিকাংই ছিল গৌর রাজ্যের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে গৌর রাজা ক্ষমতা লাভের আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহুদূরে রাঢ় ও সুহমা রাজা পশ্চিমবঙ্গ শাসন করত। সিদ্ধাচার্য ভূসুকু খুব স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাঙলা অঞ্চলের বিভিন্ন

অংশে আলাদা আলাদা সামাজিক প্রথা ও চর্চা প্রচলিত ছিল। অবধারিতভাবেই নানা অঞ্চলে বাংলা ভাষার উচ্চারণভঙ্গির[১১] পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রমিত ভাষাটি কিন্তু একই; যদিও তাদের বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি বেশ আলাদা। আবার এমনও দেখা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঙাল ও ঘটিদের মধ্যে কিছু মৌলিক ধারণা প্রকাশে একই শব্দগুচ্ছ চয়নের মিল রয়েছে বটে; তা সত্ত্বেও সেগুলোর উচ্চারণভঙ্গি বেশ আলাদা ধরনের। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা কিংবা শান্তিনিকেতনে 'আমি বলব'কে 'বলব' বলা হলেও একই ভাবের প্রকাশে পূর্ববঙ্গের লোকেরা 'বলব'কে বলবে 'কইব' অথবা 'কইমু'। এক্ষেত্রে দুই বঙ্গে মৌলিক ভাব ও প্রমিত প্রকাশভঙ্গি এক হলেও তাদের শব্দ চয়ন একেবারে আলাদা। ঢাকা থেকে প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে আসি, তখন প্রায়ই আমার মুখ ফসকে পূর্ববঙ্গের অঞ্চলিক উচ্চারণ বেরিয়ে যেত। প্রথম প্রথম শান্তিনিকেতনে আমার সহপাঠী বন্ধুরা আমার মুখের ভাষা শুনে কোনো এক অজানা কারণে খুব আমোদ ও মজা পেত। আমার সহপাঠী বন্ধুরা আমার নাম ধরে ডাকার বদলে আনন্দ ছড়াতে আমাকে 'কইব' বলে ডাকত। শব্দটি এতটা পরিচিতি পেয়েছিল যে আমার ডাকনামই হয়ে গেল 'কইব'। কেউ একজন আমাকে কৌতুক করে 'কইব' বলে ডাক দিত। ডাক শুনে আমি ফিরে তাকানো মাত্রই আমার সব সহপাঠী ঘটি বন্ধু সমস্বরে হাসিতে ফেটে পড়ত। সুযোগ পেলেই তারা এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করত। এমনকি আমাকে নিয়ে ঘটি বন্ধুদের এসব ঠাট্টা-তামাশা দুই বছর পর্যন্ত আমার বন্ধুমহলকে আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল। দুই বছর পর আমি বিকল্প শব্দ ব্যবহার করতে শিখলে এবং তারা একই কৌতুকের বারংবার ব্যবহারে কিছুটা ক্লান্ত ও একঘেয়ে হয়ে পড়লে এসবের সমাপ্তি ঘটল।

দুই বাঙলার সবটুকু আঞ্চলিক বিভেদের কতটুকু দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য বাঙলা নিজেই দায়ী? দুই গ্রুপের ভেতর এমন নির্দোষ কৌতুকের বিপুল ছড়াছড়ি ছিল। বাঙলা ভাগের আগে, বিশেষ করে অবিভক্ত বাঙলার রাজধানী কলকাতায় ঘটিদের সঙ্গে বাঙালদের অন্তরঙ্গতা ছিল। খুব সম্ভবত একটি বিষয়ে ঘটিদের সঙ্গে বাঙালদের ভেদরেখা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর সেটি ছিল ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য আমেরিকায় ফুটবল খেলা বলতে যে খেলাটিকে বোঝায়, সেরকম মারাত্মক খেলাকে আমি বোঝাচ্ছি না। আমি ফুটবল খেলা বলতে সকার খেলা বোঝাচ্ছি। কলকাতার বহু পুরোনো ফুটবল দল মোহনবাগানকে ঘটিরাই সবচেয়ে বেশি সমর্থন করত। মোহনবাগান দল থেকে অপেক্ষাকৃত নতুন দল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলটি বাঙালদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মীয় বিভেদের এখানে কোনো ধরনের জায়গাই ছিল না। এ ছাড়াও আলাদা আরেকটি ফুটবল দল ছিল—তারাও এই দুই দলের মতো দুর্দান্ত খেলত—মোহামেডান স্পোর্টিং। মোহামেডানে সব খেলোয়াড় যে মুসলমান ছিল তা নয়, হিন্দু খেলোয়াড়েরাও সেখানে খেলত। মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে বিপুল লোক সমাগম হতো, স্টেডিয়াম থাকত কানায় কানায় পূর্ণ। এটি কেবল তখনকার কথা নয়, এখনো এই দুই দলের খেলা থাকলে লোকে একইরকম উত্তেজনা অনুভব করে। কলকাতার অনেক মানুষই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই দুই দলের খেলা বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এর ফলাফল—অর্থাৎ কে জিতল আর কে হারল—এটা বাঁচা-মরার লড়াই। জন্মসূত্রে আমি ঢাকার ছেলে বিধায় আমি অবশ্যই ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক ছিলাম। যদিও স্টেডিয়ামে গিয়ে আমার খেলা দেখা হয়েছে জীবনে একবারই—যখন আমার বয়স ছিল ১০ বছর।

---

১১. ভাষাবিদদের মতে, ভাষার উচ্চারণভঙ্গি বা ইংরেজিতে যাকে আমরা অ্যাকসেন্ট বলে থাকি—সেটি বদলে যায় বাধা পেলে। অর্থাৎ সমতল ভূমিতে চলতে চলতে পথের মাঝে যদি কোনো পাহাড় কিংবা নদী কিংবা অন্য কোনো বাধা পড়ে তবে দুই প্রান্তের ভাষিক জনগোষ্ঠীর উচ্চারণভঙ্গিতে কম বা বেশি পার্থক্য দেখা যায়—যদিও এই দুই জনগোষ্ঠী একই ভাষিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

কিন্তু এই খেলাকে কেন্দ্র করে আমার আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। আমার আগ্রহ ধরে রাখতে পেপার-পত্রিকা সহায়ক ভূমিকা রাখত। যখন তারা দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কোনো বিশেষ মুহূর্তের ছবি পত্রিকায় ছাপত, আর আমি সেই ছবি ও রিপোর্ট অনেকক্ষণ ধরে পড়তাম। এই ঘটনার প্রায় ৫৫ বছর পর, ১৯৯৯ সালে আমি অপ্রত্যাশিত এক পুরস্কার পাই ইস্টবেঙ্গলের কাছ থেকে। আমার 'অব্যাহত সমর্থন ও ভক্তি'র জন্য ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব আমাকে তাঁদের আজীবন সদস্য করে নেয়।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলার শুধু বিনোদন নয়, আর্থিক ফলাফলও ছিল। কলকাতার বাজারে বিভিন্ন ধরনের মাছের আপেক্ষিক দামের সঙ্গেও এই খেলার ফলাফলের সম্পর্ক ছিল। বেশির ভাগ ঘটি রুই মাছকেই সেরা মাছ মনে করত এবং পূর্ববঙ্গের বাঙালরা সাধারণত ইলিশ মাছের অন্ধভক্ত হতো। খেলায় যদি মোহনবাগান জয়ী হতো, তাহলে রুই মাছের দাম বেড়ে আকাশচুম্বী হয়ে যেত। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা রাতের খাবারে রুই মাছের বিভিন্ন পদ রান্না করে এই বিজয়ের আনন্দকে উৎসবের মতো উদ্‌যাপন করত। একইরকমভাবে, ইলিশ মাছের দামও অনেক বেড়ে যেত, যদি ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারাতে পারত। তখন আমি জানতাম না যে জীবনে কোনো একদিন আমি অর্থশাস্ত্রী হবো। কারণ, সেসময় আমি গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে বেঁধে ফেলেছি। সেই সময়ে আমাকে পাওয়ার জন্য এই দুই বিষয়ের প্রতিপক্ষ ছিল কেবল সংস্কৃত। সেখানে অর্থশাস্ত্রের কোনো পাত্তাই ছিল না। কিন্তু হায়! যার অর্থশাস্ত্রের কোনো হতেখড়িই হয়নি, সে ভাবছে দাম বাড়ার কারণ কী? মাছের দাম ওঠানামার কারণ অনুসন্ধানে অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠে সে ঢুকে পড়ছে। বুঝতে চেষ্টা করছে হঠাৎ করে চাহিদা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার কারণ কী। এমনকি আমি তখন ভাবতে ভাবতে অর্থশাস্ত্রের আদি যুগের তত্ত্বও আবিষ্কার করেছিলাম—আমার মনে এসেছিল যে দামের এই অস্থিরতা স্বাভাবিকভাবে বেশিদিনের জন্য হতে পারবে না, এমনকি যদি খেলা শেষ হওয়ার আগেই যদি কারোর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবের সঙ্গে মিলেও যায়, তবু দামের এই অস্থিরতা বেশিদিনের জন্য হতে পারবে না। ভবিষ্যতে যা ঘটবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, খুচরা মাছবিক্রেতারা খেলার ফলাফলে কোন দল জিতবে বলে তারা আশা করছেন—তার সঙ্গে সম্পর্কিত 'সঠিক মাছটি'র সরবরাহ আগে থেকেই বেশি থাকে। বিজয়ী দলের মাছের সরবরাহ এই পরিমাণ করা হয়, যেন বাড়তি চাহিদার জন্য সরবরাহের ঘাটতি দেখা না দেয়, দাম অস্বাভাবিক বেড়ে না যায় এবং তা ক্রেতার ক্রয়সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ফুটবল খেলার ফলাফলের ব্যাপারে অনির্দিষ্ট আগামীর অনুমানের সঙ্গে রুই অথবা ইলিশের যেকোনো একটির দাম উঁচুতে ওঠার সম্পর্কের বিষয়টি খুব পরিষ্কার। খেলায় মোহনবাগান জিতলে রুই মাছের দাম, আর ইস্টবেঙ্গল জিতলে ইলিশ মাছের দাম বেড়ে যাওয়া কিছুতেই ঠেকানো যায় না।

বাজারদর স্থির কিংবা অস্থির হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ঠিক কোন কোন অনুমানগুলো আসলেই কাজ করেছে এবং তার ভিত্তিগুলোই বা কী? সেটি অনুসন্ধান করে বের করা ছোটখাটো আনন্দেরই ঘটনা ছিল বটে—একথা স্বীকার করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এখান থেকে আমি দ্বিতীয় উপসংহারে পৌঁছেছিলাম। সত্যিকার অর্থেই যদি অর্থশাস্ত্র বলতে এধরনের সমস্যাগুলোকে বাছাই করা বোঝায়—তাহলে এ শাস্ত্রটি আমাদের কী সুবিধা দিতে পারে—এমন প্রশ্ন আমি নিজেই নিজেকে করলাম। এতে কিছুটা বিশ্লেষণী আনন্দও রয়েছে। কিন্তু খুব সম্ভবত এটি পুরোপুরিই অকাজের আনন্দ। আমি কৃতজ্ঞ যে অর্থশাস্ত্রের প্রতি আমার সংশয়ী মনোভাব স্নাতক প্রথম বর্ষে অর্থশাস্ত্রে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমি আনন্দচিত্তে বলতে পারি, অ্যাডাম স্মিথের ধারণা ছিল নাব্যসংকটহীন নদীগুলোর সঙ্গে বিকাশমান সভ্যতাগুলোর আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপের সন্ধানে গভীর চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

সাত.

বাঙালির জীবনযাত্রা আবহমান কাল ধরে নদীকেন্দ্রিক সনাতনী ধারায় চলছে বিধায় খুব সহজাতভাবেই বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নদীভিত্তিক উপমাগুলোই ঘুরেফিরে আসত। নদী একদিকে যেমন মানুষের জীবন ধারনে সাহায্য করে এবং জীবনের সুস্থায়িত্বও দেয়। অন্যদিকে এই নদীই মানুষের বেঁচে থাকার সহায়-সম্বলকে ধ্বংস করে, এমনকি মানুষের প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এমন দ্বৈত চরিত্রের নদীকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছে ও বিকাশ লাভ করেছে, সেই সমাজের ভেতরও নদীর এই দ্বৈত স্বভাব চলে এসেছে ঠিক যেমন করে আমরা চা পানের জন্য চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই, সে রকমভাবেই সহজে ও স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি বাঙালির সত্তায় নদীর সৌন্দর্য ও বিধ্বংসী স্বভাবের দ্বৈততা নিজেদের অজান্তেই সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকে পড়েছে।

প্রখ্যাত বাঙালি উপন্যাসিক ও রাজনৈতিক প্রাবন্ধিক হুমায়ুন কবীরের রচিত "নদী ও নারী" উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। হুমায়ূন কবীর এ উপন্যাসে মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর সম্পর্ককে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে দেখিয়েছেন যে, বাঙালির জীবনে নদীর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে। আরও একজন অগ্রগণ্য বাঙালি লেখক বুদ্ধদেব বসু হুমায়ূন কবীরের নদী ও নারী গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। বাংলা জার্নাল "চতুরঙ্গে" প্রকাশিত গ্রন্থালোচনায় বুদ্ধদেব বসু হুমায়ূন কবীরের গল্পটিতে মানুষের জীবন কীভাবে প্রমত্ত পদ্মার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, সেদিকটির কথা উল্লেখ করে বলেন, *"বর্ষা মৌসুমে পদ্মা নদী কীর্তিনাশা হয়ে উঠলেও বর্ষা মৌসুম ছাড়া অর্থাৎ শরৎকালে পদ্মা থাকে যথারীতি শান্ত ও নয়নাভিরাম সুন্দর। অন্যদিকে যে পদ্মা মানুষকে এমনতর ভালো জীবন দিয়েছে—সেই পদ্মাই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় ভয়ার্ত ঝড়বাদলের যে রুদ্ররূপ নিয়ে হাজির হয়—তা দেখে মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর আশঙ্কায় তটস্থ থাকে। বৃষ্টিহীন শুষ্ক গ্রীষ্মের পর মুষলধারার বৃষ্টি যখন মানুষের তিল তিল করে গড়ে তোলা জগৎসংসারের সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়—তখন পদ্মার উল্‌টো রূপ দেখে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে।"*

বাংলা ভাষায় রচিত হুমায়ূন কবীরের নদী ও নারী উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই এর ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। উপন্যাসটির বাংলা শিরোনামে থাকা 'নারী' ইংরেজি তর্জমায় এসে তার লিঙ্গ পরিচয়টি হারায়। গ্রন্থের ইংরেজি শিরোনামটি হয় "ম্যান অ্যান্ড রিভার"। ইংরেজি গল্পটিতে ভূমিহীন একটি পরিবারের বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামের গল্প উঠে আসে। সেখানে প্রমত্ত পদ্মা নদীর যাত্রাপথের বাঁক বদলের সঙ্গে ভাসিয়ে নেওয়া একদিকের কুল ও নতুন চর সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য কুলকে সম্বল করে আকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়ার আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটি পরিবারের জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা হুমায়ূন কবীরের মতোই মুসলমান। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে তারা যার যার ধর্মের অনুসারী হলেও এই পরিবারটি অন্য দশটি নদীকেন্দ্রিক বাঙালি পরিবারের মতোই দুর্দশাগ্রস্থ। ইংরেজি অনুবাদের ভাষায়: *"আমরা জেলে। আমরা কৃষক। আমরা বাড়িঘর করি বালুর উপর, আর খানিক বাদেই নদীর জল সেগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর আমরা আবার ঘরদোর করি এরপর আবারও সেগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয় নদী। ভাঙ্গাগড়ার এই খেলা অনন্তকাল ধরে চলছে। অন্যদিকে, আমরা পতিত জমি চাষ করে সোনা ফলাই।"* আমি যখন হাইস্কুলের ছাত্র, তখন *নদী ও নারী* উপন্যাসটি বিপুলভাবে পঠিত ও আলোচিত ছিল। উপন্যাসে যেসব সমস্যা তুলে ধরা হয়েছিল, সেগুলো সবার মনোযোগ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। এককথায় উপন্যাসের গল্পটি ছিল একটি পরিবারের জীবন কীভাবে পদ্মা নদীর কারণে সমৃদ্ধির দেখা পেয়েছিল এবং সেই একই নদীর ক্রুদ্ধ ও কীর্তিনাশা রূপের কারণে তাদের জীবন কীভাবে বিপণ্ন হয়েছিল, তার মর্মস্পর্শী আখ্যান এতে রয়েছে।

যা হোক, এ ছাড়াও হুমায়ূন কবীরের "নদী ও নারী" উপন্যাসটির অন্য একটি দিকও রয়েছে, যা বিপুলভাবে সবার মনোযোগ কেড়েছিল। নদীপাড়ে বাঙালির জীবনযাপনে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে যে গড়পরতা অনিশ্চয়তার সমস্যা সবাইকেই ব্যাতিব্যস্ত করে রাখত এই দৃষ্টিকোণটির বাইরেও মূল বয়ানের সমান্তরালে একটি মুসলিম পরিবারের গল্প কিছুটা বেমানানভাবে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদীতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। ভারতে সেসময়ে কিছু বছর ধরে হঠাৎ করেই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল। বাস্তব জীবনে হুমায়ূন কবীর ছিলেন একজন মুসলমান রাজনৈতিক নেতা, যিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, সাতচল্লিশের দেশভাগের (ভারত-পাকিস্তান ভাগ) পর তিনি ভারতেই থেকে যান। ভারতে তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা এবং প্রথমসারির চিন্তাবিদ। 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত রচনা "ভারত স্বাধীন হল", যেটি অহিংস আন্দোলনের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে মানুষকে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটিতে হুমায়ূন কবীরেরও অবদান রয়েছে।

"নদী ও নারী" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৪০-এর দশকে "বাঙালি মুসলমানদের জীবনে এক সংকটময় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে।" কিন্তু সংকট থাকলেও সে সময়টি যে 'অনেক সম্ভাবনা'রও ছিল, সে কথা অন্য একজন বাঙালি সাহিত্য সমালোচক জাফর আহমেদ রাশেদ তাঁর লেখায় হুমায়ূন কবীরের সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অনেক মুসলমান রাজনৈতিক নেতা সেসময় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিষয়টিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে ইন্ধন দেন। মুসলমানদের জন্য "দ্য লাহোর ডিক্লারেশন ফর অ্যান ইন্ডিপেনডেন্ট হোমল্যান্ড" বা "একটি মাতৃভূমির জন্য লাহোর ঘোষণা"তে এই ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু "বাস্তবে আমরা আসল দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিকাশ দেখতে পাই, যেখানে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগে মাতৃভাষার দাবি এবং বিশেষত 'মুসলমান সংস্কৃতির' সর্বশ্রেষ্ঠ দাবিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে তার স্থলে সব ধর্ম, গোত্র, জাতপাত ও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও মাটির বৈচিত্র্যময় সত্তাকে একক ও অভিন্ন অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পরিণত করে।"

বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমানদের মতো একইধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় সবধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনায়। সাম্প্রদায়িক হিংসা[১২] হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে দ্রুত সবখানে ছড়িয়ে পড়লে এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক শক্তির নতুন মেরুকরণ ঘটে। নতুন এই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি পুরো বাঙলাকে নিজের হাতের মুঠোয় বন্দী করে রাখে দেশভাগ ও স্বাধীনতার আগপর্যন্ত। ১৯৪০ এর দশকে এই অশুভ শক্তির কারণেই বিপুল রক্তপাত ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি সেই সময়ে আমাদের মতো স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরাও একধরনের উদ্বেগের অবস্থা থেকে

---

১২. ইংরেজি কমিউনাল ভায়োলেন্সের অনুবাদ সাম্প্রদায়িক হিংসা করেছি। বাংলা শব্দটির মূল শব্দ সম্প্রদায় কোনো খারাপ কিছু বোঝায় না। আমরা কোনো একজন ব্যক্তির পরিচিতির জন্য হরহামেশাই বলি—তিনি অমুক সম্প্রদায়ের কিংবা অমুক বংশের লোক। কিন্তু সম্প্রদায় শব্দ থেকে সৃষ্টি হলেও সাম্প্রদায়িক শব্দটি মোটেও ভ্যালু-নিউট্রাল বা মূল্যবোধনিরপেক্ষ নিরীহ কোনো শব্দ নয়। সাম্প্রদায়িক কথাটির অর্থ হলো, কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে অন্য সব সম্প্রদায়কে অমর্যাদা বা নিচু চোখে দেখা। এটি এমন একটি সমস্যা, যেখানে একটি ভূখণ্ডে বসবাসরত অন্য সব সম্প্রদায়ের জন্য কোনোভাবেই ন্যায্য হতে পারে না। কেননা ন্যায্য হতে গেলে অন্যদেরও সমদৃষ্টিতে দেখার দাবিকে সে জায়গা দিতে পারে না। ইতিহাসে আমরা দেখি, সাম্প্রদায়িকতা কেবল মনোভাবের মধ্যে সীমিত থাকে না, বরং নিজের সম্প্রদায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবে বিদ্যমান অন্য সব সম্প্রদায়ের ওপর হিংসা, বিদ্বেষ ও পেশিশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে, অধিকারকে নষ্ট করে হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্য ঘৃণিত অপরাধ করেছে সাম্প্রদায়িক দল বা গোষ্ঠী।

মুক্ত ছিল না; বরং আমরা ওই বয়সেও এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভেতর থাকতাম। আসলে আমাদের তখন কোনো ধারণাই ছিল না—সাম্প্রদায়িক হিংসার এই বিষবাষ্প হঠাৎ করে কীভাবে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা প্রায়ই কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করতাম এই পাগলামির পথ থেকে পৃথিবীটা দ্রুত সরে আসুক। পৃথিবীটাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা কোনো কাজে আসতে পারি কি না, এমন পথের সন্ধান করতাম। তবে ভাঙা-গড়ার উভয় স্বভাবের এই নদী কিন্তু ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতি ভাবলেশহীন। নদীর এই ভাবান্তরহীন স্বভাব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে—ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র-সম্প্রদায়গত বিভাজননির্বিশেষে সব মানুষেরই দুরবস্থা সহভাগ করে নিতে হয়। হতে পারে এটাই "নদী ও নারী" উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

প্রকাশনা নীতিমালা

১. অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হবে।

   ক. বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ জার্নালে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হবে।

   খ. বিদেশি ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত প্রবন্ধ-নিবন্ধও গ্রহণযোগ্য।

২. প্রাথমিক 'যাচাই-বাছাইপ্রক্রিয়া' (*ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং*) সম্পাদকের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে—তবে প্রয়োজনবোধে সম্পাদনা পরিষদের অন্য সদস্যদের সহায়তা তিনি নেবেন। নির্ধারিত 'আঙ্গিক' (*স্টাইল*) ও 'বিন্যাস' (*ফরম্যাট*) অনুযায়ী সংশোধনের জন্য এই পর্যায়ে প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহের একটি 'সংক্ষেপিত তালিকা' (*শর্ট লিস্টেড*) প্রবন্ধকারকে পাঠানো হবে।

৩. অভ্যন্তরীণ পর্যালোচক (*রিভিউয়ার*) সাধারণত সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই মনোনীত হবেন।

৪. বহিঃস্থ পর্যালোচক (*এক্সটার্নাল রিভিউয়ার*) সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রবন্ধের বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত হবেন। সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সকল সদস্য পর্যালোচক (*রিভিউয়ার*) হতে পারবেন।

৫. দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের বছরে দুইবার সম্পাদনা পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৬. ক) সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো 'সুপারিশকৃত' (*রেফারাল*) প্রক্রিয়ায় জার্নালের জন্য বিবেচিত হবে।

   খ) সম্পাদনা পরিষদের অনুমোদনে সমিতির আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধসমূহও জার্নালে প্রকাশ করা যেতে পারে।

৭. অর্থনীতি সমিতির সদস্যবহির্ভূত যেকোনো আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত 'গ্রাহক মূল্য' (*সাবস্ক্রিপশন ফি*) প্রদান করে জার্নালের নিয়মিত গ্রাহক হতে পারবেন। সমিতির সদস্যবৃন্দ ৫০ শতাংশ হ্রাসকৃত মূল্যে জার্নাল পাবেন। এ ছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নসাপেক্ষে ৫০ শতাংশ ছাড়ে জার্নাল সংগ্রহ করতে পারবেন।

৮. জার্নালের 'পাদটীকা' (*ফুটনোটিং*) এবং 'লেখার শৈলী' (*রাইটিং স্ট্যাইল*) জার্নালের শেষ পাতায় সন্নিবেশিত রয়েছে।

বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

পাদটীকা (*ফুটনোট*) এবং লেখার শৈলী (*রাইটিং স্ট্যাইল*) নীতিমালা

১. বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করা হবে।

২. প্রতিটি প্রবন্ধ ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ *অ্যাবস্ট্রাক্ট* রাখা এবং মূল শব্দ কি-ওয়ার্ডস চিহ্নিত করাই সাধারণ রীতি। গবেষণাপ্রবন্ধ, সমকাল পর্যালোচনা ও বিদেশি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ও প্রবন্ধ নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়:

   ক. প্রবন্ধ ৬,০০০-৭,০০০

   খ. সমকাল পর্যালোচনা ২০০০-৩০০০

   গ. গ্রন্থ পর্যালোচনা ৩০০০-৪০০০

   ঘ. বিদেশি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ৩০০০-৪০০০

৩. প্রতিপাদ্য (থিম) ও সহ-প্রতিপাদ্য (সাব থিম)-এর আলোকে প্রবন্ধ সাধারণত নিম্নলিখিত শ্রেণিবিন্যাসে সন্নিবেশিত/সংগঠিত করা উচিত: ক) ভূমিকা: পটভূমি, সমস্যা ও কার্যকারণের নির্যাস উল্লেখ; খ) উদ্দেশ্য ও যুক্তিসিদ্ধ অনুমান; গ) পদ্ধতিগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ; ঘ) ফলাফল ও তার প্রভাব; চ) সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে); এবং ছ) সুপারিশ ও উপসংহার।

৪. ইংরেজি বা বাংলায় লেখা প্রবন্ধ, সমকাল পর্যালোচনার পাণ্ডুলিপির তিন (০৩) কপি প্রতিলিপি 'সম্পাদক, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ'—এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

৫. প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠে প্রতি লাইনের মাঝে দ্বিগুণ স্পেস রেখে কম্পোজ করা মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদক বরাবর জমা দিতে হবে। সিডি অথবা মেইলে অবশ্যই সফট কপি জমা দিতে হবে। শব্দ ও বাক্যের ফন্ট *SutonnyMJ* হবে এবং ফন্টের আকার বাংলায় ১২ ও ইংরেজি ১১ পয়েন্টে হতে হবে।

৬. লেখক পাণ্ডুলিপিতে তাঁর নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন। সম্পূর্ণ নাম, মেইলিং ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ একটি পৃথক পৃষ্ঠা সংযুক্ত এবং প্রবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করে সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৭. প্রবন্ধ/ নিবন্ধ/ অনুবাদ অন্য কোথাও প্রকাশের জন্য গৃহীত হলে বা প্রকাশ হলে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে। অন্যথায়, যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার দায় এককভাবে লেখক বহন করবেন।

৮. প্রবন্ধের শিরোনাম সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে সামঞ্জস্যপূর্ণ পয়েন্টে উপশিরোনাম ব্যবহার করা যেতে পারে। সম্পাদকীয় পরিষদ 'গবেষণা প্রবন্ধ, গবেষণা নিবন্ধ, বিশেষ পর্যালোচনা'র শিরোনাম পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

৯. প্রবন্ধে সারণি, গ্রাফ, চিত্র ও গাণিতিক সাইন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে শিরোনাম, উৎস ও সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

১০. যদি সম্পাদকীয় পরিষদ প্রাথমিকভাবে গৃহীত প্রবন্ধ জার্নালে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত করা বা অগ্রহণযোগ্য/অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত অপসারণ করা বা প্রবন্ধটি পুনর্মাজন/সংশোধন করা সমীচীন মনে করেন—সেক্ষেত্রে বিষয়টি লেখককে জানাবেন এবং লেখকের সম্মতিসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১১. বিশেষ কোনো নোট থাকলে তার সংখ্যা ক্রমাণুসারে বিন্যস্ত করা এবং তা প্রবন্ধের শেষে সময়কালসহ (সাল-বছর) উপস্থাপন করতে হবে ।

১২. গ্রন্থ/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কোনো উদ্ধৃত তথ্য/তত্ত্ব/বাক্য/শব্দাবলির স্বীকৃতি প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জিতে (*রেফারেন্স*) তালিকায় সময়কালসহ ক্রমাণুসারে সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে লেখকের নামের শেষ অংশটি সবার আগে দিয়ে শুরু করতে হবে—যেমন মো. এনামুল করিম (করিম, মো. এনামুল); এরপর ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃতির সূচনাকাল, গ্রন্থ/রেফারেন্স শিরোনাম এবং পৃষ্ঠা ও লাইন নম্বর এবং সবার শেষে প্রকাশনার বছর উল্লেখ করুন।

১৩. তথ্যপঞ্জির গ্রন্থ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/পর্যালোচনার শিরোনাম তির্যক (আইট্যালিক) করুন। তবে এক্ষেত্রে আপনার প্রদত্ত রেফারেন্সের তালিকারসাথে যাতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন। যেমনঃ বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

গ্রন্থ পর্যালোচনা • গ্রন্থ আলোচনা • অনূদিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

"বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে"
গ্রন্থকার: আবুল বারকাত

গ্রন্থ পর্যালোচনা

মো. আব্দুল হান্নান
অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের গ্রন্থের একটি পর্যালোচনা

মতিউর রহমান, শিশির রেজা
কভিড-১৯: বাংলাদেশের শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন, আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি ও করণীয়

গ্রন্থ আলোচনা

মহিউদ্দিন খান আলমগীর
"পুঁজিবাদ যে অসভ্য-বর্বর সে ব্যাপারে আমি ড. আবুল বারকাতের সঙ্গে একমত।"

সুশান্ত কুমার দাস
"পরিষ্কারভাবেই বলি, অনেক ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে।"

অনূদিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

"হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার"
গ্রন্থকার: অমর্ত্য সেন
অনুবাদ: আহমেদ জাভেদ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org